স্বদেশ ও সভ্যতা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক
ও
রয়্যাল এশিয়াটিক্ সোসাইটির সম্পাদক
ডাঃ কালিদাস নাগ, এম্. এ. (ক্যাল্), ডি. লিট্. (প্যারিস্)

নবম সংস্করণ

মডার্ণ বুক এজেন্সী
১০ নং, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

প্রকাশক—
শ্রীদীনেশচন্দ্র বসু, বাণী-বিনোদ
মডার্ণ বুক এজেন্সী
১০নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

১ম সংস্করণ	১৯৩৯
২য় সংস্করণ	১৯৪০
৩য় সংস্করণ	১৯৪১
৪র্থ সংস্করণ	১৯৪১
৫ম সংস্করণ	১৯৪৩
৬ষ্ঠ সংস্করণ	১৯৪৪
৭ম সংস্করণ	১৯৪৪
৮ম সংস্করণ	১৯৪৫
৯ম সংস্করণ	১৯৪৫

মুদ্রাকর
শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
এম. আই. প্রেস
৩০নং গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

নিবেদন

ভারতবর্ষ আমাদের স্বদেশ। এদেশের ইতিহাস আমাদেরই পিতৃ-পিতামহের কাহিনী,—তাঁহাদের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, ব্যর্থতা ও সাফল্যের কথাচিত্র। দেশের ও জাতির সেই বাস্তব চিত্রটি ছাত্র-ছাত্রীদের সম্মুখে যথাযথরূপে উপস্থিত করিবার জন্য 'স্বদেশ ও সভ্যতা' লিখিত হইয়াছে।

ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রাচ্য-মহাদেশের একটি বিশেষ বৈচিত্র্যপূর্ণ অধ্যায়। নানা জাতি, নানা ভাষা ও বিচিত্র রীতিনীতির সমন্বয়ে আমাদের দেশে আজ যে সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে, একখানি সামান্য পাঠ্যপুস্তকে তাহার সম্পূর্ণ পরিচয় দান করা সম্ভব নয়। অথচ ইতিহাসের মধ্যেই জাতীয় জীবনের প্রকৃত পরিচয় এবং সমগ্র জাতির ভবিষ্যৎ আশা নিহিত। অতীতের সঙ্গে বর্ত্তমানের যোগাযোগও এইখানে। এই বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি লইয়াই পুস্তকখানি রচিত। যাহাতে প্রবেশিকা শ্রেণীর বালক-বালিকারা দেশ ও জাতির প্রকৃত স্বরূপ—ভারতীয় ও বৃহত্তর-ভারতীয় সভ্যতার যথার্থ মর্ম্মকথা—অন্ততঃ আংশিক ভাবেও উপলব্ধি করিতে পারে, সেই উদ্দেশ্য লইয়া এই পুস্তক প্রণয়নে আমরা যত্নের ত্রুটি করি নাই। কতদূর সফল হইয়াছি তাহা সহৃদয় শিক্ষক মহোদয়গণের বিবেচ্য।

আশুতোষ বিল্ডিংস্,
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
নবেম্বর, ১৯৪০

বিনীত
শ্রীকালিদাস নাগ

পঞ্চম সংস্করণের ভূমিকা

অন্যান্য সংস্করণের ন্যায় স্বদেশ ও সভ্যতার চতুর্থ সংস্করণ দ্রুত নিঃশেষিত হওয়ায় আমি সর্ব্বাগ্রে শিক্ষাব্রতীগণকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্করণের ন্যায বর্ত্তমান সংস্করণেও প্রবীণ শিক্ষক ও ঐতিহাসিকগণের অভিমত স্মরণ রাখিয়া ও ছাত্রছাত্রী-গণের মানসিক বিকাশের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যথাযথ পবিবর্ত্তন ও পরিবর্জ্জন নীতি অনুসৃত হইযাছে।

ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনায় প্রথিতযশা পূর্ব্বাচার্য্য ৺রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ৺কাশীপ্রসাদ জয়শবাল, স্যব যদুনাথ সরকার, ডাঃ ভি. এ. স্মিথ, ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, অধ্যাপক অ্যাল্যান ও ডড্‌ওয়েল প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণের ঋণ অপরিশোধনীয়। এই গ্রন্থ প্রণয়নে আমার শ্রদ্ধাস্পদ সহকর্ম্মী ডাঃ হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী, ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন ও ডাঃ দীনেশচন্দ্র সরকারের গবেষণাদিও আমাকে সাহায্য করিয়াছে, সেজন্য তাঁহাদিগকে আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। আমার পরম স্নেহাস্পদ ছাত্র শ্রীমান সবসীকুমার সরস্বতী এম. এ-র নিকট হইতেও প্রভূত সাহায্য লাভ করিয়াছি; সেজন্য শ্রীমান্ বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র।

আশুতোষ বিল্ডিংস্, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
১৭ই মাঘ, ৮২ রবীন্দ্রাব্দ
ইং ৩১শে জানুয়ারী, ১৯৪৩

শ্রীকালিদাস নাগ

সপ্তম ও অষ্টম সংস্করণের ভূমিকা

দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের নানা কঠিন সমস্যার মধ্যে কাগজ ও অন্যান্য দ্রব্যের অভাব পুস্তকাদি ছাপার প্রধান অন্তরায় হইয়াছে। তথাপি এই নূতন সংস্করণের ব্যবস্থা করিয়া আমার প্রকাশক মডার্ণ বুক এজেন্সী সৎসাহসের পরিচয় দিয়াছেন; বন্ধুবর শ্রীদীনেশচন্দ্র বসুকে এজন্য সাধুবাদ প্রদান করি।

মধ্য যুগ ও আধুনিক যুগের অধ্যায়ে, লর্ড ওয়েভলের কার্য্যভার গ্রহণ ও ব্রহ্মদেশ পুনরধিকার চেষ্টা পর্য্যন্ত বহু নূতন তথ্য এই সংস্করণে সন্নিবেশিত করিয়াছি। শিক্ষার্থীদের সুবিধার জন্য বইখানি আমূল সংশোধিত করা হইয়াছে। এই কার্য্যে প্রধান উৎসাহ ও সাহায্য পাইয়াছি আমার প্রিয় ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট হইতে; তাঁহারা এখন অনেকেই শিক্ষাব্রতে সুপ্রতিষ্ঠিত। সুতরাং তাঁহাদের মতামত আমি সাদরে ও সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে গ্রহণ করিয়া শিক্ষকমণ্ডলীর নিকট এই সপ্তম ও অষ্টম সংস্করণ উপহার দিলাম।

আশুতোষ বিল্ডিংস,
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
রবীন্দ্রাব্দ ৮৩—৮৪
বিক্রমাব্দ ২০০০

শ্রীকালিদাস নাগ

নবম সংস্করণের ভূমিকা

স্বদেশ ও সভ্যতার নবম সংস্করণ প্রকাশিত হইল বিশ্ব-যুদ্ধের অবসানের সঙ্গে। ভারতের ইতিহাসে যুদ্ধের ও যোদ্ধৃ-জাতির বর্ণনা বিরল নহে। কিন্তু তৎসংক্রান্ত অনেক সমস্যার কথা তরুণ শিক্ষার্থীদের

মনে জাগিলেও তাহাদের সমাধান করা সহজ নয়। কেন ভারতের হিন্দু ও মুস্‌লিম রাজা-বাদশাগণ আমাদের প্রধান বিপদের ক্ষেত্র—বিশাল উপকূলকে সামুদ্রিক আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করেন নাই; সাময়িক ভাবে করিলেও নৌ-বাহিনী ও নৌ-শক্তির স্থায়ী ভিত্তি গড়িয়া তুলেন নাই—ইহা একটি জটিল প্রশ্ন। আভাষে তাহার উত্তর দিতে চেষ্টা করিয়াছি। মুস্‌লিম শাসনের মূল দুর্ব্বলতা এবং পাশ্চাত্য বণিক ও রাষ্ট্র-শক্তির সঙ্গে তাহার সংঘর্ষের বিষয়েও কিছু নূতন তথ্য সন্নিবেশিত হইল।

এই সংস্করণের সম্পাদনে আমার বহু অনুগত ছাত্র-ছাত্রী ও হিতার্থী শিক্ষক-বন্ধুদের সাহায্য পাইয়াছি তাহা সকৃতজ্ঞ-হৃদয়ে স্বীকার করি।

আশুতোষ বিল্ডিংস্,
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়,
ডিসেম্বর, ১৯৪৫

শ্রীকালিদাস নাগ।

প্রাপ্তিস্থান ঃ—

কলিকাতা—সমস্ত দোকান
ঢাকা—স্কুল সাপ্লাই কোম্পানী
চট্টগ্রাম—শিক্ষক সমবায় লাইব্রেরী
বর্দ্ধমান—শিক্ষাসঙ্ঘ
বাঁকুড়া—শিক্ষাসঙ্ঘ
ময়মনসিংহ—মডার্ণ বুক ডিপো
কিশোরগঞ্জ—রুদ্রেশ্বর লাইব্রেরী
দৌলতপুর—এন. সি. মজুমদার এ্যাণ্ড সন্স
বাগেরহাট—ঘোষ ব্রাদার্স
খুলনা—চট্টোপাধ্যায় ব্রাদার্স

বগুড়া—ছাত্র ভাণ্ডার
শ্রীহট্ট—চন্দ্রনাথ লাইব্রেরী
বসিরহাট—রবীন্দ্র লাইব্রেরী
গৌহাটি—ট্রায়ো ষ্টোরস্
শিলং—চপলা বুক ষ্টল
কুমিল্লা—পপুলার বুক এজেন্সি
মুন্সীগঞ্জ—ভারত এজেন্সি
কুচবিহার—গুহস্ বুক ডিপো
রংপুর—চৌধুরী ব্রাদার্স
চৌমহানী—ঠাকুর ব্রাদার্স
রাজসাহী—মডার্ণ লাইব্রেরী
কুষ্টিয়া—কুষ্টিয়া নিউ বুক ষ্টল

সূচীপত্র

প্রাচীন যুগ

বিষয় | পৃষ্ঠা

বিষয় | পৃষ্ঠা

বর্ত্তমান যুগের সূচনা

বর্ত্তমান যুগ (১৬০০-১৭৬১)

স্বদেশ ও সভ্যতা

অবতরণিকা

প্রথম অধ্যায়

আমাদের দেশ

'ইতিহাস' কাহাকে বলে?—'ইতিহাস' কথাটির সাধারণ অর্থ 'অতীতকালের বিবরণ'; কিন্তু প্রাচীন ঐতিহ্য ও বৃত্তান্তের বর্ণনামাত্রই ইতিহাস নয়। অতীত ঘটনাবলীর সঙ্গে বর্ত্তমানের যোগাযোগ কোথায় এবং ভবিষ্যতের সম্বন্ধ কি, ঐতিহাসিক তাহাই নিরূপণ করিতে চেষ্টা করেন। অতীতের সাহায্যে বর্ত্তমানের সমস্যা-সমাধানও ইতিহাসের প্রধান কাজ।

অতীতের দ্বারা বর্ত্তমানের ব্যাখ্যা।

নাম-পরিচয়। আমাদের এই দেশের নাম 'ভারতবর্ষ'। বৈদিক যুগে এদেশে 'ভরত' নামে এক রাজা রাজত্ব করিতেন। কিংবদন্তী বা ঐতিহ্য (tradition) অনুসারে ইনিই প্রথম এদেশে একচ্ছত্র সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন; তাই তাঁহার নামানুসারে এ দেশের নাম হয় 'ভারতবর্ষ'। কিন্তু বিদেশীদের কাছে ইহা এখন 'ইণ্ডিয়া' নামে পরিচিত। এই 'ইন্দিয়া' নামটি সংস্কৃত 'সিন্ধু' শব্দ হইতে উৎপন্ন। উত্তর-পশ্চিম গিরিপথ ভেদ করিয়া এদেশে প্রবেশ করিলে, সুবিশাল সিন্ধুনদ স্বভাবতঃই আগন্তুকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে; তাই প্রাচীন পারসিক ও গ্রীকদের কাছে সিন্ধুর নামানুসারেই ছিল ভারতভূমির পরিচয়। এমন কি আর্য্যগণ যখন প্রথম এখানে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন তখন তাঁহারাও তাঁহাদের সে নূতন উপনিবেশের নাম দিয়াছিলেন 'সপ্তসিন্ধু'। পারসিকেরা সিন্ধুকে উচ্চারণ করিতেন 'হিন্দু' এবং ইহা হইতেই সে যুগে ভারতীয়দের সাধারণ নাম হয় 'হিন্দু' এবং কালক্রমে এদেশেরও নাম হয় 'হিন্দুস্থান' —হিন্দুদের বাসভূমি। 'হিন্দু' নাম আবার গ্রীক ও রোমান

"ভারতবর্ষ"

"হিন্দুস্থান"

লেখকদের নিকট 'ইন্দুস্'(Indus) রূপ গ্রহণ করে। প্রাচীন এই 'ইন্দুস্' হইতেই আধুনিক 'ইণ্ডিয়া' নামের উৎপত্তি।

"ইণ্ডিয়া"

দেশ-পরিচয়।—ভারতবর্ষের মানচিত্র দেখিলে দুইটি লক্ষণ বিশেষরূপে সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে, একটি হইল ইহার বিশালতা, অপরটি ইহার পরিপূর্ণ অখণ্ডতা। একই সঙ্গে এরূপ বিশাল এবং এমন অবিচ্ছিন্ন দেশ পৃথিবীতে কমই আছে। আয়তনে ইহা প্রায় একটি মহাদেশের ন্যায়। উত্তরে হিমালয় হইতে দক্ষিণে কুমারিকা পর্য্যন্ত ইহার বিস্তৃতি প্রায় ২,০০০ মাইল এবং পূর্ব্ব ও পশ্চিমে সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত স্থানের বিস্তৃতিও প্রায় ২,২০০ মাইল। দক্ষিণ এশিয়ার এই ত্রিভুজাকার উপদ্বীপটি বিশালতায় রাশিয়া-বর্জ্জিত ইউরোপের প্রায় সমান; অথচ অখণ্ডতায় ইহা যে কোনও একটি ক্ষুদ্র দেশের সহিত তুলনীয়। একাধারে এই মহাদেশ-সুলভ বিশালতা এবং দেশ-সুলভ অবিচ্ছিন্নতা দেখিয়া ভৌগোলিকগণ ইহাকে "ক্ষুদ্রাকৃতি মহাদেশ" (Sub-continent) বা 'বর্ষ' আখ্যা দিয়াছেন। তাই এ-দেশের নাম হইয়াছে 'ভারতবর্ষ'।

ভারতবর্ষের মহাদেশীয় বিশালতা এবং দেশসুলভ অবিচ্ছিন্নতা

প্রাকৃতিক বিভাগ।—ভূ-প্রকৃতির বিচারে ভারতবর্ষ তিনটি স্বাভাবিক অংশে বিভক্ত, যথা—(১) উত্তরাঞ্চলের পার্ব্বত্য ভূ-ভাগ, (২) সিন্ধু-গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের সমভূমি এবং (৩) মধ্যভারত ও দক্ষিণাপথের মালভূমি।*

ত্রিধা-বিভক্ত ভারতভূমি

(১) উত্তরাঞ্চলের পার্ব্বত্য ভূ-ভাগ।—ভারতবর্ষের বাহিরে উত্তর-পশ্চিমের সুপ্রসিদ্ধ পামির পর্ব্বত-সন্ধি হইতে হিমালয়ের আরম্ভ। অতিকায় অজগরের ন্যায় ইহা কাশ্মীর হইতে আসাম পর্য্যন্ত এদেশের সমগ্র উত্তরসীমা বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। এজন্য অনেকে এই অঞ্চলটিকে হিমালয় প্রদেশ নামে বর্ণনা করিয়া থাকেন। আসামের পূর্ব্বপ্রান্তে ইহা ভারতবর্ষকে ব্রহ্মদেশ, তিব্বত ও চীন হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। অপরদিকে হিন্দুকুশ,

'হিমালয় প্রদেশ'

---

* অনেকে উপকূলভাগকে আর একটি স্বতন্ত্র ভৌগোলিক অংশ বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহা মালভূমিরই অঙ্গীভূত, কেননা সিন্ধু-গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের সমভূমির ন্যায় দক্ষিণাপথের সুদীর্ঘ সঙ্কীর্ণ উপকূল নিরবচ্ছিন্ন সমভূমি নয়। See Stamp. *Asia*, p. 172.

সুলেমান, প্রভৃতি পর্ব্বতশ্রেণীর দ্বারা আধুনিক ভারতবর্ষ আফগানিস্থান, রাশিয়া, ইরান ও বেলুচিস্থান হইতে বিচ্ছিন্ন। আফগানিস্থান ও বেলুচিস্থানের কিয়দংশ বর্ত্তমান 'ভারত সাম্রাজ্যে'র অন্তর্ভুক্ত হইলেও, তাহারা উপস্থিত 'ভারতবর্ষের' বাহিরে। কিন্তু প্রাচীন কালে সিন্ধু ও কাবুলনদীর সন্নিহিত সমগ্র জনপদ (Ariana) এদেশের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য হইত। বর্ত্তমান কাশ্মীর, লাদাক্, তিব্বত, নেপাল, সিকিম ও ভুটান প্রভৃতি রাজ্য এই পার্ব্বত্য বিভাগের অন্তর্গত।

'ভারত-সাম্রাজ্য' 'ভারতবর্ষ'

(২) **সিন্ধু-গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের সমভূমি।**—'হিমালয় প্রদেশ' এবং উত্তর-পশ্চিমের পর্ব্বতশ্রেণীর দক্ষিণে 'হিন্দুস্থানের বিশাল সমভূমি' বিন্ধ্য ও সাতপুরা পর্ব্বত পর্য্যন্ত বিস্তৃত। সিন্ধুনদের নিম্ন-উপত্যকায় নবগঠিত সিন্ধুপ্রদেশ। তাহারই উত্তর-পূর্ব্বে রাজপুতানার মরুভূমি আর পঞ্জাবের সমভূমি। বাস্তবিক ইহা সিন্ধু-গাঙ্গেয় উপত্যকার পশ্চিমাংশ মাত্র; আরাবল্লী পর্ব্বতশ্রেণী ইহাকে বিস্তীর্ণ গাঙ্গেয় উপত্যকা হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। রাজমহলের পাহাড় গাঙ্গেয় উপত্যকাকে দুইভাগে ভাগ করিয়াছে। নিম্নভাগে গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের ব-দ্বীপ এবং তাহারই পূর্ব্বে সঙ্কীর্ণ ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা।

'হিন্দুস্থানের সমভূমি'

(৩) **মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের মালভূমি।**—'হিন্দুস্থানের বিশাল সমভূমির' দক্ষিণে ভারতের সুবৃহৎ মালভূমি। ইহা (১) বিন্ধ্য-সাতপুরার উত্তরাঞ্চল এবং (২) ভারতীয় 'উপদ্বীপ' এই দুইটি প্রধান ভাগে বিভক্ত। সাতপুরা হইতে মালভূমি উত্তরে 'হিন্দুস্থানের সমভূমির' দিকে ঢালু হইয়া নামিয়া গিয়াছে। উপদ্বীপ-খণ্ডে মধ্য-ভারতের মালভূমি এবং দাক্ষিণাত্যের বিরাট অধিত্যকা।

মধ্য ও দক্ষিণ-ভারত

আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্য।—ভারতবর্ষের মানচিত্রে কর্কট-ক্রান্তিবৃত্তটি বিন্ধ্য পর্ব্বতের নিকট দিয়া চলিয়া গিয়াছে। ইহার দ্বারা সমগ্র দেশটি উত্তর-দক্ষিণে দুইটি প্রায় সমান অংশে বিভক্ত; উত্তরাংশ নাতিশীতোষ্ণমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী, দক্ষিণভাগ গ্রীষ্মমণ্ডলের অন্তর্গত। বিন্ধ্যের উত্তরে ভারতবর্ষের যে অংশ তাহা প্রাচীনকাল হইতে 'উত্তরাপথ' বা 'আর্য্যাবর্ত্ত' নামে প্রসিদ্ধ। বিন্ধ্যের দক্ষিণে সমগ্র উপদ্বীপটির নাম 'দক্ষিণাপথ' বা 'দাক্ষিণাত্য'। এই ত্রিভুজা-

'উত্তরাপথ' 'দক্ষিণাপথ'

কার উপদ্বীপের উন্নত শীর্ষদেশ বিন্ধ্যপর্ব্বতের দক্ষিণে অবস্থিত। তাই অনেকে আবার কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণে যে মালভূমির অবস্থিতি তাহাকে 'সুদূর দক্ষিণ' বলিয়াও অভিহিত করিয়া থাকেন। ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে ভারতবর্ষ এই তিনটি প্রধান খণ্ডে বিভক্ত; কেননা প্রত্যেকটিরই স্বতন্ত্র ঐতিহাসিক সত্তা আছে।

'সুদূর দক্ষিণ'

ত্রিধা-বিভক্ত রাজনীতি-ক্ষেত্র

ভারতবর্ষের ইতিহাসে প্রাকৃতিক প্রভাব।—ভারতবর্ষের নৈসর্গিক অবস্থা দেশবাসীর প্রকৃতির উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছে এবং সেই প্রভাবের ফলে ভারতের ইতিহাসের ধারা নানাপথে নানাভাবে প্রবাহিত হইয়াছে। বিশাল সাগর ও সুবিস্তীর্ণ নদনদী এদেশের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া ভারতভূমিকে সরস ও শস্যশ্যামল করিয়াছে। খনিজাত নানা ধনরত্নের অভাবও এদেশে নাই। প্রকৃতি এরূপ অনুকূল হওয়ায় গ্রাসাচ্ছাদনের চিন্তা এদেশের অধিবাসীদের অতি অল্পই ছিল। তাই অতি প্রাচীনকাল হইতেই ভারতীয়গণ জ্ঞানের চর্চ্চা এবং শিল্পের সাধনা করিয়াই জীবনের অধিকাংশ কাল অতিবাহিত করিয়াছেন। প্রাচীন যুগে যখন পৃথিবীর অধিকাংশ স্থান অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল, ভারত তখন সেই অন্ধকার যুগে জ্ঞানের ও সভ্যতার দীপশিখা জ্বালাইয়া তুলিয়াছিল। ভারতীয় সভ্যতার এবং সমাজের অন্তঃস্থলে দেখিতে পাই ইহার এই মৌলিকত্ব। নানা বৈদেশিক জাতির সংঘর্ষে বিপর্য্যস্ত হইয়াও ভারত তাহার ধর্ম্ম, সভ্যতা এবং সমাজের স্থিতি ও স্বাতন্ত্র্য হারায় নাই। স্থিতি ও প্রকৃতির অনুকূল পরিবেষ্টনই ভারতকে এই মানসিক স্বাতন্ত্র্য ও জাতীয় বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে। ভারতবর্ষ আবার আরব, মালয়, প্রভৃতি দক্ষিণ-এশিয়ার উপদ্বীপগুলির ঠিক মধ্যবর্ত্তী হওয়ায় এবং একদিকে চীন, পূর্ব্ব উপদ্বীপ, সুমাত্রা ও প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জ এবং অন্যদিকে পশ্চিম-এশিয়া ও আফ্রিকা-মহাদেশের মধ্যস্থানে অবস্থিত থাকায়, সুপ্রাচীনকাল হইতেই ভারত বিশ্ব-বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

ভারতের ভূ-প্রকৃতি ও তাহার ফল

ভৌগোলিক অবস্থান ও তাহার ফল

দেশের নৈসর্গিক অবস্থার বিভিন্নতা অনুসারে আমাদের দেশের বিভিন্ন প্রদেশের অধিবাসীদের প্রকৃতির মধ্যেও কিছু কিছু পার্থক্য দেখা যায়। পার্ব্বত্য প্রদেশের এবং রাজপুতানার মরু অঞ্চলের অধিবাসিগণ হিন্দুস্থানের সমতল নদীবহুল অঞ্চলের অধি-

প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য ও তাহার ফল

বাসীদের মত সহজে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে নাই ;— কষ্ট করিয়াই তাহাদের খাদ্য সংগ্রহ করিতে হইয়াছে ; সেজন্য তাহারা অপেক্ষাকৃত কষ্টসহিষ্ণু, শ্রমশীল ও সাহসী। বৈদেশিক জাতিগণ ভারতের ঐশ্বর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া, বারবার ভারতের ভাগ্য বিপর্য্যস্ত করিয়াছে। সীমান্ত প্রদেশের অধিবাসিগণকে এই সকল আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য নিয়ত যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হইতে হইয়াছিল ; তাই পঞ্জাব ও সীমান্ত প্রদেশের অধিবাসিগণ স্বভাবতঃই দুর্দ্ধর্ষ, রণনিপুণ ও কঠোর-প্রকৃতি।

ভারতীয় সভ্যতার মূলগত ঐক্য।—ভারতবর্ষের প্রায় ৩৮ কোটি লোকের মধ্যে কত বিভিন্ন জাতি, ধর্ম্ম ও ভাষা দেখিতে পাওয়া যায়। দেশভেদে ও জাতিভেদে সমাজের আচার-ব্যবহার ও রীতিনীতিরও পার্থক্য রহিয়াছে। তথাপি এই বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতার অন্তরালে একটি একতার ভাব এই বিশাল ভারতের সমগ্র অধিবাসীদিগকে এক অচ্ছেদ্য যোগসূত্রে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। ২০ কোটির অধিক হিন্দুর মধ্যে এই একতার বন্ধনটি বিশেষরূপে পরিলক্ষিত হয়। বেদ, উপনিষদ ভারতের বিভিন্ন ভাষাভাষী সকল হিন্দুরই পবিত্র ধর্ম্মগ্রন্থ এবং রামায়ণ ও মহাভারত সমস্ত হিন্দুরই জাতীয় মহাকাব্য। সকল শ্রেণীর সকল জাতির হিন্দুর একই তীর্থক্ষেত্র এবং তাহাদের উপাসনা ও মূল পূজা-পদ্ধতিও এক। দেশভেদে ভাষার পার্থক্যও হিন্দুদিগের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় সত্য, কিন্তু সংস্কৃত সমস্ত হিন্দুজাতির ধর্ম্ম-শাস্ত্র ও সাহিত্যের ভাষা-রূপে সর্ব্বত্র গৃহীত ও আদৃত হয়। সংস্কৃতের সাহায্যেই পূর্ব্বে সকল প্রদেশের শিক্ষিত সমাজে পরস্পরের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান চলিত। ভারতের ভাষাতত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, বিভিন্ন প্রদেশের ভিন্ন ভিন্ন ভাষাগুলির অধিকাংশই সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত। ইহা ব্যতীত জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে ভারতের সকল অংশের সামাজিক রীতি-নীতি ও সভ্যতার মধ্যে পাই একতার অবিচ্ছিন্ন সুর ; ইহা সমগ্র ভারতের জাতীয় জীবনে একটি মহান্ ঐক্যের বাণী জাগ্রত করিয়া রাখিয়াছে। রাষ্ট্রের দিক দিয়াও সু-প্রাচীনকাল হইতেই এক অখণ্ড ভারতের আদর্শ শক্তিমান নরপতিগণকে আসমুদ্র-হিমাচল একচ্ছত্র সাম্রাজ্য স্থাপনে উদ্বুদ্ধ

বৈচিত্র্যের অন্তরালে ঐক্য

করিয়াছে এবং কেহ কেহ সার্ব্বভৌম নৃপতির গৌরব লাভেও সমর্থ হইয়াছেন।

হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য

ভারতের হিন্দু এবং মুসলমানদিগের মধ্যে সমাজ, আচার ও আদর্শ প্রভৃতি বিষয়ে স্বভাবতই পার্থক্য আছে। কিন্তু বহু বিষয়ে পরস্পরের দ্বারা তাহারা প্রভাবান্বিত এবং একই জাতীয়তা-বোধের দ্বারা বহুকাল ধরিয়া অনুপ্রাণিত। এসিয়ার উক্ত দুইটি বিরাট সভ্যতার আদান-প্রদান ও সংমিশ্রণে যে ভাষা, শিল্প, সাহিত্য ও ভাবধারা রচিত হইয়াছে তাহা এই দুইটি সমাজের একতা-বন্ধনকে ভবিষ্যতে আরও সুদৃঢ় করিবে এবং অনেক পরীক্ষার ভিতর দিয়া ক্রমশঃ এই বন্ধনকে দৃঢ়তর করিতেছে।

STUDIES AND QUESTIONS

1. What are the natural divisions and chief physical features of India?
2. Estimate the influence of the physical features of India on the character and political destinies of India. (C. U. '23, '27).
3. What are the religious and cultural bonds that link together the different peoples of India?

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রাগৈতিহাসিক ভারতবর্ষ

প্রত্ন-প্রস্তরযুগের মানব

প্রত্ন-প্রস্তরযুগ।—ভারতবর্ষের আদিম যুগের অধিবাসীদের সম্বন্ধে খুব সামান্য তথ্যই জানিতে পারা গিয়াছে। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে পাথরের অমসৃণ যে সব অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া যায় তাহাতে মনে হয়, অতি প্রাচীনকালে যে জাতি বাস করিত তাহারা প্রত্ন-প্রস্তর-যুগের মানবের (Palæolithic man) সমজাতীয় ছিল। কোনরূপ ধাতুর ব্যবহার তাহাদের জানা ছিল না। পাথরের টুকরা একটু ঘসিয়া মাজিয়া যে অমসৃণ অস্ত্র তৈয়ারী হইত তাহারই সাহায্যে আত্মরক্ষা আর বনের পশুপক্ষী শিকার করিয়া তাহারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। চাষবাসের জ্ঞান তাহাদের ছিল না।

নব্য-প্রস্তরযুগ।—ইহাদের পরে ভারতবর্ষে যে জাতির

অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায় তাহাদিগকে নব্য-প্রস্তরযুগের মানুষ বলা যাইতে পারে। দাক্ষিণাত্যে, বিন্ধ্যপ্রদেশ ও যুক্তপ্রদেশ প্রভৃতি অঞ্চলে নব্য-প্রস্তরযুগের নানা নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে। এ যুগের লোকেরা কতকাংশে উন্নত ও সভ্য হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারা যে অস্ত্রাদি ব্যবহার করিত তাহা পাথরের হইলেও মসৃণতর ছিল। এই যুগেই পর্ব্বতগাত্রে চিত্রাদি অঙ্কন, মৃৎপাত্র নির্ম্মাণ, কৃষিকার্য্য ও পশুপালনের প্রথম সূত্রপাত হয়। মৃতদেহ কবর দিয়া তাহার উপর সমাধি রচনা করিবার প্রথাও বোধ হয় এই সময় হইতেই প্রচলন হয়। কোন কোন পণ্ডিতের মতে পার্ব্বত্য ও বন্য অঞ্চলের অনেক আদিম জাতি নব্য-প্রস্তরযুগের মানবেরই বংশধর।

নব্য-প্রস্তরযুগ

তাম্রযুগ।—নব্য-প্রস্তরযুগের লোকেরাই কালক্রমে তাম্র, লৌহ, প্রভৃতি ধাতুর ব্যবহার আরম্ভ করিয়া ইতিহাসে তাম্রযুগ, লৌহযুগ, প্রভৃতি বিভিন্ন যুগের লোক বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। আধুনিক সভ্যতা প্রধানতঃ নব্য-প্রস্তরযুগেরই বিকাশের ফল।

তাম্রযুগ

প্রাচীনযুগের সিন্ধু-সভ্যতা।—পুরাতত্ত্ববিদগণ নব্য-প্রস্তরযুগ ও তাম্রযুগের সন্ধিক্ষণের নাম দিয়াছেন 'তাম্র-প্রস্তর-যুগ'। এই সময় প্রস্তরের ব্যবহার কিছু কিছু থাকিলেও তাম্রের প্রচলন ধীরে ধীরে বাড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু দক্ষিণভারত ছাড়া লৌহের ব্যবহার তখনও জানা ছিল না। সম্প্রতি সিন্ধু উপত্যকার নানা স্থানে 'তাম্র-প্রস্তর-যুগের' সভ্যতার প্রচুর নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে। পঞ্জাবের অন্তর্গত হরপ্পা এবং সিন্ধু প্রদেশের মোহেন্-জো-দাড়ো প্রভৃতির বিস্তীর্ণ ধ্বংসাবশেষের মধ্যে আবিষ্কৃত শিল্পাদি দেখিলে এই সভ্যতার উৎকর্ষ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকে না।

এই সভ্যতা সিন্ধু উপত্যকা আশ্রয় করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল বলিয়া পণ্ডিতগণ ইহাকে 'সিন্ধু সভ্যতা' এই আখ্যা দিয়াছেন। তাঁহাদের মতে ইহার উদ্ভবকাল খৃষ্টজন্মের তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, ইহা দ্রাবিড় জাতির সৃষ্টি। মোহেন্-জো-দাড়োর সভ্যতার সঙ্গে সুদূর মেসোপোটেমিয়ার প্রাচীন সুমেরীয় সভ্যতার যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল তাহা প্রায় সর্ব্ববাদিসম্মত। অনেকের মতে সুমেরীয়গণ ছিল দ্রাবিড়জাতিরই

সিন্ধু-সভ্যতার স্রষ্টা

সম-জাতীয়। কিন্তু এ বিষয়ে এখনও কোন স্থিরসিদ্ধান্ত হয় নাই।

মোহেন্-জো-দাড়োর নগর ও নাগরিক জীবন

তাম্র-প্রস্তরযুগের এই সভ্যতা যে অত্যন্ত উন্নত শ্রেণীর ছিল সে বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই। মোহেন্-জো-দাড়োর নগর পরিকল্পনা ও পূর্ত্তকার্য্য দেখিলে বিস্ময়ে অবাক্ হইতে হয়। সমগ্র নগরটি সুবৃহৎ রাজপথের দ্বারা বিভিন্ন পল্লীতে বিভক্ত; পল্লীসমূহ চকমিলান ইমারতে সুসজ্জিত; ইমারৎগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে বিভক্ত। ইমারতের পাশ দিয়া গলি বা ছোট রাস্তা; এগুলি দিয়া রাজপথ বা অন্য গলিতে যাতায়াত করার সুবিধা ছিল। নগরের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য সুবৃহৎ পয়ঃ-প্রণালীরও ব্যবস্থা ছিল। শুধু গৃহস্থদের বাড়ীতেই নয়, সর্ব্ব-সাধারণের ব্যবহারের জন্যও স্নানাগার সন্তরণবাপী, কূপ, পায়খানা, প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যায়।
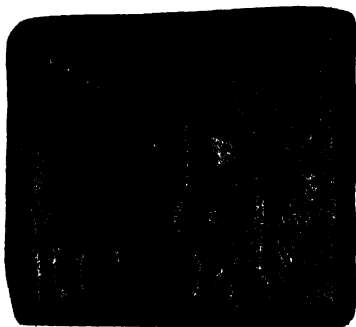
শীলমোহর (মোহন্-জো-দাড়ো)

শিল্প-কলা

সে যুগে শিল্প প্রভৃতিরও যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। পুরাবস্তুর মধ্যে নর-নারীর মূর্ত্তি, জীবজন্তুর ছবি, বিচিত্র মৃৎপাত্র, শীলমোহর, মুদ্রা, প্রভৃতি নানা দ্রব্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সকল শীলমোহরে যে লিপি উৎকীর্ণ আছে, এখনও তাহার পাঠোদ্ধার হয় নাই। তবে ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, দূর দেশের সহিত বাণিজ্যের জন্য এই সব শীলমোহর ব্যবহৃত হইত। ধাতুদ্রব্যের মধ্যে মোহেন্-জো-দাড়োয় সোনা, রূপা, তামা, টিন ও ব্রোঞ্জ পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে তামার প্রচলনই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। স্বর্ণ অলঙ্কারের প্রচুর প্রচলন ছিল। এবং পাথর বসান (জড়োয়া) অলঙ্কারেও মেয়েরা সজ্জিত হইত। তামা দিয়া অস্ত্রশস্ত্র এবং নানাপ্রকারের

গৃহস্থালীর জিনিষপত্র এবং অলঙ্কার তৈয়ারী হইত। পোড়া মাটীর মাতৃকা মূর্ত্তি এবং যোগাসনে উপবিষ্ট পুরুষ-মূর্ত্তির নিদর্শন হইতে অনেকে অনুমান করিয়াছেন যে, সে-যুগে জগন্মাতা দুর্গা (?) ও জগৎ-পিতা শিব পশুপতি (?) উভয়েরই পূজা হইত। বৃক্ষ, সর্প ও অন্যান্য জীবজন্তুর পূজারও প্রচলন তখন ছিল এরূপ প্রমাণেরও অভাব নাই।

পুরাবস্তু ও সভ্যতা

ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি

দ্রবিড় জাতি।—ঐতিহাসিক যুগে যে সকল জাতি ভারতে প্রতিষ্ঠা লাভ করে দ্রবিড় জাতি তাহাদের অন্যতম। কাহারও কাহারও মতে আর্য্যদের ন্যায় দ্রবিড়গণও সমুদ্রপথে অথবা উত্তর-পশ্চিম গিরিপথ দিয়া ভারতে প্রবেশ করে এবং এদেশের আদিম অধিবাসীদিগকে পরাজিত করিয়া বসতি স্থাপন করে। দ্রবিড়গণ অসভ্য ছিল না। তাহারা প্রধানতঃ কৃষিকর্ম্ম ও পশুপালন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত; বাণিজ্য উপলক্ষে নৌকাযোগে সাগর উত্তীর্ণ হইয়া বাবিলন প্রভৃতি দূর দেশে যাইত। তাহারা 'পুর' বা নগরে বাস করিত, ভগবানে বিশ্বাস করিত, এবং দেবালয়ে নানা দেবতা ও উপ-দেবতার পূজা

দ্রবিড়-সভ্যতা
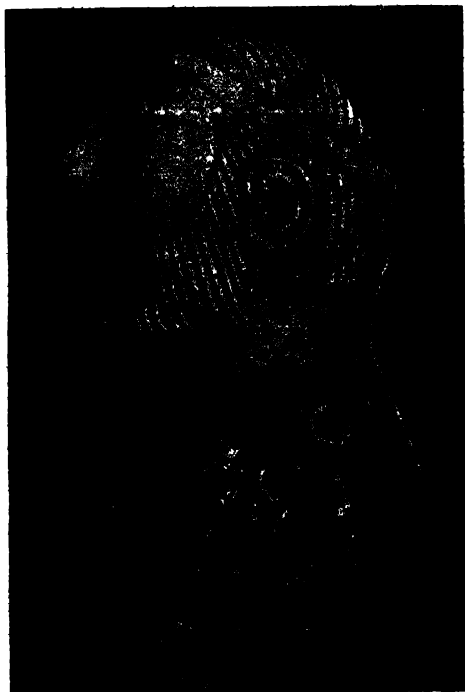
প্রস্তরমূর্ত্তি (মোহেন্-জো-দাড়ো)

দিত। দাক্ষিণাত্যের তামিল, তেলেগু, কানাড়ী ও মালেয়ালাম ভাষাভাষী লোকেরা প্রাচীন দ্রবিড় জাতির বংশধর। কিন্তু সিন্ধু-সভ্যতা প্রধানতঃ দ্রবিড় জাতির সৃষ্টি বলিয়া যে মত আছে তাহার সমর্থনে নিঃসংশয় প্রমাণ কিছুই নাই।

আর্য্যজাতি

আর্য্যজাতি।—দ্রবিড়দের সঙ্গে সঙ্গে অথবা কিছু পরে আর্য্যগণ উত্তর-পশ্চিম গিরিপথ দিয়া ভারতে প্রবেশ করেন এবং পঞ্জাব অঞ্চলে প্রথম বসতি স্থাপন করেন। ক্রমশঃ ভারতের অন্যান্য প্রদেশে আর্য্য অধিকার ও সভ্যতা বিস্তৃত হয়।

তিব্বতীয় ব্রহ্মজাতি।—স্মরণাতীত কাল হইতে উত্তর-পূর্ব্ব গিরিপথ দিয়াও নানাজাতি এদেশে প্রবেশ করিয়াছে। এই সকল জাতি 'তিব্বতীয়-ব্রহ্ম' (Tibeto-Burman) নামে পরিচিত। ইহারা মঙ্গোলীয় জাতির বিভিন্ন শাখা। নেপালী, ভুটিয়া, নাগা, কুকি, আহোম, শান, প্রভৃতি এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

অন্যান্য বৈদেশিক জাতিসমূহ।—আর্য্যদের পরও নানা জাতি ভারতবর্ষে আগমন করেন। তাঁহাদের অনেকে কালক্রমে বিশাল হিন্দু সমাজের মধ্যে মিশিয়া গিয়াছেন। খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতকে পারসিকগণ উত্তর-পশ্চিম ভারতে অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন। খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীতে ম্যাসিডনবীর আলেকজাণ্ডার ভারত আক্রমণ করেন এবং পরবর্ত্তীকালে গ্রীকগণ উত্তর-পশ্চিম ভারতে রাজ্য স্থাপনও করিয়াছিলেন। খৃঃ পূঃ প্রথম শতকে শক জাতি এদেশে প্রবেশ করে এবং ভারতের নানাস্থানে শক প্রভুত্ব স্থাপিত হয়। খৃষ্টীয় প্রথম শতকে ইউ-চি জাতীয় কুষাণগণ ভারতের উত্তর-পশ্চিমাংশে একটি বিস্তৃত সাম্রাজ্য গঠন করে। পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে মধ্য এশিয়ার হূণজাতির আক্রমণে ভারতবর্ষ বিপর্য্যস্ত হইয়া উঠে এবং হূণজাতির নানা শাখা এদেশের অনেক স্থানে বসতি স্থাপন করে। সপ্তম শতাব্দীতে পারস্যদেশ মুসলমানদের পদানত হইলে, যে মুষ্টিমেয় পারসিক পলায়ন করিয়াছিলেন তাঁহারা প্রথমে পশ্চিম-ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করেন; অধুনা তাঁহারা বোম্বাই ও গুজরাটবাসী পার্সী। এই পার্সীরাই 'অগ্নি-উপাসক' বলিয়া বিখ্যাত। মুসলমানদের মধ্যে প্রথম আরবগণ সিন্ধুদেশ জয় করেন। ইহা খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর কথা। একাদশ শতাব্দীতে নিয়মিতভাবে

পারসিক

গ্রীক

শক

কুশাণ

হূণ

পার্সী

আরব

মুসলমান-বিজয় আরম্ভ হয়। পারসিক, আফগান, তুর্কী, মুঘল, প্রভৃতি নানা জাতির দ্বারা এই বিজয়-কার্য্য অগ্রসর হয়। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দী হইতে ইউরোপীয় জাতিসমূহ ভারতবর্ষে আসিতে আরম্ভ করে এবং কালক্রমে ভারতে ইংরেজ প্রভুত্ব স্থাপিত হয়।

তুর্কী, আফগান ইঙ্গ-ইউরোপীয়

STUDIES AND QUESTIONS

1. Who are the Dravidians? What do you know about them and other pre-Aryan peoples?

2. What do you know of the Indus Civilisation of proto-historic India

3. Give a brief account of the different racial emigrations into India.

তৃতীয় অধ্যায়

বৈদিক যুগের সভ্যতা ও সংস্কৃতি

আর্য্যগণের ভারতে আগমন।—আর্য্যরা প্রথমে কোথায় বাস করিতেন তাহা বলা যায় না। কেহ কেহ বলেন তাঁহাদের পিতৃভূমি ছিল মধ্য-এসিয়া, কাহারও কাহারও মতে তাঁহারা প্রথমে মধ্য-ইউরোপে বাস করিতেন, কেহ কেহ পশ্চিম-এশিয়া, দক্ষিণ-রাশিয়া, এমন কি উত্তরমেরুও আর্য্যদের পিতৃভূমি বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। সে যাহাই হউক, কোনও এক যুগে তাঁহারা পিতৃভূমি ত্যাগ করিয়া দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়িতে থাকেন। ঠিক কোন্ সময় এই বহির্গমন আরম্ভ হয় তাহাও নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয় নাই। সম্ভবতঃ ইহা ধীরে ধীরে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া চলিতে থাকে। কালক্রমে আর্য্যদের কোন কোন শাখা ইউরোপে গিয়া বসতি স্থাপন করেন। পশ্চিম এশিয়ার আনা-টোলিয়া ও মেসোপোটেমিয়া অঞ্চলে হিটাইট্ ও মিতান্নি নামক আর্য্য জাতিসকল যে এক সময় বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন তাহার বিশিষ্ট নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। কয়েকটি আর্য্যদল বিভিন্ন সময়ে

আর্য্যদের নানা শাখা

পারস্যে আগমন করেন এবং সেখান হইতে অনেকে আবার উত্তর-পশ্চিম গিরিপথ ভেদ করিয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন।

উত্তর-পশ্চিম ভারতে আর্য্যাধিকার।—আর্য্যরা কোন্ সময় ভারতবর্ষ প্রথম অধিকার করিয়াছিলেন তাহাও নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারা যায় না, তবে অধিকাংশ পণ্ডিতদের মতে খৃষ্টের জন্মের প্রায় ২,০০০ বৎসর পূর্ব্বে আর্য্যরা ভারতে আগমন করেন। এখানে আসিয়া তাঁহারা প্রথমে পশ্চিম-সীমান্তে ও পঞ্জাব অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেন।

প্রাচীন আর্য্য-উপনিবেশ।—আর্য্যরা প্রথমে যেখানে বসতি স্থাপন করেন তাহা বৈদিক-সাহিত্যে **'সপ্তসিন্ধু'** নামে উল্লিখিত হইয়াছে। প্রাচীন পারসিকদের ধর্ম্মগ্রন্থ 'আবেস্ত'-তে উহার নাম পাওয়া যায় 'হপ্তহিন্দু'। সিন্ধু প্রভৃতি সাতটি নদীর অন্তর্গত ভূভাগকেই 'সপ্তসিন্ধু' বলা হইয়াছে। সেকালে 'সপ্তসিন্ধু' বলিতে বর্ত্তমান আফগানিস্থানের কিয়দংশ, উত্তব-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও পঞ্জাব অঞ্চল বুঝাইত। কিন্তু আর্য্যদের এই উপনিবেশ স্থাপন নির্ব্বিবাদে সম্পন্ন হয় নাই,—এখানকার আদিম অধিবাসীরা প্রাণপণে তাঁহাদিগকে বাধা দিতে চেষ্টা করিয়াছিল। আর্য্যরা এই আদিম ভারতবাসীদিগকে 'দস্যু' ও 'দাস' নামে অভিহিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের বর্ণনা হইতে জানিতে পারা যায় যে, এই তথাকথিত দস্যুরা ছিল কৃষ্ণবর্ণ ও খর্ব্বনাসিক ; আর্য্যদের ধর্ম্মের উপর স্বভাবতঃই তাহাদের কোনরূপ শ্রদ্ধা ছিল না, সুযোগ পাইলেই তাহারা নবাগত বিদেশীদের যাগযজ্ঞ পণ্ড করিয়া দিত। উত্তরকালে ইহারাই 'অনার্য্য' নামে খ্যাত হয়। 'অনার্য্য' ও 'অসভ্য' কথাদু'টি কালক্রমে প্রায় একার্থবাচক হইয়া দাঁড়াইলেও, এই অনার্য্যরা বাস্তবিক অসভ্য ছিল না। কিন্তু আর্য্যদের কাছে ধীরে ধীরে তাহাদিগকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইল ; আর্য্যরাও ক্রমে ক্রমে ইহাদের হটাইয়া আর্য্যাধিকার বিস্তার করিতে লাগিলেন।

'সপ্তসিন্ধু'

'দস্যু' ও 'দাস'

'অনার্য্য'

উত্তর ভারতে আর্য্যাধিকার।—'সপ্তসিন্ধু' হইতে আর্য্যগণ দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন। আনুমানিক খৃঃ পূঃ ১৫০০—৮০০ অব্দের মধ্যে তাঁহারা সমগ্র 'মধ্যদেশ' অধিকার করিয়া লন। সরস্বতীর দক্ষিণ হইতে অযোধ্যার সরযূ অথবা

'মধ্যদেশ'

ঐরাবতী (রাপ্তী) নদী পর্য্যন্ত ছিল মধ্যদেশের বিস্তার। মধ্যদেশে আর্য্যগণ কুরু, পঞ্চাল, মৎস্য, শূরসেন, কোশল, কৌশাম্বী, প্রভৃতি অনেকগুলি ক্ষুদ্র বৃহৎ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার পর তাঁহারা গণ্ডকী (গণ্ডক) নদী অতিক্রম করিয়া কাশী বা বারাণসী এবং বিদেহ বা উত্তর বিহার রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। সরযূ তীর হইতে বিদেহ পর্য্যন্ত অধিকার করিতে তাঁহাদের কতকাল লাগিয়াছিল তাহা বলা যায় না ; সম্ভবতঃ খৃঃ পূঃ ৮০০ অব্দের পূর্ব্বে উহা সমাপ্ত হয় নাই। দক্ষিণ ও পূর্ব্ব-বিহার এবং বঙ্গদেশ বহুকাল পর্য্যন্ত অনার্য্যদেরই বাসভূমি ছিল। খৃঃ পূঃ ৬০০ বৎসর পূর্ব্বে এ অঞ্চলে আর্য্যধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হয় নাই। গণ্ডকী তীর হইতে বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত ভূ-ভাগ প্রাকী বা প্রাচী অর্থাৎ পূর্ব্বদেশ নামে অভিহিত হইত। কালক্রমে ব্রহ্মপুত্র ও ইরাবতীর উপত্যকায়ও (বর্ত্তমান আসাম ও ব্রহ্মদেশ) আর্য্যাধিকার বিস্তৃত হয়।

'প্রাচী'

অবন্তী, সৌরাষ্ট্র, সৌবীর, প্রভৃতি জনপদসমূহে আর্য্যপ্রভাব প্রসারিত হইতে কিছু বিলম্ব হইয়াছিল। বর্ত্তমান মালব প্রদেশই প্রাচীন অবন্তী রাজ্য ; সৌরাষ্ট্র রাজ্যের অবস্থিতি ছিল কাথিয়াবাড় উপদ্বীপে, এবং সিন্ধুর নিম্ন-উপত্যকার সন্নিহিত জনপদের নাম ছিল সৌবীর। মনুসংহিতার যুগে (খৃঃ পূঃ ২০০) দ্বিতীয় শতকে উত্তরে হিমালয় হইতে দক্ষিণে বিন্ধ্য এবং পূর্ব্বে বঙ্গোপসাগর হইতে পশ্চিমে আরবসাগর পর্য্যন্ত সমগ্র উত্তর-ভারত **'আর্য্যাবর্ত্ত'** নামে বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং সে সময়ে যে উত্তরভারতে আর্য্যপ্রভাব সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমান করা চলে।

অবন্তী, সৌরাষ্ট্র, সৌবীর

মনুসংহিতায় আর্য্যাবর্ত্ত

দাক্ষিণাত্যে আর্য্যাধিকার।—বৈদেশিক যুগের শেষ-ভাগে আর্য্যগণ বিন্ধ্যপর্ব্বত অতিক্রম করিতে আরম্ভ করেন। সাত্বতগণের দ্বারা (খৃঃ পূঃ ১০০০) বর্ত্তমান বেরার প্রদেশে বিদর্ভ রাজ্য স্থাপিত হয় ; তাহাদেরই আর একটি শাখা নাসিকের নিকট দণ্ডক রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। আধুনিক বুন্দেলখণ্ডে ছিল চেদী রাজ্য। সম্ভবতঃ ইহার পরে ইক্ষ্বাকুবংশীয় আর্য্যদের দ্বারা গোদাবরী অঞ্চলে অশ্মক ও মূলক রাজ্য স্থাপিত হয়। অগস্ত্য ঋষি ও রামায়ণের কাহিনী হইতে আর্য্যদের দক্ষিণ ভারতে

বিদর্ভ, দণ্ডক, চেদি, অশ্মক, মূলক

'সুদূর দক্ষিণে' আর্য্য-প্রভাব

অভিযান সম্বন্ধে আভাস পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ গোদাবরী অতিক্রম করিয়াও তাঁহারা অনার্য্যদের সঙ্গে অনেক যুদ্ধবিগ্রহ করিয়াছিলেন। কিন্তু উত্তর-ভারতের ন্যায় দাক্ষিণাত্যে আর্য্য-প্রভাব সুদৃঢ় হইয়া উঠিতে পারে নাই। দাক্ষিণাত্যে আর্য্য রাজ্য-সমূহের আশেপাশে অনেক অনার্য্য-রাজ্য ছিল। বিন্ধ্য ও নর্ম্মদা নদীর মধ্যবর্ত্তী ভূ-ভাগে 'পুলিন্দ','নিষাদ', প্রভৃতি অনার্য্য জাতি বাস করিত। উড়িষ্যার পার্ব্বত্য অঞ্চলে 'শবর' এবং বৈতরণী নদী হইতে গোদাবরী পর্য্যন্ত উপকূলভাগে 'কলিঙ্গ'দের বাস ছিল; কলিঙ্গ দেশের দক্ষিণে গোদাবরী হইতে কৃষ্ণা পর্য্যন্ত ছিল তেলেগু-ভাষী 'অন্ধ্র' নামে আর একটি অনার্য্য জাতির বাসভূমি। অপেক্ষাকৃত দক্ষিণে ছিল 'তামিল' কানাড়ী, মালেয়ালী, প্রভৃতি জাতিসমূহ।

দাক্ষিণাত্যের অনার্য্যগণ

ভারতবর্ষে আর্য্যাধিকারের বিশেষত্ব।—আর্য্যগণ সুদীর্ঘকাল ধরিয়া অতি ধীরে ধীরে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করিতেছিলেন। ভারতে আর্য্যাধিকারের ইতিহাস শুধু যুদ্ধ-বিগ্রহেরই ইতিহাস নয়; এই সময়ে আর্য্য এবং অনার্য্যদের মিলন ও সমন্বয়ের ভিতর দিয়া সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় জীবনেও নানা গুরুতর পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল। সে সকল পরিবর্ত্তনের ফলে উভয় জাতির মধ্যে যোগসূত্র গড়িয়া উঠিয়া এক নিখিল-ভারতীয় সংস্কৃতির উদ্ভব হয়।

আর্য্য অনার্য্যের সমন্বয়

আর্য্য-সাহিত্য।—আর্য্যদের প্রাচীনতম গ্রন্থের নাম 'বেদ'। 'বেদ' শব্দের অর্থ জ্ঞান। সেকালে হিন্দুদের বিশ্বাস ছিল যে, বেদ বা বেদমন্ত্রসমূহ মানুষের রচনা নয়—স্বয়ং পরমেশ্বরের বাণী। এজন্য বেদকে 'নিত্য' ও 'অপৌরুষেয়' বলা হইত। বেদমন্ত্রসমূহ দেবকুল হইতে শ্রুতবাক্য বলিয়া বেদের আর এক নাম 'শ্রুতি'। বেদ চারিভাগে বিভক্ত যথা—ঋক, সাম, যজু, ও অথর্ব্ব। প্রত্যেক বেদ আবার 'সংহিতা' ও 'ব্রাহ্মণ' এই দুই অংশে বিভক্ত। সংহিতাভাগ পদ্যে রচিত,—উহা গাথা ও বেদমন্ত্রের সমষ্টি; ব্রাহ্মণ ভাগ প্রধানতঃ গদ্যে লিখিত,—উহা যাগযজ্ঞের বিধিনির্দ্দেশ। সংহিতা ও ব্রাহ্মণ ব্যতীত বেদের 'আরণ্যক' ও 'উপনিষৎ' নামে আরও দুইটি দার্শনিক বিভাগ পরবর্ত্তী যুগে গড়িয়া উঠে।

'বেদ'

'শ্রুতি'

'সংহিতা' ও 'ব্রাহ্মণ'

'আরণ্যক' ও 'উপনিষৎ'

বেদচতুষ্টয়ের মধ্যে ঋগ্বেদ প্রাচীনতম। সামবেদের অধিকাংশ

মন্ত্রই ঋগ্বেদ হইতে সঙ্কলিত ; এবং যজ্ঞকালে সামমন্ত্রসমূহ ছন্দমাত্রা ও সুর সংযোগে গীত হইত। যজুর্ব্বেদে যজ্ঞের ক্রিয়াকলাপের জন্য প্রয়োজনীয় মন্ত্রের সঙ্কলন করা হইয়াছে। অথর্ব্ববেদ বৈদিক যুগের শেষ ধর্ম্মগ্রন্থ ; ইহাতে সৃষ্টি-রহস্য, পৃথিবীর স্তব, ব্রাত্য (শূদ্র)—বন্দনাদির সঙ্গে নানারূপ চিকিৎসা দুর্বোধ্য সঙ্কেত ও শত্রুনাশের মন্ত্র রহিয়াছে। ঋক্-সংহিতার রচনাকাল সম্ভবতঃ খৃঃ পূঃ ২০০০ হইতে ১৫০০ অব্দের মধ্যে। অন্যান্য সংহিতা ও ব্রাহ্মণসমূহ আনুমানিক ১৫০০ হইতে ৮০০ খৃঃ পূর্ব্বাব্দের মধ্যে রচিত হয় ; উপনিষৎগুলির রচনাকাল ৮০০ হইতে ৫০০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দ। অবশ্য এ সকল বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ আছে।

বেদচতুষ্টয়

বৈদিক সাহিত্যের রচনাকাল

বেদ বা শ্রুতি সাহিত্য বিপুল ও জটিল হইয়া উঠিলে, তাহাদের সংক্ষিপ্তসার হিসাবে 'সূত্র' গ্রন্থগুলি রচিত হয়। ছয় বেদাঙ্গ ও ষড়দর্শন এই সূত্র সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। ষড়দর্শন বলিতে কপিলের সাংখ্য, পতঞ্জলির যোগ, গৌতমের ন্যায়, কণাদের বৈশেষিক, জৈমিনির পূর্ব্বমীমাংসা, এবং ব্যাসের উত্তরমীমাংসা বা বেদান্ত এই কয়টি দর্শনশাস্ত্র বুঝায়। বেদাঙ্গ বলিতে বুঝাইত বেদ পাঠের জন্য অপরিহার্য্য ছয়টি বিদ্যা, যথা—শিক্ষা (উচ্চারণ), ছন্দঃ, ব্যাকরণ, নিরুক্ত (শব্দসমূহের বুৎপত্তি), জ্যোতিষ এবং কল্প (যজ্ঞাদি)। নিরুক্ত ও ব্যাকরণ রচনায় যথাক্রমে যাস্ক ও পানিনি এই দুই মহামনীষীর নাম অক্ষয় হইয়া আছে। কল্পসূত্র নানা শাখায় বিভক্ত ; শ্রৌতসূত্রে যাগ-যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান পদ্ধতি লিপিবদ্ধ হইয়াছে ; শুল্বসূত্রে পাই যজ্ঞবেদী প্রভৃতি নির্ম্মাণের ব্যবস্থা,—ইহা হইতেই হিন্দু জ্যামিতি ও রেখা গণিতের উদ্ভব ; গৃহ্যসূত্রে গার্হস্থ্য ও সমাজ জীবনের বিধি-নির্দ্দেশ এবং ধর্ম্মসূত্রে সমাজ ও রাষ্ট্র শাসন বর্ণিত হইয়াছে। এই সকল গ্রন্থই পরবর্ত্তীকালে বিরাট হিন্দু স্মৃতি বা ধর্ম্মশাস্ত্র নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ধর্ম্মসূত্র অবলম্বন করিয়াই উত্তরকালে মনুসংহিতা, যাজ্ঞবল্ক্য-স্মৃতি, প্রভৃতি রচিত হয়। সূত্রগ্রন্থগুলি সম্ভবতঃ ৬০০—২০০ খৃঃ পূঃ মধ্যে রচিত হইয়াছিল।

সূত্র-সাহিত্য—ষড়দর্শন ও বেদাঙ্গ

ধর্ম্মশাস্ত্র ব্যতীত আর্য্যগণ অর্থশাস্ত্র (রাজনীতি), কামশাস্ত্র (ভোগনীতি), আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ, হস্তিশাস্ত্র, অশ্বসূত্র, শিল্প ও

সঙ্গীতশাস্ত্র, নাট্যশাস্ত্র, স্থাপত্য বিদ্যা, কারুকর্ম্ম, প্রভৃতি নানা পার্থিব জ্ঞানবিজ্ঞান বিষয়েও অনেক মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করিয়া- ছিলেন। প্রাচীন বিজ্ঞানের বিকাশে হিন্দুদের দানের তুলনা নাই।

আর্য্য-ধর্ম্ম।—প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন শক্তিকে দেবদেবীরূপে কল্পনা করিয়া আর্য্যগণ তাঁহাদের আরাধনা করিতেন। রবিকরোজ্জ্বল অনন্ত আকাশ তাঁহাদের নিকট হইলেন স্বর্গের দেবতা 'দ্যৌঃ', ইনিই গ্রীকদিগের নিকট 'জিউস' (Zeus) এবং রোমানদিগের নিকট জুপিটর (Jupiter) নাম ধারণ করিয়া দেবরাজে পরিণত হন। পরে অনন্ত জলরাশি বা মহাসমুদ্রের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা বরুণ, আর বৃষ্টি ও বজ্রের দেবতা ইন্দ্র, শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। অগ্নি, সূর্য্য, মরুৎ (বায়ু), উষা, সরস্বতী, পৃথিবী, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, যম, প্রভৃতিও আর্য্যদের প্রধান উপাস্য দেবতা ছিলেন। কিন্তু বহু দেবদেবীর উপাসনা করিলেও সকল দেবতা যে এক অদ্বিতীয় মহাশক্তিরই বিভিন্ন রূপ এ ধারণা আর্য্যদের কাছে অজ্ঞাত ছিল না। ক্রমশঃ তাঁহারা হিন্দু ভাবধারার মূলভিত্তি কর্ম্মফলবাদ ও জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী হন।

আর্যাদের দেবদেবী

একেশ্বরবাদ

কর্ম্মফল ও জন্মান্তরবাদ

দেবতার উদ্দেশ্যে অগ্নিতে আহুতি দান ও স্তব-স্তুতি পাঠই ছিল আর্য্যদের ধর্ম্মাচরণের সহজ প্রণালী। উপাসকগণ নিজেরাই এভাবে আরাধনা করিতেন। কালক্রমে নানা বিধি-নির্দ্দেশের দ্বারা যাগ-যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান জটিল হইয়া উঠিলে, আর্য্য সমাজে বিশেষজ্ঞ যাজক বা পুরোহিত শ্রেণীর অভ্যুদয় ঘটে। তাঁহারাই ক্রমে ধর্ম্মের রক্ষক ও ধারক হইয়া উঠিতে লাগিলেন। এদিকে অনার্য্যদের মূর্ত্তিপূজা, পশুবলিদান, প্রভৃতি আচারপদ্ধতিও ধীরে ধীরে আর্য্য সমাজে প্রবেশ লাভ করে। আর্য্যদের উপাসনাবিধির নাম 'যজ্ঞ', আর অনার্য্যদের ধর্ম্মাচরণ-প্রণালীর নাম ছিল 'পূজা'। এই ভাবে আর্য্য ও অনার্য্যদের ভাবধারার আচার ও সংমিশ্রণের ফলেই বর্ত্তমান 'হিন্দুধর্ম্ম' গড়িয়া উঠিয়াছে।

ধর্ম্ম-প্রণালী

যাজক বা পুরোহিত-শ্রেণী

'যজ্ঞ' ও 'পূজা'

আর্য্যগণের রাষ্ট্র ও সমাজ।—আর্য্যসমাজের মূল ভিত্তি ছিল পারিবারিক জীবন। এক একটি পরিবার ছিল এক একজন গৃহপতির অধীন। কয়েকটি পরিবার লইয়া হইত একটি গ্রাম আর গ্রামের অধ্যক্ষকে বলা হইত 'গ্রামণী'। কয়েকখানি গ্রামের

পরিবার

গ্রামণী

সমবায়ে 'জনসাধারণ' বা 'বিশ' গঠিত হইত। বিশ বা জনের অধিপতির নাম ছিল 'বিশপতি' বা 'রাজন্'। গৃহপতি যেরূপ ছিলেন পরিবারের কর্ত্তা, রাজাও তেমনই হইতেন তাঁহার রাজ্যের সর্ব্বময় অধীশ্বর। বৈদিক যুগের প্রথম দিকে রাজা রাজ্যের প্রবীণ ও অভিজ্ঞ নায়কগণের পরামর্শানুসারে রাজ্য শাসন করিতেন। 'সভা' ও 'সমিতি' নামে জনসাধারণেরও প্রতিষ্ঠান ছিল; রাজা সাধারণতঃ সভা-সমিতির মতামত উপেক্ষা করিয়া চলিতে পারিতেন না। আদিযুগে প্রজারাই বিশিষ্ট নেতাকে রাজপদে বরণ করিত, তবে সম্ভবতঃ রাজপদ অধিকাংশ স্থলে ছিল বংশানুক্রমিক। রাজতন্ত্র ব্যতীত বৈদিক যুগে কোথাও কোথাও গণতন্ত্রও প্রচলিত ছিল। তবে গণতন্ত্র অপেক্ষা রাজতন্ত্রেরই ছিল অধিক প্রচলন। কালক্রমে রাজপদের ক্ষমতা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যে-সকল রাজা অন্যান্য রাজাদের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিতে পারিতেন, তাঁহারা রাজ-চক্রবর্ত্তী বা 'একরাট্' নামে খ্যাত হইলেন। সাধারণতঃ অশ্বমেধ ও রাজসূয় যজ্ঞের দ্বারা শক্তিশালী নরপতিরা নিজেদের 'একরাট্' অর্থাৎ সার্ব্বভৌম একচ্ছত্র অধিপতি বলিয়া ঘোষণা করিতেন। একচ্ছত্র সাম্রাজ্য স্থাপনের দ্বারা রাজশক্তি বৃদ্ধি পাইলেও, প্রাচীন ভারতে যথেচ্ছাচার বা স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠার বিশেষ কোন সুযোগ ছিল না। প্রত্যেক রাজা অভিষেকের সময় প্রজারঞ্জনের শপথ গ্রহণ করিতেন; রাজা সাধারণতঃ সভা-সমিতির নির্দ্দেশ এবং ধর্ম্মের অনুশাসন লঙ্ঘন করিতে পারিতেন না। সর্ব্বোপরি প্রাচীন হিন্দুসমাজ যে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল তাহার প্রভাবে রাজশক্তি সামাজিক ব্যবস্থার উপর বিশেষ কোনরূপ অন্যায় প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। হিন্দুদের রাষ্ট্র ও সমাজবিধানে রাজার প্রধান কাজ ছিল বিচার ও দেশরক্ষা,—সমাজের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে পণ্ডিত, নির্লোভ ও ত্যাগী ব্রাহ্মণগণের বিধানই চরম বলিয়া স্বীকৃত হইত।

রাজা

সভা-সমিতি

গণতন্ত্র

'একরাট্'

সমাজবিধান ও রাজশক্তি

বর্ণ-বিভাগ।—বর্ণ-বিভাগ আর্য্যসমাজের সর্ব্বপ্রধান বিশেষত্ব। এখনও হিন্দুসমাজ বর্ণভেদের উপরই প্রতিষ্ঠিত। আর্য্যগণ যখন প্রথম ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন তখন তাঁহারা এখানে কৃষ্ণকায় আদিম জাতিদের সাক্ষাৎকার লাভ করেন। আর্য্যাধি-

প্রাক্-আর্য্য,

আর্য্য ও অনার্য্য

কারের পর তাই এদেশে গৌরবর্ণ বিজেতা আর্য্য, ও কৃষ্ণবর্ণ বিজিত অনার্য্য এই দুই শ্রেণী-ভেদের সৃষ্টি হইল। ক্রমে সমাজে জটিলতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গুণ-কর্ম্ম অনুসারে চারি বর্ণের উদ্ভব হয়; যাঁহারা শাস্ত্রপাঠ ও যাগ-যজ্ঞাদিতে দক্ষ হইয়া উঠিলেন তাঁহারা হইলেন ব্রাহ্মণ; শস্ত্রবিদ্যাবিৎ ও রণনিপুণ বীর জাতি ক্ষত্রিয় নামে অভিহিত হইতে লাগিলেন; কৃষি, পশুপালন ও ব্যবসায়-জীবীদের বলা হইত বৈশ্য, এবং সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রাক্-আর্য্য, অনার্য্য জাতি ও শ্রমিকগণ অন্ত্যজ, দাস, ব্রাত্য বা শূদ্র শ্রেণীভুক্ত হইলেন। প্রথমে আর্য্যদের মধ্যে বর্ণ-বিভাগ বা জাতিভেদ এত কঠোর ছিল না। বৈদিক যুগে পরস্পরের বিবাহ-সম্বন্ধের পথে বিশেষ বাধা ছিল না, কেহ ইচ্ছা করিলে নিজ বর্ণের নির্দ্দিষ্ট বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া অন্য বৃত্তিও গ্রহণ করিতে পারিতেন ও করিতেন। কালক্রমে সমাজ-নিয়মের জটিলতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জাতিভেদের কঠোরতা দেখা দিল এবং বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে বিবাহাদি নিষিদ্ধ হইল; উচ্চবর্ণেরা নিম্নবর্ণের লোকদের হাতে অন্নগ্রহণ করিলে সমাজে পতিত বলিয়া গণ্য হইতে লাগিলেন। তবে চিরকালই হিন্দু সমাজে কিছু না কিছু অসবর্ণ বিবাহ চলিয়া আসিতেছে। তাই বিভিন্ন বর্ণের সংমিশ্রণে আর্য্য সমাজে নানা বর্ণসঙ্করেরও সৃষ্টি হইয়া চলিয়াছে। অপর দিকে অনার্য্য ও বিভিন্ন উপজাতি হিন্দু আচার-ব্যবহার গ্রহণ করিয়া নানা জটিল শ্রেণীর সৃষ্টি করিয়াছে। তাই যেন আজ ঐক্যমন্ত্র হারাইয়া হিন্দুসমাজ অগণিত উচ্চ ও নীচ বর্ণে বিভক্ত এবং দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র

বর্ণসঙ্কর

চতুরাশ্রম।—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন জাতিই উচ্চবর্ণের অঙ্গীভূত এবং আচারে দ্বিজ বলিয়া সম্মানিত হইত। উচ্চবর্ণের প্রত্যেককে প্রাচীন আর্য্যসমাজের সুকঠোর বিধিনির্দ্দেশ মানিয়া চলিতে হইত। চতুরাশ্রম এই সকল বিধিনির্দ্দেশের অন্যতম। চতুরাশ্রম বলিতে জীবনের চারিটি অবস্থা বুঝায়। প্রথম অবস্থার নাম ব্রহ্মচর্য্য, এই সময় প্রত্যেককে উপনয়ন গ্রহণ করিয়া গুরুগৃহে ছাত্রজীবন যাপন করিতে হইত; ছাত্রজীবনের আদর্শ ছিল ভোগবিলাসহীন হইয়া পবিত্রভাবে শাস্ত্রাধ্যয়ন। ছাত্র-জীবন সমাপ্ত হইলে ব্রহ্মচারী গার্হস্থ্য আশ্রমে প্রবেশ করিতেন;

ব্রহ্মচর্য্য

গার্হস্থ্য

তখন বিবাহ করিয়া সংসারধর্ম্ম পালন করাই ছিল জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য। সাধারণতঃ পুরুষদের মধ্যে এক বিবাহই প্রচলিত ছিল। শুধু রাজা মহারাজারা একাধিক বিবাহ করিতেন। ইহার পর প্রৌঢ় বয়সে বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়া সংসার হইতে অবসর গ্রহণ করিতে হইত; অরণ্যের মধ্যে কুটির বাঁধিয়া লোকহিত এবং ধর্ম্ম-চিন্তায় জীবন যাপনই ছিল সে আশ্রমের আদর্শ। চতুর্থ আশ্রমের নাম সন্ন্যাস (যতি বা ভৈক্ষ্য); তখন সংসারের সকল বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া পারমার্থিক তত্ত্বের অনুশীলনে জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি কাটাইতে হইত।

আর্য্য-সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা।—কৃষি, বাণিজ্য ও পশুপালন ছিল প্রাচীন আর্য্যদের প্রধান উপজীবিকা ও বৃত্তি; শিল্পকৌশলও তাঁহাদের অজানা ছিল না। মৃৎশিল্প, ধাতুশিল্প, দারুশিল্প, নানারূপ কারুকার্য্য, বস্ত্রবয়ন, প্রভৃতি দ্বারাও প্রাচীন আর্য্যসমাজে বহু লোক জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। এতদ্ব্যতীত তাঁহারা বাণিজ্য-ব্যবসায়েও পটু ছিলেন। কাহারও কাহারও মতে বৈদিক যুগে সামুদ্রিক বাণিজ্যেও আর্য্যরা সুদক্ষ ছিলেন। প্রাচীন আর্য্যগণ দুগ্ধ, ফলমূল, যবাদি শস্য, মৎস্য ও পশুমাংস আহার করিয়া জীবন ধারণ করিতেন। সোমরস ও সুরা নামক মদ্য ইঁহাদের অতি প্রিয় পানীয় ছিল। আর্য্যগণের পোষাক-পরিচ্ছদের কোন আড়ম্বর ছিল না। 'নীবি' (কটির আচ্ছাদন), 'পরিধান' (বস্ত্র) এবং 'অধিবাস' (উত্তরীয়) দ্বারাই তাঁহারা বেশভূষা সম্পাদন করিতেন। কার্পাস ও পশম, এই উভয়বিধ দ্রব্যই পরিচ্ছদের জন্য ব্যবহৃত হইত। আর্য্যনারীগণ অলঙ্কার-প্রিয় ছিলেন। মণিমুক্তা, স্বর্ণ ও রৌপ্যের অলঙ্কারের বিশেষ প্রচলন ছিল।

আর্য্যসমাজের নারী।—নারী অন্তঃপুরচারিণী ছিলেন বটে, কিন্তু দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় অন্তঃপুরের বাহিরেও পুরুষের সহ-কর্ম্মিণী ছিলেন। কারণ সংখ্যালঘু আর্য্যপুরুষ সর্ব্বদাই যুদ্ধ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিত কাজেই পুরুষের যাবতীয় কার্য্য মেয়েদের নির্ব্বাহ করিতে হইত; যেমন কৃষি, পশুপালন, অস্ত্রশস্ত্র নির্ম্মাণ, প্রভৃতি। যাগযজ্ঞাদিতে বিবাহিতারা স্বামীর সহধর্ম্মিণীরূপে প্রত্যেক ক্রিয়া-কলাপেই যোগদান করিতেন। পিতৃগৃহেও কন্যাকে সুশিক্ষা

দেওয়া হইত। তাই দেখি, বৈদিক যুগে লোপামুদ্রা, মমতা, ঘোষা, বিশ্ববারা, প্রভৃতি অনেক মহিলা-ঋষি বেদমন্ত্রও রচনা করিয়াছেন। আর্য্যসমাজে ঋষিরা ছিলেন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্মানের অধিকারী। নারীর প্রতি এই সর্ব্বোচ্চ সম্মান দান করিতেও তাঁহারা কার্পণ্য করেন নাই। পরবর্ত্তীকালেও বিদুষী মহিলারা দার্শনিক বিচার-সভায় সভানেত্রীর কাজ করিয়াছেন যেমন মৈত্রেয়ী ও গার্গী। কাহারও কাহারও মতে, আবেস্তার যুগে পারসিক নারীদের ন্যায়, বৈদিক কালের উচ্চবর্ণের মহিলারা যজ্ঞোপবীতও ধারণ করিতেন।

বৈদিক সমাজে নারীর উচ্চ স্থান

বৈদিক নারী 'ব্রহ্মবাদিনী' নামে সম্বর্দ্ধিত হইয়াছেন। খেল-রাজমহিষী বিশ্‌পলা বীর স্বামীর সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। তাঁহার একখানা পা যুদ্ধে কাটা যায় এবং দেববৈদ্য অশ্বিনীকুমারদের দয়ায় তাহার পরিবর্ত্তে একখানা লোহার পা তিনি প্রাপ্ত হন। ইন্দ্রসেনা দস্যুদমনে স্বামীকে নিজে রথ চালনা করিয়া সাহায্য করেন। বিশ্ববারা শুধু অগ্নির ঋক্‌মন্ত্রাদি রচনা করেন নাই, তিনি নিজে ঋত্বিকরূপে যজ্ঞকার্য্য সম্পাদন করেন। বিবাহ বন্ধন অচ্ছেদ্য এবং আধ্যাত্মিক, এই সামাজিক শুভরীতি বিশ্ববারার কল্যাণেই প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এই সব উচ্চ অধিকার হইতে পরবর্ত্তী যুগের নারীরা ক্রমশঃ বঞ্চিত হন।

সে যুগের নারীদের শুধু জ্ঞান বিকাশের জন্যই শিক্ষা দেওয়া হইত না, দৈহিক উৎকর্ষের দিকেও লক্ষ্য রাখা হইত। ঋক্‌বেদে এইরূপ প্রমাণ আছে যে, প্রাচীন কালের মেয়েদের যুদ্ধশিক্ষাও দেওয়া হইত। পূর্ণবয়স্কা না হইলে মেয়েদের বিবাহ হইত না এবং মেয়েদের স্বামী-নির্ব্বাচনে একান্ত স্বাধীনতা ছিল। ইচ্ছা করিলে মেয়েরা অবিবাহিতও থাকিতে পারিত, তাহাদের 'পিতৃষদ' বলা হইত। মেয়েরা জীবিকা স্বরূপ শিক্ষা-ব্রত গ্রহণ করিয়া 'উপাধ্যায়া' নামে অভিহিত হইতেন।

মহাকাব্যের যুগ।—আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে, ভারত-বর্ষে আর্য্যাধিকারের ইতিহাস সহস্রাধিক বৎসর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে ভারতীয় সমাজে কতই না পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। কিন্তু রাষ্ট্রিক ঘটনার দিক দিয়া তাহার কোনও ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায় না। ঘটনাপর্য্যায়ের দিক দিয়া

যুগনির্ণয়ের সমস্যা

বিচার করিলে বৈদিক যুগে আর্য্যাধিকারের প্রথম পর্ব্বের পরই আমরা রামায়ণের ও মহাভারতের দ্বন্দ্ব-কাহিনীর সম্মুখীন হই। তাই মহাকাব্যের যুগকে বৈদিক যুগেরই শেষপর্ব্ব বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে।

রামায়ণের মূল কাহিনী

রামায়ণ।—রামায়ণ আদিকবি বাল্মীকি-রচিত অযোধ্যার রাজপুত্র রামচন্দ্রের কাহিনী। রাম ছিলেন দশরথ রাজার জ্যেষ্ঠপুত্র। বিদেহরাজ জনকের কন্যা সীতার সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। দশরথ রামচন্দ্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে, বিমাতা কৈকেয়ীর চক্রান্তে রামচন্দ্রকে চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য বনবাসে গমন করিতে হয়। তাঁহার প্রতি বনবাসের আদেশ শ্রবণ করিয়া সীতা এবং রামানুজ লক্ষ্মণও বনে তাঁহার অনুগমন করিলেন। রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ দণ্ডকারণ্যে আসিয়া গোদাবরীতীরে কুটীর বাঁধিয়া বাস করিতে লাগিলেন। সেখান হইতে লঙ্কার রাজা রাবণ সীতাকে অপহরণ করিয়া লইয়া যান। অতঃপর রাম-লক্ষ্মণ কিষ্কিন্ধ্যার 'বানর-রাজ' সুগ্রীবের সহিত সখ্যতা স্থাপন করিয়া বানরসেনার সহায়তায় প্রায় সবংশে রাবণকে নিধন করেন। অতঃপর সীতাকে উদ্ধার করিয়া রাম-লক্ষ্মণ অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, রাম রাজপদে অভিষিক্ত হন। কিন্তু প্রজারা সীতার চরিত্র সম্বন্ধে নানারূপ অলীক জল্পনা-কল্পনা করিতে থাকে; তখন প্রজারঞ্জনার্থে বাধ্য হইয়া রাম সীতাকে বনবাসে প্রেরণ করেন। সীতা মহামুনি বাল্মীকির আশ্রমে আশ্রয় লাভ করিলেন। সেখানে তাঁহার লব ও কুশ নামে দুইটি যমজ পুত্র ভূমিষ্ঠ হইল। রামের পর তাঁহারাই অযোধ্যার সিংহাসন লাভ করেন। সংক্ষেপে ইহাই হইল রামায়ণের মূল কাহিনী।

মহাভারতের মূলকাহিনী

মহাভারত।—মহাভারতের রচয়িতার নাম কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস। ইহার মূল কাহিনী হস্তিনাপুরের ভরতবংশীয় দুইটি শাখার পারিবারিক মহাসমর। কথিত আছে, এই মহাযুদ্ধে আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষে যত রাজা ছিলেন, সকলেই কোন না কোন পক্ষে যোগদান করিয়াছিলেন। বৈদিক যুগের ভরত বা কুরুবংশের নৃপতি বিচিত্রবীর্য্যের ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু নামে দুই পুত্র

ছিলেন। ধৃতরাষ্ট্রের ছিলেন দুর্যোধনাদি শত পুত্র; পাণ্ডুরাজের যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব এই পাঁচ পুত্র। পাণ্ডুপুত্রেরা কুরু-রাজ্যের দক্ষিণে ইন্দ্রপ্রস্থ নামে এক নগর স্থাপন করিয়া রাজ্য শাসন করিতেন। কিছুকাল পরে দুর্যোধন যুধিষ্ঠিরকে দ্যূতক্রীড়ায় আহ্বান করিয়া জয়লাভ করিলে, পাণ্ডবদিগকে তের বৎসরের জন্য বনবাসে প্রেরণ করেন। বনবাসকাল উত্তীর্ণ হইবার পর পাণ্ডবেরা আসিয়া রাজ্য ফিরিয়া চাহিলে, দুর্যোধন বিনা যুদ্ধে তাহা ফিরাইয়া দিতে অসম্মত হন। ফলে, কুরুক্ষেত্রের মহাসমর বাধিয়া যায়। এই যুদ্ধে কুরুকুল প্রায় ধ্বংস হইয়া গেল, যুধিষ্ঠির সমগ্র কৌরব রাজ্যের একচ্ছত্র অধীশ্বর হইয়া বসিলেন।

রামায়ণ ও মহাভারত ধর্ম্মকাব্য

রামায়ণ ও মহাভারত, এই মহাকাব্যদ্বয় হিন্দুসমাজে ধর্ম্মগ্রন্থরূপে সমাদৃত। গ্রন্থোক্ত চরিত্রসমূহ আজও হিন্দুসমাজে আদর্শস্থানীয় হইয়া রহিয়াছে। হিন্দুর ধর্ম্মজীবনে ইঁহাদের প্রভাবও অসামান্য। রামায়ণের রাম ও মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ হিন্দুর চক্ষে লোকপাল বিষ্ণুর অবতার এবং তাঁহাদিগকেই কেন্দ্র করিয়া পরবর্ত্তী যুগে হিন্দুসমাজে এক অভিনব ভক্তিধর্ম্মের উদ্ভব হইয়াছে। সীতা ও সাবিত্রীর অনুপম চরিত্র ও পাতিব্রত্য, রামচন্দ্রের পিতৃভক্তি, লক্ষ্মণের ভ্রাতৃপ্রেম, ভীষ্ম ও যুধিষ্ঠিরের সত্যনিষ্ঠা, কর্ণের মহত্ত্ব, প্রভৃতি হিন্দুজীবনের আদর্শ স্বরূপ গণ্য হইয়া থাকে। মহাভারতের অন্তর্গত 'গীতা' হিন্দুদিগের একখানি শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মগ্রন্থ। ইহাতে অতি উচ্চাঙ্গের দার্শনিক তত্ত্বসমূহ সন্নিবেশিত আছে। এই দুইখানি মহাকাব্যের নানা কাহিনী অবলম্বন করিয়া উত্তরকালে ভারতের কবি ও সাহিত্যিকগণ তাঁহাদের অমর গ্রন্থরাজি রচনা করিয়া গিয়াছেন।

কাব্য, সাহিত্য ও সমাজের উপর মহাকাব্যদ্বয়ের প্রভাব

রামায়ণ ও মহাভারত সম্বন্ধে আর একটি বিষয়ও উল্লেখযোগ্য। প্রাচীন ভারতের শিক্ষা, দীক্ষা, অর্থনীতি, সমাজ, ধর্ম্ম ও রাজনীতি প্রভৃতি এই বিরাট গ্রন্থদ্বয়ে বিশদভাবে বর্ণিত আছে। ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাসের উপাদান এই দুইটি জাতীয় মহাকাব্য হইতে বিশেষভাবে পাওয়া যায়। সে সময়ে ভারত যে উন্নতির কত উচ্চ শিখরে উঠিয়াছিল তাহার প্রমাণ সাধারণ দীনতম প্রজারও

দৈনন্দিন জীবনে সুখ-স্বাচ্ছন্দ, স্বচ্ছলতা ও রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে ক্ষমতা-লাভ। রাজার সঙ্গে প্রজার পিতাপুত্রের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ছিল। প্রজার মঙ্গল ও মনোরঞ্জন রাজার সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইত। দেশে দুর্ভিক্ষ ও রোগের প্রাদুর্ভাব হইলে লোকে রাজাকে অপরাধী সাব্যস্ত করিত। প্রতিটি প্রজার ধনমান ও জীবন রক্ষা করা রাজার শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম ছিল। যে সাম্যনীতি বিংশশতাব্দীর রাষ্ট্র-তন্ত্রকে বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে, তাহা প্রাচীন ভারতে সানন্দে অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হইত। মুসলমান আমলে সুলতান ও প্রজায় যে দুস্তর ব্যবধান দেখি হিন্দু যুগে তাহা অজানা ছিল। ইংরাজের সময় প্রজার সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে নাগরিক সমৃদ্ধি। রামায়ণ-মহাভারতের কালে হৃষ্টপুষ্ট সমৃদ্ধ প্রজাবাই ছিল রাজঐশ্বর্য্য। সেই জন্যই মহাত্মা গান্ধী আজও রাম-রাজ্যের সুখস্বপ্ন দেখেন।

STUDIES AND QUESTIONS

1. Who were the Aryans? Write a short account of their gradual spread over Northern and Southern India. (C. U., '14, '28).

2. What was the state of Aryan civilisation in the age of the Rig Veda? (C. U., '22).

3. Write a short note on *Varnasrama* as it was in the Vedic Age, and also on the institution of the *Asrama*. (C. U., '20).

4. Write a short account of the civilisation of the Vedic Aryans. (C. U., '38).

5 Give some account of the social and political organisation of the Hindus in the Epic Age. What changes do you notice in the character of Hindu society and government from the Vedic Age to that of the Epic? (C. U. '17, '29).

6. What is the historical importance of the two great epics of ancient India? What light do they throw on the national life and character of the ancient Hindus? (C. U., '28).

চতুর্থ অধ্যায়

জৈন ও বৌদ্ধ-ধর্ম্মের বিকাশ

আর্য্য-সমাজে ধর্ম্মবিপ্লব।—বৈদিক যুগের শেষভাগে আর্য্যধর্ম্ম অত্যন্ত জটিল ও নীরস কর্ম্মবিধিতে পরিণত হইল। নানা আড়ম্বরপূর্ণ ক্রিয়াকাণ্ড উদ্ভবের ফলে ধর্ম্ম-ব্যবস্থা ব্রাহ্মণ বা পুরোহিত সম্প্রদায়ের হাতে পড়িয়া বৈদিক সমাজে ব্রাহ্মণের অপ্রতিহত আধিপত্য স্থাপিত হয়। তাঁহারাই হইলেন যেন ধর্ম্ম ও সমাজের একমাত্র ধারক ও রক্ষক। ক্রমে বর্ণবৈষম্য ও জাতিভেদের কঠোরতাও অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইল।

সমাজে পুরোহিত সম্প্রদায়ের আধিপত্য

জড় ধর্ম্মানুষ্ঠান, যাগযজ্ঞাদিতে পশুবধের নিষ্ঠুর প্রথা, সংখ্যাগরিষ্ঠ নিম্নবর্ণের উপর ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের প্রভুত্ব ও অত্যাচারের ফলে যাগযজ্ঞ ও ক্রিয়াকাণ্ডপূর্ণ বৈদিক ধর্ম্মের প্রতি জনসাধারণের অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হইয়া উঠে। ইহার ফলে দেশে 'তীর্থক' প্রভৃতি বেদবিরোধী নানা ধর্ম্মমতের উদ্ভব হইল। বেদবিরোধী এই সব ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে জৈনধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্ম ছিল প্রধান এবং ইহাদের প্রভাব অতি দ্রুত ভারতের সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়ে।

দুইটি বিশিষ্ট ধর্ম্মমত

জৈন-ধর্ম্ম।—কিংবদন্তী অনুসারে পর পর চব্বিশ জন তীর্থঙ্কর জৈনধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করেন। তীর্থঙ্কর বলিতে ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহাপুরুষ বুঝায়। শেষ দুইজন তীর্থঙ্করের নাম পার্শ্বনাথ ও মহাবীর। পার্শ্বনাথ কাশীর রাজবংশে খৃঃ পূঃ ৮ম শতকে জন্মগ্রহণ করেন। আধুনিক পণ্ডিতদের মতে জৈন ভাবধারা প্রাচীনতর হইলেও পার্শ্বনাথই জৈন সম্প্রদায়ের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। অহিংসা, সত্য, অচৌর্য্য এবং অপ্রতিগ্রহ এই চারিটি সাধন ছিল পার্শ্বনাথ-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের মূলমন্ত্র; ইহা 'চতুর্যাম' নামে বিখ্যাত।

জৈনধর্ম্মের উদ্ভব ও তীর্থঙ্করগণ

পার্শ্বনাথ

'চতুর্যাম'

পার্শ্বনাথের পর যে তীর্থঙ্করের আবির্ভাব হয় তিনি মহাবীর নামে পরিচিত। সংসারাশ্রমে মহাবীরের নাম ছিল বর্দ্ধমান। ইনি বৈশালীর নিকটে এক ক্ষত্রকুলে খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতকে জন্মগ্রহণ করেন এবং গৌতম বুদ্ধের সমসাময়িক হইলেও সম্ভবতঃ মহাবীর বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। তরুণ বয়সে যশোদা নাম্নী এক

মহাবীর

কুমারীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয় এবং কিছুকাল পরে তাঁহার এক কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করে। ত্রিশ বৎসর বয়সের সময় তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর কঠোর তপস্যার পর সিদ্ধিলাভ করিয়া 'জিন' বা বিজয়ী নামে বিখ্যাত হন। অতঃপর তিনি ধর্ম্মপ্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। সুদীর্ঘকাল ধর্ম্মপ্রচার করিয়া বর্ত্তমান পাটনা জেলার পাবা-পুরী নামক স্থানে মহাবীর দেহত্যাগ করেন। মহাবীরের প্রবর্ত্তিত সম্প্রদায়ের নাম ছিল, 'নির্গ্রন্থ'—গ্রন্থিশূন্য বা বন্ধনহীন। তাঁহার নিজ উপাধি হইতেই তৎ-প্রবর্ত্তিত সম্প্রদায় উত্তরকালে 'জৈন সম্প্রদায়' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।
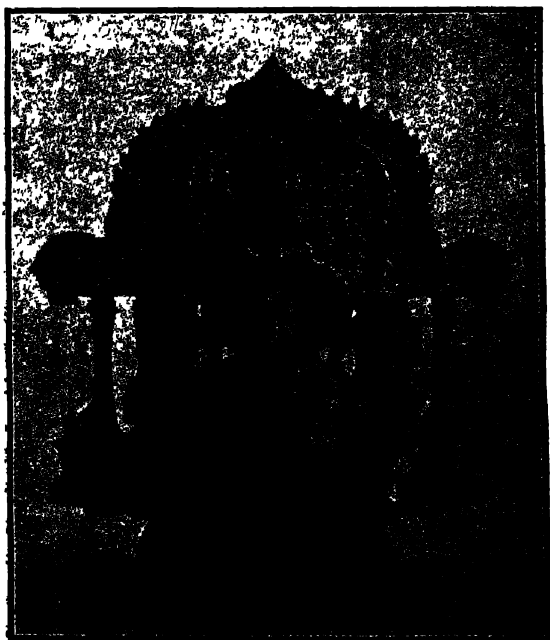
পার্শ্বনাথ (দশম শতাব্দীর মূর্ত্তি হইতে)

মহাবীর সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া পার্শ্বনাথের সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াছিলেন। পার্শ্বনাথের প্রবর্ত্তিত 'চতুর্যামে'র সঙ্গে মহাবীর জিতেন্দ্রিয়তার আদর্শ যোগ করিয়া দিয়াছিলেন। তিনিই জৈনদের মধ্যে 'দিগম্বর' সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করিয়া যান। জৈনদের মধ্যে 'শ্বেতাম্বর' ও 'দিগম্বর' এই দুইটি প্রধান সম্প্রদায় আছে। জৈনগণ সৃষ্টিকর্ত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না; বেদকেও অভ্রান্ত বা অপৌরুষেয় মনে করেন না এবং জাতিভেদ গ্রাহ্য করেন না। তাঁহাদের মতে যাঁহারা সম্পূর্ণভাবে জিতেন্দ্রিয় হইতে পারেন সেই সকল 'জিন' বা সিদ্ধপুরুষের মধ্যেই অনন্ত শক্তির বিকাশ হয়; উহাই নির্ব্বাণ বা মোক্ষ। এরূপ সিদ্ধপুরুষগণই দেবতারূপে পূজ্য। জৈন মতে কেবল জীবজন্তু বৃক্ষলতাই নয়, পার্থিব বস্তুমাত্রই প্রাণধর্ম্মী। অহিংসা ও ইন্দ্রিয়জয়ই ধর্ম্মাচরণের অপরিহার্য্য পন্থা। বৌদ্ধ ধর্ম্মেরও ইহাই মূলমন্ত্র।

শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর সম্প্রদায়, জৈন-ধর্ম্মমত

বৌদ্ধধর্ম্ম ও বুদ্ধদেব।—বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন শাক্য গৌতম। পার্শ্বনাথ ও মহাবীরের ন্যায় তিনিও ছিলেন ক্ষত্রিয়-সন্তান। তাঁহার পিতা শুদ্ধোধন কপিলবস্তুর * শাক্য জাতির নায়ক ছিলেন। মহাবীরের ন্যায় তিনি খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতকে আবির্ভূত হন। গৌতমের জন্মের অব্যবহিত পরেই তাঁহার মাতা মায়াদেবীর মৃত্যু হয়। তিনি তাঁহার বিমাতা ও মাতৃষসা গৌতমীর দ্বারাই প্রতিপালিত হন। গৌতমীর পালিত পুত্র, বলিয়াই তাঁহার নাম হয় গৌতম; সংসারাশ্রমে তাঁহার নাম ছিল সিদ্ধার্থ। মাত্র ষোড়শ বর্ষ বয়সের সময় গোপা বা যশোধরা নাম্নী এক সুন্দরী কুমারীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। বাল্যকাল হইতেই গৌতম অত্যন্ত চিন্তাশীল ছিলেন; সংসারের জরা, বার্দ্ধক্য, পীড়া, মৃত্যু, প্রভৃতি মানবের নানাবিধ দুর্দ্দশা তাঁহাকে গভীরভাবে বিচলিত করিত। ২৯ বৎসর বয়সে রাহুল নামে তাঁহার এক পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে। ইহাতে সংসারের মায়াবন্ধন দৃঢ়তর হইবার আশঙ্কায় সেইদিনই গভীর নিশীথে তিনি গৃহত্যাগ করেন। গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসীর বেশে তিনি নানা গুরুর নিকট উপদেশ গ্রহণ করিতে থাকেন, কিন্তু কেহই তাঁহাকে শান্তি দান করিতে পারিলেন না।

বুদ্ধ

* কপিলবস্তু নগর ছিল নেপালের তরাই অঞ্চলে।

অতঃপর গৌতম কঠোর তপস্যায় নিরত হইলেন, তথাপি তপঃক্লিষ্ট সিদ্ধার্থ শান্তি পাইলেন না; পরিশেষে কৃচ্ছ্রসাধন ত্যাগ করিয়া তিনি গয়ার নিকটে প্রসিদ্ধ বোধিদ্রুমতলে গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। এখানেই তাঁহার 'বোধি' বা অন্তরে দিব্যজ্ঞানের বিকাশ হয়। দিব্য-জ্ঞান লাভ করিয়া সিদ্ধার্থ গৌতম জ্ঞানী বা 'বুদ্ধ' নামে বিশ্ব-বিখ্যাত হন। ইহার পর হইতে তিনি ধর্ম্ম-প্রচার করিতে লাগিলেন; প্রায় ৪৫ বৎসর যাবৎ নানাস্থানে ধর্ম্মপ্রচার করিয়া ৮০ বৎসর বয়সে (খৃঃ পূঃ ৪৮৩) বর্ত্তমান গোরখপুর জেলার কুশীনগর (বর্ত্তমান কসিয়া) নামক স্থানে তিনি দেহত্যাগ করেন। বুদ্ধের (এবং মহাবীরেরও) জন্মকাল ও মৃত্যুকাল সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে।
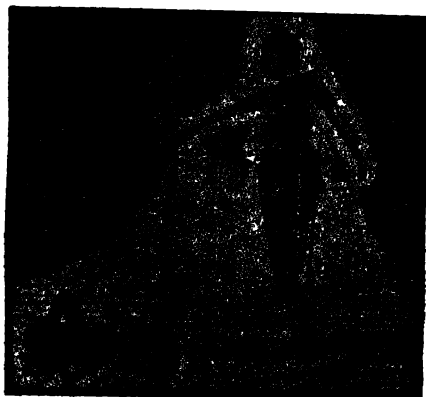
সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগ (প্রাচীন চিত্র হইতে)

বুদ্ধের ধর্ম্মমত

পরবর্ত্তীকালে বৌদ্ধধর্ম্ম নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়িলেও, গৌতম বুদ্ধের ধর্ম্মমত ছিল সহজ ও সরল। বুদ্ধ বেদের অপৌরুষেয়তা এবং ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিতেন না; বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের জটিল ক্রিয়াকলাপকেও মুক্তির সোপান বলিয়া মানিতেন না। তবে জন্মান্তরবাদ ও কর্ম্মফলে বিশ্বাসই ছিল বৌদ্ধধর্ম্মের মূল ভিত্তি। কামনা-বাসনাই মানুষকে নানারূপ কর্ম্মে নিয়োজিত করে; ফলে জীবমাত্রই এক জন্মের পর কর্ম্মফল অনু-যায়ী অপর জন্ম গ্রহণ করিয়া নানারূপ দুঃখ ভোগ করে; সুতরাং চিত্তশুদ্ধি—অর্থাৎ কামনা-বাসনার বিনাশই—মোক্ষ লাভের একমাত্র উপায়। বৌদ্ধেরা এই মোক্ষের নাম দিয়াছেন 'নির্ব্বাণ' —বাসনা হইতে মুক্তি। তাঁহারা এই নির্ব্বাণ লাভের যে পথনির্দ্দেশ

অষ্টাঙ্গিক মার্গ

করিয়া গিয়াছেন তাহাকে বলা হয় 'অষ্টাঙ্গিক মার্গ'। সম্যক্ দৃষ্টি, সদ্বাক্য, সৎকর্ম্ম, সৎসঙ্কল্প, সৎজীবন, সৎচেষ্টা, সৎস্মৃতি এবং সম্যক্ সমাধি, এই কয়টিই অষ্টাঙ্গিক মার্গ। অহিংসা বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাণস্বরূপ।
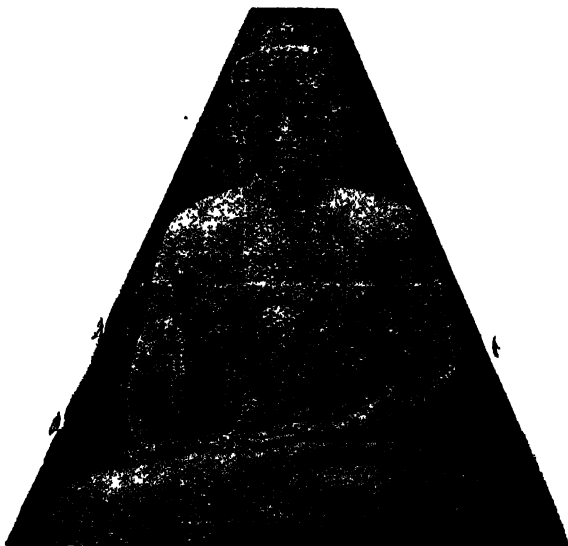
বুদ্ধ

বুদ্ধদেব জনসাধারণের জন্যই ধর্ম্মের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন; সে কারণে কেবলমাত্র পণ্ডিত-বোধ্য 'দেবভাষা' সংস্কৃতের সহায়তা গ্রহণ না করিয়া, তিনি লৌকিক ভাষার সাহায্যেই ধর্ম্মোপদেশ দান করিতেন। তিনি নিজে তাঁহার ধর্ম্মমত লিপিবদ্ধ করিয়া যান নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর শিষ্যেরা তাঁহার মৌখিক উপদেশসমূহ সংগ্রহ করিয়া পুস্তকাগারে নিবদ্ধ করেন। বৌদ্ধদের ধর্ম্মগ্রন্থের নাম 'ত্রিপিটক',—তিনটি পেটিকা। ত্রিপিটকের প্রথম ভাগের নাম 'সূত্র'; ইহাতে বুদ্ধদেবের উপদেশ ও প্রচারাদির বর্ণনা আছে; দ্বিতীয় ভাগের নাম 'বিনয়'; ইহা বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের পালনীয় বিধি-নির্দ্দেশ সংগ্রহ। তৃতীয় ভাগের নাম 'অভিধর্ম্ম', ইহাতে

বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থ

বৌদ্ধধর্ম্মের মূল দার্শনিক তত্ত্বসমূহ সন্নিবেশিত হইয়াছে। বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পর কয়েকটি বৌদ্ধ-সঙ্গীতি বা সম্মিলন অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম বৌদ্ধ-সম্মিলন রাজগৃহে আহূত হইয়াছিল; উহার একশত বৎসর পরে বৈশালীতে দ্বিতীয়, অশোকের রাজত্বকালে পাটলীপুত্র নগরে তৃতীয় এবং কণিষ্কের সময় পুরুষপুরে (পেশোয়ার) চতুর্থ বৌদ্ধ-সম্মিলন অনুষ্ঠিত হয়।

বৌদ্ধ-সঙ্গীতি

হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মের তুলনা।—প্রকৃতপক্ষে 'হিন্দুধর্ম্ম' হইতেই জৈন ও বৌদ্ধ মতের অভ্যুত্থান সুতরাং তিনটি ধর্ম্মের মধ্যে স্বভাবতঃই সাদৃশ্য আছে। হিন্দুধর্ম্মের কর্ম্মফল ও জন্মান্তরবাদ জৈন ও বৌদ্ধগণ গ্রহণ করেন। যে অহিংসা-মন্ত্র এই দুই ধর্ম্মের প্রাণস্বরূপ, উপনিষদেই তাহার প্রথম আভাষ পাওয়া যায়। কিন্তু হিন্দুমতে বেদ অভ্রান্ত ও অপৌরুষেয়; জৈন ও বৌদ্ধগণ ইহা স্বীকার করেন না এবং হিন্দুদের ন্যায় তাঁহারা জাতি-ভেদ ও ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্বও মানেন না। এইখানেই হিন্দুধর্ম্মের সহিত বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মের মৌলিক পার্থক্য এবং এই জন্যই হিন্দুধর্ম্মের সহিত প্রভূত সাদৃশ্য সত্ত্বেও সেকালের জৈন ও বৌদ্ধগণ নৈষ্ঠিক হিন্দুর চক্ষে বিধর্ম্মীরূপে গণ্য হন; কিন্তু কালক্রমে হিন্দুগণ বৌদ্ধ ও জৈন মতের সারাংশ গ্রহণ করিয়াছেন। জৈন তীর্থঙ্করগণ আজ হিন্দুর নিকট শ্রদ্ধার পাত্র, বুদ্ধদেবও স্বয়ং ভগবানের অবতার বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন। পরবর্ত্তী কালের জৈনগণ হিন্দু দেবদেবীর অর্চ্চনা এবং ধর্ম্মকার্য্যে ব্রাহ্মণের পৌরোহিত্যও স্বীকার করেন। বৌদ্ধগণ কিন্তু এবিষয়ে চরমপন্থী; তাঁহারা ব্রাহ্মণের পৌরোহিত্য বা হিন্দু দেবদেবী মানেন না। জৈন ও বৌদ্ধ উভয় ধর্ম্মই সাংখ্য দর্শনের মত সৃষ্টিকর্ত্তার অস্তিত্ব বিষয়ে উদাসীন; এখানেও হিন্দুধর্ম্মের সঙ্গে এই দুই ধর্ম্মের মৌলিক পার্থক্য। অহিংসা-নীতি সম্বন্ধে জৈনরা বৌদ্ধগণ অপেক্ষা চরমভাবাপন্ন; তাঁহারা প্রাকৃতিক সকল প্রকার বস্তুতেই প্রাণশক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করেন; এবং জীবহত্যা দূরে থাকুক, অন্য কর্ত্তৃক নিহত প্রাণীর মাংসভক্ষণ পর্য্যন্ত দূষণীয় বলিয়া মনে করেন; কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মে তাহা একান্ত নিষিদ্ধ নহে। ইতর প্রাণীদের প্রতি অপরিসীম মমতাবোধ হইতে বৌদ্ধ ও জৈনদের কল্যাণে, পশুদের আশ্রয় পিঞ্জরাপোলের সৃষ্টি হইয়াছে।

কর্ম্মফল ও জন্মান্তর

জাতিভেদ ও বেদের অপৌরুষেয়তা

ব্রাহ্মণের পৌরোহিত্য ও হিন্দু দেবদেবী

ঈশ্বরের অস্তিত্ব

অহিংসা

কৃচ্ছ্র-সাধন

ধর্ম্মাচরণে জৈনরা কৃচ্ছ্রসাধনের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করিয়া থাকেন, বৌদ্ধরা মধ্যপন্থী। ইন্দ্রিয় জয় করিয়া জিনদের ন্যায় অনন্ত আধ্যাত্মিক শক্তি লাভ করাই জৈন ধর্ম্মের আদর্শ; বৌদ্ধদের প্রধান আদর্শ বুদ্ধের ন্যায় 'সম্যক্ জ্ঞান'লাভের দ্বারা নির্ব্বাণপ্রাপ্তি। উভয় ধর্ম্মই মূলতঃ নৈতিক চরিত্র গঠনের ধর্ম্ম; হিন্দুধর্ম্ম চরিত্র-গঠন, জ্ঞানলাভ, ভক্তিসাধন, প্রভৃতি কোনও একটি ব্যাপারের উপরই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্ব আরোপ করে না, অধিকারী-ভেদে প্রত্যেকের জন্য পৃথক পৃথক বিধান দিয়া থাকে। অর্থাৎ ব্যক্তি বিশেষের মনোবৃত্তি এবং ক্ষমতার উপর লক্ষ্য রাখিয়াই এই বিধান দেওয়া হয়।

অনাসক্তি ও নির্ব্বাণ

অধিকার-বাদ

জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের পরিণতি।—ভারতবর্ষে জৈনধর্ম্ম সঙ্কীর্ণ হইলেও অদ্যাবধি অক্ষুণ্ণ আছে কিন্তু আজ, বৌদ্ধগণের সংখ্যা অতি সামান্য। ইহার কারণ কি? জৈনধর্ম্ম মূলতঃ বেদ-ব্রাহ্মণ-বিরোধী হইলেও, জৈনরা বৌদ্ধদের ন্যায় কখনও হিন্দুধর্ম্মের প্রবল প্রতিকূলতা করেন নাই; বরং তাঁহারা হিন্দু দেবদেবীদের পূজা প্রচলন এবং ধর্ম্মকার্য্যে ব্রাহ্মণ-পুরোহিত নিয়োগ করিয়া একটা সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াছেন। অথচ চিরকাল ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে আবদ্ধ থাকায় জৈনধর্ম্মের আভ্যন্তরীণ শুচিতা অব্যাহত রহিয়াছে,—বিশাল বৌদ্ধধর্ম্মের ন্যায় পরস্পর-বিরোধী নানা মতবাদ ও নিম্ন-শ্রেণীর আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে স্বীয় বিশেষত্ব হারাইয়া ফেলে নাই। বস্তুত, স্ববিরোধী মতবাদ এবং তান্ত্রিক অভিচারের দ্বারা বৌদ্ধধর্ম্ম ক্রমশঃ অবনতির পথে ধাবিত হয়,—ভারতে বৌদ্ধধর্ম্মের পতনের ইহা একটি প্রধান কারণ। প্রথমে রাজানুগ্রহ ছিল বৌদ্ধধর্ম্মের একটি পরম আশ্রয়; বৌদ্ধ রাজন্যবর্গের পতনে তাহাও বিনষ্ট হইয়া যায়। পক্ষান্তরে জৈনধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্মের ন্যায় রাজানুগ্রহ লাভ না করিলেও, আজ অবধি বিত্তশালী বণিকগণের একনিষ্ঠ সেবা পাইয়া আসিতেছে; সেইজন্য জৈন সম্প্রদায় ক্ষুদ্র হইলেও যথেষ্ট প্রভাব-শালী। বৌদ্ধধর্ম্ম উত্তরকালে যখন বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে তখন ক্রমশঃ তাহা হিন্দুধর্ম্মের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া যায়। সর্ব্বশেষে তুর্কী মুসলমানদের আক্রমণে উহাদের সঙ্ঘশক্তি প্রায় বিলুপ্ত হইয়া পড়ে। কিন্তু বৌদ্ধ দর্শন এবং মৈত্রী, করুণা,

জৈনধর্ম্মের পরিবর্ত্তন

বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতি

রাজানুগ্রহ

বণিকদের সমর্থন

তুর্কী আক্রমণ

অহিংসা মন্ত্রের প্রভাব আজও ভারতবাসীকে পৃথিবীর সম্মুখে গৌরবান্বিত করিতেছে।

STUDIES AND QUESTIONS

1. Describe the rise of Jainism and compare it with the religion founded by Buddha. To what do you ascribe the success of both the religions? (C. U. '19)

2. Account for the rise of Buddhism in India and give a sketch of the life and doctrines of its founder. Wherein does Buddhism differ from Hinduism and Jainism? (C. U., '15).

3. Account for the success of Buddhism. To what do you ascribe its decline in India? (C.U., '24)

4. What do you know of Gautama Buddha? Give a short account of the Buddhist Councils. (C. U. '20).

5. Give an account of the life and teaching of Gautama Buddha. (C. U. '42).

পঞ্চম অধ্যায়

মগধের অভ্যুত্থান

খৃষ্টপূর্ব্ব ৬ষ্ঠ শতকে রাষ্ট্রীয় পরিস্থিতি।—বুদ্ধ ও মহাবীরের আবির্ভাবের প্রাক্কালে আর্য্য-ভারতে ষোলটি রাজ্য বিশেষ শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল বলিয়া সেগুলি 'ষোড়শ মহাজনপদ' নামে খ্যাতি লাভ করে। এই সকল রাজ্যের মধ্যে কোন কোনটি ছিল গণতন্ত্র, কোন কোনটি বা রাজতন্ত্র। গণতন্ত্র-সমূহকে 'গণ' বা 'সঙ্ঘ' বলা হইত; যাঁহারা জনসাধারণের নামে এই সকল রাষ্ট্র শাসন করিতেন তাঁহাদের উপাধি ছিল 'গণজ্যেষ্ঠ' বা 'সঙ্ঘমুখ্য'—কখনও কখনও তাঁহারা 'রাজা' উপাধিও লাভ করিতেন। কোন রাষ্ট্রের গণজ্যেষ্ঠরা মিলিত হইয়া যে 'পরিষদ্' গঠন করিতেন 'সংস্থাগার' নামক সভাগৃহে তাহার অধিবেশন বসিত। সে যুগের গণতন্ত্রসমূহের মধ্যে বৃজি ও লিচ্ছবি

'ষোড়শ মহাজনপদ'

গণতন্ত্র ও রাজতন্ত্র

ক্ষত্রিয়দের যুক্তরাষ্ট্র ছিল সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী ; উত্তর-বিহারের অন্তর্গত বৈশালী নগরীতে ইহার রাজধানী ছিল। এই গণতান্ত্রিক বৈশালীর উপকণ্ঠেই মহাবীরের জন্ম হয়। বুদ্ধের জন্মভূমি কপিলবস্তুও শাক্যদের দ্বারা গণতান্ত্রিক প্রথায় শাসিত হইত। জৈন ও বৌদ্ধধর্ম্মে তাই সঙ্ঘশক্তিরই প্রাধান্য দেখা যায়। রাজ-তন্ত্রের মধ্যে অবন্তী, বৎস, কোশল ও মগধ এই চারিটি রাজ্য বিশেষ পরাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল। অবন্তী রাজ্য ছিল মালব প্রদেশে, বৎসরাজ্য এলাহাবাদের সন্নিকটে—কৌশাম্বী বা কোশামের চারিধারে, কোশল অযোধ্যা প্রদেশে এবং মগধ দক্ষিণ-বিহারে। অবন্তীরাজ প্রদ্যোত, বৎস-রাজ উদয়ন, কোশলের নৃপতি প্রসেনজিৎ এবং মগধের অধিপতি বিম্বিসার ছিলেন বুদ্ধ ও মহাবীরের সমসাময়িক। প্রত্যেক রাজাই স্বভাবতঃ অন্যান্য রাজ্য জয় করিয়া অধিকতর শক্তিশালী হইয়া উঠিতে চাহিতেন। এইরূপ যুদ্ধ-বিগ্রহের ফলে একদিকে যেমন গণতন্ত্রসমূহ লোপ পাইতে লাগিল, তেমনই আবার প্রবলপ্রতাপ রাজতন্ত্রের অভ্যুদয় হইতে আরম্ভ করিল। পরিশেষে পরাক্রান্ত রাজশক্তিকে আশ্রয় করিয়াই একচ্ছত্র সাম্রাজ্যের অভ্যুত্থান হয়।

অবন্তী, বৎস, কোশল ও মগধ

গণতন্ত্রের পতন ও সাম্রাজ্যের অভ্যুদয়

কোশল ও মগধের অভ্যুদয়।—গাঙ্গেয় উপত্যকার কেন্দ্রদেশে ছিল রামায়ণ-প্রসিদ্ধ কোশলের অবস্থান ; মগধ একদিকে গঙ্গা ও শোন নদী আর একদিকে ছোটনাগপুরের পার্ব্বত্য প্রাচীরের দ্বারা সুরক্ষিত ছিল, অথচ গাঙ্গেয় উপত্যকা ও গঙ্গার ব-দ্বীপ অঞ্চলের সঙ্গে যোগরহিতও ছিল না। মহাভারতের কুরুরাজ্যের পতনের পর রামায়ণের কোশল স্বভাবতঃই শক্তিশালী হইয়া উঠিতে থাকে। কোশলরাজ ক্রমশঃ কাশীরাজ্য ও কপিলবস্তুর শাক্যরাজ্য জয় করিয়া স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিলেন। এদিকে মগধরাজও পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্য সকল অধিকার করিয়া বিপুল ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিলেন। ফলে উভয় রাজ্যের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ উপস্থিত হইল এবং শেষে মগধই সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাজ্যে পরিণত হয়।

মগধের অভ্যুত্থান

মহাভারতে জরাসন্ধ নামে এক পরাক্রান্ত মগধ-রাজের বিবরণ পাওয়া যায়। খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতকে বিম্বিসার মগধের রাজা ছিলেন।

বিম্বিসার ও শিশুনাগ বংশ

বৌদ্ধগ্রন্থে বিম্বিসারকে 'হর্য্যঙ্ককুলোদ্ভব' বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। বিম্বিসার অঙ্গদেশ (পূর্ব্ব-বিহার) জয় করেন এবং নূতন রাজগৃহে (রাজগির) রাজধানী স্থাপিত করেন। তিনি কোশল-নৃপতি প্রসেনজিতের এক ভগ্নীর পানিগ্রহণ করিয়া কাশী রাজ্যের একাংশ যৌতুক-স্বরূপ লাভ করেন। ইহাতে পশ্চিমে কাশী হইতে পূর্ব্বে অঙ্গদেশ পর্য্যন্ত তাঁহার একাধিপত্য স্থাপিত হয়। বৃদ্ধ বয়সে বুদ্ধ-ভক্ত বিম্বিসার তাঁহার পুত্র বৌদ্ধ-বিদ্বেষী অজাতশত্রুর হস্তে নিহত হন বলিয়া কিম্বদন্তী আছে। কোশলরাজ প্রসেনজিৎ মগধের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। বহুকাল যুদ্ধের পর প্রসেনজিৎকেই সন্ধি ভিক্ষা করিতে হইল। তিনি আপন কন্যার সহিত অজাতশত্রুর বিবাহ দিয়া যৌতুক-স্বরূপ কাশী রাজ্য ফিরাইয়া দিলেন। ইহাতে কোশলের প্রতিপত্তি হ্রাস পাইতে আরম্ভ করিল। অতঃপর বৈশালীর গণতন্ত্রও মগধের অধিকাব-ভুক্ত হইয়া পড়িল। গাঙ্গেয় উপত্যকায় মগধরাজ যেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী রাজচক্রবর্ত্তী হইয়া উঠিলেন। অজাতশত্রুর রাজত্ব-কালেই মগধের সীমা হিমালয় হইতে ছোটনাগপুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। অজাতশত্রুর পুত্র উদয়ী-ভদ্র গঙ্গা ও শোন নদীর সঙ্গম স্থলে (বর্ত্তমান পাটনার অনতিদূরে) পাটলিপুত্র বা কুসুমপুর নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করেন। পরবর্ত্তী রাজাদের আমলে যে ধীবে ধীরে মগধের প্রভাব-প্রতিপত্তি এবং রাজ্যসীমা বর্দ্ধিত হইতেছিল তাহা অনুমান করা যাইতে পাবে। শিশুনাগ নামক মগধের আর এক রাজা অবন্তীর প্রদ্যোত বংশের ধ্বংস সাধন করিয়া সুদূর মালব অঞ্চলে মগধের প্রভাব বিস্তার কবেন। কালক্রমে মহাপদ্ম উগ্রসেন নামে জনৈক শূদ্র বীর মগধের সিংহাসন অধিকার করেন। ইহা খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীর শেষ-ভাগে অথবা চতুর্থ শতাব্দীর প্রথম ভাগের ঘটনা।

কোশল ও মগধের দ্বন্দ্ব

অজাতশত্রুর রাজ্যসীমা

পাটলিপুত্র

শিশুনাগ বংশের পতন

নন্দবংশের অভ্যুত্থান

নন্দ সাম্রাজ্য।—মহাপদ্ম উগ্রসেন ছিলেন নন্দবংশোদ্ভব শূদ্র। তাই মগধের সিংহাসনে তিনি যে বংশের প্রতিষ্ঠা করিয়া যান তাহা 'নন্দবংশ' নামে পরিচিত। মহাপদ্ম প্রবলপ্রতাপ সম্রাট ছিলেন; পুরাণে তাঁহাকে 'একরাট্' বা রাজচক্রবর্ত্তী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। সম্ভবতঃ সমগ্র গাঙ্গেয় উপত্যকা তাঁহার পদানত

নন্দবংশ

ছিল; কাহারও কাহারও মতে তিনি কলিঙ্গভূমি এবং দাক্ষিণাত্যের কিয়দংশও অধিকার করিয়াছিলেন্। মহাপদ্মের পর নন্দবংশের আটজন রাজা পর পর মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন; কিংবদন্তী অনুসারে তাঁহারা সকলেই ছিলেন মহাপদ্ম উগ্রসেনের পুত্র। সর্ব্বশেষ নন্দের নাম ছিল ধননন্দ। প্রকৃতই তিনি বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী ছিলেন; তাঁহার এক একটি সৈন্যদলেই দুই লক্ষ পদাতিক, বিশ হাজার অশ্বারোহী, চারি হাজার হস্তী এবং দুই হাজার রথ ছিল। ধননন্দের রাজত্বকালেই গ্রীকবীর দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডার উত্তর-পশ্চিম ভারত আক্রমণ করেন (খৃঃ পূঃ ৩২৭)। কিন্তু উত্তর-পশ্চিম ভারত জয় করিয়া পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইতে চাহিলে, আলেকজাণ্ডারের সেনানিগণ ধননন্দ-শাসিত মগধের সহিত শক্তি-পরীক্ষায় অসম্মত হন; এজন্য মগধের সহিত যুদ্ধ না করিয়াই আলেকজাণ্ডারকে পশ্চিমে ফিরিয়া যাইতে হয়।

মগধ সাম্রাজ্যের বিস্তার ও ঐশ্বর্য্য

আলেকজাণ্ডার

উত্তর-পশ্চিম ভারত ও বৈদেশিক আক্রমণ।—উত্তর-পশ্চিম ভারতের প্রান্তভাগ নানা উপজাতির আক্রমণে প্রায়ই বিব্রত হইয়া উঠিত। খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতকে পারস্য-সম্রাট কুরুস্ বা কাইরস্ (Cyrus, 558—530 B. C.) ভারত আক্রমণ করেন। ইহার পর দারয়বৌষ বা দারায়স্ (Darius, 522—486 B. C.) গান্ধার ও সিন্ধু-উপত্যকায় পারসিক আধিপত্য বিস্তার করেন। কথিত আছে, দারায়সের সাম্রাজ্য আরব সাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পারসিক সাম্রাজ্যের প্রথা অনুসারে তিনি বিজিত রাজ্যে 'ক্ষত্রপ' নামক রাজ-প্রতিনিধিদের শাসনব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করেন। এশিয়ার পারসিক সাম্রাজ্যের মধ্যে এই হিন্দু অংশটিই ছিল সর্ব্বাপেক্ষা জনবহুল ও সম্পদশালী; সাম্রাজ্যের এক-তৃতীয়াংশ রাজস্ব উত্তর-পশ্চিম ভারত হইতেই সংগৃহীত হইত। পারস্য সাম্রাজ্য ঈজিপ্ট ও গ্রীস হইতে সিন্ধু ও আরব-সাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ভারতে পারসিক অধিকারের ফলে স্বভাবতই পশ্চিম এশিয়ার সঙ্গে এদেশের সংস্কৃতিগত যোগ ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিতে থাকে; ভারতবাসীর পক্ষে পারস্য ও পশ্চিম এশিয়ায় গমনাগমনের পথও নিরাপদ ও সুগম হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যেরও প্রসার ঘটে। উত্তরকালে পারস্য-সম্রাট জারেক্সস

পারসিক আক্রমণ

কাইরস্

দারায়স্

'ক্ষত্রপ'

পারসিক অধিকারের ফলাফল

(Xerxes) গ্রীসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন, অনেক ভারতীয় সৈন্যও তাঁহার অধীনে ইউরোপ গমন করে। গ্রীকবীর আলেক-জাণ্ডার যখন পারস্য আক্রমণ করেন তখনও ভারতীয় সৈন্যদল পারস্যের পক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিল। পারসিকদের সহিত ভারতবাসী-দের এই যোগাযোগের চিহ্নস্বরূপ ইন্দো-পারসিক শিল্প ও 'খরোষ্ঠী' লিপির কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহা পারস্যের প্রাচীন লিপি (Aramaic alphabet) হইতে উদ্ভূত। উত্তর-পশ্চিম ভারতবর্ষে পারসিক অধিকার ঠিক কতকাল স্থায়ী হইয়াছিল বলা কঠিন। কিন্তু আলেকজাণ্ডারের পারস্য আক্রমণের সময় (খৃঃ পূঃ ৩৩০) পর্য্যন্ত অর্থাৎ প্রায় ২০০ বৎসর যে এদেশের সঙ্গে পারস্যের যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই।

খরোষ্ঠী লিপি

আলেকজাণ্ডারের আক্রমণ।—পারস্যের দারায়সের প্রায় দুই শতাব্দী পরে ম্যাসিডনরাজ মহাবীর আলেকজাণ্ডার সমগ্র গ্রীস জয় করিয়া পতনোন্মুখ পারস্যরাজ্য আক্রমণ করেন। অনায়াসে পারস্য অধিকার করিয়া (খৃঃ পূঃ ৩৩০) আলেকজাণ্ডার ভারতবর্ষের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত তখন অসংখ্য খণ্ডরাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল। তাহাদের মধ্যে কোনটি ছিল রাজতন্ত্র ও কোনটি গণতন্ত্র। খৃঃ পূঃ ৩২৭ অব্দে আলেকজাণ্ডার হিন্দুকুশ অতিক্রম করিয়া ভারত-বর্ষে প্রবেশ করিলেন। বর্ত্তমান রাওলপিণ্ডির নিকট তখন তক্ষ-শিলা রাজ্যে অম্ভি নামে এক রাজা রাজত্ব করিতেন। আলেকজাণ্ডার সিন্ধু পার হইয়া তক্ষশিলায় প্রবেশ করিলে, অম্ভিরাজ বিনা যুদ্ধেই তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিলেন। তক্ষশিলার পর বিতস্তা ও চন্দ্রভাগা নদীর মধ্য-স্থলে ছিল পুরুরাজ্য। পর বৎসর (খৃঃ পূঃ ৩২৬) আলেকজাণ্ডার বিতস্তা পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া পুরুরাজ্য আক্রমণ করিলেন। পুরুরাজ (Porus) বিপুল বিক্রমে

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত

আলেকজাণ্ডার

পুরু ও আলেকজাণ্ডার

দিগ্বিজয়ীর গতিরোধ করিয়া দাঁড়াইলেন; কিন্তু রণকুশল আলেকজাণ্ডারের বিরুদ্ধে তাঁহার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়া গেল; তুমুল যুদ্ধের পর পুরুরাজ বন্দী হইলেন। আলেকজাণ্ডার তাঁহার শৌর্য্য-বীর্য্য দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। কথিত আছে, পুরুরাজ তাঁহার সম্মুখে নীত হইলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি আমার কাছে কিরূপ ব্যবহার প্রত্যাশা করেন?" পুরুরাজ সগর্ব্বে উত্তর করিলেন, 'রাজার মত'। এই উত্তরে সন্তুষ্ট হইয়া আলেকজাণ্ডার তাঁহাকে হৃতরাজ্য প্রত্যর্পণ করিয়া তাঁহার সহিত সখ্যতা স্থাপন করিলেন। ইহার পর তিনি বিপাশা নদী পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলে তাঁহার রণক্লান্ত সৈন্যদল আর অধিক দূর যাইতে চাহিল না,

আলেকজাণ্ডারের প্রত্যাবর্ত্তন (৩২৫ খৃঃ পূঃ)

—লোকপরম্পরায় নন্দবংশ এবং মগধের রাষ্ট্রশক্তি ও বিপুল বাহিনীর কথা তাহাদের কর্ণগোচর হইয়াছিল। অগত্যা বিপাশা-তীর হইতে তাঁহাকে ফিরিয়া যাইতে হইল (খৃঃ পূঃ ৩২৫)। ফিরিবার সময় তিনি সৈন্যদলকে দুই ভাগ করিয়া এক দলকে নৌসেনাপতি নিয়ারকসের সঙ্গে জলপথে পারস্যের দিকে প্রেরণ করিলেন, আর এক দলকে নিজেরই নেতৃত্বে বেলুচিস্থানের মধ্য দিয়া স্বদেশের দিকে লইয়া চলিলেন। কিন্তু গ্রীসে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে বাবিলন্ নগরে তাঁহার মৃত্যু হইল (খৃঃ পূঃ ৩২৩)।

আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের ফলাফল

আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের ফলে গ্রীক্ ও ভারতীয় সভ্যতার মধ্যে যোগসূত্র স্থাপিত হয় এবং এই দুইটি সভ্যতা পরস্পরের উপর প্রভাব বিস্তার করে। ভারতের শিল্প, স্থাপত্য ও জ্যোতিষ শাস্ত্রে এই প্রভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। প্রসিদ্ধ 'গান্ধার শিল্প,' আলেকজাণ্ডারের আক্রমণের পরোক্ষ ফল বলিয়া ধরা যাইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, ইহার ফলে ভারত ও ইউরোপের মধ্যে গমনাগমনের পথ সুগম হইয়া ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটে। ইহা ব্যতীত ভারতীয় ও গ্রীক দেশসমূহের মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হওয়ায় উত্তরকালে বহ্লীক (Bactrian) দেশীয় গ্রীকগণ ও গ্রীকসভ্যতায় প্রভাবান্বিত পারদ (Parthian)-গণ ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে কয়েকটি খণ্ডরাজ্য স্থাপন করিতে সমর্থ হন। আলেকজাণ্ডারের আক্রমণে পঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের ক্ষুদ্র রাজ্যসমূহ বিধ্বস্ত ও শক্তিহীন হইয়া পড়ায় ভারতে বৃহৎভাবে

রাষ্ট্রীয় ঐক্য স্থাপনের চেষ্টা হয়। পূর্ব্বোক্ত ক্ষুদ্র রাজ্যগুলির দুর্ব্বলতার সুযোগ লইয়া মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্ত তাহাদিগকে একে একে নিজের অধিকারভুক্ত করিয়া লন এবং উত্তর ভারতে এক বিশাল সাম্রাজ্য গঠন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। কিন্তু গ্রীক্ আক্রমণের ফলে ভারতের ক্ষতিও কম হয় নাই। আলেকজাণ্ডারের নির্ম্মম সৈন্যদের হাতে কত সমৃদ্ধ জনপদ, কতশত শিক্ষা ও শিল্পকেন্দ্র ধ্বংস হইয়াছিল, কত অসহায় নরনারী ও বালকবালিকার প্রাণনাশ ঘটিয়াছিল তাহার ইয়ত্তা নাই।

STUDIES AND QUESTIONS

1. Give a short account of the political situation of India in the time of Buddha and Mahavira.

2. What do you know of Iranian domination of North-West India in the sixth century B.C.? What were its consequences?

3 Give an account of Alexander's invasion of India and indicate its leading consequences.
(C.U. '32, '39, '44.)

ষষ্ঠ অধ্যায়

মৌর্য্য সাম্রাজ্য

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্য।—মগধের সহিত শক্তি-পরীক্ষা না করিয়াই আলেকজাণ্ডার ভারতবর্ষ ত্যাগ করিলেন। তাঁহার মৃত্যুসংবাদ ভারতে পৌঁছিলে চন্দ্রগুপ্ত নামক এক ভারতীয় বীর গ্রীকদিগকে পরাভূত করিয়া পঞ্জাব অধিকার করেন (খৃঃ পূঃ ৩২১)। চন্দ্রগুপ্তের বংশ-পরিচয় সম্বন্ধে সঠিক কিছু জানা যায় না। তিনি যে-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহার নাম 'মৌর্য্যবংশ'। অনেকের মতে শূদ্র চন্দ্রগুপ্ত ছিলেন নন্দবংশেরই সন্তান; তাঁহার মাতা বা পিতামহীর নাম ছিল মূরা; এই মূরা নাম হইতেই এই বংশের নাম হয় 'মৌর্য্য-বংশ'। কিন্তু বৌদ্ধগণ মৌর্য্যবংশকে নন্দবংশ হইতে স্বতন্ত্র এক ক্ষত্রিয় বংশ বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন; উত্তর ভারতে পিপ্পলী-বনু নামক স্থানে মৌর্য্যদের রাজ্য ছিল। চাণক্য বা কৌটিল্য

চন্দ্রগুপ্ত ও মৌর্য্যবংশ

চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যলাভ

নামে তক্ষশিলার এক কূটনীতিজ্ঞ ব্রাহ্মণের সহায়তায় চন্দ্রগুপ্ত অচিরেই নন্দগণকে পরাভূত করিয়া মগধ অধিকার করিলেন। অল্পকাল পরেই মগধের সহিত গ্রীকদের সংঘর্ষ বাধিয়া গেল। আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্য গ্রীক সেনাপতিরা ভাগাভাগি করিয়া লইয়াছিলেন,—এশিয়ার গ্রীক রাজ্যসমূহ সেলিউকস্ নামক সেনাপতির অধিকারে আসিয়াছিল।

সেলিউকসের সহিত যুদ্ধ ও চন্দ্রগুপ্তের জয়লাভ

ভারতবর্ষের রাজ্যগুলি উদ্ধার করিবার আশায় সেলিউকস্ যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন, কিন্তু চন্দ্রগুপ্তের হাতে তাঁহার নিদারুণ পরাজয় ঘটিল;—তিনি পঞ্জাবের অন্তর্গত গ্রীক রাজ্যগুলির উপর হইতে দাবী প্রত্যাহার করিয়াই নিষ্কৃতি পাইলেন না, কাবুল, কান্দাহার ও হিরাট এই তিনটি প্রদেশ সমর্পণ করিয়া চন্দ্রগুপ্তের নিকট সন্ধি ভিক্ষা করিতে বাধ্য হইলেন। সম্ভবতঃ চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে সেলিউকসের কন্যার বিবাহও হইয়াছিল। সিরিয়ার অধীশ্বর সেলিউকস্ চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় মেগাস্থিনিস্ নামক এক রাজদূত রাখিয়াছিলেন। সমগ্র সিন্ধু-গাঙ্গেয় উপত্যকা এইভাবে চন্দ্রগুপ্তের অধিকারে আসিল।

দাক্ষিণাত্য জয়

সুরাষ্ট্রও (কথিয়াবাড়) তাঁহার অধিকারে ছিল। কাহারও কাহারও মতে সুদূর মহীশূর পর্য্যন্ত তাঁহার সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল।

চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যু

কথিত আছে, বৃদ্ধ বয়সে তিনি জৈনধর্ম্মে দীক্ষা লইয়া মহীশূরের অন্তর্গত শ্রবণবেলগোলায় জৈনধর্ম্মের বিধান অনুসারে অনশনে প্রাণত্যাগ করেন।

মেগাস্থিনিসের বিবরণ।—মেগাস্থিনিস্ বহুকাল চন্দ্রগুপ্তের সভায় ছিলেন। তিনি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে Indica নামে একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। তাঁহার লিখিত গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ পাওয়া যায় নাই, কিন্তু অন্যান্য গ্রীক লেখকগণ সে পুস্তক হইতে যে সকল কথা উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা একত্র সংগ্রহ করিয়া মৌর্য্য-ভারত সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানিতে পারা গিয়াছে। মেগাস্থিনিসের Indica এবং কৌটিল্যের "অর্থশাস্ত্র" হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, চন্দ্রগুপ্ত কেবল দিগ্বিজয়ী বীরই ছিলেন না, গঠনমূলক শাসনকার্য্যেও তাঁহার অসামান্য প্রতিভা ছিল।

সমাজ শ্রেণী-ভেদ

মেগাস্থিনিস্ তৎকালীন জনসমাজকে সাধারণভাবে সাতটি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া গিয়াছেন; যথা—(১) দার্শনিক (ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ),

(২) কৃষক, (৩) শিকারী ও পশুপালক, (৪) শিল্পী ও ব্যবসায়ী, (৫) সৈনিক, (৬) পর্য্যবেক্ষক ও গুপ্ত সংবাদ-সংগ্রাহক এবং (৭) অমাত্য। মেগাস্থিনিস্ ভারতবাসীদের নৈতিক চরিত্রের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। দেশের লোক সরল ও অনাড়ম্বর জীবনে অভ্যস্ত ছিল; তাহারা সত্যবাদী এবং ধর্ম্মানুরাগী ছিল; দেশে চুরি-ডাকাতি প্রায় ছিলই না, লোকে মামলা-মোকদ্দমাও বড়-একটা করিত না; যজ্ঞকাল ব্যতীত অন্য সময় মদ্যপান অতিশয় গর্হিত বলিয়া মনে করা হইত। দেশে দাসত্ব-প্রথাও বিরল ছিল। কৃষকগণ ধীর, শান্ত এবং শ্রমপরায়ণ ছিল; তাহারা কখনও উৎপীড়িত হইত না। ধনধান্যের প্রাচুর্য্যে ভারতবর্ষ অত্যন্ত সমৃদ্ধ ছিল; দুর্ভিক্ষ অজ্ঞাত ছিল। প্রচুর মূল্যবান রত্ন ও প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্য সর্ব্বসাধারণের সম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছিল। ভারতের অধিবাসিগণ বেশভূষায় সৌখীন ও অলঙ্কারপ্রিয় ছিল।

ভারতবাসীর নৈতিক চরিত্র

দেশের সমৃদ্ধি

গঙ্গা ও শোন নদীর সঙ্গমস্থলে নয় মাইল দীর্ঘ ও দুই মাইল বিস্তৃত স্থান ব্যাপিয়া ছিল রাজধানী পাটলীপুত্রের অবস্থান। চারিদিকে গভীর পরিখা ও উচ্চ প্রাচীরের দ্বারা নগরটি সুরক্ষিত ছিল; দারুময় বিশাল রাজ-প্রাসাদ ঐশ্বর্য্য ও আড়ম্বরে পারস্যের রাজ-প্রাসাদ অপেক্ষাও গৌরবমণ্ডিত ছিল। এই বিশাল নগর পরিচালনার জন্য আধুনিক মিউনিসিপ্যালিটির ন্যায় ত্রিশজন সদস্য লইয়া একটি পৌরসভা গঠিত হইয়াছিল। পৌরসভার সদস্যগণ পঞ্চায়েতের ন্যায় প্রতি পাঁচজন মিলিয়া ছয়টি সমিতিতে বিভক্ত ছিলেন; প্রত্যেক সমিতির উপর এক-একটি বিভাগের কার্য্য ন্যস্ত থাকিত। কোন সমিতি নাগরিকদের জন্মমৃত্যুর বিবরণ রাখিতেন, কোন সমিতি ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করিতেন; অপর সমিতিগুলির উপর বৈদেশিকদের তত্ত্বাবধান, শুল্ক আদায়, প্রভৃতি বিভিন্ন কার্য্যের ভার ন্যস্ত ছিল। বিক্রীত দ্রব্যাদির মূল্যের এক-দশমাংশ ছিল রাজকর। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে ইহার সমর্থন মেলে।

রাজধানী পাটলিপুত্র

মেগাস্থিনিস্ চন্দ্রগুপ্তের রাষ্ট্রশাসন-ব্যবস্থারও যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। শাসনবিভাগের এক-একটি শাখার ভার এক-এক শ্রেণীর অধ্যক্ষ বা রাজপুরুষদের উপর ন্যস্ত ছিল; তাঁহারা

শাসন-ব্যবস্থা

রাজস্ব-সংগ্রহ, পথঘাট নির্ম্মাণ, জলসেচ, জমির জরিপ, প্রভৃতি বিভিন্ন কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। দেশের উৎপন্ন শস্যের এক-চতুর্থাংশ রাজস্ব রূপে সংগৃহীত হইত। পাটলিপুত্র হইতে পঞ্জাব পর্য্যন্ত একটি সুদীর্ঘ পথ নিৰ্ম্মিত হইয়াছিল; বিভিন্ন পথের সংযোগ-ক্ষেত্রে স্তম্ভ স্থাপন করিয়া পথনির্দ্দেশ করা হইত এবং পথের মধ্যে দূরত্বজ্ঞাপক চিহ্নও থাকিত। চন্দ্রগুপ্তের সময়ে আইন ও শৃঙ্খলার কঠোরতা সর্ব্বত্র বিদিত ছিল। সামান্য অপরাধে অপরাধীর অঙ্গচ্ছেদের ব্যবস্থা করা হইত। মৌর্য্য রাজ্যে সর্ব্বত্র গুপ্তচর রাখিবার প্রথা ছিল। চরেরা রাজ্যের সর্ব্ববিভাগ পরিদর্শন করিয়া সকল সংবাদ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে রাজাকে জানাইতেন।

সৈন্যবিভাগ

চন্দ্রগুপ্তের বিরাট সৈন্যবাহিনী ছিল—ছয় লক্ষ পদাতিক, ত্রিশ হাজার অশ্বারোহী, নয় হাজার হস্তী, অগণিত রথ এবং বিরাট নৌ-বহর তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত হইয়া থাকিত। পৌর-সভার ন্যায় সেনা-বিভাগের ভারও ত্রিশজন রণদক্ষ সদস্যের উপর ন্যস্ত ছিল। পাঁচজন সদস্য লইয়া এক-একটি সমিতি—এইভাবে সেনা-বিভাগে ছয়টি সমিতি গঠন করা হইত; রসদ-সংগ্রহ, নৌ-বহর, অশ্বারোহী, পদাতিক, প্রভৃতির তত্ত্বাবধানের ভার এক-একটি সমিতির উপর ন্যস্ত ছিল। সৈন্যগণ রাজকোষ হইতে বেতন, ভাতা, ইত্যাদি পাইত।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র।—কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র' নামক গ্রন্থ হইতেও এই যুগের শাসন ব্যবস্থার অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। কেহ কেহ মনে করেন, এই গ্রন্থখানি চন্দ্রগুপ্তের প্রধান মন্ত্রী প্রসিদ্ধ কৌটিল্য বা চাণক্য পণ্ডিতের রচনা। কিন্তু অনেক পণ্ডিতের মতে এই গ্রন্থখানি খৃষ্টের জন্মের পরবর্ত্তী শতকে রচিত বা সম্পাদিত হয়। সে যাহাই হউক ইহা হইতে প্রাচীনকালের অর্থনীতি ও শাসন-ব্যবস্থা সম্বন্ধে অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য জানিতে পারা যায়। মেগাস্থিনিসের ন্যায় অর্থশাস্ত্রের লেখকও সুনিয়ন্ত্রিত রাজ্য শাসন-পদ্ধতির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। শাসন বিভাগের এক-একটি শাখা এক-একজন অধ্যক্ষের দ্বারা পরিচালিত হইত। নগরের শাসনভার যাঁহার উপর ন্যস্ত থাকিত তাঁহার উপাধি ছিল **'নগরাধ্যক্ষ'**। সৈন্য বিভাগের অধ্যক্ষের নাম ছিল **'বলাধ্যক্ষ'**

চাণক্য বা কৌটিল্য

শাসন-ব্যবস্থা

মৌর্য্য-সাম্রাজ্য কয়েকটি প্রদেশে বিভক্ত ছিল। রাজবংশীয় কুমারগণই সচরাচর প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত হইতেন। বর্ত্তমানকালের ন্যায় প্রদেশগুলি জেলায় এবং জেলাগুলি গ্রামে বিভক্ত ছিল। **'স্থানিক'** নামক এক শ্রেণীর রাজকর্ম্মচারী জেলার শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। গ্রামের শাসনভার সাধারণতঃ গ্রামের জনসাধারণের উপর ন্যস্ত থাকিত। **'গোপ'** নামক রাজকর্ম্মচারিগণ তাহাদের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। শাসন-কর্ত্তৃপক্ষকে রাজ্যের সকল প্রকার সংবাদ জানাইবার জন্য দেশে গুপ্তচর-প্রথার প্রভূত প্রচলন ছিল। **'মহামাত্র'** ও **'অমাত্য'** উপাধিধারী রাজপুরুষগণ রাজাকে কেন্দ্রীয় শাসনকার্য্য নির্ব্বাহে সাহায্য করিতেন। ইহা ব্যতীত **'মন্ত্রি পরিষদ্'** নামে আর একটি সভা ছিল; রাজা মন্ত্রি-পরিষদের সদস্যগণকে এবং মহামাত্র ও অমাত্যগণকে একত্র আহ্বান করিয়া সর্ব্বদা তাঁহাদের পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। রাজার দেহরক্ষী সৈন্যদের মধ্যে একদল নারী-রক্ষিণীও ছিল। অর্থশাস্ত্রের মতে রাজা নিজেকে জনসাধারণের প্রধান কর্ম্ম-চারী মনে করিয়া রাজ্যের মঙ্গলবিধানে নিয়ত সচেষ্ট থাকিতেন। রাজাদর্শ

বিন্দুসার।—চব্বিশ বৎসরকাল অপ্রতিহত প্রতাপে রাজত্ব করার পর চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যু হয়। অতঃপর তাঁহার পুত্র বিন্দুসার 'অমিত্রঘাত' উপাধি গ্রহণ করিয়া মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। বিন্দুসারও যে বিশেষ শক্তিমান নরপতি ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহাকে কঠোর হস্তে বিদ্রোহ দমন করিতে হইয়া-ছিল। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, তিনিই প্রথম দাক্ষিণাত্য জয় করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালেও গ্রীকদের সহিত মৌর্য্যদের মিত্রতা অক্ষুণ্ণ ছিল; সেলিউকসের উত্তরাধিকারী তাঁহার সভায় দায়িমাখোস্ (Daimachos) নামে একজন রাজদূতকে প্রেরণ করিয়াছিলেন; মিশরের গ্রীক নরপতিও বিন্দুসারের নিকট রাজদূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইহা হইতে যে কেবল মৌর্য্য-সম্রাটের প্রভাব-প্রতিপত্তিরই পরিচয় পাওয়া যায় তাহা নহে, ভারতবর্ষের সহিত অন্যান্য দেশের যোগাযোগের কথাও জানিতে পারা যায়।

'অমিত্রঘাত'

বিদ্রোহ দমন ও দাক্ষিণাত্য জয়

গ্রীকদের সহিত সম্বন্ধ

মহামতি অশোক।—খৃঃ পূঃ ২৭৩ অথবা ২৭২ অব্দে বিন্দুসার পরলোক গমন করিলে, তাঁহার পুত্র অশোক মগধের

ভ্রাতৃ-কলহ

সিংহাসনে আরোহণ করেন। কথিত আছে, বিন্দুসারের মৃত্যুতে সিংহাসনের উত্তরাধিকার লইয়া তাঁহার পুত্রদের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হয় এবং অশোক সকলকে পরাভূত করিয়া রাজপদ অধিকার করেন,—তাঁহার নির্ম্মম হস্তে কোন কোন ভ্রাতার প্রাণ-

নাশ পর্য্যন্ত ঘটে বলিয়া তিনি 'চণ্ডাশোক' এই কুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। এ সকল কথা কতদূর সত্য তাহা নিঃসংশয়ে বলা কঠিন। তবে বিন্দুসারের মৃত্যুর প্রায় চারি বৎসর পরে যে অশোকের রাজ্যাভিষেক হইয়াছিল তাহার কিছু কিছু প্রমাণ আছে।
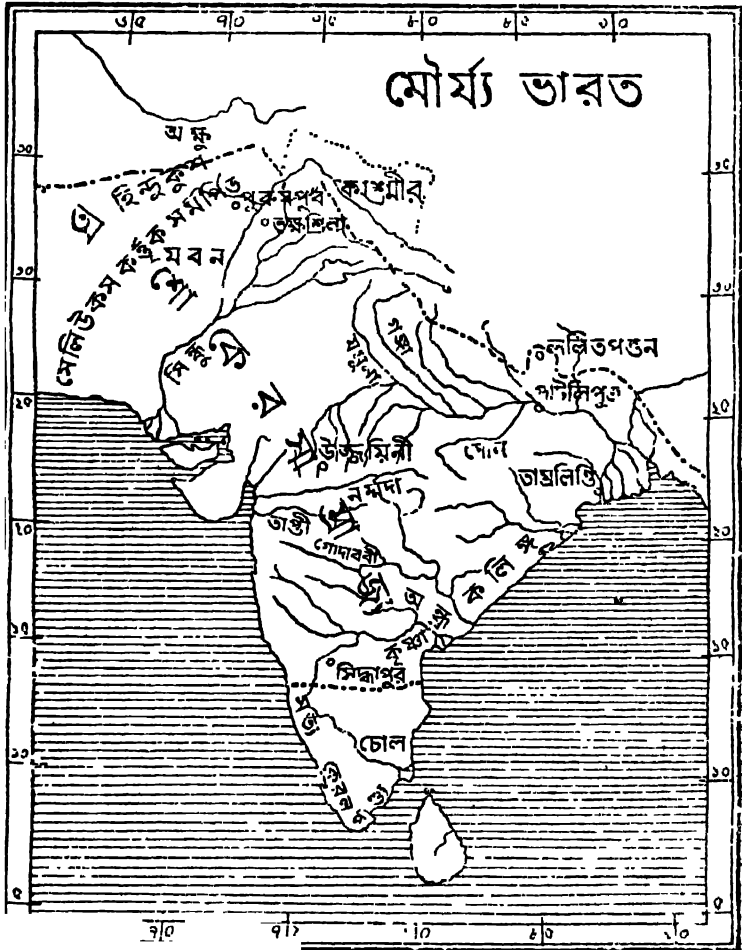
অভিষেক

প্রথম জীবনে অশোক পিতা ও পিতামহের ন্যায়ই রাজ্যলিপ্সু ছিলেন। রাজ্যের আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা বিধান করিয়া, অভিষেকের আট বৎসর পরে সাম্রাজ্য বিস্তারের অভিপ্রায়ে তিনি কলিঙ্গদেশ আক্রমণ করেন। উড়িষ্যার বৈতরণী নদী হইতে মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর গোদাবরী নদী পর্য্যন্ত ছিল কলিঙ্গ ভূমির বিস্তার। কলিঙ্গবাসীরাও ছিল অত্যন্ত পরাক্রমশালী। উভয় পক্ষে তুমুল সংগ্রামের পর অশোক জয়লাভ করিলেন বটে কিন্তু রণক্ষেত্রের শোচনীয় দৃশ্য তাঁহাকে নিরতিশয় ব্যথিত করিয়া তুলিল। পশুবলের দ্বারা দিগ্বিজয় তাঁহার অন্তরে নিদারুণ ব্যথা ও রাষ্ট্রপ্রসারে বিতৃষ্ণা আনিল। অহিংসাই জৈনবৌদ্ধমতে পরম ধর্ম্ম এবং তিনি অহিংসার দ্বারা **'ধর্ম্ম বিজয়'** সম্পন্ন করিবার সঙ্কল্প গ্রহণ করিলেন। এই সময়েই তিনি উপগুপ্ত নামে জনৈক বৌদ্ধ ভিক্ষুর নিকট হইতে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। তদবধি অহিংসার বাণী প্রচারই তাঁহার জীবন-ব্রত হইয়া উঠিল। দীক্ষা গ্রহণের পর তিনি মৌর্য্য সম্রাটগণের চিরাচরিত 'বিহার যাত্রা' (প্রমোদ ভ্রমণ) বন্ধ করিয়া, তীর্থভ্রমণ এবং বুদ্ধের বাণী প্রচারের অভিপ্রায়ে **'ধর্ম্মযাত্রায়'** বাহির হন। তিনি নিজের বিশাল সাম্রাজ্যের মধ্যে নীতিবোধ ও ধর্ম্মভাব প্রচারের জন্য **'ধর্ম্মমহামাত্র'** নামে এক শ্রেণীর নূতন রাজকর্ম্মচারী নিযুক্ত করিলেন; তাঁহারা গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে প্রজাদের কাছে ধর্ম্মনীতি প্রচার করিয়া বেড়াইতেন। রাজ্যের নানাস্থানে পর্ব্বতগাত্রে এবং প্রস্তরস্তম্ভে ধর্ম্মাশোকের **'ধর্ম্মলিপি'** উৎকীর্ণ করিয়া দেওয়া হইল,—প্রজারা যাহাতে গুরুজনদিগকে শ্রদ্ধা করে, সত্য কথা বলে, পরস্পরের প্রতি সদয় ব্যবহার করে, পশুপক্ষীর প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহার না করে এবং পর-মত-সহিষ্ণু হয়, সেজন্য এই সকল শিলালিপিতে নানা সদুপদেশ সরল লৌকিক ভাষায় লিখিত হইয়াছিল। কিন্তু কেবল নিজের রাজ্যের মধ্যেই ধর্ম্ম ও নীতি প্রচার করিয়া অশোক ক্ষান্ত হইতে পারিলেন না,—

কলিঙ্গ জয়

বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ ও ধর্ম্মপ্রচার

ধর্ম্মযাত্রা

ধর্ম্মমহামাত্র নিয়োগ

ধর্ম্মলিপি

কলিঙ্গের দুঃখদুর্দ্দশা দর্শনে তাঁহার অন্তরে 'ধর্ম্ম-বিজয়ে'র যে শুভ প্রেরণা আসিয়াছিল তাহা সার্থক করিবার উদ্দেশ্যে তিনি দেশে দেশে প্রচারক প্রেরণ করিতে লাগিলেন। দাক্ষিণাত্যের অন্ধ্র, চোল, পাণ্ড্য, সত্যপুত্র, কেরলপুত্র, প্রভৃতি রাজ্যে বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ সঙ্ঘ স্থাপন করিলেন; সুদূর ব্রহ্মদেশেও শোন এবং উত্তর নামক দুইটি প্রচাবক অশোক প্রেরণ করিলেন। তাঁহার এক পুত্র (মতান্তরে ভ্রাতা) মহেন্দ্র এবং কন্যা সঙ্ঘমিত্রা তাম্রপর্ণী বা সিংহলে গিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ করিলেন। অশোক সিবিয়ার গ্রীক-রাজা আন্তিয়োকস্ থীয়স্ (Antiochos Theos), মিশরের গ্রীক-নরপতি টলেমী ফিলাডেলফস্ (Ptolemy Philadelphos), মাসিদনরাজ আন্তিগোনাস্ গোনাতাস্ (Antigonus Gonatus), এপিরাসের (Epirus) রাজা আলেকজাণ্ডার এবং উত্তর আফ্রিকায় সিরিনের (Cyrene) অধিপতি মাগাস্ (Magas), প্রভৃতির নিকট মৈত্রী-দূত ও প্রচারকমণ্ডলী পাঠাইয়াছিলেন।

ধর্ম্মবিজয়

প্রচার

বৈদেশিক রাজাদের সহিত সম্বন্ধ

বুদ্ধদেব ও অশোকের মধ্যে প্রায় তিনশত বৎসর ব্যবধান; এই সুদীর্ঘ কালেব মধ্যে বৌদ্ধধর্ম্ম যথেষ্ট রূপান্তর গ্রহণ করিয়াছিল, বৌদ্ধ ধর্ম্মাচার্য্যদের মধ্যেও অনেক মতভেদের সৃষ্টি হইয়াছিল। এই সকল মতভেদ দূব করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের মূলনীতির উদ্ধার এবং বিবদমান বৌদ্ধসমাজে সংহতি ও ঐক্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে অশোক পাটলিপুত্রে এক বৌদ্ধসঙ্গীতি আহ্বান করিলেন। ইহাই **তৃতীয় বৌদ্ধ সম্মিলন**। এই সম্মিলনের কার্য্যসূচী সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না, তবে ইহা যে বৌদ্ধ সমাজে নবীন প্রাণশক্তির সঞ্চার কবিয়াছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

তৃতীয় বৌদ্ধ-সম্মিলন

অশোকের শাসন-পদ্ধতি।—উত্তরে হিন্দুকুশ ও হিমালয় হইতে দক্ষিণে মহীশূর এবং পূর্ব্বে ব্রহ্মপুত্র হইতে পশ্চিমে আরব-সাগর ও পারস্যের পূর্ব্বপ্রান্ত পর্য্যন্ত ছিল অশোকের বিশাল সাম্রাজ্যের বিস্তার। এই বিরাট সাম্রাজ্য শাসন করিবার যোগ্যতাও তাঁহার সম্পূর্ণরূপে ছিল। আভ্যন্তরীণ শাসন-কার্য্যে তিনি কোন অংশেই তাঁহার পিতা বা পিতামহ অপেক্ষা হীন ছিলেন না, ববং অহিংসা-মন্ত্রে দীক্ষা লইয়াও তিনি যে আজীবন

সাম্রাজ্যসীমা

অপ্রতিহত প্রভাবে এই বিশাল সাম্রাজ্যে শৃঙ্খলা রক্ষা করিয়া চলিতে পারিয়াছিলেন তাহাতে শাসক হিসাবেও তাঁহাকে পৃথিবীর যে কোনও শ্রেষ্ঠ নরপতির তুলনায় শ্রেষ্ঠতর বিবেচনা করা যাইতে পারে; বাস্তবিক পৃথিবীর ইতিহাসে অশোকের তুলনা নাই। অশোকের শাসন-পদ্ধতি তাঁহার পিতা ও পিতামহের শাসন-প্রণালীর অনুরূপ ছিল; এক-একজন রাজকুমার 'মহামাত্র'দের সহায়তায় রাজ-প্রতিনিধি হিসাবে সাম্রাজ্যের এক-এক অংশ শাসন করিতেন। আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন জনপদ অনেকটা স্বাধীন ছিল বলিয়াই মনে হয়; তবে যাহাতে কোথাও স্বেচ্ছাচার চলিতে না পারে সেজন্য কেন্দ্রীয় শক্তির মহামাত্রগণ এবং সম্রাট স্বয়ং প্রত্যেক প্রাদেশিক রাষ্ট্রের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতেন। চন্দ্রগুপ্তের সময় হইতেই 'প্রতিবেদক' (reporter) নামে এক শ্রেণীর কর্ম্মচারীরা নিয়মিতভাবে প্রাদেশিক শাসনকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়া রাজধানীতে সংবাদাদি
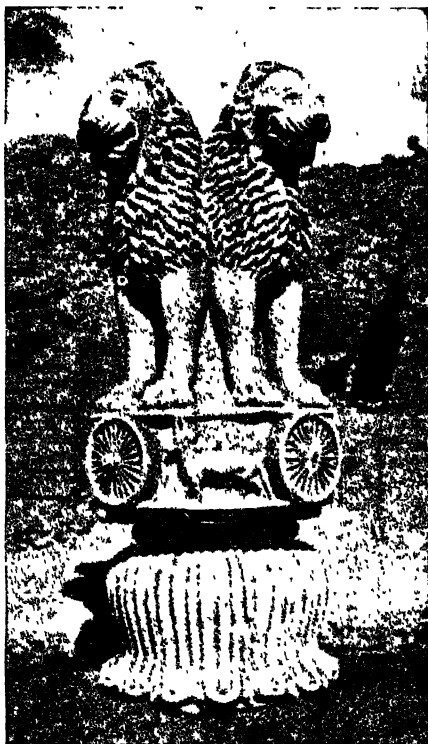
প্রাদেশিক শাসন ও কেন্দ্রীয় শক্তি

স্তম্ভশীর্ষ (সারনাথ)

প্রতিবেদক

রাজুক

লিখিয়া পাঠাইতেন। প্রজার মঙ্গল-বিধানের জন্য **'রাজুক'** বা **'রজ্জুক'** নামে এক শ্রেণীর কর্ম্মচারী নিয়োগ করা হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়; ধর্ম্ম ও নীতি প্রচারের জন্য 'ধর্ম্মমহামাত্র' নামে কর্ম্মচারিগণ নিযুক্ত ছিলেন। অশোকের রাজত্বকালে পূর্ব্বতন-দণ্ড-বিধির কঠোরতা অনেক কমিয়া গিয়াছিল। জনসাধারণের সুবিধার জন্য পথঘাটে বৃক্ষরোপণ, কৃষিক্ষেত্রে জলসেচের ব্যবস্থা, বিশ্রামাগার, রুগ্নাবাস ও আরোগ্য-শালা স্থাপন প্রভৃতি ছিল সাধারণ কর্ত্তব্যের অন্তর্ভূত। দেশে অনেক পশু-চিকিৎসালয়ও স্থাপিত হইয়াছিল। দীনদরিদ্রগণ যাহাতে নিয়মিত ভিক্ষা পায় সে ব্যবস্থাও তিনি করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে রাজপ্রাসাদে আহারের জন্য প্রতিদিন বহু পশুপক্ষী বধ করা হইত। অশোকের আদেশে রাজ্যমধ্যে অকারণ প্রাণিহত্যা যতদূর সম্ভব হ্রাস করা হইল।

ধর্ম্মমহামাত্র

জনহিত

শিল্পকলা।—অশোকের রাজত্বকালে দেশে ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্য কলার মধ্যেও নূতন প্রাণসঞ্চার হয়। চন্দ্রগুপ্তের দারুময় প্রাসাদের পরিবর্ত্তে তিনি প্রস্তর-নির্ম্মিত রাজপ্রাসাদ এবং অসংখ্য স্তূপ, মনোরম স্তম্ভ ও বিচিত্র গুহানিবাস নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। কিংবদন্তী অনুসারে তিনি ছিলেন আশি হাজার স্তূপের প্রতিষ্ঠাতা। পাটনার অনতিদূরে (বাঁকিপুর) অশোকের রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। এ যুগের ভারতীয় শিল্পকলায় পশ্চিম-এশিয়ার—বিশেষতঃ পারস্যের প্রভাব সুস্পষ্ট।

রাজপ্রাসাদ, স্তূপ, স্তম্ভ, গুহাবাস

অশোকের শ্রেষ্ঠত্ব।—কেবলমাত্র সমগ্র পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নরপতিগণের মধ্যেই নয়, মানবজাতির শ্রেষ্ঠ কর্ম্মবীরদের মধ্যেও মহামতি অশোকের স্থান অতি উচ্চে। নরপতি হিসাবে তিনি ছিলেন আদর্শস্থানীয়; প্রজার মঙ্গলের মধ্যে ব্যক্তিগত জীবনের সকল সুখ এবং আশা-আকাঙ্ক্ষা তিনি নিঃশেষে বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছিলেন। কথিত আছে, উত্তরকালে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন, অথচ প্রাচীন রাজর্ষিদের মত তিনি রাজকার্য্য হইতে একেবারে দূরে সরিয়া যান নাই। কিন্তু ইহাই তাঁহার জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি নহে। পৃথিবীতে যে সকল নরপতি প্রজার মঙ্গলই আত্মকল্যাণ জ্ঞান করিয়া দীনদরিদ্রের ন্যায় জীবনযাপন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যেও অশোকের তুলনা পাওয়া কঠিন।

আদর্শ নরপতি

জনসাধারণের পার্থিব সমৃদ্ধি তাঁহার একমাত্র কামনা ছিল না, —তাহাদের নৈতিক ও পারমার্থিক উন্নতিও ছিল তাঁহার জীবনের সাধনা। আবার এ কাজে কেবল নিজের প্রজারাই তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য ছিল না,—সমগ্র মানবজাতির স্থায়ী কল্যাণ ছিল এই উদার কর্ম্মবীরের উদ্দেশ্য। যে সকল নরপতি অশোকের ন্যায় ধর্ম্মপ্রচারে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যেও উদারতায় অশোকের সমকক্ষ খুঁজিয়া পাওয়া দুরূহ। অশোক নিজে ছিলেন বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী; তাঁহারই অক্লান্ত প্রচারকার্য্যের ফলে আজও পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ নরনারী বুদ্ধের শরণাগত। কিন্তু ধর্ম্ম সম্বন্ধে তিনি আজীবন যে পরম উদারতার আদর্শ প্রচার করিয়া গিয়াছেন তাহাই তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গৌরব। অশোক কখনও নিজ রাজ্যেও জোর করিয়া বৌদ্ধমত প্রচার করেন নাই, তিনি প্রজাদিগকে সকল ধর্ম্মের প্রতিই শ্রদ্ধাশীল হইতে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন; ধর্ম্মের যাহা মূলনীতি তাহারই প্রচার তাঁহার সকল কর্ম্মপ্রচেষ্টার মূলে নিহিত ছিল। ইহাই অশোকের শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয়। একদিকে এই অনন্যসাধারণ প্রতিভা এবং অপরদিকে তাঁহার অসাধারণ কর্ম্মশক্তি, শাসনপটুতা, চরিত্রবল ও বিশ্বমৈত্রী তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে।

আদর্শ কর্ম্মবীর মানবজাতির নৈতিক কল্যাণকামী

অসাধারণ উদারতা

অশোকের অমরত্ব

মৌর্য্য সাম্রাজ্যের পতন।—মৌর্য্যসাম্রাজ্যের উন্নতির যুগে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় ঐক্য প্রায় সফল হইয়া আসিয়াছিল,— ভারতের ভৌগোলিক সীমার বাহিরেও সাম্রাজ্য প্রসারিত হইয়াছিল। পর পর চন্দ্রগুপ্ত, বিন্দুসার ও অশোক তিনজনই সাম্রাজ্যের সীমা বিস্তৃত করিয়াছিলেন। কলিঙ্গ বিজয়ের পর অশোক দিগ্বিজয়ের পথ ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মবিজয়ের আদর্শ অনুসরণ করিলেও, তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা বিশেষ ক্ষুণ্ণ হয় নাই। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর (খৃঃ পূঃ ২৩২) পর উহা ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। অনেকেরই বিশ্বাস, অশোক অহিংসা ও ধর্ম্মের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করিতেন বলিয়া দেশের রাষ্ট্রিক ও সামরিক শক্তি ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়ে এবং তাহাতেই মৌর্য্য সাম্রাজ্যের পতন হয়। অশোকের মৃত্যুর পর তাঁহার এক পুত্র কাশ্মীরের স্বাধীন রাজা হইয়া বসেন, আর এক পুত্র মগধের

মৌর্য্য সাম্রাজ্যের পতনের কারণ

সামরিক দুর্ব্বলতা

সিংহাসন লাভ করেন। রাজশক্তি এইভাবে বিভক্ত হইয়া পড়িলে, স্বভাবতঃই মৌর্য্যরাজগণের সামরিক শক্তিরও হ্রাস হয়। সুতরাং মৌর্য্যশক্তি বিচ্ছিন্ন ও হীনবল হইয়া পড়িলে, সুযোগ বুঝিয়া দাক্ষিণাত্যে অন্ধ্র-সাতবাহন এবং কলিঙ্গে চেতবংশীয় নরপতিগণ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন; হিন্দুকুশের অপরদিকে অবস্থিত ব্যাক্‌ট্রিয়া হইতেও গ্রীক রাজারা বারবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন। মৌর্য্যদের যখন এরূপ শোচনীয় অবস্থা তখন মৌর্য্যবংশের দশম ও শেষ নরপতি বৃহদ্রথ তাঁহার সেনাপতি পুষ্যমিত্রের হস্তে নিহত হন (আঃ ১৮৭ খৃঃ পূঃ)।

সাতবাহন ও কলিঙ্গ বিদ্রোহ

গ্রীক আক্রমণ

STUDIES AND QUESTIONS

1. Sketch the career of Chandragupta Maurya, and state what you know of his system of civil administration. (C. U. '33).

2. Sketch the career of Chandragupta Maurya as a conqueror and ruler. (C. U. '24, '37, '41, '43, '44).

3. What light does Megasthenes's account throw on the social and political institutions of the country in the reign of the first Maurya Emperor ?
(C. U. '18, '20).

4. Sketch the career of Asoka. (C. U. '32).

5. Write a history of the Maurya dynasty with a special reference to Asoka's religious propaganda,
(C U. '25).

6. Give a brief estimate of Asoka as a ruler and a propagator of Buddhism. (C. U '27, '36, '39).

7. Briefly describe the steps that Emperor Asoka adopted for the spread of Buddhism within and outside his empire. (C. U. '29, '39, '41, '44)

8. Describe the various measures adopted by Asoka for the material, moral and religious advancement of his people. (C. U. '29, '32, '35)

9. Give a short history of the Maurya Empire. (C. U. '21).

10 Give an account of the civil administration of the Mauryas. (C. U. '40, '45).

11. Why is Asoka regarded as one of the greatest rulers of the world ? (C. U. '42, '44).

সপ্তম অধ্যায়

মৌর্য্যবংশের পতনের পর ভারতের রাষ্ট্রীয় পরিস্থিতি

পুষ্যমিত্র ও শুঙ্গবংশ

উত্তর-ভারত—শুঙ্গ ও কাণ্বংশ।—বৃহদ্রথ মৌর্য্যকে হত্যা করিয়া ব্রাহ্মণ পুষ্যমিত্র মগধের সিংহাসনে যে রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করিয়া যান তাহার নাম 'শুঙ্গবংশ'। অশোকের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই কলিঙ্গদেশ স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিল। কলিঙ্গের চেতবংশীয় রাজা খারবেল সম্ভবতঃ পুষ্যমিত্রের সময় মগধ আক্রমণ করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী মৌর্য্য সম্রাটগণের দুর্ব্বলতার সুযোগে গ্রীকগণও পঞ্জাবে আপনাদের আধিপত্য স্থাপন করিয়া গাঙ্গেয় উপত্যকার দিকে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিতেছিল। তাহারা এই সময় অযোধ্যা অতিক্রম করিয়া রাজপুতানার অন্তর্গত মধ্যমিকা (চিতোরের অনতিদূরে 'নগরী') অধিকার করিয়া বসিল। পরে পাটলিপুত্রের দিকে অগ্রসর হইলে, পুষ্যমিত্রের হস্তে তাহাদিগকে পরাভব স্বীকার করিয়া ফিরিয়া যাইতে হয়। এই সকল আক্রমণ সত্ত্বেও দ্রোণাচার্য্যের ন্যায় এই ব্রাহ্মণবীর পুষ্যমিত্র আপনার অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছিলেন। দক্ষিণে নর্ম্মদা পশ্চিমে বিপাশা নদী পর্য্যন্ত তাঁহার সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। বৈদিকধর্ম্ম পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিয়া তিনি দুইটি অশ্বমেধযজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ পতঞ্জলি এইরূপ একটি অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। অনেকের মতে এই অশ্বমেধ যজ্ঞ ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পুনরভ্যুদয়ের ও বৌদ্ধধর্ম্ম ক্ষয়ের লক্ষণ।

চেতরাজ খারবেলের মগধ আক্রমণ

শুঙ্গ-সাম্রাজ্য

অশ্বমেধ যজ্ঞ ও ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পুনরভ্যুদয়

পুষ্যমিত্রের পর অগ্নিমিত্র মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। পিতার রাজ্যকালে তিনি ছিলেন বিদিশার শাসনকর্ত্তা; তাঁহার কাহিনী অবলম্বনে মহাকবি কালিদাস 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নামক নাটক রচনা করেন। তাহা হইতে জানা যায়, তিনি নল-উপাখ্যানে বর্ণিত প্রসিদ্ধ বিদর্ভ দেশের (বেরার) রাজাকে পরাজিত করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী শুঙ্গরাজগণ ছিলেন হীনবল। আনুমানিক ৭২ খ্রীঃ পূর্ব্বাব্দে শুঙ্গবংশের শেষ নরপতি তাঁহার মন্ত্রী বাসুদেব কর্ত্তৃক নিহত হন।

শুঙ্গবংশের পতন

কাণ্বংশ

বাসুদেব যে রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন তাহার নাম 'কাণ্বংশ'। এই বংশের চারিজন রাজা মোট ৪৫ বৎসর রাজত্ব করেন। আনুমানিক ২৭ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে দাক্ষিণাত্যের সাতবাহন (অন্ধ্র) রাজগণের হস্তে কাণ্বদের পরাভব ঘটে। ইহার পরেও কিছুকাল উত্তর-ভারতে অযোধ্যা, মথুরা, কৌশাম্বী, প্রভৃতি স্থানে 'মিত্র' উপাধিধারী কয়েকজন নৃপতির রাজত্বের কথা জানিতে পারা যায়।

মিত্ররাজগণ

উত্তর-পশ্চিম ভারতে গ্রীক অধিকার।—অশোকের মৃত্যুর পর দাক্ষিণাত্যের সাতবাহন ও কলিঙ্গের চেতরাজগণের ন্যায় গান্ধার ও উহার পার্শ্ববর্ত্তী স্থানগুলিতে সামন্ত রাজারা স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। সিরিয়া ও ব্যাক্‌ট্রিয়ার (বহ্লীক) গ্রীক রাজারা এই সুযোগে ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে লাগিলেন। আনুমানিক খৃঃ পূঃ ২০৬ অব্দে সিরিয়ার গ্রীক নরপতি তৃতীয় আন্তিয়োকস্ (Antiochos III) হিন্দুকুশ অতিক্রম করিয়া ভারত-সীমান্তে প্রবেশ করেন। ইহার পর খৃঃ পূঃ ২০৬ হইতে ১৯০ অব্দের মধ্যে ব্যাকট্রিয়ার গ্রীক রাজা য়ুথিডেমস্ (Euthydemos) এবং তাঁহার পুত্র ডেমেট্রিয়স্ (Demetrios) বা দিমিত্রিয় গান্ধার ও পঞ্জাব অধিকার করেন। দিমিত্রিয় ছিলেন সিরিয়ার রাজা আন্তিয়োকসের জামাতা। ইহার পর য়ুক্রাতিদিস্ (Eukratides) নামে আর একজন গ্রীক রাজা ব্যাকট্রিয়া হইতে গান্ধার পর্য্যন্ত জয় করেন। তখন হইতে এই দুই গ্রীক রাজবংশ অক্ষুনদী (Oxus) হইতে পূর্ব্ব-পঞ্জাব পর্যন্ত সমগ্র ভূ-ভাগ শাসন করিতে থাকেন। মিনাণ্ডার বা মিলিন্দ পঞ্জাবের শাকল (শিয়ালকোট) নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন; সম্ভবতঃ তাঁহার সহিত পুষ্যমিত্র শুঙ্গের শক্তি-পরীক্ষাও হইয়াছিল। কথিত আছে, নাগসেন নামক জনৈক ধর্ম্মাচার্য্যের নিকট হইতে মিলিন্দ বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষা লইয়াছিলেন।

সিরিয়া ও ব্যাক্‌ট্রিয়ার গ্রীক রাজগণ

তৃতীয় আন্তিয়োকস্

য়ুথিডেমস ও ডেমেট্রিয়স

য়ুক্রাতিদিস্

মিনাণ্ডার

মিনাণ্ডারের বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ

ভারতবর্ষে গ্রীক-শাসন কিঞ্চিদধিক এক শতাব্দীকাল স্থায়ী হইয়াছিল; পরে কতকগুলি যাযাবর জাতির আক্রমণে ইহার অবসান ঘটে।

শকাধিকার।—'বহ্লীকদেশীয় গ্রীকদের' পরে যে সকল

যাযাবর জাতি উত্তর-পশ্চিম গিরিপথ দিয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করে, তাহারা প্রধানতঃ ছিল শক, পহ্লব (Parthian), এবং ইউ-চি (Yueh-chi) এই তিনটি দলে বিভক্ত।

শক, পহ্লব, ও ইউ-চিগণের বাসভূমি

শকদের বাসস্থান ছিল অক্ষু বা বক্ষু (Oxus) নদীর উত্তর তটে। পহ্লব বা পারদরা (Parthians) কাস্পিয়ান সাগরের দক্ষিণ দিকে অর্থাৎ উত্তর পারস্যে বাস করিত। ইউ-চিদের বাসভূমি ছিল চীনদেশের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে। ইউ-চিরা হিউঙ-নো (হূণ ?) নামক আর একটি পরাক্রান্ত যাযাবর জাতির চাপে পড়িয়া অক্ষুনদীর দিকে আগমন করে এবং শকদিগকে সেখান হইতে তাড়াইয়া দেয়; ইহা আনুমানিক ১৩৫ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দের ঘটনা। ইউ-চি জাতি কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া শকগণ ইরাণ, আফগানিস্থান ও ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অধিকার করিয়া বসতি স্থাপন করিল। ভারতবর্ষে শকদের প্রথম পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন মোগ (Moga or Maue). তিনি গ্রীকদের নিকট হইতে পুষ্করাবতী ও তক্ষশিলা নগরী জয় করেন। ক্রমে শকগণ আরও অগ্রসর হইয়া মথুরা, উজ্জয়িনী, ভৃগুকচ্ছ,বরোচ,সুরাষ্ট্র,প্রভৃতি নামক স্থানে তাহাদের রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। পারসিক প্রভাবান্বিত শক রাজারা 'ক্ষত্রপ' ও 'মহাক্ষত্রপ' প্রভৃতি পারসিক উপাধি ধারণ করিতেন। মালব ও সুরাষ্ট্রের শকরাজ্য কালক্রমে অত্যন্ত পরাক্রমশালী হইয়া উঠিয়াছিল। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের মধ্যভাগে (আঃ ১৩০—১৫০ খৃঃ) মালব-সৌরাষ্ট্রে মহাক্ষত্রপ রুদ্র-দামন রাজত্ব করিতেন; উজ্জয়িনী নগরীতে তাঁহার রাজধানী ছিল। তিনি পঞ্জাবের মূলতান অঞ্চল হইতে কোঙ্কন উপকূল পর্য্যন্ত সমগ্র ভূ-ভাগ অধিকার করিয়াছিলেন। দক্ষিণাত্যের সাতবাহনবংশীয় রাজা গৌতমীপুত্র শাতকর্ণি পর্য্যন্ত রুদ্রদামনের নিকট পরাভব স্বীকার করেন এবং ব্রাহ্মণ হইয়াও নিজ পুত্রের সহিত ম্লেচ্ছ রুদ্র-দামনের কন্যার বিবাহ দিয়া সন্ধি স্থাপন করেন। রুদ্রদামন সংস্কৃত সাহিত্যের একজন পৃষ্টপোষক ছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে। ভৃগুকচ্ছের প্রসিদ্ধ ক্ষত্রপ নহপান গৌতমীপুত্র শাতকর্ণির নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন। সুরাষ্ট্রের শক-ক্ষত্রপগণ খৃষ্টীয় প্রথম শতকের শেষদিক হইতে চতুর্থ শতকের শেষ পর্য্যন্ত প্রায় তিনশত

শকদের ভারতে প্রবেশ

শকাধিকার

রুদ্রদামন

নহপান

শকদের পতন

বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। গুপ্তবংশের ২য় চন্দ্রগুপ্তের (বিক্রমাদিত্য) হস্তে এই ক্ষত্রপবংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

পহ্লব রাজবংশ।—শক রাজাদের পরে পহ্লবগণ কান্দাহার ও সীস্তান অধিকার করিয়া ক্রমে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত ও পঞ্জাবে আপনাদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। পহ্লবরাজগণের মধ্যে গুদুফর বা গোণ্ডোফারেস (Gondophares) ছিলেন সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। কথিত আছে, তাঁহারই রাজত্বকালে যিশুখৃষ্টের শিষ্য সেণ্ট টমাস্ (St. Thomas) ভারতবর্ষে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিতে আসিয়াছিলেন।

গোণ্ডোফারেস

সেণ্ট টমাস

কুষাণ রাজগণ।—পহ্লবদের পর তুষার বা কুষাণ জাতি মধ্যএশিয়া হইতে ভারতবর্ষে প্রবেশ করে। কুষাণরা ছিল ইউ-চিদেরই একটি শাখা। কালক্রমে ইউ-চি জাতির পাঁচটি শাখার মধ্যে কুষাণরাই সর্ব্বাপেক্ষা পরাক্রমশালী হইয়া উঠিয়াছিল। আনুমানিক ৫০ খৃষ্টাব্দে কুষাণ-নেতা কুজল কদফিস্ (Kadphises I) ইউ-চি-দিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করেন ও হিন্দুকুশের দক্ষিণে অভিযান করিয়া কাবুল ও কান্দাহার জয় করেন। পারস্যের সীমান্ত হইতে বিতস্তা নদী পর্য্যন্ত তাঁহার অধিকারে আসিয়াছিল। কাহারও কাহারও মতে আফগানিস্থান অধিকার করার পর যখন তিনি ভারত অভি-যানের আয়োজন করিতেছিলেন তখন ৮০ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার পুত্র বিম কদফিস্ (Vima or Wema Kadphises) বা ২য় কদফিস্ পিতার আরব্ধ কার্য্য সম্পন্ন করেন; গান্ধার হইতে কাশী পর্য্যন্ত সমগ্র ভূ-ভাগ তাঁহার অধিকারভুক্ত হয়। একজন 'মহাসেনাপতি' উপাধিধারী প্রতিনিধির হস্তে ভারতবর্ষের শাসনভার অর্পণ করিয়া তিনি ফিরিয়া যান।

কুষাণজাতি

১ম কদফিস

২য় কদফিস্

সম্রাট কণিষ্ক।—বিম কদফিসের পর কণিষ্ক কুষাণ রাজ্যের সিংহাসনে আরোহণ করেন। বিম কদফিসের সঙ্গে তাঁহার কি সম্পর্ক ছিল তাহা বলা যায় না। তিনি ঠিক কখন সিংহাসনে আরোহণ করেন তাহাও নিশ্চয় করিয়া জানিতে পারা যায় নাই। তবে কণিষ্কই যে কুষাণ-বংশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নরপতি ছিলেন সে বিষয়ে সকলেই একমত। তাঁহার রাজত্বকালেই কুষাণ সাম্রাজ্য উন্নতির চরমশিখরে আরোহণ করিয়াছিল। ভারতবর্ষের কাশ্মীর এবং পূর্ব্বতুর্কীস্থানের কাশগড়, ইয়ারকন্দ, খোটান, প্রভৃতি স্থান তাঁহার

কণিষ্ক

কণিষ্কের সাম্রাজ্য

সময়ে কুষাণ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূ‌ক্ত হয়; পাটলিপুত্রের রাজাও তাঁহার নিকট পরাজিত হন। মধ্যএশিয়া হইতে কাশী পর্য্যন্ত ভূ-ভাগ তাঁহার অধিকারভুক্ত ছিল। চীন সম্রাটের সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া তিনি একজন চীন-রাজকুমারকে নিজ রাজ্যে জামিন (hostage) স্বরূপ আটক করিয়া রাখিয়াছিলেন। কণিষ্কের রাজধানী ছিল পুরুষপুর (পেশোয়ার)। মহামতি ধর্ম্মাশোকের ন্যায় তিনিও বৌদ্ধধর্ম্মের পরম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ইতিপূর্ব্বে বৌদ্ধধর্ম্ম হীনযান ও মহাযান এই দুইটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত ও হীনবল হইয়া পড়িয়াছিল। এই মতভেদ ও বিরোধ দূর করিবার জন্য সম্রাট কণিষ্ক বৌদ্ধ ধর্ম্মাচার্য্যগণকে এক মহাসম্মেলনে আহ্বান করেন; ইহাই **চতুর্থ** এবং শেষ **বৌদ্ধ-সঙ্গীতি**। এই সম্মেলনে মহাযান

চতুর্থ বৌদ্ধ-সম্মেলন

কণিষ্ক (মথুরায় প্রাপ্ত)

মতবাদ স্বীকৃত হয় এবং উহারই ফলে ভারতের বাহিরে নূতন করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের বিস্তার ঘটে। কিন্তু তখন হইতে ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্মের আধিপত্য কমিতে থাকে। কণিষ্ক অনেক স্তূপ ও বিহার (মঠ) নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। রাজধানী পুরুষপুরে বুদ্ধের দেহাবশেষের উপর তিনি যে বিরাট স্তূপ নির্ম্মাণ করেন তাহা সে যুগের একটি দর্শনীয় বস্তু ছিল। তখনকার ভারতীয় শিল্পের ইতিহাসে **'গান্ধার**

মহাযান বৌদ্ধমতের প্রাধান্য, বিদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের বিস্তার ও স্বদেশে প্রাধান্য হ্রাস

গান্ধার শিল্প

পণ্ডিতসমাজ

শিল্প' প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। কণিষ্ক বিদ্বানের সমাদর করিতেন; 'বুদ্ধচরিত'-রচয়িতা বৌদ্ধ-কবি ও সঙ্গীতজ্ঞ অশ্বঘোষ, বৌদ্ধ-দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক নাগার্জ্জুন এবং বসুমিত্র, চিকিৎসাগ্রন্থ-রচয়িতা চরক, প্রভৃতি মহামনীষিগণ তাঁহার সভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

কণিষ্কের রাজ্য-কাল লইয়া পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে তিনি ৭৮ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ ও শকাব্দের প্রতিষ্ঠা করেন। মথুরায় রাজবেশী কণিষ্কের একটি অর্দ্ধভগ্ন প্রস্তর-প্রতিমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে।

কুষাণ সাম্রাজ্যের পতন

কণিষ্কের পর যথাক্রমে বাসিষ্ক, হুবিষ্ক, ২য় কণিষ্ক এবং বাসুদেব কুষাণ সাম্রাজ্যের সিংহাসন লাভ করেন, তাঁহাদের রাজত্বকাল সম্বন্ধে বিশেষ উল্লেখযোগ্য তথ্য জানিতে পারা যায় না। বাসুদেবের পর হইতে হিন্দু রাজাদের উন্নতি ও কুষাণ সাম্রাজ্যের অধঃপতন আরম্ভ হয়; ক্রমে কুষাণ রাজত্ব সীমান্ত প্রদেশ ও পঞ্চনদের মধ্যেই আবদ্ধ হইয়া পড়ে।

কলিঙ্গের চেত বংশ, অন্ধ্র সাতবাহন বংশ

দাক্ষিণাত্য।—মৌর্য্য-সাম্রাজ্য-পতনের সমসময়ে দাক্ষিণাত্যে দুইটি স্বতন্ত্র স্বাধীন রাজ্যের অভ্যুত্থান হয়।—একটি কলিঙ্গের চেতরাজ্য, অপরটি অন্ধ্রদেশের সাতবাহন রাজ্য। তন্মধ্যে প্রাচীন সাতবাহন রাজ্যই বিশেষ পরাক্রমশালী হইয়া উঠে। ইহা ব্যতীত 'সুদূর দক্ষিণে'ও অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্রবিড় রাজ্য মৌর্য্যযুগের পূর্ব্ব হইতেই বিদ্যমান ছিল।

খারবেল

কলিঙ্গের চেতবংশ।—কলিঙ্গের চেতবংশের সর্ব্বাপেক্ষা পরাক্রান্ত নরপতির নাম ছিল খারবেল। তাঁহার সহিত পার্শ্ববর্ত্তী অন্যান্য রাজগণের সংঘর্ষ হইয়াছিল এবং তিনি বার বার জয়লাভ করিয়া কলিঙ্গের লুপ্ত গৌরব উদ্ধার করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ পুষ্যমিত্রের রাজত্বকালে তিনি পাটলিপুত্র আক্রমণ করিয়াছিলেন। এই যুদ্ধের ফলাফল সম্বন্ধে সঠিক কিছু জানা যায় না। খারবেল ছিলেন জৈনধর্ম্মাবলম্বী এবং জৈনশিল্পের প্রাচীনতম নিদর্শন কলিঙ্গদেশে পাওয়া যায়।

সিমুক

অন্ধ্রের সাতবাহন রাজবংশ।—অশোকের মৃত্যুর পর সাতবাহন রাজাদের নেতৃত্বে অন্ধ্রদেশে এক স্বাধীন রাজ্য স্থাপিত হয়। সাতবাহন রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা সিমুকের পুত্র প্রথম

শাতকর্ণি মালবদেশের পূর্ব্বাংশ জয় করিয়া একটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। তাঁহার হস্তে মগধরাজকেও পরাভব স্বীকার করিতে হইয়াছিল বলিয়া প্রবাদ আছে। শাতকর্ণির পর শক প্রভৃতি বৈদেশিক জাতির চাপে সাতবাহনপ্রভুত্ব অনেকখানি ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িয়াছিল।

১ম শাতকর্ণি

শকগণ সাতবাহন রাজ্যের উত্তর-পশ্চিমাংশ (মালব ও তৎসন্নিহিত অঞ্চল) অধিকার করিয়াছিলেন। পরে সাতবাহন-রাজ গৌতমীপুত্র শাতকর্ণি (আঃ ১০৭—১৩০খৃঃ অঃ) শকদের হাত হইতে নষ্ট রাজ্য উদ্ধার করেন। তিনিই ছিলেন এই বংশের শ্রেষ্ঠ নরপতি। উত্তরে মালব হইতে দক্ষিণ কর্ণাট পর্য্যন্ত তাঁহার অধিকারভুক্ত ছিল। কিন্তু বৃদ্ধবয়সে তাঁহাকে আবার উজ্জয়িনীর শক-রাজা রুদ্রদামনের নিকট পরাজয় মানিতে হয়। গৌতমীপুত্র শাতকর্ণির পুত্র পুলুমায়ির রাজত্বকালে মালব-সীমান্ত হইতে গোদাবরী ও কৃষ্ণার মোহনা পর্য্যন্ত পশ্চিম ও পূর্ব্বে সাতবাহন রাজ্য বিস্তৃত ছিল। এই বংশের শেষ পরাক্রান্ত নৃপতির নাম ছিল যজ্ঞশ্রী শাতকর্ণি। তাঁহার মৃত্যুর পর (আঃ ২০০ খৃঃ অঃ) সাতবাহন বংশের পতন আরম্ভ হয়। খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে সাতবাহন-বংশ বিস্মৃতির অন্ধকারে বিলীন হইয়া যায়। আনুমানিক ২২০ খৃঃ পূর্ব্বাব্দ হইতে ২৩০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সাতবাহন-বংশের ত্রিশজন রাজা রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহাদের রাজ্যে প্রাকৃত ও সংস্কৃত দুই ভাষারই আদর ছিল।

গৌতমীপুত্র শাতকর্ণি

পুলুমায়ি

যজ্ঞশ্রী শাতকর্ণি

সাতবাহন-গণের পতন

সুদূর দক্ষিণের তামিল রাজগণ।—'সুদূর দক্ষিণে'র দ্রবিড় বা তামিল রাজগণ উত্তর-ভারত ও দক্ষিণাপথের রাষ্ট্র-নৈতিক বিপ্লব হইতে অনেকটা মুক্ত ছিলেন। অশোকের সময় এই অঞ্চলে চোল, পাণ্ড্য, সত্যপুত্র ও কেরলপুত্র এই চারিটি রাজ্যের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। চোলরাজ্য ছিল বর্ত্তমান তাঞ্জোর ও ত্রিচিনোপল্লী অঞ্চলে; মদুরা ও তিন্নেবেল্লী জেলায় ছিল পাণ্ড্যরাজ্যের অবস্থিতি; সত্যপুত্র ও কেরলপুত্রের অবস্থান ছিল যথাক্রমে উত্তর ও দক্ষিণ মালাবার জেলায়। খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতকে তামিলগণ সিংহল জয় করিয়াছিলেন। পাণ্ড্যরা বহির্ব্বাণিজ্যে কৃতিত্ব লাভ করিয়াছিলেন; খৃঃ পূঃ ২০ অব্দে জনৈক পাণ্ড্য-রাজা কর্ত্তৃক রোম-সম্রাট আগাষ্টাসের নিকট বাণিজ্য-দূত প্রেরণের খবর পাওয়া যায়। উত্তরকালে সত্যপুত্র রাজ্যের অস্তিত্ব লোপ পায়। খৃষ্টীয় তৃতীয় শতকে মান্দ্রাজের নিকট পল্লব নামে এক রাজবংশের অভ্যুদয় হয়। বর্ত্তমান কাঞ্চী বা কঞ্জীভেরাম তাঁহাদের রাজধানী ছিল। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকের মধ্যভাগে পল্লবরাজ

চোল, পাণ্ড্য, সত্যপুত্র ও কেরলপুত্র

বিষ্ণুগোপ আর্য্যাবর্ত্তের প্রবল পরাক্রান্ত সমুদ্রগুপ্তের হস্তে পরাজিত হইয়াছিলেন।

শকাব্দ ও বিক্রমাব্দ।—ভারতবর্ষের অগণিত অব্দের মধ্যে শকাব্দ ও বিক্রমাব্দ বা বিক্রম-সংবৎ এখনও প্রচলিত আছে। বিক্রমসংবৎ খৃঃ পূঃ ৫৮ অব্দ হইতে গণনা আরম্ভ হয়। কিংবদন্তী অনুসারে উজ্জয়িনী-রাজ বিক্রমাদিত্য ইহার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। কিন্তু খৃঃ পূঃ ৫৮ সালে উজ্জয়িনীতে 'বিক্রমাদিত্য' উপাধিধারী কোন্ রাজা রাজত্ব করিতেন তাহার সঠিক প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। মগধরাজ বিক্রমাদিত্য (গুপ্তবংশের ২য় চন্দ্রগুপ্ত) ইহার প্রায় ৪৫০ বৎসর পরে আবির্ভূত হন। কাহারও কাহারও মতে

বিক্রমাব্দের আরম্ভ

(চৈত্যগৃহ—ভাজা খৃঃ পূঃ ২য় শতক)

কুষাণ-সম্রাট কণিষ্কই ছিলেন 'বিক্রম-সংবতের' প্রতিষ্ঠাতা। অনেকে আবার সীমান্ত অঞ্চলের শক-নরপতি অয় বা সাতবাহন-রাজ গৌতমীপুত্র শাতকর্ণিকে এই অব্দের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া মনে

করেন। গুপ্তযুগের লিপিতে এই অব্দটি 'মালবগণের অব্দ' বলিয়া কথিত হইয়াছে। সম্ভবতঃ প্রাচীনকালে এই অব্দটি প্রথমে মালব দেশে প্রচলিত ছিল। মগধরাজ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত-বিক্রমাদিত্য উজ্জয়িনীর শকরাজবংশের উচ্ছেদ করিয়াছিলেন। বোধ হয় এই ঘটনার যোগাযোগে অব্দটি পরে বিক্রমাদিত্যের নামের সহিত জড়িত হইয়া পড়ে।

শকাব্দের প্রথম প্রচলন

শকাব্দের প্রচলন হয় ৭৮ খৃষ্টাব্দে। কেহ কেহ বলেন কুষাণ-সম্রাট কণিষ্ক ছিলেন ইহার প্রবর্ত্তক, তিনি এই ৭৮ খৃষ্টাব্দেই সিংহাসনে আরোহণ করেন। অন্যান্য অনেকের মতে বিম কদফিস্ শকাব্দের প্রচলন করিয়াছিলেন। এমনও হইতে পারে ইহা কোন পরাক্রান্ত 'শকক্ষত্রপে'র রাজ্যাভিষেক উপলক্ষ্যে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল।

সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, প্রভৃতি

সমসাময়িক ভারতীয় সভ্যতা।—মৌর্য্য সাম্রাজ্যের পতনের ফলে ভারতবর্ষ বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে বিভক্ত হইয়া পড়িলেও ভারতীয় সভ্যতার অগ্রগতি অব্যাহত ছিল। সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্পকলা, প্রভৃতির জন্য এযুগ প্রসিদ্ধ। অশ্বঘোষের **'বুদ্ধচরিত'**, গুণাঢ্যের **'বৃহৎ কথা'** এবং সম্ভবতঃ মহাকবি ভাসের নাট্যসমূহ এ যুগেরই সৃষ্টি। **'রামায়ণ'** ও **'মহাভারত'** এই দু'খানি মহাকাব্যকে আমরা আজ যে আকারে পাই প্রধানতঃ তাহাও অনেকের মতে এই সময়েই সমাপ্ত হয়। প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ পতঞ্জলির **'মহাভাষ্য'**, দার্শনিক কাত্যায়নীপুত্রের **'বিভাষা'** ও **'মহাবিভাষা'**, নাগার্জ্জুনের **'মাধ্যমিক সূত্র'**, গ্রীকরাজ মিলিন্দের প্রশ্নাবলী (**'মিলিন্দ পঞ্‌হো'**), জ্যোতির্ব্বিদ গর্গের **'সংহিতা'**, আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ চরক ও সুশ্রুতের **'সংহিতা'**, প্রভৃতি গ্রন্থগুলির প্রত্যেকটি জ্ঞান ও বিজ্ঞান রাজ্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। কৌটিল্যের **'অর্থশাস্ত্র'**, হিন্দুর প্রধান ধর্ম্মশাস্ত্র **'মনুসংহিতা'**, বাৎসায়নের **'কামসূত্র'** ও যাজ্ঞবল্ক্য-**'স্মৃতি'**, প্রভৃতি অমূল্যগ্রন্থ এই যুগে সঙ্কলিত হইয়াছিল।

শিল্প

শিল্পকার্য্যে এ যুগের বিশিষ্ট দান **'গান্ধার শিল্প'**। গান্ধার-শিল্প পাশ্চাত্য (গ্রীক ও রোমান) রীতির সহিত ভারতীয় ভাব-ধারার এক অপূর্ব্ব মিলনের ফল। সুবিখ্যাত **সাঁচী স্তূপের**

তোরণগুলির শিল্পকলা এ যুগের ভারতীয় ভাস্কর্য্যের অনুপম নিদর্শন। অন্যান্য শিল্পনিদর্শনের মধ্যে **বরহুত, বুদ্ধগয়া, নাগার্জুনীকোণ্ডা ও অমরাবতীর শিলাবেষ্টনী, ভাজার বিহার, কার্লে, কানহেরী, নাসিক ও নানাঘাটের গুহাচৈত্য,** প্রভৃতি সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য।
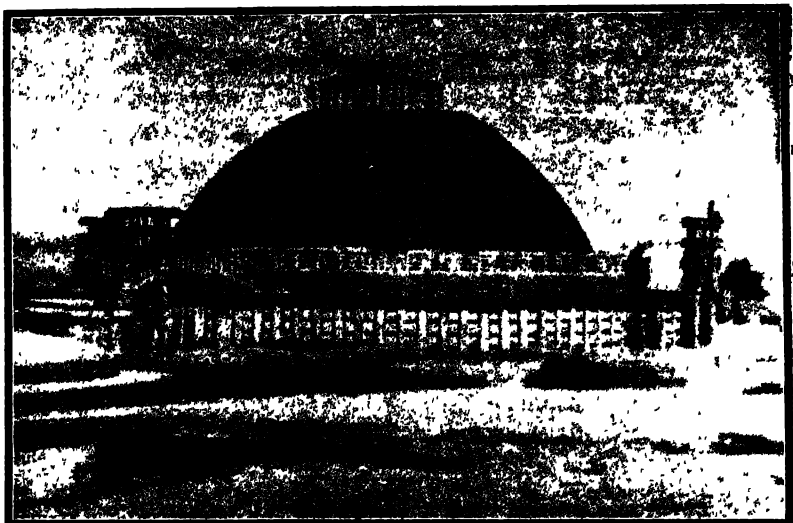
সাঁচীস্তূপ (খৃঃ পূঃ তৃতীয় হইতে ১ম শতকের মধ্যে নির্ম্মিত)

ধর্ম্মপ্রচার ও উপনিবেশ স্থাপন

স্থলপথে ভারতবর্ষের বাহিরে ধর্ম্মপ্রচার, ও সমুদ্র-পথে বাণিজ্য-বিস্তার এবং উপনিবেশ স্থাপনের জন্যও এই যুগ বিশেষভাবে স্মরণীয়। অশোকের রাজত্বকালে চীন ও ব্রহ্মদেশে ধর্ম্মপ্রচারের জন্য প্রচারকমণ্ডলী প্রেরণ করা হইয়াছিল বলিয়া যে প্রবাদ আছে কোন কোন ঐতিহাসিক তাহাতে সন্দেহ করেন: কিন্তু মৌর্য্যোত্তর যুগে যে সেখানে বৌদ্ধমত প্রচার করা হইয়াছিল তাহাব বিশিষ্ট প্রমাণ আছে। কাশ্মীর, গান্ধার এবং তৎসন্নিহিত স্থানসমূহ তখন মহাযান বৌদ্ধধর্ম্মের কেন্দ্র ছিল। এই অঞ্চল হইতে বামিয়ান, হাদ্দা, বেগরাম, ফুণ্ডুকিস্থান, কাশগড়, খোটান, কুচা, তুর্ফান,

তুর্কীস্থান ও পারস্যের মধ্য দিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম পশ্চিমে রোমক সাম্রাজ্য ও পূর্ব্বে চীনদেশে বিস্তারলাভ করে। এই যুগের ভারতীয় গজ-দন্তের শিল্প-নিদর্শন সম্প্রতি ইতালীতে পাওয়া গিয়াছে এবং রোমক রাজ্যের মুদ্রাদি ভারতে আবিষ্কৃত হইয়াছে।

চীনদেশে ঠিক কোন্ সময় বৌদ্ধধর্ম্ম গৃহীত হইয়াছিল সে বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে; তবে খৃষ্টের জন্মের পূর্ব্বেই যে ভারতীয় প্রচারকগণ তথায় গমন করিতে আরম্ভ করেন সে বিষয়ে সকলেই প্রায় একমত। প্রসিদ্ধ চীন সেনাপতি চাঙ্-কিয়েন খৃঃ পূঃ ১৩১-১২৫ সালে ভারত-সীমান্তে আসিয়া প্রথম চীন ভাষায় এ দেশের নাম সেন্টু (সিন্ধু) লিপিবদ্ধ করেন। চীনসম্রাট মিঙ্-টি (Ming-ti) ৬৭ খৃষ্টাব্দে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন বলিয়া একটি প্রবাদ আছে। তাঁহারই রাজত্বকালে কাশ্যপ মাতঙ্গ ও ধর্ম্মরত্ন নামে দুইজন ভারতীয় প্রচারক চীনে আমন্ত্রিত হইয়া চীনা ভাষায় বৌদ্ধধর্ম্মগ্রন্থের অনুবাদ আরম্ভ করিয়াছিলেন।

চাঙ্-কিয়েন

মিঙ্-টি

কাশ্যপ মাতঙ্গ ও ধর্ম্মরত্ন

ধর্ম্মপ্রচার ব্যতীত বাণিজ্য-ব্যপদেশেও ভারতীয় বণিকগণ স্থল-পথে ও সমুদ্রপথে, ভারতের বাহিরে, উত্তর ও পূর্ব্ব আফ্রিকা, তুর্কী-স্থান, ইরাণ, বাবিলন, আরব, মিশর, চীন ও পূর্ব্ব উপদ্বীপ, প্রভৃতি সুদূর দেশে যাতায়াত করিত। বহির্জগতে এ যুগে ভারতীয় সংস্কৃতি ও বহির্ব্বাণিজ্যের বিশেষ প্রসার ঘটে। মালয়, শ্যাম, ইন্দোচীন, সুমাত্রা, জাভা, বোর্ণিও এবং সুদূর সেলিবিস্ ও ফিলিপিন্ প্রভৃতি স্থানেও ভারতীয়গণ তাঁহাদের আর্থিক এবং পারমার্থিক উপনিবেশ বা "বৃহত্তর ভারতের" প্রতিষ্ঠা করেন।†

STUDIES AND QUESTIONS

1. Describe the political condition of India immediately after the fall of the Mauryas. (C U.'41).
2. What do you know of the conquests of the Bactrian Greeks and the Scythians in India ?
3. State what do you know about the Kushan dynasty in India and of the greatest Kushan emperor. (C. U. '12, '20).
4. What do you know of the reign of Kanishka ? (C. U. '34)

† এসম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

5. Write a short history of the Kushan Empire. (C. U. '17, '20, '36).

6. Trace the rise and fall of the Kushan rule in India. (C. U. '40).

7. Trace the rise and fall of the Kushan Empire. Summerise the main events of the reign of the greatest Kushan Emperors. (C. U. '43).

অষ্টম অধ্যায়

মগধের পুনরভ্যুদয় ও গুপ্তসাম্রাজ্য

প্রথম চন্দ্রগুপ্ত (৩২০—৩০ খৃঃ অঃ)।—খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকের প্রথম ভাগে এক নূতন রাজবংশের অভ্যুদয়ের ফলে মগধ আবার পরাক্রান্ত হইয়া উঠিল, ইহা গুপ্তবংশ নামে খ্যাত। এ বংশের প্রথম দুইজন রাজা মগধের অন্তর্গত সামান্য এক ভূখণ্ডের অধিপতি ছিলেন। তৃতীয় নরপতি চন্দ্রগুপ্তের (১ম) সময় হইতেই রাজ্য বিস্তারের সূত্রপাত হয়। পাটলিপুত্রই তাঁহার রাজধানী ছিল। পরাক্রান্ত লিচ্ছবি কুলের রাজকন্যা কুমারদেবীকে বিবাহ করায় তাঁহার প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়। ক্রমে মগধ হইতে প্রয়াগ (এলাহাবাদ) ও অযোধ্যা পর্য্যন্ত তাঁহার অধিকার বিস্তৃত হয় এবং তিনি 'মহারাজাধিরাজ' উপাধি গ্রহণ করেন। পণ্ডিতগণের মতে ৩২০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার রাজ্যাভিষেক-বৎসরে একটি অব্দের প্রচলন হয়—উহাই গুপ্তসংবৎ বা গুপ্তাব্দ।

গুপ্ত-সাম্রাজ্যের সূত্রপাত

গুপ্তাব্দ

সমুদ্রগুপ্ত (৩৩০—৭৫)।—চন্দ্রগুপ্তের পর তাঁহার পুত্র সমুদ্রগুপ্ত মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ নরপতিদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। তাঁহার ন্যায় সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা খুব অল্প রাজার মধ্যেই দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। প্রথমে তিনি মগধের পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্যসমূহ জয় করিয়া গঙ্গা, যমুনা ও চম্বলনদীর মধ্যবর্ত্তী ভূ-ভাগে একচ্ছত্র প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। তাহার পর পূর্ব্ব উপকূল ধরিয়া তিনি দাক্ষিণাত্যের দিকে অগ্রসর হন এবং দক্ষিণাপথের অনেক রাজাকে পরাজিত করেন। এই দিগ্বিজয়ী বীর তাঁহাদের

আর্য্যাবর্ত্তে গুপ্ত-অধিকার

দাক্ষিণাত্যে দিগ্বিজয়

আনুগত্য স্বীকারেই সন্তুষ্ট হইয়া পরম উদারতার সহিত বিজিত রাজ্যগুলি তাঁহাদিগকে ফিরাইয়া দেন। তাঁহার নিজের অধিকার

সমুদ্রগুপ্তের সাম্রাজ্য সীমা

উত্তরে হিমালয়, পূর্ব্বে ব্রহ্মপুত্র, দক্ষিণে নর্ম্মদা, এবং পশ্চিমে যমুনা ও চম্বলনদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কিন্তু একদিকে সমতট (দক্ষিণ-পূর্ব্ববঙ্গ), কামরূপ ও নেপাল এবং অপরদিকে পঞ্জাব, রাজপুতানা ও মালবের গণতন্ত্রসমূহও তাঁহাকে কর প্রদান করিত।

করদরাজ্য

উত্তর ও পশ্চিমের শক ও কুষাণ নৃপতিগণ এবং সুদূর সিংহলের

অধিরাজত্ব

রাজা মেঘবর্ণ পর্য্যন্ত তাঁহাকে অধিরাজ বলিয়া মানিতেন। এদিক দিয়া দেখিলে সমুদ্রগুপ্তকে প্রায় আসমুদ্র হিমাচলের রাজচক্রবর্ত্তী বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। দিগ্বিজয়ের পর তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।

সমুদ্রগুপ্তের চরিত্র

সমুদ্রগুপ্তের প্রতিভা ছিল সর্ব্বতোমুখী; তিনি কেবল যে একজন অসামান্য বীর ছিলেন তাহাই নয়, বিদ্বান, কবি এবং সঙ্গীতজ্ঞ বলিয়াও তাঁহার খ্যাতি ছিল। এক ধরণের মুদ্রায় তাঁহার বীণাবাদন-রত মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে। তাঁহার সভায় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের প্রভূত সমাদর ছিল। গুপ্তরাজারা ছিলেন ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পৃষ্ঠপোষক; কিন্তু অন্য কোন ধর্ম্মকে তাঁহারা অবহেলা করিতেন না। সমুদ্রগুপ্তের অনুমতি লইয়া সিংহলের বৌদ্ধরাজা মেঘবর্ণ বুদ্ধগয়ায় একটি সঙ্ঘারাম বা আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য (৩৭৫—৪১৪)।—কোন

রামগুপ্ত

কোন পণ্ডিতের মতে সমুদ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র রামগুপ্ত সিংহাসনে আরোহণ করেন; কিন্তু কিছুকাল পরে তাঁহার ভ্রাতা ২য় চন্দ্রগুপ্ত তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করেন। এ মতের সত্যতা সম্বন্ধে এখনও নিশ্চিতরূপে কিছুই জানিতে পারা যায় নাই। ২য় চন্দ্রগুপ্ত বিদর্ভ অঞ্চলের পরাক্রান্ত বাকাটক রাজবংশে কন্যা দান করিয়া তাঁহাদের

শকদের উচ্ছেদ

সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করেন। তারপর তিনি শক-ক্ষত্রপদিগকে পরাভূত করিয়া মালব ও সুরাষ্ট্র অধিকার করিলে 'শকারি' নামে বিখ্যাত হইয়া উঠেন। ইহাই ছিল তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মুদ্রায় তিনি 'বিক্রমাদিত্য' বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। 'বিক্রমাদিত্য' আখ্যাটি প্রাচীন হিন্দু রাজাদের বড়ই

প্রিয় ছিল; একাধিক রাজা এই উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে মহাকবি কালিদাস প্রমুখ 'নবরত্নের' পৃষ্ঠপোষক উজ্জয়িনীর 'শকারি' বিক্রমাদিত্যই কিংবদন্তীতে অমর হইয়া আছেন। কিছুকাল পূর্ব্বে কর্ণাট প্রদেশে কয়েকখানি
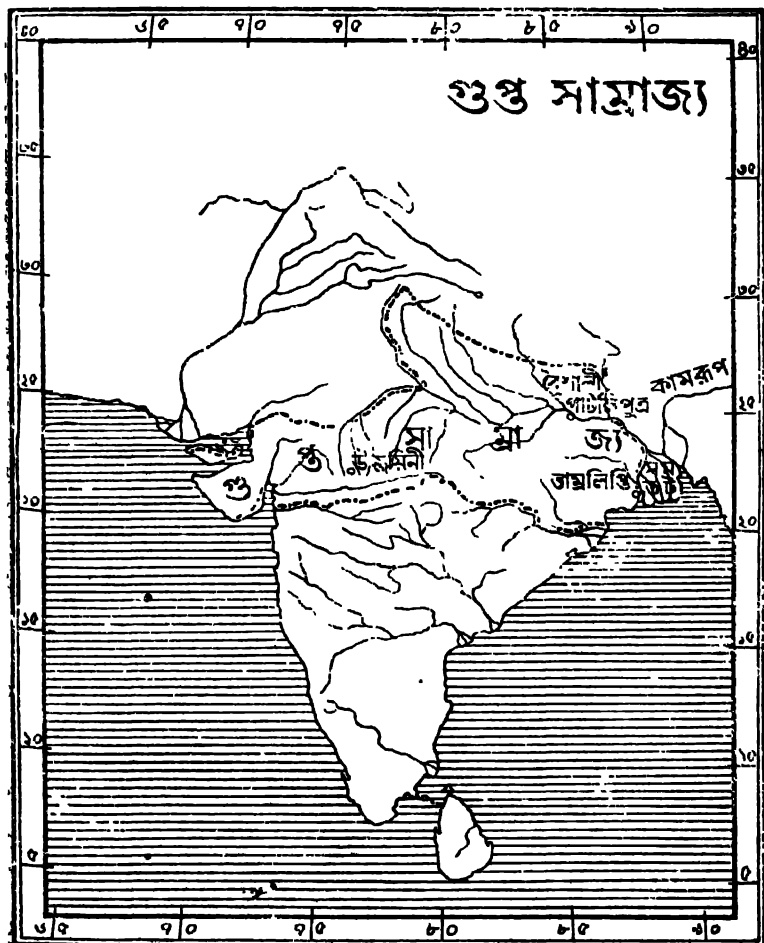
প্রাচীন লিপি পাওয়া যায়; তাহাতে বিক্রমাদিত্যকে পাটলিপুত্র এবং উজ্জয়িনী উভয় স্থানেরই অধীশ্বর বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহা হইতে ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেন যে, ২য় চন্দ্রগুপ্তই ছিলেন কিংবদন্তীর সেই সুপ্রসিদ্ধ 'বিক্রমাদিত্য'। কিন্তু কিংবদন্তীতে ধন্বন্তরী, ক্ষপণক, অমরসিংহ, শঙ্কু, বেতালভট্ট, ঘটকর্পর, কালিদাস, বরাহমিহির এবং বররুচি, এই যে 'নবরত্নের' নাম পাওয়া যায়, তাঁহারা সকলে একই সময়ের ছিলেন কি না সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। তবে কালিদাস সম্ভবতঃ ২য় চন্দ্রগুপ্তের সমসাময়িক ছিলেন।

বিক্রমাদিত্য

ফা-হিয়েন।—চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে চৈনিক বৌদ্ধ-তীর্থযাত্রী ফা-হিয়েন (Fa Hien) ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। তিনি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এক মনোজ্ঞ বিবরণ লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বিবরণ হইতেই জানিতে পারা যায় যে, তখন ভারতবাসীদের অবস্থা অত্যন্ত সমৃদ্ধ ছিল; শাসকগণ প্রজাসাধারণকে উৎপীড়ন করিতেন না,—দণ্ডপ্রণালীর কঠোরতা অনেক হ্রাস পাইয়াছিল, এবং দেশের সর্ব্বত্র শান্তি ও শৃঙ্খলা বিরাজ করিত; দস্যু-তস্করের কোন উপদ্রব ছিল না। মেগাস্থিনিসের ন্যায় তিনিও ভারতবাসীর নৈতিক চরিত্রের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। ভারতবর্ষে তখন জনসাধারণের জন্য চিকিৎসালয় ও আরোগ্যশালার (Hospital) অভাব ছিল না। মগধের আরোগ্যশালা দেখিয়া ফা-হিয়েন বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছিলেন। পাটলিপুত্রে অশোকের অপূর্ব্ব রাজপ্রাসাদ দেখিয়া তিনি উহা মনুষ্যনির্ম্মিত বলিয়া ভাবিতে পারেন নাই। বঙ্গদেশের তাম্রলিপ্তি (তমলুক) সে যুগের একটি প্রসিদ্ধ শিক্ষা কেন্দ্র ও বন্দর ছিল; মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে এই গৌরব আংশিক ভাবে "শ্রীমন্ত সদাগর" প্রভৃতির কাহিনীতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তাম্রলিপ্তি হইতে বাঙ্গালী বণিকেরা সিংহল, ব্রহ্মদেশ, মালয়, চম্পা, কাম্বোজ, সুমাত্রা, যবদ্বীপ, প্রভৃতি দূর-

সুশাসন

ভারতবাসীর নৈতিক চরিত্র

জনকল্যাণ

বহির্ব্বাণিজ্য ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের প্রসার

দূরান্তরে বাণিজ্য করিতে যাইতেন। তাহার ফলে মালয় ও যবদ্বীপ তখন ছিল হিন্দু সভ্যতা ও ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের একটি প্রসিদ্ধ কেন্দ্র। ফা-হিয়েন তম্‌লুক বন্দর হইতে ভারতীয় পোতে আরোহণ করিয়া মালয় ও যবদ্বীপ পার হইয়া নিজদেশ চীনে ফিরিয়া যান।

বহির্ব্বাণিজ্য ও ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের প্রসার

১ম কুমারগুপ্ত (৪১৪—৫৫)।—চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের পর তাঁহার পুত্র ১ম কুমারগুপ্ত 'মহেন্দ্রাদিত্য' উপাধি গ্রহণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। সমুদ্রগুপ্তের ন্যায় তিনিও অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সুদীর্ঘ রাজত্বকালের শেষভাগে মধ্য এশিয়ার দুর্দ্ধর্ষ হূণ জাতি ভারতবর্ষ আক্রমণ করে। যুবরাজ স্কন্দগুপ্ত তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া গুপ্তসাম্রাজ্যের অধঃপতন কিছুকালের জন্য রোধ করিয়াছিলেন।

'মহেন্দ্রাদিত্য'

হূণ আক্রমণ

স্কন্দগুপ্ত (৪৫৫—৬৭)।—কুমারগুপ্ত মহেন্দ্রাদিত্যের পুত্র স্কন্দগুপ্ত অতিশয় পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন এবং 'বিক্রমাদিত্য' উপাধি গ্রহণ করেন। হূণদের আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য তিনি সাম্রাজ্যের প্রত্যন্তভাগে কয়েকজন সুদক্ষ শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবদ্দশায় হূণরা গুপ্ত সাম্রাজ্যের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে নাই। ৪৬৭ অথবা ৪৬৮ খৃষ্টাব্দে স্কন্দগুপ্তের মৃত্যু হয়।

স্কন্দগুপ্ত—'বিক্রমাদিত্য'

পরবর্ত্তী গুপ্তরাজগণ।—স্কন্দগুপ্তের পরই গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন আরম্ভ হইয়া যায়। তাহার পর একে একে পুরগুপ্ত, নরসিংহ-গুপ্ত, বালাদিত্য এবং ২য় কুমারগুপ্ত সিংহাসন লাভ করিলেও কেহই দীর্ঘকাল রাজত্ব করিতে পারেন নাই। ৪৭৭ খৃষ্টাব্দে বুধগুপ্ত রাজা হন; তাঁহার সময় বঙ্গদেশ হইতে মালবের পূর্ব্বাংশ পর্য্যন্ত গুপ্ত সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। তিনিই এই বংশের শেষ অধিরাজ। তাঁহার মৃত্যুর পর অন্তর্ব্বিরোধ এবং মধ্য এশিয়ার বর্ব্বর হূণজাতির আক্রমণে গুপ্তরাজশক্তি ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। পঞ্জাব, রাজপুতানা, ও মালব হূণদের অধিকারে আসিল। ইহার পরেও গুপ্ত-আখ্যা-ধারী রাজগণ খৃষ্টীয় অষ্টম শতক পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের প্রাধান্য লোপ পাইয়াছিল। গুপ্তদের দুর্ব্বলতার সুযোগে একদিকে মালব ও সুরাষ্ট্র এবং অপরদিকে কনৌজ ও বঙ্গদেশ স্বাধীনতা ঘোষণা করিল।

গুপ্তশক্তির পতন

গুপ্তযুগের প্রকৃত স্বরূপ সাহিত্য

গুপ্তযুগের সভ্যতা।—গুপ্তযুগ ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি স্মরণীয় অধ্যায়। ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম ও সংস্কৃত সাহিত্যের তখন অভূতপূর্ব্ব উন্নতি হইয়াছিল।

গুপ্তরাজগণের সভাকবিদের মধ্যে হরিষেণ ও বীরসেনের নাম উল্লেখযোগ্য; হরিষেণ ছিলেন সমুদ্রগুপ্তের সভাকবি,—বীরসেন চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের সভায় অবস্থান করিতেন।

কালিদাস

মহাকবি কালিদাস বিক্রমাদিত্যের 'নবরত্নে'র মধ্যে উজ্জ্বলতম রত্ন বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া গিয়াছেন; তাঁহার সমকক্ষ কবি সংস্কৃত সাহিত্যে আর দেখিতে পাওয়া যায় নাই। 'কুমারসম্ভব', 'মেঘদূত', 'রঘুবংশ', 'ঋতুসংহার', বিক্রমোর্ব্বশী', 'মালবিকাগ্নিমিত্র' এবং 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' প্রভৃতি কাব্য ও নাটক শুধু সংস্কৃত সাহিত্যেরই নয়, বিশ্বসাহিত্যেরও অমর সম্পদ। 'মৃচ্ছকটিক' নাটকের

শূদ্রক ও বিশাখদত্ত

রচয়িতা শূদ্রক এবং 'মুদ্রারাক্ষস' নাটকের প্রণেতা বিশাখদত্ত সম্ভবতঃ গুপ্তযুগের প্রারম্ভে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এই যুগেই রামায়ণ ও

রামায়ণ মহাভারত স্মৃতি পুরাণ

মহাভারত নূতন করিয়া সম্পাদিত ও সমাপ্ত হইয়াছিল এবং বহু তন্ত্র, স্মৃতি ও পুরাণসমূহও নূতন করিয়া সঙ্কলিত হয়। সাহিত্য ব্যতীত গুপ্তযুগে সঙ্গীত,

শিল্পকলা

চিত্রকলা, ভাস্কর্য্য, স্থাপত্য, প্রভৃতি চারুশিল্পেরও অভূতপূর্ব্ব উন্নতি হইয়াছিল।

অজন্তা চিত্র চন্দ্ররাজের স্তম্ভ
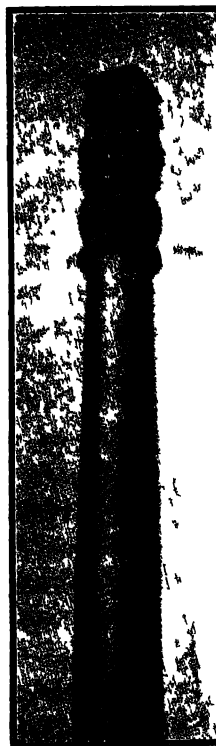
অজন্তা ও বাঘ গুহার প্রসিদ্ধ চিত্রাবলী

দিল্লীর লৌহস্তম্ভ

আজিও জগতের বিস্ময়ের বস্তু হইয়া আছে এবং চন্দ্ররাজের লৌহস্তম্ভ এ যুগের ধাতু শিল্পের উৎকর্ষ প্রমাণ করিতেছে। সুকুমার মূর্ত্তি রচনায়, সুন্দর ও সুঠাম চৈত্য, বিহার ও মন্দির নির্ম্মাণে গুপ্তযুগ

ভারতীয় শিল্পকলার ইতিহাসে বিখ্যাত। প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ আর্য্যভট্ট ও বরাহমিহির এই সময়ই আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ভূগোল ও জ্যোতির্ব্বিদশাস্ত্রের ইতিহাসে ভারতীয় ও রোমক সুধীগণের আদান-প্রদানও যথেষ্ট হয়। জীববিদ্যা, আয়ুর্ব্বেদ, পদার্থবিদ্যা, গণিতশাস্ত্র, রসায়ন, প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক বিষয়ে হিন্দুদের গবেষণা তখনকার বৈদ্যক ও তন্ত্রাদি শাস্ত্রে স্থান পায়; এবং সুদূর চীন, পারস্য ও আরব দেশের রাজন্য ও সুধীবর্গ চৈনিক, ফার্সী ও আরবী ভাষায় হিন্দু ও বৌদ্ধ গ্রন্থাদির অনুবাদের ব্যবস্থা করেন। হজরত মহম্মদের আবির্ভাবের সঙ্গে সমগ্র পশ্চিম-এসিয়ায় এক নবজাগরণের সূত্রপাত হয় এবং আরব ও পারসিক ভাষা ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যের সহযোগিতায় সমৃদ্ধ হয়।

আর্য্যভট্ট
বরাহমিহির
হিন্দু বিজ্ঞান

সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প, প্রভৃতির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে গুপ্তযুগে ভারতের বাহিরে 'বৃহত্তর ভারত' (১৪ অধ্যায় দ্রষ্টব্য) গঠনও সুসম্পূর্ণ হইয়া আসিয়াছিল। **প্রকৃতপক্ষে ভারত তখন ছিল সমগ্র এশিয়ার প্রধান বাণিজ্য ও সংস্কৃতি-কেন্দ্র।** এযুগে চীন ও ভারতের মধ্যে ধর্ম্ম, শিল্প ও সাহিত্যের আদান-প্রদানের দ্বারা প্রত্যক্ষ যোগ গভীরভাবে স্থাপিত হয় এবং মালয় ও পূর্ব্ব উপদ্বীপে ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধধর্ম্ম প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বহু হিন্দু উপ-নিবেশ প্রতিষ্ঠিত হয়। ৬৭৩ খৃঃ চৈনিক পরিব্রাজক I-tsing মহাবোধিতে (বিহার) একটি চীনা মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পান। সে মন্দিরটি মগধের গুপ্তবংশের রাজা শ্রীগুপ্ত কর্ত্তৃক পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছিল। চীনের তাঙ্ (T'ang) রাজত্বের সময় (৬১৮-৯০৬) ভারতীয় নদী, সমুদ্র, দেশ, প্রভৃতি সম্বন্ধে চীনা নাবিকদের যে প্রচুর অভিজ্ঞতা ছিল তাহার বহু প্রমাণ আছে। ইহা ব্যতীত খোটান, মধ্য-এশিয়া, চীন, পূর্ব্ব-এশিয়া ও পশ্চিম-এশিয়ার সহিত স্থলপথে ও সমুদ্রপথে ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্যেরও প্রসার ও উন্নতি ঘটে। এই সকল কারণে গুপ্তযুগকে ভারত-ইতিহাসে "সুবর্ণ যুগ" বলা হয়।

STUDIES AND QUESTIONS

1. When and by whom was the Gupta Empire

founded ? Mention the leading events in the reign of the first three Gupta Emperors. (C. U.'11, '14, '42).

2. Sketch the part played in the history of ancient India by Samudra Gupta. (C. U. '26).

3. Give a short history of the Gupta dynasty and describe the foreign invasion that took place during their rule. (C. U. '29).

4. Give a short history of the Gupta Empire. (C. U. '21, '22, '26), with a special reference to the achievement of its most famous sovereigns (1914,'44), with a special reference to the foreign invasions that took place during their rule (1916).

5. How far is it true to say that every form of mental activity made itself felt in the Gupta period ? (C. U. '23).

6. Briefly describe the reign of Chandra Gupta II. What light is thrown on the state of the country by Fa-hien ? (C. U. '34, '42).

7. Describe the reign of Samudra Gupta. (C. U. '38, '42).

8. What part did Skanda Gupta play in resisting foreign invasion ? (C. U. '41).

9. Why is the Gupta period called the Golden Age of Ancient Indian history ? (C.-U. '42, '45).

নবম অধ্যায়

গুপ্তসাম্রাজ্যের পতনের পর ভারতের অবস্থা

(প্রথম পর্ব্ব)

কনৌজের অভ্যুত্থান

হুণ জাতির পরিচয়

হুণজাতি।—পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে দুর্দ্দান্ত হুণদের আক্রমণে গুপ্তসাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া পড়ে।[১] হুণরা মধ্য-এশিয়ার সুবিস্তীর্ণ "স্তেপ." (Steppe) অঞ্চলে ঘুরিয়া বেড়াইত। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকে

তাহারা দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়িতে আরম্ভ করে,—একদল ভল্‌গা নদীর উপত্যকা বাহিয়া মধ্য ইউরোপের দিকে অগ্রসর হয়, আর একদল আসে অক্ষু নদীর উপত্যকায়। শেষোক্ত দল পঞ্চম শতকের শেষভাগে পারস্য অধিকার করিয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করে। ইহারা 'শ্বেত হূণ' (White Huns) নামে পরিচিত। স্কন্দগুপ্ত ইহাদের গতিরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর আনুমানিক ৪৯০ খৃষ্টাব্দে হূণ-দলপতি তোরমাণ মধ্য-ভারত পর্য্যন্ত অধিকার বিস্তৃত করেন। তোরমাণের পুত্র মিহিরগুল বা মিহিরকুল কাশ্মীর-পঞ্জাবের শাকল (শিয়ালকোট) নগরে রাজত্ব করিতেন। পূর্ব্ব-মালব এবং পঞ্জাব তাঁহার অধিকারে ছিল। হূণদের নৃশংস অত্যাচারে ইউরোপ ও ভারতবর্ষ প্রপীড়িত হইয়াছে। ইউরোপে হূণ-দলপতি এট্টিলার ন্যায় ভারতবর্ষে মিহিরকুলও চরম বর্ব্বরতা দেখাইয়া গিয়াছেন। অনেক হিন্দুরাজাই হূণ অত্যাচার প্রতিহত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। আনুমানিক ৫৩২ খৃষ্টাব্দে মগধের গুপ্তরাজ বালাদিত্য এবং দশপুর বা মন্দশোরের অধিপতি যশোধর্ম্মন্ মিহিরকুলকে পরাভূত করেন।

'শ্বেত হূণ'

তোরমাণ ও মিহিরগুল

যশোধর্ম্মন্।—গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের কিছুকাল পরে যশোধর্ম্মন্ মালবে একটি পরাক্রান্ত স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন অসাধারণ সমরকুশল; তাঁহারই সুপরিচালনায় হূণ-শক্তি বিধ্বস্ত হইয়া যায়। একদিকে হিমালয় হইতে পূর্ব্বঘাট এবং অপরদিকে ব্রহ্মপুত্র হইতে আরবসাগর পর্য্যন্ত তাঁহার আধিপত্য বিস্তৃত ছিল। কেহ কেহ তাঁহাকে কিংবদন্তীর 'বিক্রমাদিত্য' বলিয়া মনে করেন কিন্তু এই মতের অনুকূলে কোনরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় না। হূণবিজয় ছিল তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি; ইহার পর ভারতবর্ষে হূণেরা আর কোন শক্তিশালী রাজ্য স্থাপন করিতে পারে নাই। তবে ইহার পরও তাহাদের সহিত অন্যান্য হিন্দু রাজাদের প্রায়ই সংঘর্ষ হইত কিন্তু ক্রমশঃ হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া হূণরা শকদের ন্যায় হিন্দু সমাজের অঙ্গীভূত হইয়া যায়। সে-যুগের হিন্দুত্ব যথেষ্ট উদার ছিল।

যশোধর্ম্মার সাম্রাজ্য

হূণ-উচ্ছেদ

মৌখরি ও গুপ্তদের বিরোধ।—যশোধর্ম্মার বংশধরদের বিষয় কিছুই জানিতে পারা যায় না; সম্ভবতঃ তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে

সঙ্গেই তাঁহার সাম্রাজ্যের অবসান ঘটে। ইহার পর আর্য্যাবর্ত্তে কনৌজ, থানেশ্বর, মগধ ও গৌড় এই চারিটি পরাক্রান্ত রাজ্যের উদ্ভব দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে কনৌজ ও থানেশ্বরের রাজারা হূণদের আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়া তখনকার দিনে প্রতিপত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। ষষ্ঠ শতাব্দীতে বর্ত্তমান যুক্তপ্রদেশ অঞ্চলে কান্যকুব্জ বা কনৌজকে কেন্দ্র করিয়া মৌখরি নামে এক পরাক্রান্ত রাজবংশের অভ্যুদয় হইয়াছিল। মৌখরিদের প্রভাব বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে স্বভাবতঃই মগধের গুপ্তরাজাদের সঙ্গে তাঁহাদের বিরোধ বাধিয়া যায়। ঐতিহাসিকরা তখনকার গুপ্তরাজগণকে "পরবর্ত্তী গুপ্ত" বংশ (later Guptas) নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। এই বংশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নরপতি ছিলেন মহাসেনগুপ্ত। পূর্ব্বদিকে ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত তাঁহার আধিপত্য বিস্তৃত হইয়াছিল এরূপ শোনা যায়; কিন্তু গুপ্ত-মৌখরি দ্বন্দ্বে মৌখরিরাই ক্রমশঃ প্রধান হইয়া উঠেন। মৌখরিবংশের শ্রেষ্ঠ নরপতি ছিলেন ঈশানবর্ম্মন্। মৌখরি-রাজগণ গঙ্গা-যমুনার দোয়াব এবং অযোধ্যা হইতে মগধ পর্য্যন্ত ভূ-ভাগ অধিকার করেন। মৌখরিবংশের শেষ নরপতি গ্রহবর্ম্মন্ থানেশ্বরের রাজা প্রভাকরবর্দ্ধনের কন্যা রাজশ্রীর সহিত পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হন।

কনৌজ, থানেশ্বর, মগধ ও গৌড়

কিন্তু প্রভাকরবর্দ্ধনের মৃত্যুর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই গৌড় দেশের রাজা শশাঙ্কের সহায়তায় মালবরাজ দেবগুপ্ত কান্যকুব্জ অধিকার করিয়া গ্রহবর্ম্মাকে নিহত করেন; তাঁহার পত্নী রাজ্যশ্রীও সঙ্গে সঙ্গে বন্দিনী হন।

গৌড়াধিপ শশাঙ্ক, মালবরাজ দেবগুপ্ত ও গ্রহবর্ম্মা, রাজ্যশ্রী

থানেশ্বরের পুষ্যভূতি বংশ।—মৌখরিরাজমহিষী রাজ্যশ্রীর পিতা পুষ্যভূতিবংশীয় প্রভাকরবর্দ্ধন থানেশ্বরে রাজত্ব করিতেন। পঞ্জাবের পূর্ব্বাঞ্চলে বহুকাল হইতেই পুষ্যভূতি নৃপতিদের রাজ্য ছিল। প্রভাকরবর্দ্ধন হূণদিগকে পরাভূত করিয়া আপনার প্রভাব-প্রতিপত্তি বিশেষরূপে বর্দ্ধিত করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র রাজ্যবর্দ্ধন থানেশ্বরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহাকেও হূণদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হইতে হইয়াছিল। মালবরাজ দেবগুপ্তের হস্তে গ্রহবর্ম্মার পরাজয় ও মৃত্যুর সংবাদ তাঁহার নিকট পৌঁছিলে অবিলম্বে রাজ্যবর্দ্ধন কান্যকুব্জ অভিমুখে অগ্রসর হইয়া

প্রভাকরবর্দ্ধন

রাজ্যবর্দ্ধন

সহজেই দেবগুপ্তকে পরাভূত করেন ; কিন্তু দেবগুপ্তের সহযোগী গৌড়াধিপতি শশাঙ্ক কর্ত্তৃক তিনি নিহত হন।

গৌড়রাজ শশাঙ্ক।—গুপ্ত-সাম্রাজ্যের পতনের পর গৌড় বা পশ্চিম-বঙ্গে এক পরাক্রান্ত রাজ্যের অভ্যুদয় হয়। এই রাজ্যের উদ্ভব সম্বন্ধে নিশ্চিতরূপে কিছু জানা যায় না। গৌড়-রাজগণ পশ্চিম দিকে আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করেন, কিন্তু প্রবলপ্রতাপ মৌখরিদেব বিরোধেব ফলে সে চেষ্টা সফল হয় নাই। আনুমানিক ৬০৩ খৃঃ অব্দে শশাঙ্ক নামে এক রাজা গৌড়ের সিংহাসনে আবোহণ করেন। শশাঙ্কের রাজধানী ছিল বর্ত্তমান মুর্শিদাবাদের নিকট কর্ণসুবর্ণ নামক নগরে। দক্ষিণে বর্ত্তমান উড়িষ্যা প্রদেশের অন্তর্গত গঞ্জাম জেলা এবং পশ্চিমে বারাণসী পর্য্যন্ত তাঁহার অধিকারে ছিল। **ঐতিহাসিক যুগে ইহাই বাঙ্গালীর প্রথম সাম্রাজ্য।** গৌড়ের সঙ্গে কান্যকুব্জের ছিল পুরাতন বিরোধ। মালবরাজ দেবগুপ্ত ও গৌড়রাজ শশাঙ্কের সম্মিলিত শক্তিব সংঘাতে কান্যকুব্জের গ্রহবর্ম্মার পরাজয় ও মৃত্যু হয় এবং তাঁহার পত্নী রাজ্যশ্রী বন্দিনী হন। ইহাতে থানেশ্বরের রাজা রাজ্যবর্দ্ধন দেবগুপ্তকে পরাভূত করিলেও শশাঙ্কের হস্তে স্বয়ং নিহত হন। রাজ্যবর্দ্ধনের মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা হর্ষবর্দ্ধন কামরূপরাজ ভাস্করবর্ম্মার সহায়তায় শশাঙ্ককে দমন করিতে চেষ্টা করেন। ৬১৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত শশাঙ্ক স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিয়াছিলেন এরূপ প্রমাণ আছে। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর হয়ত অসমীয়া নৃপতি ভাস্করবর্ম্মা কর্ণসুবর্ণ জয় করিয়াছিলেন।

গৌড়-বঙ্গাধিপ শশাঙ্কের রাজ্যবিস্তার

হর্ষবর্দ্ধন শিলাদিত্য।—প্রায় একসঙ্গে কনৌজ ও থানেশ্বরের সিংহাসন শূন্য হইয়া পড়িলে, উভয় রাজ্যের অমাত্যগণ রাজ্যবর্দ্ধনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হর্ষবর্দ্ধনকে রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন। ৬০৬ খৃষ্টাব্দ হইতে হর্ষাব্দ নামে যে সংবৎ গণনা করা হয়, তাহা হর্ষবর্দ্ধনের রাজ্যভার গ্রহণের তারিখ হইতে প্রচলিত হইয়া থাকিবে। হর্ষবর্দ্ধন ইহার কয়েক বৎসর পরে রাজোপাধি গ্রহণ কবিয়াছিলেন। তাঁহার উপাধি ছিল 'শিলাদিত্য'। শাসনভার গ্রহণ করিয়াই তিনি তাঁহার ভগিনী রাজ্যশ্রীর উদ্ধারে বাহির হইয়া পড়িলেন। ভগ্নীকে উদ্ধার করার পর হর্ষবর্দ্ধন

থানেশ্বর ও কনৌজ রাজ্যের মিলন

হর্ষাব্দ

রাজ্যশ্রীর উদ্ধার

কনৌজে রাজধানী স্থানান্তর

থানেশ্বর হইতে কনৌজে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। অতঃপর কামরূপের রাজা ভাস্করবর্ম্মার সহিত মৈত্রী স্থাপন করিয়া হর্ষবর্দ্ধন ভ্রাতৃহন্তা শশাঙ্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। শশাঙ্কের সহিত তাঁহার যুদ্ধের বিবরণ কিছুই জানিতে পারা যায় না; তবে শশাঙ্ক যে ৬১৯ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ সম্প্রতি পাওয়া গিয়াছে। সম্ভবতঃ ৬১৯ খৃঃ অব্দের পর ভাস্করবর্ম্মা গৌড়ের রাজধানী কর্ণ-সুবর্ণ জয় করিয়াছিলেন। দক্ষিণে বিন্ধ্যাচল পর্য্যন্ত হর্ষবর্দ্ধনের অধিকার বিস্তৃত হইয়াছিল। কিন্তু নর্ম্মদা পার হইয়া দাক্ষিণাত্যে প্রবেশের চেষ্টা করিলে দাক্ষিণাত্যের পরাক্রান্ত চালুক্যরাজ ২য় পুলকেশীর নিকট পরাভূত হইয়া তাঁহাকে ফিরিয়া আসিতে হয়। কাথিয়াবাড় অঞ্চলে তখন বলভী নামে এক রাজ্য ছিল; বলভীরাজ ধ্রুবসেন পরাজিত হইয়া হর্ষবর্দ্ধনের অধিনায়কত্ব স্বীকার করিয়া লইলেন। ৬৪১ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বেই মগধ তাঁহার অধিকারে আসিয়াছিল এমন প্রমাণও পাওয়া যায়। ৬৪৩ খৃঃ অব্দে হর্ষবর্দ্ধন গঞ্জাম জেলার কোঙ্গোদ রাজ্য অধিকার করেন। এভাবে কেবল কাশ্মীর, পঞ্জাবের কিয়দংশ, রাজপুতানা, সিন্ধু এবং কামরূপ ব্যতীত সমগ্র উত্তরাপথ হর্ষবর্দ্ধনের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল; দক্ষিণাপথের চালুক্য-রাজগণও উত্তরাপথে তাঁহার সার্ব্বভৌম আধিপত্য স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহারই রাজত্বকালে সুপ্রসিদ্ধ চৈনিক পর্য্যটক হিউয়েন্‌-সাঙ বা যুয়ান্‌ চোয়াঙ ভারতে আগমন করেন।
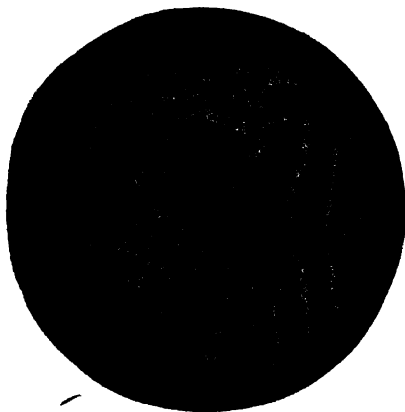
হর্ষ শিলাদিত্য

কামরূপরাজ ভাস্করবর্ম্মার সহিত মৈত্রী

হর্ষের সাম্রাজ্য বিস্তার

দাক্ষিণাত্যে পরাজয়

বলভীরাজ্য জয়

কোঙ্গোদ জয়

হর্ষের সাম্রাজ্য

হিউয়েন্‌-সাঙ

হর্ষবর্দ্ধন রণনৈপুণ্য, ধর্ম্ম, বিদ্যানুরাগ, পাণ্ডিত্য, উদারতা, প্রভৃতি গুণের জন্য প্রসিদ্ধ। 'কাদম্বরী' ও 'হর্ষচরিত'-

হর্ষের চরিত্র
বিদ্যোৎসাহ

স্ব হ স্তো মম ম হা রা জা ধি রা জ শ্রী হ র্ষ স্য
(হর্ষের হস্তাক্ষর)

রচয়িতা সুপ্রসিদ্ধ বাণভট্ট তাঁহারই সভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। শ্রীহর্ষ নিজেও ছিলেন সাহিত্যিক,—তাঁহার রচিত নাটকগুলির মধ্যে 'রত্নাবলী' সংস্কৃত সাহিত্যের একখানি বিশিষ্ট অবদান। একাধারে এরূপ রণনৈপুণ্য ও সাহিত্যিক প্রতিভা শুধু ভারতবর্ষের ইতিহাসেই নয়, সমগ্র জগতের ইতিহাসেও দুর্লভ। নিজে শৈবমতাবলম্বী হইয়াও তিনি ছিলেন বৌদ্ধ ধর্ম্মের একজন পরম পৃষ্ঠপোষক। তাঁহার রাজত্বকালে দেশে অনেক চিকিৎসালয়, বিশ্রামাগার, প্রভৃতি জনহিতকর প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছিল; সদাশয়তা, দানশীলতা ও প্রজাহিতৈষণাদি বিবিধ সদ্‌গুণের জন্য হর্ষবর্দ্ধন অমর হইয়া রহিয়াছেন। হূণ উপপ্লাবন এবং গুপ্তসাম্রাজ্যের পতনের পর আর্য্যাবর্ত্তের ভাগ্যাকাশে বিপ্লব উপস্থিত হইলে হর্ষবর্দ্ধনই পুনরায় উত্তর ভারতে সাংস্কৃতিক ঐক্য ও রাষ্ট্রসাম্য প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু সে রাষ্ট্র-সাম্যের মূল সুদৃঢ় ছিল না। খৃঃ ৬৪৬ বা ৬৪৭ অব্দে হর্ষবর্দ্ধন মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া পড়ে। নানা খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত হওয়ায় উত্তর ভারতের ইতিহাস মুসলিম আক্রমণের পূর্ব্বাহ্ণে আবার দ্বন্দ্ববিরোধে দুর্ব্বল হইয়া উঠে।

সাহিত্যিক প্রতিভা

প্রজাহিতৈষণা

রাষ্ট্রসাম্য প্রতিষ্ঠা

হিউয়েন্ সাঙ।—হর্ষবর্দ্ধনের রাজত্বকালে তাঙ্ (T'ang) সাম্রাজ্যের প্রসিদ্ধ চৈনিক পণ্ডিত ও পর্য্যটক হিউয়েন্-সাঙ্ বা যুয়ান্-চোয়াঙ্ (Hiuen Tsang) ভারতবর্ষে আগমন করেন। তিনি এদেশে আসিয়া হর্ষবর্দ্ধনের আনুকূল্য লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার লিখিত বিবরণ হইতে সমসাময়িক ভারতবর্ষ ও মধ্য এশিয়া সম্বন্ধে

অনেক বহুমূল্য তথ্য জানিতে পারা যায়। তাঙ্ বংশ (T'ang dynasty 618-906) প্রায় বাঙ্গালার পাল রাজবংশের সমসাময়িক। তাঙ্ যুগের চীনা নাবিক ও বণিকগণ ভারতীয় শ্রেষ্ঠী ও নৌবহরের সঙ্গে যোগ রক্ষা করিতেন। দক্ষিণে কাণ্টন (Canton)
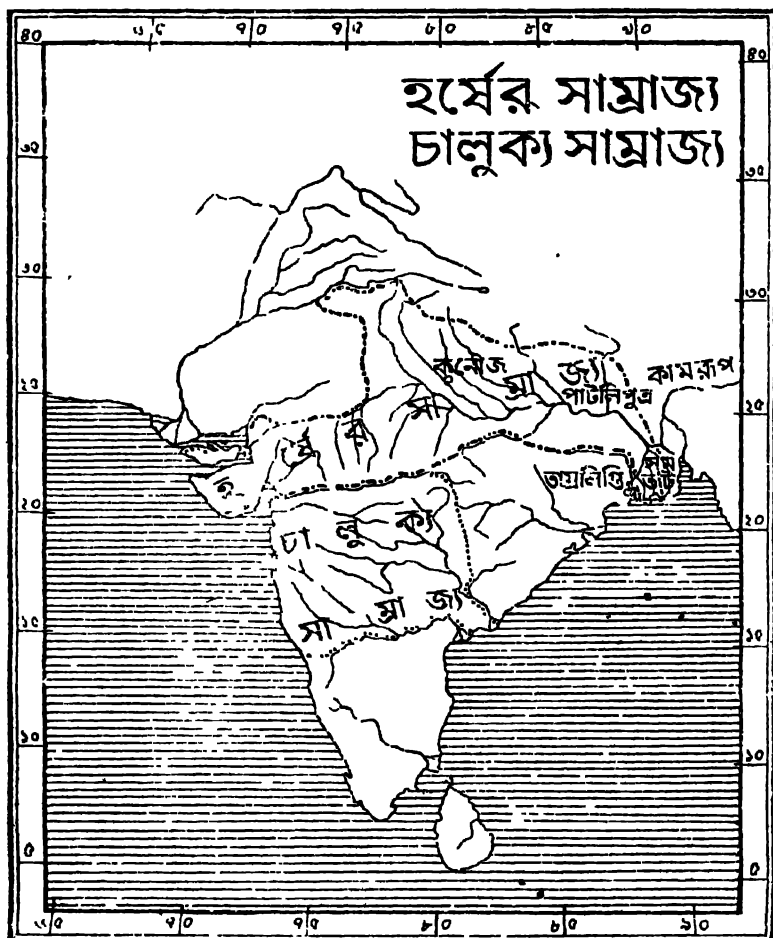
বন্দর হইতে পূর্ব্ব-চীনে চাঙ্-চাও (Chang-Chow) প্রভৃতি বন্দরের সহিত ভারতের বাণিজ্য সম্বন্ধ ছিল (১০৮৯)।

রাজধানী কনৌজ তখন অত্যন্ত সমৃদ্ধ ছিল; কিন্তু পাটলিপুত্র ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। পাটলিপুত্রের দক্ষিণে নালন্দা নামক স্থানে (বর্ত্তমানে পাটনা জেলার বড়গাঁও) যে বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় গড়িয়া উঠিয়াছিল, এশিয়ার নানাদেশ হইতে ছাত্রেরা সেখানে অধ্যয়ন করিতে আসিত; সে যুগে ভারতবর্ষে উহাই ছিল যথার্থ বিশ্ববিদ্যালয়। প্রায় দশ হাজার ছাত্র সেখানে থাকিয়া ধর্ম্মশাস্ত্র, ন্যায়, দর্শন, সাহিত্য, শিল্প, গণিত, আয়ুর্ব্বেদ ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিক বিষয় অধ্যয়ন করিত। হিউয়েন্-সাঙের সময় নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন শীলভদ্র নামে একজন বাঙ্গালী পণ্ডিত। তাঁহার ছাত্ররূপে হিউয়েন্-সাঙ কয়েক বৎসর নালন্দায় অধ্যয়ন ও পুঁথির নকল করিয়াছিলেন।

কনৌজ, পাটলীপুত্র, নালন্দা

শীলভদ্র

হর্ষবর্দ্ধন এবং তাঁহার শাসন-প্রণালীর অনেক প্রশংসা হিউয়েন্-সাঙ করিয়া গিয়াছেন। তিনি শুনিয়াছিলেন যে, ছয় বৎসরের যুদ্ধের ফলে হর্ষবর্দ্ধন 'পঞ্চরাষ্ট্রে' বিভক্ত ভারতবর্ষ (আর্য্যাবর্ত্ত) জয় করেন। প্রজাদের করভার ছিল অত্যন্ত লঘু; বিনা পারিশ্রমিকে কাহাকেও 'বেগার' খাটান হইত না। তবে রাজ্যে দস্যু-তস্করের অল্পবিস্তর উপদ্রব ছিল; হিউয়েন্-সাঙ নিজেই কয়েকবার দস্যুহস্তে পতিত হইয়াছিলেন। সম্রাট স্বয়ং রাজ্যের সমুদয় কার্য্য পরিদর্শন করিতেন এবং প্রায়ই রাজ্যভ্রমণে বাহির হইতেন। সেকালে দণ্ডবিধি ছিল অত্যন্ত কঠোর; অপরাধীর অঙ্গচ্ছেদের ব্যবস্থা ছিল সাধারণ শাস্তির অন্তর্ভূত; অপরাধ নির্ণয়ের প্রথাও ছিল অদ্ভুত— অগ্নি, জল, বিষ, প্রভৃতি পরীক্ষার দ্বারা অপরাধ নির্ণয় করা হইত। জীবহত্যা নিবারণ করিবার জন্য সম্রাট নানারূপ বিধিনিষেধের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। দেশে জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে রোগীদের জন্য অনেক চিকিৎসালয় স্থাপন করা হইয়াছিল; অতিথি অভ্যাগতদের জন্য অতিথিশালারও সুব্যবস্থা ছিল।

শাসন-প্রণালী

লঘু করভার

দণ্ডবিধি

জনকল্যাণ

হর্ষবর্দ্ধন স্বয়ং শৈবমতাবলম্বী হইলেও ধর্ম্মসম্বন্ধে অত্যন্ত উদার ছিলেন; বিশেষ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি তাঁহার কিঞ্চিৎ পক্ষপাতও ছিল। তাঁহার দয়া-দাক্ষিণ্যের খ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়া

হর্ষের উদারতা

কনৌজে মহাসম্মিলন

পড়িয়াছিল। একবার তিনি কান্যকুব্জে এক ধর্ম্ম-সম্মেলনের আয়োজন করেন। তাহাতে অনেক বৌদ্ধ ভিক্ষু, জৈন সন্ন্যাসী, শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ এবং বিশজন করদ নৃপতি সম্মিলিত হন। প্রায় এক-শত ফিট উচ্চ এক মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া সম্রাট তাহাতে নিজের সমান উচ্চ এক স্বর্ণময় বুদ্ধমূর্ত্তি স্থাপন করেন। প্রত্যহ প্রভাতে আর একটি বৃহৎ স্বর্ণময় বুদ্ধিমূর্ত্তি লইয়া শোভাযাত্রা করিয়া সেই মন্দিরে লইয়া যাওয়া হইত। সম্রাট স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্রের বেশে বুদ্ধমূর্ত্তির মস্তকে ছত্রধারণ করিয়া পথ চলিতেন, অন্যান্য রাজারা তাঁহার অনুগমন করিতেন; পথে স্বর্ণরৌপ্য ও মণিমুক্তা ছড়ান হইত। মন্দিরে পৌঁছিয়া মূর্ত্তিটিকে সুগন্ধি জলে স্নান করাইবার পর সম্রাট বুদ্ধের পূজা করিতেন। তারপর সমাগত সকলকে পরিতোষ সহকারে আহার করাইয়া ধর্ম্মাচার্য্যগণকে লইয়া তিনি সভায় বসিতেন। সভায় নানারূপ তত্ত্বকথার আলোচনা হইত। এইরূপে একমাস কাটিলে অনুষ্ঠানের শেষদিন মন্দিরে আগুন লাগে এবং সেই গোলযোগের মধ্যে এক আততায়ী সম্রাটকে হত্যা করিবার চেষ্টা করে। এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে, বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রতি সম্রাটের অনুরাগে ক্ষুব্ধ হইয়া ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করিয়াছিল। এই উৎসব শেষে হর্ষবর্দ্ধন হিউয়েন্ সাঙকে সঙ্গে লইয়া প্রয়াগে গমন করিলেন। সেখানে গঙ্গাযমুনার সঙ্গম স্থলে পাঁচ বৎসর অন্তর একটি করিয়া মহোৎসব হইত। এই মহোৎসবে বুদ্ধ, সূর্য্য ও শিবের সম্মিলিত পূজা সম্পন্ন করিয়া সম্রাট এক বিরাট প্রান্তরে বসিয়া জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সকলকে প্রার্থিত বস্তু দান করিতেন। এই প্রান্তরটির নাম রাখা হইয়াছিল "দানক্ষেত্র" বা "সন্তোষক্ষেত্র"। এই উৎসব তিনমাস কাল ব্যাপিয়া চলিত। রাজা দান করিতে করিতে শেষে নিজের রাজবসন পর্য্যন্ত বিলাইয়া দিয়া ভগ্নী রাজ্যশ্রীর নিকট হইতে একখানি সাধারণ বস্ত্র ভিক্ষা করিয়া তাহাই পরিধান করিতেন এবং সর্ব্বস্বদানের ব্রত সমাপন করিয়া পরমভিক্ষু বুদ্ধের চরণে আত্ম-নিবেদন করিতেন। হিউয়েন্ সাঙ ৬৩০ হইতে ৬৪৪ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে ছিলেন। চীনদেশে ফিরিবার পর চীন সম্রাটের আনুকূল্যে বহু মূল্যবান ভারতীয় শাস্ত্রাদি চীনভাষায় অনুবাদ

প্রয়াগে দানব্রত

করিয়া তিনি অমর হন। চীন ও ভারতের আধ্যাত্মিক সহযোগীতা এশিয়ার ইতিহাসে এক উজ্জ্বলতম অধ্যায়। চীন হইতে মোঙ্গলিয়া, সাইবিরিয়া, কোরিয়া ও জাপানে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রসার লাভ করে।

STUDIES AND QUESTIONS

1. Who were the Huns ? Write an account of their inroads and conquests in India. (C. U. '26, '30).

2. Narrate how Yasodharman distinguished himself as a defender of his country against foreign inroads. (C. U. '29, '32).

3. Who was the last great Hindu Emperor of Northern India ? What was the extent of his empire ? What foreign traveller visited India during his reign and what account of India has he left ? (C. U. '10).

4. Institute a comparison between Asoka and Harshavardhana. (C. U. '22).

5. Give a short account of the reign of the king who held supreme sway over Northern India when Hieun Tsang visited India. (C. U. '25).

6. Give an estimate of Harshavardhana as a warrior, a philanthropist and a patron of learning (C. U. '28, 44).

7. Give some account of the services rendered to Buddhism by Asoka, Kanishka and Harsha. (C.U. '30).

8. Sketch the reign of Harshavardhana. (C. U. '35, '37. '44).

9. When did Hieun Tsang visit India ? What light does his account of India throw on the religious and political conditions of the country in the seventh century A. D. ? (C. U. '17, '19, '22, '33).

10. Narrate briefly what you know about the accounts of (*a*) Fa-Hien ; (*b*) Hieun Tsang.(C.U. '40),

দশম অধ্যায়

গুপ্তসাম্রাজ্যের পতনের পর ভারতের অবস্থা

(দ্বিতীয় পর্ব্ব)

বিভিন্ন রাজশক্তির দ্বন্দ্ব

বাণভট্ট তাঁহার 'হর্ষচরিত' নামক গ্রন্থে হর্ষযুগের ভারতের অপূর্ব্ব চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। কনৌজকে কেন্দ্র করিয়া হর্ষবর্দ্ধনের বিস্তৃত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর ভারতের ইতিহাসে কান্যকুব্জ এক নূতন গরিমায় বিভূষিত হয়। শক্তিশালী রাজগণ, পূর্ব্বযুগে মগধের ন্যায়, পরবর্ত্তীকালে কনৌজ অধিকার করিয়া সম্রাট পদবী লাভ করিবার দাবী করিতেন। এইজন্য উত্তরকালে কনৌজের প্রভুত্ব লইয়া প্রতিদ্বন্দ্বী রাজগণের মধ্যে বহু যুদ্ধ-বিগ্রহ চলিয়াছিল। মুসলমান আক্রমণের কাল পর্য্যন্ত, উত্তর ভারতের ইতিহাস কনৌজকে কেন্দ্র করিয়া রচিত হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

কনৌজের পুনরভ্যুদয়

যশোবর্ম্মন্।—হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যুর পর অষ্টম শতকের প্রারম্ভে যশোবর্ম্মা কনৌজের লুপ্ত গৌরব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন। গৌড় ও মগধের রাজাকে পরাজিত ও নিহত করিয়া তিনি পূর্ব্বদিকে রাজ্য সীমা বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। ৭৩১ খৃঃ অব্দে তাঁহার এক মন্ত্রীকে চীনদেশে রাজদূতরূপে প্রেরণ করা হয়। 'উত্তরচরিত', 'মালতী-মাধব', প্রভৃতি নাটক-প্রণেতা সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত কবি ভবভূতি এবং 'গৌড়বাহো' (গৌড়বধ—গৌড়রাজের পরাভব) নামক প্রাকৃত কাব্যের রচয়িতা বাক্‌পতিরাজ তাঁহার সভাসদ ছিলেন। কিন্তু পরিশেষে কাশ্মীররাজ মুক্তাপীড় ললিতাদিত্যের হস্তে যশোবর্ম্মা পরাজিত হন; সঙ্গে সঙ্গে কনৌজের গৌরব সাময়িকভাবে লুপ্ত হইয়া যায়।

চীনে দূত প্রেরণ

সাহিত্য ভবভূতি

যশোবর্ম্মার মৃত্যু

কাশ্মীর।—আনুমানিক ৭৪০ খৃঃ অব্দে কর্কোটবংশীয় মুক্তাপীড় ললিতাদিত্য কাশ্মীরের সিংহাসনে আরোহণ করিয়া, তিব্বতের কিয়দংশ জয় করেন। কনৌজরাজ যশোবর্ম্মার পরাজয়ের পর মগধ, বঙ্গ এবং কলিঙ্গ পর্য্যন্ত তাঁহার পদানত হয়। ইহার পর

মুক্তাপীড় ললিতাদিত্য

মালব ও গুজরাট তাঁহার আধিপত্য স্বীকার করে। কেহ কেহ
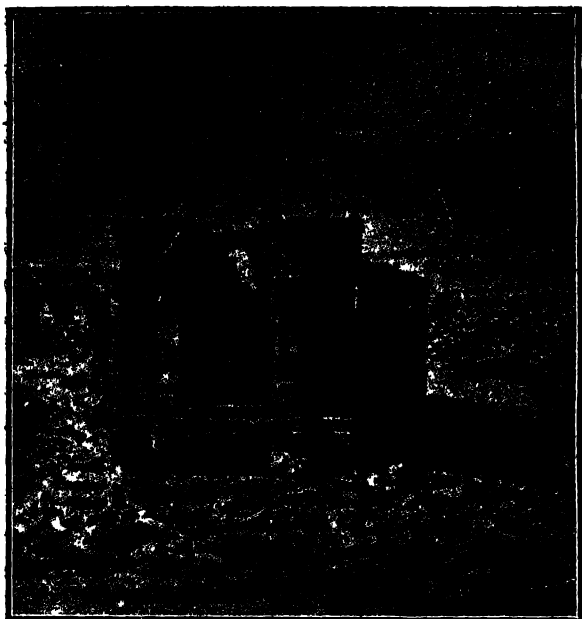
মার্ত্তণ্ড মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ (কাশ্মীর)

অনুমান করেন যে, ললিতাদিত্য সিন্ধুজয়ী মুসলমান আরবদিগকেও পরাভূত করিয়াছিলেন। আরবগণ পারস্য জয় করিয়া সহজে সিন্ধুদেশে আধিপত্য বিস্তার করে। কাশ্মীরের সুপ্রসিদ্ধ হিন্দু-গ্রীক রীতির মার্ত্তণ্ড মন্দির মুক্তাপীড়ের রাজত্বকালে নির্ম্মিত হইয়াছিল। কথিত আছে, তাঁহার পৌত্র জয়াপীড় বিনয়াদিত্য পুনরায় কনৌজ আক্রমণ করিয়া পুণ্ড্রবর্দ্ধন বা উত্তরবঙ্গ পর্য্যন্ত আধিপত্য স্থাপন করেন। ৮৫৫ খৃঃ অব্দে উৎপল বংশীয় অবন্তিবর্ম্মা কাশ্মীরের সিংহাসন লাভ করেন। অবন্তিবর্ম্মার পুত্র শঙ্করবর্ম্মা প্রতিহার-বংশীয় ১ম ভোজদেবের সময় কনৌজ আক্রমণ করিয়া, পঞ্জাবের কিয়দংশ অধিকার করিয়াছিলেন। দশম শতকের শেষ দিকে সুলতান মামুদের অভিযানের সময়ে রাণী দিদ্দা কাশ্মীরের সিংহাসনে

জয়াপীড় বিনয়াদিত্য

অবন্তিবর্ম্মা

শঙ্করবর্ম্মা,

রাণী দিদ্দা,

আর্য্যাবর্ত্তে কাশ্মীর-প্রভাবের অবসান

আরোহণ করেন। অতঃপর লোহর বংশীয় রাজগণ কাশ্মীরের সিংহাসন লাভ করেন। কিন্তু আর্য্যাবর্ত্তে প্রভাব বিস্তার করিবার মত পরাক্রম তাঁহাদের ছিল না।

ভারতীয় রাষ্ট্রনীতি ও বঙ্গদেশ

বঙ্গের পালবংশ। পঞ্চম শতকের শেষভাগে গুপ্ত-সাম্রাজ্যের পতন হইলে বঙ্গদেশে স্বাধীন রাষ্ট্রের অভ্যুদয় হয়। ষষ্ঠ শতকে বাঙ্গালী রাজারা আর্য্যাবর্ত্তে রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা করিয়া কনৌজের মৌখরি রাজগণের বিরুদ্ধতায় ব্যর্থকাম হইয়াছিলেন।

শশাঙ্ক

সপ্তম শতাব্দীতে গৌড়রাজ শশাঙ্কের অভ্যুদয় ঘটে। শশাঙ্কের পর বাঙ্গালায় ঘোর দুর্দ্দিন ঘনাইয়া আসিয়াছিল; ক্রমাগত নানা বিদেশী রাজাদের আক্রমণে বাঙ্গালার রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক জীবনে নিদারুণ বিপ্লব উপস্থিত হয়। বাঙ্গালার এই দুর্দ্দৈব ও অরাজকতার ইতিহাস "মাৎস্য ন্যায়" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

অরাজকতা বা 'মাৎস্য ন্যায়'

এই দুর্দ্দশা সহ্য করিতে না পারিয়া খৃষ্টীয় অষ্টম শতকের মধ্যভাগে বাঙ্গালার প্রকৃতিপুঞ্জ একমত হইয়া গোপাল নামে এক ব্যক্তিকে রাজপদে বরণ করিলেন। তিনি সহজেই দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরাইয়া আনিলেন। গোপাল নিজে ছিলেন বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী; বিখ্যাত উদ্দণ্ডপুর বৌদ্ধ বিহার তিনিই প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। প্রজাদের রাজ্যসঙ্কটে উপযুক্ত নেতাকে রাজপদে বরণ করার অধিকার বাঙ্গালার ইতিহাসে এই প্রথম দেখা যায়।

গোপাল ও পালবংশ

ধর্ম্মপাল (৭৭০-৮১৫) দিগ্বিজয়

গোপালের পুত্র ধর্ম্মপাল ছিলেন পালবংশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নরপতি। বঙ্গদেশ হইতে পঞ্জাবের অন্তর্গত জলন্ধর পর্য্যন্ত তাঁহার অধিকার বিস্তৃত হইয়াছিল। অষ্টম শতকের শেষ অথবা নবম শতকের প্রথম দিকে তিনি কনৌজরাজ ইন্দ্রায়ুধকে পরাজিত করিয়া সে স্থলে চক্রায়ুধ নামে একজন আশ্রিতকে নরপতিরূপে সিংহাসনে স্থাপন করেন। সম্ভবতঃ এই কারণে কনৌজে এক রাজন্যসম্মিলন আহূত হয়, তাহাতে ভোজ, মৎস্য, মদ্র, কুরু, যবন, অবন্তি, গান্ধার, কীর, প্রভৃতি নানা রাজ্যের রাজগণ উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অধিরাজ বলিয়া স্বীকার করেন। কিন্তু তিনি নির্ব্বিবাদে রাজত্ব করিতে পারেন নাই। দক্ষিণাপথের রাষ্ট্রকূটরাজ ধ্রুব ও ৩য় গোবিন্দের সহিত প্রবল সংঘর্ষের ফলে ধর্ম্মপালকে রাষ্ট্রকূট শক্তি স্বীকার করিয়া লইতে হয়। এদিকে প্রতিহাররাজ ২য় নাগভট

রাজন্য-সম্মিলন

রাষ্ট্রকূট ও প্রতিহারদের সঙ্গে সংঘর্ষ

কনৌজ হইতে ধর্ম্মপালের আশ্রিত চক্রায়ুধকে বিতাড়িত করিয়া সেখানে প্রতিহারবংশের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করেন। ধর্ম্মপাল কয়েকটি বিহার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে মগধের বিক্রমশিলা ও বঙ্গদেশে সোমপুর মহাবিহারের নাম সুপ্রসিদ্ধ। রাজসাহী জেলার পাহাড়পুরে সোমপুর মহাবিহারের বিরাট্ ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার স্থাপত্যরীতি সুদূর যবদ্বীপের মন্দিরে প্রভাব বিস্তার করে।

অন্যূন ৩২ বৎসর কাল রাজত্ব করিয়া ধর্ম্মপালের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র দেবপাল সিংহাসন লাভ করেন এবং হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারে মনোনিবেশ করিয়া তিনি তাঁহার বিজয়-বাহিনী লইয়া উত্তরে কাম্বোজ (তিব্বত) হইতে দক্ষিণে বিন্ধ্য পর্য্যন্ত সমগ্র ভূভাগ জয় করেন। তিনি উৎকলী ও হূণগণকে এবং দ্রবিড় ও গুর্জ্জররাজকে পরাজিত করিয়াছিলেন, এরূপ প্রমাণও পাওয়া যায়। কামরূপ ও উৎকল জয় তাঁহার সেনাপতি লাউসেন বা লবসেনের চেষ্টাতেই সম্ভব হইয়াছিল বলিয়া কিম্বদন্তী আছে। তাঁহার সময়ে সুবর্ণ-দ্বীপের (সুমাত্রা) রাজা বালপুত্রদেব দেবপালের বদান্যতায় নালন্দায় একটি সঙ্ঘারাম নির্ম্মাণ ও তাহার ব্যয়াদি নির্ব্বাহের ব্যবস্থা করাইয়া দিয়াছিলেন। মালয় উপদ্বীপের সহিত পূর্ব্ব-ভারতবর্ষের গভীর সম্বন্ধ ঐতিহাসিকরা স্বীকার করিয়াছেন। সুমাত্রা, যবদ্বীপ ও মালয়ে যে বিশাল হিন্দুরাজ্য গড়িয়া ওঠে তাহার নাম "শ্রীবিজয়"। উড়িষ্যার সহিতও এই "শ্রীবিজয়" রাজ্যের যোগ ছিল। সুতরাং বাঙ্গালী, ওড়িয়া ও তামিল নাবিকগণ যে ভারতীয় নৌশক্তির প্রতিষ্ঠা করেন, তাহার ফলে পল্লব, চোল ও পাণ্ড্যরাজগণ মালয় ও সিংহলে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের নৌবাহিনীর কথা সুবিজ্ঞাত। দেবপাল অন্যূন ৩৯ বৎসরকাল বিপুল গৌরবে রাজত্ব ও বাঙ্গালার শৌর্য্যবীর্য্যের প্রসার করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর পালবংশের প্রভাবপ্রতিপত্তি অনেক হ্রাস পাইয়াছিল।

দেবপাল (৮১৫-৫৪)

লাউসেন

দেবপালের পর তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ১ম বিগ্রহপাল বা ১ম শূরপাল রাজপদ লাভ করেন। কয়েক বৎসর রাজত্বের পরে তিনি স্বেচ্ছায় সিংহাসন ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মচর্চ্চায় মনোনিবেশ করিলে, তাঁহার পুত্র নারায়ণপাল সিংহাসনে আরোহণ করেন।

১ম বিগ্রহপাল

নারায়ণপাল

এই সময় পালরাজাদের দুর্ব্বলতার সুযোগে প্রতিহারগণ আপনাদের প্রতিপত্তি অনেকটা বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। ১ম প্রতিহাররাজ ১ম ভোজ মুঙ্গেরের নিকট এক যুদ্ধে পালরাজাকে পরাজিত করেন। ১ম ভোজের পুত্র মহেন্দ্রপাল উত্তরবঙ্গও অধিকার করিয়াছিলেন। এদিকে তিব্বত হইতে কাম্বোজ নামক এক জাতির আক্রমণে উত্তরবঙ্গ কিছুকালের জন্য আবার পালরাজাদের হস্তচ্যুত হয়। পালবংশের নবম অধিপতি ১ম মহীপাল পিতৃরাজ্য পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু প্রতিহাররাজ ১ম ভোজের নিকট পরাভবের পর পালরাজগণ আর্য্যাবর্ত্তে প্রভাববিস্তারের আর কোন সুযোগ পান নাই।

প্রতিহারদের সঙ্গে সংঘর্ষ

পালবংশের পতন

গুর্জ্জর-প্রতিহারবংশ।—যে প্রতিহারদের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বাঙ্গালার পালরাজাদের সাম্রাজ্যবিস্তারের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যায়, তাঁহারা গুর্জ্জর জাতির একটি শাখা বলিয়া পণ্ডিতেরা মনে করেন। অধিকাংশেরই মতে গুর্জ্জরজাতি মধ্য এশিয়ার হূণদের সঙ্গে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন। অন্যান্য অনেক বৈদেশিক জাতির ন্যায় ইঁহারা ভারতীয় জাতির সহিত মিশিয়া গিয়াছিলেন। ক্রমশঃ গুর্জ্জর-প্রতিহারগণ আপনাদিগকে রাজপুত এবং লক্ষ্মণের বংশধর বলিয়া দাবী করিতেন।

গুর্জ্জর-প্রতিহার জাতি

খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে গুর্জ্জরগণ রাজপুতানার ভিনমাল ও সিরোহি এবং নর্ম্মদার মোহনায় ভৃগুকচ্ছে (বরোচ) রাজ্য স্থাপন করেন। ইহার পর অষ্টম শতকে মালব অথবা মারবাড়ে একটি প্রতিহার রাজ্যের কথা জানিতে পারা যায়; মালবের প্রতিহাররাজ ১ম নাগভট সিন্ধুজয়ী আরবদিগকে পরাজিত করেন। প্রতিহার-বংশের চতুর্থ রাজা বৎস অষ্টম শতকের শেষদিকে গৌড়বঙ্গের সঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভ করেন। গৌড়বঙ্গ ব্যতীত দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূট-দিগের সহিত প্রতিহার বংশীয় রাজগণের সংঘর্ষ হয়। রাষ্ট্রকূট-দিগের প্রতিকূলতায় প্রতিহাররাজ্য বিশেষ বিস্তার লাভ করিতে পারে নাই। বৎসরাজের পুত্র ২য় নাগভট (আঃ ৮১৫—'৩৩) ধর্ম্মপালের আশ্রিত চক্রায়ুধকে কনৌজ হইতে বিতাড়িত করিয়াছিলেন; কিন্তু শেষে আবার তাঁহাকে রাষ্ট্রকূটবংশের ৩য় গোবিন্দের নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে হয়।

প্রতিহারদের অভ্যুদয়

আরব-বিজয়ী ১ম নাগভট

বৎসরাজ

২য় নাগভট

২য় নাগভটের পৌত্র ১ম ভোজদেব (আঃ ৮৩৬ – '৯৩) পূর্ব্ব-পঞ্জাব হইতে গৌড়বঙ্গের পশ্চিম-সীমা পর্য্যন্ত সমগ্র ভূ-ভাগ অধিকার করেন এবং তাঁহার পুত্র মহেন্দ্রপাল (আঃ ৮৯৩—৯১০) এই বংশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন। "কর্পূরমঞ্জরী" নামক প্রাকৃত নাটকের রচয়িতা প্রসিদ্ধ আলঙ্কারিক কবি রাজশেখর মহেন্দ্রপালের একজন সভাসদ্ ছিলেন। তাঁহার সময় সিন্ধুসীমান্ত হইতে পুণ্ড্রবর্দ্ধন (উত্তরবঙ্গ) অর্থাৎ আরব সমুদ্র হইতে বঙ্গোপসাগর পর্য্যন্ত প্রতিহার সাম্রাজ্য বিস্তৃত হয়। ভৃগুকচ্ছ বা বরোচ-বন্দরে গুর্জ্জরগণ ষষ্ঠশতকে যে শক্তিকেন্দ্র গড়িয়া তুলিতে আরম্ভ করেন তাহা ষোড়শ শতক পর্য্যন্ত ক্রমশঃ পশ্চিম-ভারতের নৌশক্তিকে বর্দ্ধিত করিয়াছিল। পর্ত্তুগীজ হইতে বৃটিশ-যুগের আরম্ভ পর্য্যন্ত বড় বড় জলযুদ্ধে গুর্জ্জর-নৌবহর অনেক কৃতিত্ব দেখাইয়াছিল, যদিও কোন স্থায়ী রাষ্ট্রশক্তি সেই সব সাধারণ নাবিকদের যথাযথ শিক্ষা ও সাহায্য দান করিতে পারে নাই। প্রাচীনকালেও লাট ও গুর্জ্জরভূমি হইতে বণিক ও নাবিকগণ সুদূর যবদ্বীপ পর্য্যন্ত পৌছিয়াছিল তাহার প্রমাণ আছে।

১ম ভোজদেব

মহেন্দ্রপাল

আলঙ্কারিক রাজশেখর

মহেন্দ্রপালের পর প্রতিহার সাম্রাজ্যের পতন হইতে থাকে; তাঁহার পুত্র ১ম মহীপাল রাষ্ট্রকূট-নরপতি ৩য় ইন্দ্রের নিকট পরাজিত হন এবং ৩য় ইন্দ্র কনৌজ লুণ্ঠন করেন (আঃ ৯১৬)। ইহার পর মহীপাল কনৌজ উদ্ধার করিলেও প্রতিহারদের সুদিন আর ফিরিল না। নানা স্থানে ক্ষুদ্র-বৃহৎ অনেকগুলি রাজ্য স্বাধীনতা ঘোষণা করিল—আরবসাগর হইতে বঙ্গোপসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত বিশাল প্রতিহারসাম্রাজ্য সঙ্কুচিত হইয়া কনৌজের আশে-পাশে কোনও ক্রমে আরও এক শতাব্দীকাল টিঁকিয়া রহিল মাত্র। পরে ১০১৮ খৃঃ অব্দে সুলতান মামুদ কনৌজ লুণ্ঠন করেন। ইহার কিছুকাল পরেই প্রতিহারবংশের শেষ নরপতি রাজ্যপাল আততায়ীর হস্তে নিহত হন এবং প্রতিহার-রাজ্যের শেষ রশ্মিটুকুও বিলীন হইয়া যায়।

১ম মহীপাল

প্রতিহারদের পতন

সুলতান মামুদের কনৌজ-লুণ্ঠন

STUDIES AND QUESTIONS

1. Write a note on Yasovarman and Lalitaditya. (C. U. '32).

2. Sketch briefly the history of the Palas of Bengal (C. U. '31, 34), and of the Gurajara-Pratiharas of Kanauj. (C. U. '34, '39,'45).

একাদশ অধ্যায়

দক্ষিণাপথের অভ্যুত্থান

গুপ্তোত্তর যুগ দাক্ষিণাত্যের অভ্যুত্থান

পূর্ব্বাভাস।—গুপ্তযুগ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের ইতিহাসে উত্তরাপথেরই প্রাধান্য ছিল অতি প্রবল। গুপ্তযুগের পর দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সূত্রপাত হয়। দক্ষিণাপথে তখন যে শুধু পরাক্রান্ত রাজশক্তির বিকাশ হইতেছিল তাহা নয়, দক্ষিণাপথের রাজারা তখন উত্তরাপথেও প্রাধান্য বিস্তারের চেষ্টা করিতেছিলেন—এ যুগে দাক্ষিণাত্যের ইতিহাসের ইহাই বিশেষত্ব।

বাতাপির চালুক্যবংশ।—খৃষ্টীয় তৃতীয় শতকে সাতবাহন (অন্ধ্র) সাম্রাজ্যের পতনের পর দাক্ষিণাত্য নানা ক্ষুদ্র-বৃহৎ রাজ্যে বিভক্ত হইয়া গিয়াছিল। ষষ্ঠ শতকের মধ্যভাগে বাতাপিপুরে (বিজাপুর জেলার বাদামী) ১ম পুলকেশী চালুক্যরাজ্য স্থাপন করেন। ১ম পুলকেশী কয়েকটি রাজ্য জয় করিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্রগণও বিশেষ পরাক্রান্ত ছিলেন,—তাঁহাদের বাহুবলে চালুক্যরাজ্যের আয়তন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

১ম পুলকেশী

দ্রবিড়-বিজেতা ২য় পুলকেশী

সপ্তম শতকের প্রারম্ভে (৬০৯) ১ম পুলকেশীর পৌত্র ২য় পুলকেশী সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনিই ছিলেন এই বংশের শ্রেষ্ঠ নরপতি। তাঁহার বিজয়বাহিনী দক্ষিণে কাবেরী নদী হইতে উত্তরে নর্ম্মদা পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল। তিনি কাঞ্চীর পল্লবরাজ মহেন্দ্রবর্ম্মাকে পরাজিত করেন এবং "সুদূর দক্ষিণের" চোল, চের (কেরল) ও পাণ্ড্যরাজগণের উপর প্রভাব বিস্তার করেন। হর্ষবর্দ্ধন দক্ষিণাপথে প্রবেশের চেষ্টা করিলে, নর্ম্মদাতীরে ২য় পুলকেশীর হস্তে পরাভব স্বীকার করিয়া ফিরিয়া

দিগ্বিজয়

আসিতে বাধ্য হন এবং ২য় পুলকেশী মালব ও গুজরাট অধিকার করেন। এভাবে তিনি প্রায় সমগ্র দক্ষিণাপথের একচ্ছত্র সম্রাট্ হইয়া বসিলেন। হর্ষের আশ্রিত চৈনিক পর্য্যটক হিউয়েন্-সাঙ ৬৪১ খৃঃ অব্দে ২য় পুলকেশীর রাজসভা পরিদর্শন করিয়া চালুক্য সম্রাট্ এবং তাঁহার প্রজাদের শৌর্য্যবীর্য্যের এক চমৎকার বর্ণনা লিখিয়া গিয়াছেন। কথিত আছে, ২য় পুলকেশী ও সাসেনীয (Sassanian) বংশের গৌরব পারস্যরাজ ২য় খুসরুর মধ্যে মৈত্রীর নিদর্শনস্বরূপ রাজদূতের বিনিময় হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার এই অভূতপূর্ব্ব প্রতিষ্ঠা বেশী দিন স্থায়ী হইল না। ৬৪২ খৃঃ অব্দে পল্লব-রাজ নরসিংহবর্ম্মার সহিত যুদ্ধে তিনি পরাজিত ও নিহত হইলেন। কিন্তু ২য় পুলকেশীর পুত্র ১ম বিক্রমাদিত্য পল্লবদের রাজধানী কাঞ্চী (কাঞ্চীভেরাগ) অবরোধ করিয়া চালুক্যদের লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন এবং পল্লবরাজ নরসিংহবর্ম্মার মৃত্যুর পর চালুক্যরাজ ২য় বিক্রমাদিত্য কাঞ্চী জয় করেন। হিন্দু রাজগণের মধ্যে চালুক্যদেরই সঙ্গে সিন্ধুজয়ী আরবদের প্রথম সংঘর্ষ হয়; ২য় বিক্রমাদিত্যের অধীন এক মহাসামন্ত "তাজ্জিক" অর্থাৎ আরবগণকে পরাজিত করেন। ৭৫৩ খৃঃ অব্দে রাষ্ট্রকূটদের আক্রমণে বাদামী বা বাতাপিপুরের চালুক্যবংশের প্রাধান্য বিনষ্ট হইয়া যায়। বাদামীর প্রসিদ্ধ হিন্দু গুহামন্দির সে যুগের ভাস্কর্য্যশিল্প-বিকাশের সাক্ষ্য দেয়। এই বংশের এক শাখা গোদাবরী ও কৃষ্ণার মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে এক নূতন রাজবংশ স্থাপন করেন। ইহা পূর্ব্ব-চালুক্য বা বেঙ্গির চালুক্যবংশ নামে খ্যাত।

হিউয়েন্-সাঙের বিবরণ

পারস্যের সহিত মৈত্রী

২য় পুলকেশীর পরাভব ও মৃত্যু

চালুক্য-প্রাধান্যের অবসান

পল্লববংশ।—তৃতীয় খৃষ্ট শতকে সাতবাহনের পতনের সময়ই পল্লবগণ কাঞ্চীতে স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া ক্রমেই শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছিলেন। ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে পল্লবরাজ সিংহবিষ্ণু চের, চোল ও পাণ্ড্য রাজ্য জয় করিয়া তামিল জাতির সাংস্কৃতিক ঐক্য ও স্বীয় প্রাধান্য বিস্তার করেন। চালুক্যদের সঙ্গে তাঁহাদের প্রায়ই যুদ্ধবিগ্রহ হইত। চালুক্যসম্রাট্ ২য় পুলকেশীর হস্তে পল্লবরাজ মহেন্দ্রবর্ম্মার পরাজয় ঘটে কিন্তু মহেন্দ্রবর্ম্মার পুত্র নরসিংহ-বর্ম্মা ২য় পুলকেশীকে পরাভূত ও নিহত করেন। পল্লববংশের মধ্যে নরসিংহবর্ম্মাই ছিলেন সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ নরপতি।

পল্লব ও চালুক্যদের সংঘর্ষ

সিংহল-বিজয়ী নরসিংহবর্ম্মা

পুলকেশীর পরাভবের পর তিনি "সুদূর দক্ষিণে" পাণ্ড্যদেশ এবং সিংহল পর্য্যন্ত পল্লববংশের প্রাধান্য স্থাপন করেন। চালুক্যদিগের
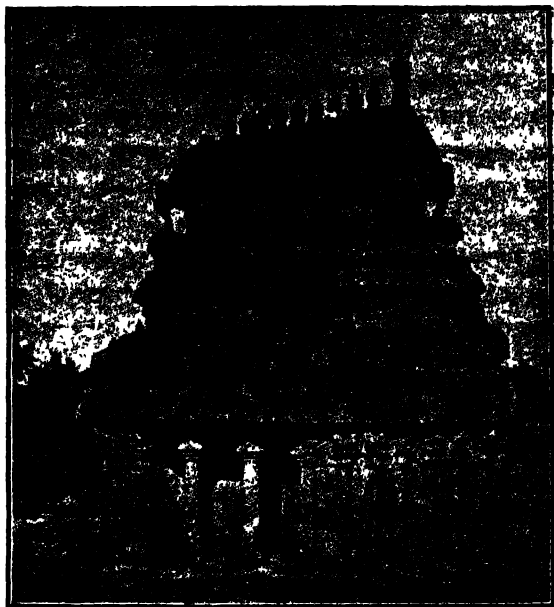
গণেশরথ—মামল্লপুরম্

পল্লবশিল্প

ন্যায় পল্লবরাজগণের সময়ও দাক্ষিণাত্যে দ্রবিড় ভাস্কর্য্য, চিত্রকলা ও স্থাপত্যশিল্পের বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল এবং পল্লবশিল্পের প্রভাব বৃহত্তর ভারতে বিশেষ প্রসার লাভ করে। নরসিংহবর্ম্মার রাজত্বকালে মহাবলীপুরম্ বা মামল্লপুরম্ নামক স্থানে পাহাড় কাটিয়া যে সাতটি মন্দির বা রথ নির্ম্মিত হয় তাহা আজও দর্শকের মনে বিস্ময় সঞ্চার করে। তাহার মধ্যে "দ্রৌপদীরথ" যেন অবিকল বাঙ্গালাদেশের পর্ণকুটীরেরই নকল। অর্জ্জুনতপস্যা, গঙ্গাবতরণ, গিরিগোবর্দ্ধন-ধারণ, প্রভৃতির প্রস্তরচিত্র পল্লবশিল্পের অপূর্ব্ব নিদর্শন। নরসিংহবর্ম্মার মৃত্যুর পর পল্লবশক্তির পতন আরম্ভ হয়; নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে

পল্লবদের পতন

চোলদের আক্রমণে পল্লবরাজ্য সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইয়া যায়।

দন্তিদুর্গ

রাষ্ট্রকূটবংশ।—অষ্টম শতকের মধ্যভাগে (৭৫৩) দন্তিদুর্গ চালুক্যগণকে পরাস্ত করিয়া, নাসিক অঞ্চলে রাষ্ট্রকূট-সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন। দন্তিদুর্গের পর ১ম কৃষ্ণ রাজা হন। আধুনিক আরঙ্গবাদের নিকটে তিনিই ইলোরার সুবিখ্যাত কৈলাসনাথের মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া অমর হইয়া গিয়াছেন। বিশ্বের বিস্ময় এই অপূর্ব্ব মন্দির গাঁথা হয় নাই, বিশাল পাহাড় কাটিয়া রচিত হয়। সুতরাং এই মন্দির পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভাস্কর্য্যেরই (স্থাপত্যের নয়) পরিচয়। ইলোরায়, অজন্তার মত বৌদ্ধশিল্পের সহিত জৈন ও ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীর মূর্ত্তি ও পুরাণাদির চিত্র দেখা যায়। একটি ভিত্তিচিত্রে লক্ষ্মীনারায়ণ গরুড়বাহনে দীপ্যমান।

১ম কৃষ্ণ

ধ্রুব

কৃষ্ণের পর তাঁহার পুত্র ধ্রুব রাজপদ লাভ করেন। এই সময় রাষ্ট্রকূটগণ অত্যন্ত শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন। ধ্রুব প্রতিহাররাজ বৎসকে পরাজিত করেন। ধ্রুবের পুত্র ৩য় গোবিন্দ (৭৯৪—৮১৫) বৎসরাজের পুত্র ২য় নাগভটকে পরাভূত করিয়া গুর্জ্জরদেশ
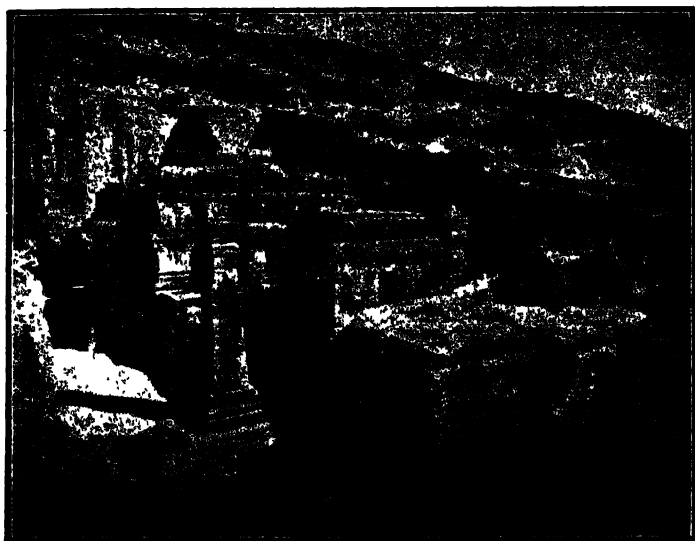
৩য় গোবিন্দ

কৈলাসনাথের মন্দির—ইলোরা

অধিকার করেন এবং দিগ্বিজয়ের উদ্দেশ্যে হিমালয়ের সানুদেশ পর্য্যন্ত অগ্রসর হন। গৌড়বঙ্গের দিগ্বিজয়ী ধর্ম্মপাল রাষ্ট্রকূট-সম্রাট্ ৩য় গোবিন্দের প্রভাব স্বীকার করিয়া তাঁহার সহিত বৈবাহিকসূত্রে আবদ্ধ হন। দক্ষিণে পল্লবগণও রাষ্ট্রকূট-সম্রাটের আধিপত্যের সম্মুখে মস্তক অবনত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

১ম অমোঘবর্ষ

৩য় গোবিন্দের পর তাঁহার পুত্র ১ম অমোঘবর্ষ (৮১৫—৮৭৭) সম্রাট্পদে অভিষিক্ত হইয়া মান্যখেট (নিজাম রাজ্যের আধুনিক মালখেড্) নামক স্থানে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। ৯১৬ খৃঃ

৩য় ইন্দ্র

অব্দে অমোঘবর্ষের প্রপৌত্র ৩য় ইন্দ্র প্রতিহারসম্রাট্ ১ম মহীপালকে পরাস্ত করিয়া কনৌজ লুণ্ঠন করেন। এই আঘাতের ফলেই কনৌজের প্রতিহারসাম্রাজ্য চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যায়। রাষ্ট্রকূট-

৩য় কৃষ্ণ

বংশের শেষ পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন ৩য় কৃষ্ণ। তিনি দুর্দ্ধর্ষ চোলদিগকেও পরাস্ত করিয়া "সুদূর দক্ষিণে" প্রভুত্ব স্থাপন করেন; অবশেষে ৯৭৩ খৃঃ অব্দে চালুক্য-বংশের ২য় তৈল রাষ্ট্রকূটশক্তি

রাষ্ট্রকূটদের পতন

ধ্বংস করিয়া কল্যাণনামক নগরে পুনরায় চালুক্যপ্রভুত্ব স্থাপন করেন; ইতিহাসে এই রাজবংশ "কল্যাণের চালুক্যবংশ" নামে প্রসিদ্ধ। বাতাপি ও কল্যাণের চালুক্যগণ প্রকৃতপক্ষে একই আদি মহারাষ্ট্রবংশের বীর সন্তান।

STUDIES AND QUESTIONS

1. Sketch the part played in the history of ancient India by Pulakesin II (C. U. '30, '32)

2. Write a note on the Pallavas of Kanchi (C. U '31, '33, '34.)

3. Sketch briefly the history of the Chalukyas of Vatapi. (C. U. '34)

4. Write a note on Narasimhavarman Pallava. (C U. '35.)

5. Write a note on the Rashtrakutas. (C.U. '36)

6. Indicate the achievements of the Rashtrakutas. (C U. '41.)

দ্বাদশ অধ্যায়

প্রাচীন যুগের অবসান

(প্রথম পর্ব্ব)

উত্তরাপথ

বহুধাবিভক্ত ভারতবর্ষ

পূর্ব্বাভাস।—প্রতিহার-সাম্রাজ্যের পতনের পর উত্তর-ভারত বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হইয়া গেল এবং রাজারা নিজ নিজ প্রভুত্বস্থাপনের জন্য পরস্পর যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হইলেন। তখন যে সকল নূতন রাজবংশ উত্তর-ভারতে প্রাধান্য লাভ করে তাহাদের মধ্যে মালবের "পরমার", জেজাকভুক্তির "চন্দেল্ল", ডাহলদেশের "চেদি" বা "কলচুরি," গুজরাটের "বাঘেলা" ও "চৌলুক্য", আজমীড়ের 'চৌহান" এবং কনৌজের "গহড়বাল"-বংশ সবিশেষ বিখ্যাত। এদিকে তখন ভারতের পূর্ব্বাংশে পাল ও সেনবংশের রাজারা রাজত্ব করিতেন এবং উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশে ব্রাহ্মণ শাহি-বংশের আধিপত্য ছিল। মুসলমানগণ তখন ভারত জয় করিতে উদ্যত। উত্তর-পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন হিন্দু রাজগণ ধ্বংসকর আত্মকলহে লিপ্ত থাকায়, সম্মিলিতভাবে মুসলমান আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে অসমর্থ হন। হিন্দু অনৈক্যের ফলে মুসলমানগণ ভারতবিজয়ের পথ সহজ দেখেন।

মুসলমান আক্রমণ

১ম মহীপাল

বঙ্গের রাজগণ।—পিতৃরাজ্য পুনরুদ্ধার করিয়া প্রথম মহীপাল, পালবংশের লুপ্ত গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ রাজেন্দ্র চোলের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতেও তিনি সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার সময় পালপ্রভুত্ব সম্ভবত বারাণসী পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। এ যুগে আচার্য্য ধর্ম্মপালের নেতৃত্বে একদল বৌদ্ধপ্রচারক তিব্বতে গমন করেন। তিব্বতের ধর্ম্ম ও শিল্পের উপর বাঙ্গালীর প্রভাব বিশেষভাবে স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু পালরাজাদের পুনরভ্যুদয় হইলেও সমগ্র বঙ্গদেশ তাঁহাদের

তিব্বতে প্রচারকার্য্য

বঙ্গের চন্দ্র
শূররাজ্য

প্রভুত্ব স্বীকার করিয়া লয় নাই। পূর্ব্ববঙ্গে চন্দ্রদের অধীনে এবং পশ্চিমবঙ্গে শূরদের অধীনে দুইটি স্বাধীন রাজ্যের পত্তন হইয়াছিল। বর্ত্তমান মেদিনীপুর-অঞ্চলে তখনও তিব্বতীদের জ্ঞাতি কাম্বোজরা রাজত্ব করিতেছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

নয়পাল
চেদিরাজ
লক্ষ্মীকর্ণের
আক্রমণ

দীপঙ্কর

প্রথম মহীপালের পুত্র নয়পালের রাজত্বকালে চেদিরাজ লক্ষ্মীকর্ণ বাঙ্গালাদেশ আক্রমণ করেন। অতঃপর উভয় রাজার মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হয় এবং নয়পালের পুত্র ৩য় বিগ্রহপাল লক্ষ্মীকর্ণের কন্যার সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। নয়পালের রাজত্বকালেই সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধ বাঙ্গালী পণ্ডিত অতীশ বা দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান সুদূর সুমাত্রা দ্বীপে ও তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিয়া অমরকীর্ত্তি লাভ করেন এবং বঙ্গীয় চিত্রকলার প্রভাব তিব্বতী বৌদ্ধশিল্পের উপর বিস্তৃত হয়। তাঁহার পর ৩য় বিগ্রহপাল দীর্ঘকাল রাজত্ব করেন। তাঁহার পুত্র ২য় মহীপালের (আঃ ১০৮১—'৮২) সময় পালসাম্রাজ্য পুনরায় ধ্বংসের মুখে অগ্রসর হয়। পূর্ব্ববঙ্গে চন্দ্রবংশের পর বর্ম্মরাজবংশ প্রবল হইয়া উঠে। দিব্য বা দিব্বোক নামে এক কৈবর্ত্তনায়কের নেতৃত্বে বরেন্দ্রী—অর্থাৎ উত্তরবঙ্গ বিদ্রোহ ঘোষণা করে; ২য় মহীপাল পরাজিত ও নিহত হন। দিব্বোকের মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ভীম বরেন্দ্রভূমির রাজা হন। ২য় মহীপালের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামপাল ভীমকে পরাজিত ও নিহত করিয়া বরেন্দ্রী উদ্ধার করেন। তাঁহার মন্ত্রী সন্ধ্যাকরনন্দী-রচিত "রামচরিত"-কাব্যে ইহা বর্ণিত আছে। তাঁহার সুদীর্ঘ রাজত্বকালে পালবংশের গৌরব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইলেও বেশী দিন স্থায়ী হইতে পারে নাই। সেনরাজবংশের বিজয়সেনের বিজয়াভিযানে বাঙ্গালায় পালপ্রভুত্ব চিরদিনের মত নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়। কিন্তু তুর্কী আক্রমণ পর্য্যন্ত বিহারপ্রদেশে পালরাজগণ রাজত্ব করিতেন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়।

৩য় বিগ্রহপাল
২য় মহীপাল

কৈবর্ত্তনায়ক
দিব্বোক ও
২য় মহীপাল

কৈবর্ত্তনায়ক
ভীম ও
রামপাল

বিজয়সেনের
আক্রমণ
তুর্কী আক্রমণ

বঙ্গের সেনরাজবংশ।—সেনরাজারা ছিলেন দাক্ষিণাত্যের কর্ণাটদেশীয় ব্রাহ্মণ, কিন্তু বাঙ্গালাদেশে প্রভুত্ব স্থাপন করিয়া তাঁহারা নিজেদের ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিতেন। একাদশ শতাব্দীতে সামন্তসেন রাঢ় অঞ্চলে (বর্দ্ধমান বিভাগ) একটি ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করেন। বিজয়সেন (১০৯৭—১১৫৯) ছিলেন সামন্তসেনের পৌত্র (২) শূরবংশের রাজকন্যা বিলাসদেবীকে বিবাহ

সামন্তসেন
বিজয়সেন

করিয়া তিনি বংশের প্রভাব ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। তাঁহারই আক্রমণে বঙ্গদেশে পালসাম্রাজ্যের অবসান ঘটে। ইহার পর তীরভুক্তি (মিথিলা বা উত্তর-বিহারের ত্রিহুত), কামরূপ ও কলিঙ্গ পর্য্যন্ত তাঁহার প্রভুত্ব বিস্তৃত হয়। তিনি হুগলীজেলার ত্রিবেণীর নিকটে নূতন রাজধানী স্থাপন করিয়া তাহার নাম রাখেন "বিজয়পুর"। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র স্বনামখ্যাত বল্লালসেন (আঃ ১১৫৯—'৮৫) রাজপদ লাভ করেন; তিনি ছিলেন শূরবংশের দৌহিত্র। কৌলীন্য প্রথার প্রবর্ত্তকরূপে বল্লালসেনের নাম বাঙ্গালাদেশে অক্ষয় হইয়া আছে। তিনি "দানসাগর" ও "অদ্ভুতসাগর" নামক দু'খানি গ্রন্থ রচনা করেন। বল্লালের পর তাঁহার পুত্র লক্ষ্মণসেন (১১৭৮ বা ১১৮৫) রাজা হন। নিরতিশয় ভীরু বলিয়া তাঁহার চরিত্রে অনর্থক কালিমা লেপন করা হইয়াছে; প্রকৃতপক্ষে লক্ষ্মণসেনই ছিলেন সেনবংশের শেষ পরাক্রান্ত নরপতি। তিনি কামরূপের রাজাকে পরাজিত করিয়া তাঁহাকে বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করেন। কাশীর রাজাকেও লক্ষ্মণসেনের নিকট পরাভব স্বীকার করিতে হইয়াছিল। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, ১১১৯ খৃঃ অব্দ হইতে যে লক্ষ্মণসংবৎ গণনা করা হয় তাহা লক্ষ্মণসেনেরই রাজ্যাভিষেকের সময় প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল; কিন্তু এ ধারণার কোন ভিত্তি আছে বলিয়া মনে হয় না। লক্ষ্মণসেন বিদ্বান্ ও বিদ্যোৎসাহী নরপতি ছিলেন। কথিত আছে যে, বল্লালের অসমাপ্ত গ্রন্থ "অদ্ভুতসাগর" তিনিই সম্পূর্ণ করিয়া যান। "গীতগোবিন্দ"-প্রণেতা বীরভূমের ভক্তকবি জয়দেব, এবং ধোয়ী, উমাপতি, প্রভৃতি প্রসিদ্ধ লেখকগণ লক্ষ্মণসেনের সভাসদ্ ছিলেন। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষে অথবা ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমে মুহম্মদ ঘুরীর সেনাপতি বখতিয়ারের পুত্র ইখ্‌তিয়ারউদ্দীন মুহম্মদ (ইখ্‌তিয়ারউদ্দীন মুহম্মদ বিন্ বখতিয়ার) বিহার জয় করিবার পর নদীয়া আক্রমণ করিলে, লক্ষ্মণসেন ("রায লখ্‌মনীয়া") অথবা তাঁহার পুত্রগণ পূর্ব্ববঙ্গে হটিয়া যান। কিন্তু ইহার পরও বিক্রমপুরে সেনরাজগণ ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। লক্ষ্মণসেনের দুই পুত্র বিশ্বরূপসেন ও কেশবসেন পরাক্রান্ত নৃপতি ছিলেন বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায়।

বল্লালসেন।

লক্ষ্মণসেন।

কবি জয়দেব, ধোয়ী, উমাপতি

ইখ্‌তিয়ার উদ্দীনের আক্রমণ ও সেনবংশের পতন

বঙ্গের অভ্যুত্থান

পাল ও সেনরাজগণের কৃতিত্ব।—পালবংশের অভ্যুত্থান বাঙ্গালাদেশের ইতিহাসে এক গৌরবময় অধ্যায়। তখনই বাঙ্গালাদেশে সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তের রাষ্ট্রনীতি প্রথম প্রতিষ্ঠালাভ করে; ইহার পূর্বে শশাঙ্ক গঞ্জাম-(কোঙ্গোদ) পর্য্যন্ত অধিকার করিলেও, হর্ষবর্দ্ধনের প্রতিকূলতায় বাঙ্গালার সে প্রভুত্ব স্থায়ী হইতে পারে নাই। পালরাজগণ বিচ্ছিন্ন ও উপদ্রুত বঙ্গভূমিতে শান্তি, শৃঙ্খলা ও ঐক্য স্থাপন করিয়া, বাঙ্গালাদেশকে "মাৎস্য ন্যায়ের" প্লাবন হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। পালরাজগণ ছিলেন বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী। উদ্দণ্ডপুর, বিক্রমশিলা, সোমপুর প্রভৃতি বিহার তাঁহাদেরই কীর্ত্তি। তাঁহাদেরই সময় ধর্ম্মপাল ও দীপঙ্করপ্রমুখ আচার্য্যগণ ভারতীয় নৌশক্তিপ্রসারের ফলে তিব্বত, ব্রহ্ম, শ্রীবিজয় দ্বীপ (সুমাত্রা) ও মালয়দেশে ভারতীয় সভ্যতা ও ধর্ম্ম প্রচার করেন। দেবপালের রাজত্বকালে সুদূর সুমাত্রা দ্বীপের রাজা তাহার অনুমতি লইয়া নালন্দায় একটি সঙ্ঘারাম নির্ম্মাণ করাইয়া দিলে উহার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য উদারহৃদয় দেবপাল পাঁচখানি গ্রাম দান করিয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী হইলেও পালরাজগণ ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের বিরোধিতা করেন নাই। ব্রাহ্মণরাই মন্ত্রীর ন্যায় উচ্চপদে নিযুক্ত হইতেন। তাঁহারা বিদ্যোৎসাহীও ছিলেন; আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ চক্রপাণি দত্ত, "বৌদ্ধগান ও দোহা"-রচয়িতা লুই ও কাহ্নপাদ প্রভৃতি পদকর্ত্তা, এবং "রামচরিত"-রচয়িতা কবি সন্ধ্যাকর নন্দী এই সময়ই আবির্ভূত হন। পালযুগেই ধীমান্ ও তাঁহার পুত্র বীতপাল ভাস্কর্য্যে

পালযুগের চিত্র

বৃহত্তর ভারতে ও তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্ম ও ভারতীয় সভ্যতার প্রভাব

চক্রপাণি দত্ত, সন্ধ্যাকর নন্দী, ধীমান্ বীতপাল

ও চিত্রকলায় পূর্ব্ব-এশিয়ার এক নূতন শিল্পরীতির প্রতিষ্ঠা করেন এবং এই শিল্পকলার প্রভাব ব্রহ্মদেশীয় মন্দিরে ও ভিত্তি চিত্রে এবং নেপালী ও তিব্বতী শিল্পের উপর বিস্তৃত হয়।

সেনরাজগণ ছিলেন ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পৃষ্ঠপোষক। কথিত আছে, বল্লালসেন মগধ, উড়িষ্যা, নেপাল, ভুটান, চট্টগ্রাম, আরাকান (ব্রহ্মদেশ), প্রভৃতি স্থানে প্রচারক প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই প্রবাদের সত্যাসত্য যাহাই হউক, বল্লালসেন যে বঙ্গসমাজের একজন শ্রেষ্ঠ সমাজপতি ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। আজিও বঙ্গের ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থগণ তৎপ্রবর্ত্তিত কৌলিন্যপ্রথা স্বীকার করিয়া চলেন। বল্লালসেন ও লক্ষ্মণসেন বিদ্যোৎসাহী নরপতি ছিলেন, তাঁহাদের সময়েই বঙ্গদেশে জয়দেব, ধোয়ী, হলায়ুধ, শ্রীধর দাস, উমাপতি ধর, প্রভৃতি কবিগণ আবির্ভূত হন। বিজয়সেনের রাজত্বকালে শূলপাণি নামক শিল্পী বরেন্দ্রীতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন।

ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের অভ্যুদয়

সমাজ-সংস্কার

কৌলীন্যপ্রথা

জয়দেব, ধোয়ী, হলায়ুধ, শ্রীধর দাস, উমাপতি শূলপাণি

উড়িষ্যার প্রাচ্য গঙ্গ-রাজবংশ।—পঞ্চম শতাব্দীর শেষদিকে অথবা ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রারম্ভে উড়িষ্যার দক্ষিণসীমান্তে কলিঙ্গভূমিতে গঙ্গবংশ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ঐতিহাসিকগণ এই বংশের নাম দিয়াছেন "প্রাচ্য গঙ্গবংশ"। তখন উড়িষ্যা ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহ নানা রাজ্যে বিভক্ত ছিল এবং কামরূপ, বঙ্গদেশ, চেদি ও চোল রাজ্যের পরাক্রান্ত নৃপতিগণ বারবার এই সকল রাজ্য আক্রমণ করিতেন। অবশেষে একাদশ শতাব্দীতে প্রাচ্য গঙ্গবংশের রাজা অনন্তবর্ম্মন্ চোড়গঙ্গ (১০৭৮—১১৪৮) সমগ্র দেশে একচ্ছত্র রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার রাজ্যসীমা গঙ্গা হইতে গোদাবরী নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। তাঁহারই রাজত্বকালে পুরীর জগন্নাথ-মন্দিরের নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ হয়; বহুকাল পরে তাঁহার প্রপৌত্র ৩য় অনঙ্গভীমের রাজত্বকালে উহা সমাপ্ত হইয়াছিল। মুক্তেশ্বর, পরশুরামেশ্বর, প্রভৃতি উড়িষ্যার মন্দিরগুলি, ভারতশিল্পে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছে; ৮ম শতকের ভুবনেশ্বর এবং ১৩ শতকের কোনার্কের মন্দির বিশ্ববিশ্রুত। ইহার পর প্রাচ্য গঙ্গবংশের সহিত প্রথমে বঙ্গদেশের সেনবংশীয় নরপতিদের এবং পরে তুর্কীবাহিনীর অনেকবার কঠোর সংঘর্ষ হইয়াছিল। গঙ্গবংশের শেষ রাজার নাম ভানুদেব। তাঁহার পর তাঁহার মন্ত্রী কপিলেন্দ্র উড়িষ্যার সিংহাসন

অনন্তবর্ম্মন চোড়গঙ্গ

৩য় অনঙ্গভীম

ভানুদেব কপিলেন্দ্র

অধিকার করেন (১৪৩৪—'৩৫)। তাঁহাদের পরাক্রমের ফলে উড়িষ্যা বহুকাল পর্য্যন্ত দিল্লীর সুলতানের আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়া স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিয়াছিল।

কামরূপ রাজ্য।—হর্ষবর্দ্ধনের রাজত্বকালে কামরূপ বা প্রাগ্‌জ্যোতিষ (বর্ত্তমান আসামের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার নিম্নভাগ) একটি শক্তিশালী রাজ্য বলিয়া পরিগণিত ছিল। হর্ষের মিত্র ভাস্করবর্ম্মাই ছিলেন কামরূপের প্রবল পরাক্রান্ত রাজা। কিছুকালের জন্য গৌড়ের রাজধানী কর্ণসুবর্ণ তাঁহার অধিকারভুক্ত ছিল। কামরূপরাজগণ আপনাদিগকে মহাভারতের ভগদত্তের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিতেন। মহাভারতের অর্জ্জুন চিত্রাঙ্গদার দেখা পান মণিপুরে এবং ভীমসেন তাঁহার বংশ স্থাপন করেন ডিমাপুরে বা হিড়িম্বাপুরে। তেজপুরে বাণরাজা ও ঊষা-অনিরুদ্ধ-উপাখ্যান এবং সুদূর সদিয়া ও লৌহিত্যনদ পারে পরশুরামতীর্থ সাক্ষ্য দেয় যে, পুরাণ, তন্ত্র ও মহাভারতের প্রভাব এ অঞ্চলেও কতটা প্রবল ছিল। নবম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে হর্জ্জরবর্ম্মা কামরূপে রাজত্ব করিতেন। একাদশ শতকের প্রথম দিকে ব্রহ্মপাল নামে জনৈক অধিনায়ক প্রজাদের দ্বারা কামরূপের রাজপদে বৃত হইয়া ছিলেন। তাঁহার পুত্র রত্নপাল একজন পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। গৌড়েশ্বর রামপালের পুত্র কুমারপালের মন্ত্রী বৈদ্যদেব কামরূপ অধিকার করিয়াছিলেন। সেন রাজবংশের বিজয়সেন ও লক্ষ্মণসেন কামরূপরাজকে পরাভূত করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু বাহিরের কোনও রাজাই বেশি দিন কামরূপে প্রভুত্ব রক্ষা করিতে পারেন নাই। কামরূপরাজগণও আর্য্যাবর্ত্তের রাষ্ট্রক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার বিশেষ কোনও অবসর পান নাই কিন্তু কামরূপ (আসাম) হইতে আর্য্যসভ্যতা ব্রহ্মদেশে প্রবেশ করে। দিল্লীর সুলতানগণ এবং বঙ্গদেশের মুসলিম রাজগণ বহুবার কামরূপ জয় করিতে গিয়া ব্যর্থকাম হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন।

ভাস্করবর্ম্মা
হর্জ্জরবর্ম্মা
ব্রহ্মপাল
রত্নপাল

জেজাকভুক্তির চন্দেল্লগণ।—বুন্দেলখণ্ডের প্রাচীন নাম ছিল জেজাকভুক্তি। নবম শতকে সেখানে চন্দেল্লবংশ একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। চন্দেল্লগণ ছিলেন রাজপুত। তাঁহাদের প্রথম পরাক্রান্ত নরপতির নাম ছিল যশোবর্ম্মন্। কালঞ্জর পর্ব্বত অধিকার করিয়া যশোবর্ম্মা দুর্ভেদ্য কালঞ্জর (বা কলিঞ্জর) দুর্গকে

যশোবর্ম্মা

তাঁহার প্রধান শক্তিকেন্দ্রে পরিণত করেন। এতদ্ব্যতীত মহোবা এবং খজুরাহো নগর দুইটিও যশোবর্ম্মার অধিকারে আসিয়াছিল। অতঃপর তাঁহার পুত্র ধঙ্গ (৯৫৪—'৯৮) কনৌজের প্রতিহাররাজকে পরাভূত করিয়া, যমুনা হইতে নর্ম্মদা পর্য্যন্ত রাজ্যসীমা বর্দ্ধিত করেন। কিন্তু চন্দেল্লবংশের গৌরব বেশীদিন স্থায়ী হয় নাই। ধঙ্গের এক বংশধর গজনীর সুলতান মামুদের নিকট পরাজিত হন। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে দিল্লী-আজমীরের চৌহান নরপতি পৃথ্বীরাজের হস্তে চন্দেল্লরাজ পরমর্দ্দিদেব পরাভূত হন; অবশেষে ১২০২ খৃঃ অব্দে মুহম্মদ ঘুরীর সেনাপতি কুতুব্‌উদ্দীন কালঞ্জর

ধঙ্গ

সুলতান মামুদের জয়

পরমর্দ্দিদেব

কুতুব্‌উদ্দীনের জয়
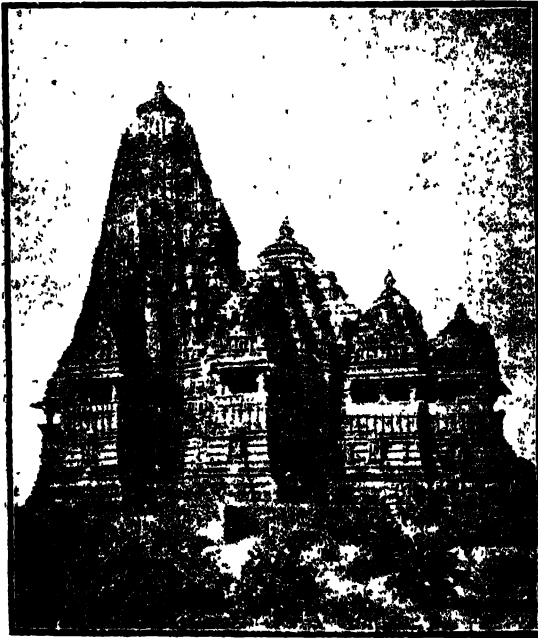
মহাদেব মন্দির—খজুরাহো (একাদশ শতক)

জয় করিলে চন্দেল্লবংশের আধিপত্য বিনষ্ট হইয়া যায়। চন্দেল্ল-নরপতিগণ বিদ্যা ও শিল্পানুরাগী ছিলেন; ধঙ্গের রাজত্বকালে

চন্দেল্লদের কৃতিত্ব

খজুরাহো নগরে অনেকগুলি অপূর্ব্ব হিন্দু ও জৈন মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল; খজুরাহো মন্দিরের ভাস্কর্য্য ভারতীয় শিল্পের চরম বিকাশের ফল। চন্দেল্লরাজগণ অনেক মন্দির, প্রাসাদ, দীর্ঘিকা, প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। 'প্রবোধ-চন্দ্রোদয়''-নামক বিখ্যাত রূপক-নাটকের লেখক কৃষ্ণমিশ্র চন্দেল্লরাজ কীর্ত্তিবর্ম্মার একজন সভাসদ্ ছিলেন।

কৃষ্ণমিশ্র

ডাহলের চেদিরাজগণ।—জব্বলপুর অঞ্চলে ডাহলদেশে চেদিরাজ্য প্রতিষ্ঠা লাভ করে। চেদিরাজগণ নিজেদের হৈহয় বা কলচুরি ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিতেন। জব্বলপুরের নিকট ত্রিপুরী (তেওয়া) নামক স্থানে ছিল তাঁহাদের শিল্পকেন্দ্র ও রাজধানী। চেদিরাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ১ম কোকল; তিনি কনৌজের প্রতিহাররাজ ভোজের মিত্র ছিলেন। এই বংশের প্রথম পরাক্রান্ত নৃপতির নাম গাঙ্গেয়দেব। কথিত আছে, তিনি উত্তরে তীরভুক্তি (ত্রিহুত) হইতে দক্ষিণে কর্ণাট পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া "বিক্রমাদিত্য" উপাধি গ্রহণ করেন। তাঁহার পুত্র লক্ষ্মীকর্ণ (আঃ ১০৪০—'৭০) কনৌজ হইতে পশ্চিমবঙ্গ পর্য্যন্ত জয় করিয়াছিলেন। চন্দেল্লরাজ কীর্ত্তিবর্ম্মা এবং চালুক্যরাজ সোমেশ্বরের হস্তে লক্ষ্মীকর্ণ পরাজয় স্বীকার করেন। লক্ষ্মীকর্ণের পুত্র যশঃকর্ণের (আঃ ১০৭০—১১২৫) সময় চেদিরাজ্য উত্তর-বিহারের চম্পারণ্য (চম্পারণ) হইতে দক্ষিণে গোদাবরী নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। যশঃকর্ণের পর চেদিরাজগণ দুর্ব্বল হইয়া পড়েন। পরিশেষে দাক্ষিণাত্যের অন্তর্ভূত দেবগিরির যাদবরাজ কৃষ্ণ (১২৪৭—'৭০) চেদিরাজ্য আক্রমণ করিলে উহা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

১ম কোকল

গাঙ্গেয়দেব

লক্ষ্মীকর্ণ

যশঃকর্ণ

চেদিরাজ্যের পতন

মালবের পরমার রাজগণ।—মালবের পরমার রাজগণের রাজধানী ছিল সুপ্রসিদ্ধ ধারা নগরী। পরমার বংশের প্রতিষ্ঠাতার নাম উপেন্দ্র বা কৃষ্ণরাজ। দশম শতকের শেষভাগে মুঞ্জ নামক রাজার রাজত্বকালে পরমার রাজগণ শক্তিশালী হইয়া উঠিলেও মুঞ্জকে পরিশেষে কল্যাণের চালুক্যরাজ ২য় তৈলের হস্তে পরাজিত হইতে হয়। ভোজরাজ ছিলেন পরমার-বংশের সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ নরপতি; তিনি আনুমানিক ১০১০ খৃঃ অঃ হইতে ১০৫৫ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনি দুর্দ্ধর্ষ তুর্কীদিগকে পরাভূত করেন;

মুঞ্জ

ভোজরাজ

তাঁহার সময় পরমার রাজ্য দক্ষিণে কোঙ্কণ-উপকূল পর্য্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়াছিল। শেষজীবনে কল্যাণের চালুক্যরাজ সোমেশ্বর আহবমল্ল, চেদিরাজ লক্ষ্মীকর্ণ এবং গুজরাটের চৌলুক্যরাজ ভীম সম্ভবতঃ একযোগে ধারা নগরী আক্রমণ করিলে ভোজরাজ পরাভূত হন। এই ব্যাপারের পর হইতেই পরমারশক্তি ক্রমশ দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। গুজরাটের চৌলুক্যগণ কিয়ৎকালের জন্য মালব অধিকার করিয়া বসিলেন। অতঃপর ত্রয়োদশ শতকে দিল্লীর সুলতান ইল্‌তুৎমিস্ মালব জয় করেন। পরমার-বংশের নরপতিদের মধ্যে ভোজরাজ অমর হইয়া আছেন; শকারি বিক্রমাদিত্যের ন্যায় তাঁহার সম্বন্ধেও অনেক কথা ও কাহিনী প্রচলিত আছে। বস্তুতঃ তাঁহার ন্যায় বহুমুখী প্রতিভা ও বিদ্যোৎসাহ খুব অল্প রাজার মধ্যেই দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। তিনি নিজেও ছিলেন সঙ্গীত, কাব্য, অলঙ্কার, ছন্দ, দণ্ডনীতি (রাজনীতি), জ্যোতিষ, দর্শন, প্রভৃতি নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত; শিক্ষাবিস্তারের উদ্দেশ্যে তিনি একটি সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। ভোজপুরের সুবিখ্যাত হ্রদও তাঁহার আব একটি কীর্ত্তি। তাঁহার নামের সহিত জড়িত হইয়া ধারা নগরী মধ্যযুগের সংস্কৃত-সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে।

পবমারগণের পতন

ইল্‌তুৎমিসেব মালব-জয়, ভোজরাজের প্রসিদ্ধি

গুজরাটের চৌলুক্যরাজগণ।—দশম শতকের শেষভাগে চৌলুক্য বা শোলঙ্কি রাজপুতগণ গুজরাটে একটি রাজ্য স্থাপন করেন। এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতার নাম ছিল মূলরাজ। অন্‌হিলপাটক বা অন্‌হিলবাড়া (বর্ত্তমান পাটন) নামক স্থানে তাঁহার রাজধানী ছিল। মূলরাজের প্রপৌত্র ১ম ভীমের রাজত্বকালে সুলতান মামুদ সোমনাথ-মন্দির ধ্বংস কবেন (১০২৬)। ১ম ভীমের পৌত্র সিদ্ধরাজ জয়সিংহ মালবদেশ অধিকার করেন। তাঁহার রাজত্বকাল সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় ১০৯৪ হইতে ১১৪৪ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তাঁহার পর কুমারপাল (আঃ ১১৪৪—'৭৩) সিংহাসনে আরোহণ করেন। সম্ভবতঃ তিনি আচার্য্য হেমচন্দ্রের নিকট জৈনধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই বংশের অপর একজন পরাক্রান্ত রাজা ২য় মূলরাজ প্রবল তুর্কীবাহিনীর গতিরোধ করিয়াছিলেন। কালক্রমে গৃহবিচ্ছেদের ফলে চৌলুক্যরাজ্যে

মূলরাজ

১ম ভীম, মামুদের সোমনাথ-লুণ্ঠন, সিদ্ধরাজ জয়সিংহ, কুমারপাল,

২য় মূলরাজ

বীরধবল

বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইলে চৌলুক্যরাজ্য সেই বংশের বাঘেলা-শাখার অধিকারে আসে। বাঘেলাবংশের বীরধবল বিপুল পরাক্রমে মুইজউদ্দীন বহ্‌রমের আক্রমণ ব্যর্থ করিয়াছিলেন। তাঁহার দুইজন মন্ত্রী বাস্তুপাল ও তেজঃপাল আবু, গির্ণার এবং শত্রুঞ্জয় পর্ব্বতে অনেকগুলি সুদৃশ্য জৈনমন্দির নির্ম্মাণ করেন। আবুপর্ব্বতের মন্দিরে জৈনশিল্পের চরম বিকাশ দেখা যায়।

বিশালদেব, অর্জ্জুন, ২য় কর্ণের সময় আলাউদ্দীন কর্ত্তৃক গুজরাট-জয়

বীরধবলের পুত্র বিশালদেব বাঘেলা-রাজগণের মধ্যে প্রথম "রাজা" উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পর তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র অর্জ্জুন রাজপদে অভিষিক্ত হন। অর্জ্জুনের পৌত্র ২য় কর্ণের রাজত্বকালে দিল্লীর সুলতান আলাউদ্দীন খল্‌জীর সেনাপতিগণ গুজরাট অধিকার করেন (১২৯৭)।

কনৌজের গহড়বাল-রাজগণ।—খৃষ্টীয় একাদশ শতকের শেষভাগে চন্দ্রদেব নামে এক নরপতি গঙ্গা ও যমুনার উপত্যকা-প্রদেশে গহড়বাল-রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি কনৌজ ও কাশী জয় করেন।

গোবিন্দচন্দ্র

অতঃপর তাঁহার পৌত্র গোবিন্দচন্দ্রের রাজত্ব-কালে (আঃ ১১১৪—'৫৪) মুঙ্গের পর্য্যন্ত গহড়বাল বংশের প্রভুত্ব বিস্তৃত হয়। তিনি তুর্কীদের আক্রমণ হইতে কাশী ও অন্যান্য তীর্থ রক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

জয়চ্চন্দ্র

গোবিন্দচন্দ্রের পৌত্র জয়চ্চন্দ্র বা জয়চাঁদ (১১৭০—'৯৪) এই বংশের শেষ পরাক্রান্ত রাজা। দিল্লী-আজমীড়ে তখন ইতিহাসপ্রসিদ্ধ পৃথ্বীরাজ (৩য়) রাজত্ব করিতেন; তাঁহার সহিত জয়চ্চন্দ্রের ঘোর শত্রুতা ছিল। শোনা যায় জয়চ্চন্দ্রই মুহম্মদ ঘুরীকে পৃথ্বীরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে প্ররোচনা দান করিয়াছিলেন।

মুহম্মদ ঘুরীর কনৌজ জয়

পৃথ্বী-রাজের পরাজয় ও মৃত্যুর পর মুহম্মদ ঘুরী কনৌজ আক্রমণ করিলে চন্দ্রাবর বা চন্দবার নামক স্থানে জয়চ্চন্দ্র পরাজিত ও নিহত হইলেন (১১৯৪)। অল্পকালের মধ্যেই সমগ্র গহড়বালরাজ্য মুসলমানের পদানত হইল।

দিল্লীনগরীর উদ্ভব

দিল্লী-আজমীড়ের চৌহানরাজগণ।—কথিত আছে, ১০৫২ খৃঃ অব্দে তোমরবংশের অনঙ্গপাল নামে এক রাজা দিল্লীর লালকিল্লা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। তোমরদের পর শাকম্ভীর (সম্ভর) এবং আজমীড়ের চৌহান বা চাহমান রাজ-

পুতগণ ৪র্থ বিগ্রহরাজের নেতৃত্বে দিল্লী জয় করেন। এই ৪র্থ বিগ্রহরাজই "হরকেলি" নামক নাটকের রচয়িতা। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ৩য় পৃথ্বীরাজ আনুমানিক ১১৭৯ খৃঃ অব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহারই হস্তে জেজাকভুক্তির (বুন্দেলখণ্ড) চন্দেল্লরাজ পরমর্দ্দি পরাভূত হন। ১১৯১ খৃঃ অব্দে মুহম্মদ ঘূরী পৃথ্বীরাজকে আক্রমণ করিলে, পৃথ্বীরাজই প্রথমে তাঁহাকে পরাজিত করেন; কিন্তু পর বৎসর (১১৯২) মুহম্মদ ঘূরীর হস্তে তিনি পরাভূত ও নিহত হন। পৃথ্বীরাজের কাহিনী অবলম্বন করিয়া প্রসিদ্ধ চারণ চাঁদকবি "পৃথ্বীরাজ রাসো" নামক গ্রন্থ রচনা করেন এবং উহা রাজপুতানার ও রাজপুতজাতির আদি মহাকাব্য রূপে সম্বর্দ্ধনা লাভ করে। পৃথ্বীরাজের পতনে দিল্লীনগরী মুহম্মদ ঘূরীর অধিকারভুক্ত হয়। ইহাই, ভারতবর্ষে তুর্কী-আধিপত্যের সূচনা ও প্রথম অধ্যায়।

৪র্থ বিগ্রহরাজ

৩য় পৃথ্বীরাজ

মুহম্মদ ঘূরীর দিল্লী জয়

STUDIES AND QUESTIONS

1. Describe the political condition of India on the eve of the Muhammadan conquest. (C. U. '10, '23.)

2. What do you know of the rise of the Rajputs? Name the principal Rajput Houses and Chiefs on the eve of the Muhammadan conquest. (C. U. '12, '15, '27.)

3. Write notes on: the Senas (C.U.'36,'45), the Chandellas ('36), the Paramaras ('45), the Chalukyas ('45), the Gahadavalas and the Chauhanas ('39,'45).

ত্রয়োদশ অধ্যায়

প্রাচীন যুগের অবসান

(দ্বিতীয় পর্ব্ব)

দক্ষিণাপথ

কল্যাণের চালুক্য বংশ।—৯৭৩ খৃঃ অব্দে চালুক্যবংশের ২য় তৈল রাষ্ট্রকূটগণকে পরাজিত করিয়া দাক্ষিণাত্যে পুনরায় চালুক্যপ্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করেন। ঐতিহাসিকগণ দুইটি চালুক্য-রাজ্যের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য ২য় তৈল কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত রাজবংশকে "কল্যাণের চালুক্যবংশ" নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। ২য় তৈল

২য় তৈল কর্ত্তৃক কল্যাণের রাজ্য-প্রতিষ্ঠা

৯৯৫ খৃঃ অব্দে মালবের পরমারবংশীয় রাজা মুঞ্জকেও পরাজিত করেন। এই সময়ে "সুদূর দক্ষিণে" চোলগণ পরাক্রান্ত হইয়া উঠিতেছিলেন। দক্ষিণাপথের প্রভুত্ব লইয়া চালুক্য ও চোলদিগের মধ্যে দীর্ঘকাল যাবৎ বিরোধ চলিতে থাকে। তৈলের প্রপৌত্র সোমেশ্বর আহবমল্ল ১০৫২ খৃঃ অব্দে প্রথমে কোপ্পম নামক স্থানে চোলদিগকে পরাজিত করেন, কিন্তু অল্পকাল পরেই কুদালসঙ্গম নামক স্থানে তাঁহাকে চোলদিগের নিকট পরাভব স্বীকার করিতে হয়। সোমেশ্বর নিজাম রাজ্যের অন্তর্গত কল্যাণ বা কল্যাণীনগরে চালুকসাম্রাজ্যের রাজধানী স্থাপন করেন। সোমেশ্বরের পুত্র ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্য (১০৭৬—১১২৭) চোলদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন। বিক্রমাদিত্য কল্যাণ-রাজবংশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নরপতি ছিলেন। তাঁহার নানা বিজয়াভিযান-কাহিনী তাঁহার সভাসদ্‌কবি বিহ্লনরচিত "বিক্রমাঙ্কদেব চরিত"-এ বর্ণিত আছে। "মিতাক্ষরা" রচয়িতা স্মার্ত্ত মহারাষ্ট্রপণ্ডিত বিজ্ঞানেশ্বর তাঁহার সভা অলঙ্কৃত করিতেন। কালক্রমে চালুক্যশক্তি দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে ১১৫৬ খৃঃ অব্দে চালুক্যদের সেনাপতি বিজ্জল কলচুর্য্য চালুক্যরাজ্য অধিকার করিয়া বসেন। তাঁহার মন্ত্রী বসব ছিলেন বীরশৈব বা লিঙ্গায়ৎ সম্প্রদায়ের ধর্ম্মগুরু। অবশেষে ৪র্থ সোমেশ্বরের এক সেনাপতি ১১৮৩ খৃঃ অব্দে চালুক্যপ্রাধান্য পুনরায় প্রতিষ্ঠা করেন, কিন্তু সামান্য কয়েক বৎসর পরেই (১১৯০) চালুক্যসাম্রাজ্যের অবসান হয়; সঙ্গে সঙ্গে তেলেগুরাজ্যে (অন্ধ্রদেশ) কাকতীয়বংশ, মহীশূরে হোয়সলবংশ এবং মহারাষ্ট্রে যাদববংশ প্রবল হইয়া উঠে।

সোমেশ্বর আবহমল্ল

চোল-চালুক্য-সংঘর্ষ

৬ষ্ঠ বিক্রমাদিত্য

বিহ্লন, বিজ্ঞানেশ্বর ও বসব

চালুক্যদের পতন

অন্ধ্রের কাকতীয় বংশ।—অন্ধ্রদেশে প্রথমে অনুমকোণ্ডম এবং পরে বরঙ্গল ছিল কাকতীয়-রাজাদের রাজধানী। তাই ইহাদিগকে কখন কখন "বরঙ্গলের কাকতীয়বংশ"ও বলা হয়। প্রথমে প্রোলরাজ কল্যাণের চালুক্যরাজাদের দুর্ব্বলতার সুযোগে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তাঁহার পৌত্র গণপতি (১১৯৯—১২৬০) যাদবরাজ সিংঘনকে পরাজিত করিয়া দক্ষিণে কাঞ্চী পর্য্যন্ত আধিপত্য স্থাপন করেন। গণপতির কন্যা রাণী রুদ্রাম্বা বা রুদ্রম্ম (১২৬০—'৯১) পিতার মৃত্যুর পর সিংহাসনে উপবেশন করিয়া দীর্ঘকাল যাবৎ নিরতিশয় দক্ষতার সহিত রাজ্য শাসন করিয়া-

প্রোলরাজ

গণপতি

রাণী রুদ্রাম্বা

ছিলেন। ভেনিসীর পর্য্যটক বিখ্যাত মার্কো পোলা তাঁহার ভ্রমণ-কাহিনীতে রাজ্ঞী রুদ্রাম্বার শাসনকার্য্যের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। রুদ্রাম্বার দৌহিত্র ২য় প্রতাপরুদ্র পুনরায় যাদবগণকে পরাজিত করেন। কিন্তু কিছুকাল পরে তাঁহাকে আবার দিল্লীর সুলতান আলাউদ্দীন খল্‌জীর সেনাপতি মালিক কাফুরের হস্তে পরাভব স্বীকার করিতে হয় (১৩০৮)।

মার্কো পোলোর বর্ণনা

২য় প্রতাপরুদ্র

আলাউদ্দীনের বরঙ্গল-জয়

মহীশূরের হোয়সলবংশ।—মহীশূরঅঞ্চলে খৃষ্টীয় পঞ্চম শতক হইতে একাদশ শতক পর্য্যন্ত 'প্রতীচ্য গঙ্গগণ' (Western Gangas) রাজত্ব করিতেন। "প্রতীচ্য গঙ্গবংশ"-এর পতনের পর হোয়সলগণ সেখানে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। হোয়সলদের রাজধানী ছিল দোরসমুদ্রে; ইহাই বর্ত্তমান হলেবীদ—হোয়সল শিল্পের প্রধান কেন্দ্র। এই বংশের প্রথম প্রসিদ্ধ নরপতি ছিলেন বিষ্ণুবর্দ্ধন (আঃ ১১০৬—'৪১); পার্শ্ববর্ত্তী অনেক রাজাকে তিনি পরাজিত করিয়াছিলেন। সুবিখ্যাত আচার্য্য রামানুজ তাঁহাকে বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। বিষ্ণুবর্দ্ধনের পৌত্র ২য় বীরবল্লাল (১১৭৩—১২২০) সোমেশ্বর চালুক্যের সেনাপতিকে পরাজিত করিয়া বিশেষ পরাক্রমশালী হইয়া উঠেন। দেবগিরির যাদবরাজ ভিল্লমও তাঁহার নিকট পরাস্ত ও নিহত হন। তাঁহার সময় উত্তরে মলপ্রভা নদী পর্য্যন্ত হোয়সলরাজ্য বিস্তার লাভ করিয়াছিল। ৩য় বীরবল্লাল ১৩১০ খৃঃ অব্দে দিল্লীর সুলতান আলাউদ্দীন খল্‌জীর সেনাপতি মালিক কাফুরের হস্তে পরাজয় স্বীকার করেন। ইহার পরে হোয়সলশক্তি ক্রমশঃ অবনতির দিকে অগ্রসর হয়।

বিষ্ণুবর্দ্ধন

২য় বীরবল্লাল

মহারাষ্ট্রের যাদববংশ।—দ্বাদশ শতকের শেষদিকে দেবগিরি বা দৌলতাবাদে ভিল্লম (১১৮৭—'৯১) যাদবরাজ্য স্থাপন করেন। ভিল্লমের পৌত্র সিংঘন (১২১০—'৪৭) ছিলেন এই বংশের সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ নরপতি; উত্তরে নর্ম্মদা হইতে দক্ষিণে কৃষ্ণা ও মলপ্রভা নদী পর্য্যন্ত তাঁহার আধিপত্য বিস্তৃত হইয়াছিল। তাঁহার সময়ে বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ ভাস্করাচার্য্যের পৌত্র চঙ্গদেব একটি জ্যোতিষবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। সিংঘনের পৌত্র রামচন্দ্রের রাজত্বকালেই হেমাদ্রি, বোপদেব, জ্ঞানেশ্বর, প্রভৃতি পণ্ডিতগণ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। ১২৯৪ খৃঃ অব্দে দিল্লীর

ভিল্লম

সিংঘন

চঙ্গদেব, হেমাদ্রি, বোপদেব, জ্ঞানেশ্বর

সুলতান জালালুদ্দীন খল্‌জীর ভ্রাতুষ্পুত্র আলাউদ্দীন (পরে সুলতান) রামচন্দ্রকে পরাভূত করিয়া দেবগিরি লুণ্ঠন করেন। কথিত আছে, রামচন্দ্র দিল্লীর প্রভুত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য হন। ১৩০৯ খৃঃ অব্দে রামচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র শঙ্কর স্বাধীনতা ঘোষণা করিলে, মালিক কাফুর তাঁহাকে পরাজিত ও নিহত করেন (১৩১২)। এই ভাবে দেবগিরির যাদববংশ নির্ম্মূল হইয়া যায়।

রামচন্দ্র, আলাউদ্দীন কর্ত্তৃক দেবগিরি লুণ্ঠন, যাদব বংশের অবসান

চোলগণের অভ্যুত্থান।—কল্যাণের চালুক্যদের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন তাঞ্জোরের চোল নরপতিগণ। এই চোলরাজ-বংশের প্রতিষ্ঠাতার নাম ছিল বিজয়ালয়। বিজয়ালয়ের পুত্র আদিত্য (৮৭১—৯০৭) কাঞ্চীর পল্লবগণকে পরাভূত করেন। আদিত্যের পুত্র ১ম পরান্তক (৯০৭—'৫৩) সিংহল পর্য্যন্ত চোলপ্রভুত্বের বিস্তার সাধন করিয়াছিলেন। অতঃপর ৯৮৫ খৃঃ অব্দে রাজরাজ চোল দক্ষিণে সিংহল হইতে উত্তরে কলিঙ্গ পর্য্যন্ত এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হন। বর্ত্তমান মহীশূররাজ্যের অধিকাংশ এবং মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর প্রায় সমগ্রভাগ তাঁহার অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। তাঁহার নৌবাহিনী ভারত মহাসাগরের কয়েকটি দ্বীপও অধিকার করে। ১০১৫ খৃঃ অব্দে রাজরাজ চোল চীনদেশে রাজদূত প্রেরণ করেন। তাঁহার পুত্র সুবিখ্যাত ১ম রাজেন্দ্র চোল (১০১৮—'৪৩) শুধু চোলবংশেরই শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন না, ভারতবর্ষের সমুদয় দিগ্বিজয়ী রাজার মধ্যে তাঁহার সমকক্ষ রণকুশল নৃপতি খুব অল্পই দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। কল্যাণের চালুক্য ও মহীশূরের "প্রতীচ্য গঙ্গ বংশ" ধ্বংস করিয়া তিনি পূর্ব্ব-বঙ্গ পর্য্যন্ত অগ্রসর হন। তাঁহার হস্তে পশ্চিমবঙ্গের মহীপাল, দক্ষিণপশ্চিম বঙ্গের রণশূর এবং পূর্ব্ববঙ্গের গোবিন্দচন্দ্র পরাভব স্বীকার করেন। গঙ্গবংশ ধ্বংস করিয়া অথবা গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত

বিজয়ালয়, আদিত্য

১ম পরান্তক, রাজরাজ চোল

১ম রাজেন্দ্র চোল

রাজরাজ চোলের মুদ্রা

প্রভুত্ব বিস্তার করিয়া তিনি "গঙ্গইকোণ্ড"—অর্থাৎ গঙ্গাবিজয়ী উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি ত্রিচিনোপল্লী-জেলায় নূতন রাজধানী স্থাপন করিয়া তাহার নাম রাখেন "গঙ্গইকোণ্ড চোল-পুরম্"। এদিকে আবার সমুদ্র পার হইয়া তিনি ব্রহ্ম, মার্ত্তাবান, নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, মালয় এবং সুমাত্রার কিয়দংশ পর্য্যন্ত জয় করেন। সুতরাং একাদশ শতক পর্য্যন্ত ভারতীয় নৌবাহিনীর

জল ও স্থলে দিগ্বিজয়

নৌ-শক্তি
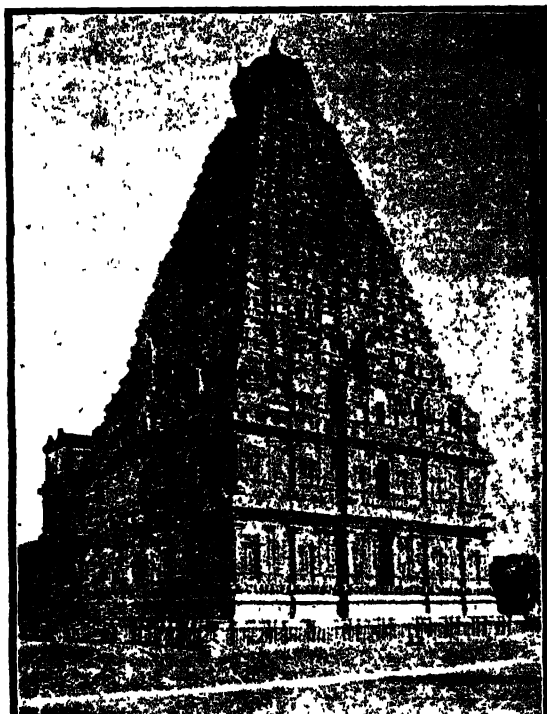
শিবমন্দির—তাঞ্জোর (দশম শতকে রাজরাজ চোল কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত)

গৌরব বঙ্গোপসাগর অতিক্রম করিয়া সুদূর মালয় ও যবদ্বীপ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং সম্ভবতঃ পশ্চিমভারতের গুর্জ্জর নাবিকগণও

মালদ্বীপ (Maldive) হইতে পূর্ব্বআফ্রিকায় এবং পারস্থে সাগর ও লোহিত সাগর অতিবাহন করিয়া পাশ্চাত্য জাতির সহিত বাণিজ্যসম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিল। প্রথম পর্তুগীজ ভাস্কো-ডি-গামা যখন দক্ষিণআফ্রিকা হইতে দক্ষিণভারতে নামেন তখন তাঁহার রণপোতের পাইলট্ একজন ভারতীয় নাবিককে তিনি সাদরে পথপরিদর্শক-(pilot) পদে বরণ করেন। ১০৩৩ খৃঃ অব্দে রাজেন্দ্র চোল চীনদেশে দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন।

রাজেন্দ্র চোলের মৃত্যুর পর পুনরায় কল্যাণের চালুক্যদের সঙ্গে তাঁহার পুত্রগণের বিরোধ উপস্থিত হয়। পরিশেষে ১০৭৪ খৃঃ অব্দে রাজেন্দ্র চোলের দৌহিত্র ২য় রাজেন্দ্র চোল কুলোত্তুঙ্গ, চোলসিংহাসন প্রাপ্ত হন। ২য় রাজেন্দ্র চোলের সহিত কল্যাণের ৬ষ্ঠ বিক্রমাদিত্যের এক সংঘর্ষ হইয়াছিল। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, "প্রাচ্য গঙ্গবংশে"র রাজা অনন্তবর্ম্মা (১০৭৬—১১৭৭) গঙ্গা হইতে গোদাবরী পর্য্যন্ত ভূভাগ অধিকার করিলে, ২য় রাজেন্দ্র চোল অনন্তবর্ম্মাকে পরাভূত করিয়া কলিঙ্গ-রাজ্য কাড়িয়া লইয়াছিলেন। ১০৮৬ খৃঃ অব্দে তিনি চোল-রাজ্য জরিপ করাইয়া রাজস্বের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন। ২য় রাজেন্দ্র চোলের পর চোলদের অধঃপতন আরম্ভ হইয়া যায় এবং হোয়সল, কাকতীয় ও পাণ্ড্যগণ ক্রমে ক্রমে পরাক্রান্ত হইয়া উঠিতে থাকেন। মহীশূরে হোয়সল স্থাপত্যশিল্পের নিদর্শন এবং তাঞ্জোর ও মাদুরায় চোল ও পাণ্ড্যদের বিরাট মন্দির ও গোপুরম্ দেখা যায়।

২য় রাজেন্দ্র চোল

চোলদের পতন

মাদুরার পাণ্ড্যরাজবংশ।—চোলদের অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে পাণ্ড্যরাজ্য প্রবল হইয়া উঠিতে থাকে। বর্ত্তমান মাদুরা, রামনাদ ও তিন্নেভেল্লি জেলায় ছিল পাণ্ড্যরাজ্য। পাণ্ড্যরাজগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন জটাবর্ম্মা সুন্দরপাণ্ড্য (১২৫১—'৭০)। সিংহল এবং মালয় পর্য্যন্ত তাঁহার প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। মুসলমান ঐতিহাসিক ওয়াসাফ্ ও ভেনিসের পর্য্যটক মার্কো পোলো যে বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন তাহা হইতে জানিতে পারা যায় যে, সে যুগে বাণিজ্যশ্রীতে পাণ্ড্যদেশ অত্যন্ত সমৃদ্ধ ছিল; পাণ্ড্যদেশের কায়লবন্দরে সুদূর আরবদেশ ও চীন হইতে বিস্তর বাণিজ্যপোত আসিত। পাণ্ড্যরাজগণ নৌবহরগঠনে বিশেষ

জটাবর্ম্মা সুন্দরপাণ্ড্য, ওয়াসাফ্ ও মার্কো পোলোর বিবরণ

মনোযোগ দিতেন। তাঁহাদের উৎসাহে ও আনুকূল্যে কেরল (কোচিন ও ত্রিবাঙ্কুর) অর্থাৎ মালাবার উপকূলের সুদক্ষ নাবিকগণ বহুশতাব্দী ধরিয়া ভারত মহাসাগরে ভারতীয় নৌশক্তি বিস্তার করিয়াছিল। তাহার ফলে ভারতীয় নাবিকগণ একদিকে সুদূর প্রাচ্যের সমগ্র বাণিজ্য চীনা ও জাপানী বণিক্‌দের হাত হইতে মালয় উপদ্বীপে গ্রহণ করিয়া আরব সাগর পারে পাশ্চাত্যবণিক-সঙ্ঘের নিকট পৌঁছাইয়া দিত। মধ্যযুগে ভেনিস্ ও জেনোয়ার নাবিকগণ তুর্কীরাজ্যের কড়া পাহারা এড়াইয়া ভারতীয় বণিকদের সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধ স্থাপন করিতে বহুবার চেষ্টা করে। মার্কো পোলোর কাহিনী তাহার প্রমাণ। ভারতবর্ষের মধ্যে মালাবারীদের যুদ্ধশিক্ষালয় ও নৌবিদ্যালয় বিখ্যাত ছিল। এই কলেজের একজন গোলন্দাজকে মালদ্বীপের যুদ্ধশিক্ষালয়ের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করা হইয়াছিল এবং স্বয়ং মালদ্বীপের সুলতান তাঁহাকে সম্মানিত করিয়াছিলেন। চতুর্দ্দশ শতকে পাণ্ড্য-রাজপরিবারে গৃহবিবাদের সুযোগে আলাউদ্দীন খল্‌জীর সেনাপতি মালিক কাফুর রামেশ্বর সেতুবন্ধ পর্য্যন্ত জয় করিয়া সেখানে একটি মসজিদ্ স্থাপন করেন।

আলাউদ্দীন কর্ত্তৃক পাণ্ড্যদেশ-জয়

STUDIES AND QUESTIONS

1. Write notes on the Yadavas of Deogiri and the Imperial Cholas. (C. U. '36, '39,'45).

2, What do you know of Rajendra Chola I ? (C.U. '37), and the achievement of the Cholas in the acts of war and peace. (C. U. '41.)

3. Write short notes on any four of the following—(*a*) Pulakesin II Chalukya, (*b*) Lalitaditya Muktapida, (*c*) Narasinghavarman, (*d*) Rajendra Chola I, (*e*) Ballal Sen, (*f*) Prithviraj Chauhan. (C. U. '43, '44)

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

পৌরাণিক যুগের হিন্দু-সভ্যতা

গুপ্তোত্তরযুগ।—গুপ্তসাম্রাজ্যের পতনের পর হইতেই ভারতের রাষ্ট্রীয় ঐক্য প্রকৃতপক্ষে বিনষ্ট হইয়া যায় এবং সমগ্রদেশ

বহু খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত হইয়া পড়ে। অবশ্য হর্ষবর্দ্ধন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া ভারতে রাষ্ট্রীয় ঐক্যস্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার সে চেষ্টা সম্পূর্ণরূপে সফল হয় নাই; তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই সে সাম্রাজ্য লুপ্ত হইয়া যায়। তখন ভারতে যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহারা স্ব স্ব প্রভুত্ববিস্তারের চেষ্টায় অবিরত আত্মকলহে লিপ্ত হইয়া পড়িল। ইহার মধ্যে কখনও বা শক্তিমান্ কোনও রাজা সাম্রাজ্যস্থাপনের স্বপ্ন কিঞ্চিৎ সফল করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। কিন্তু এই সকল সাম্রাজ্য ছিল ক্ষণস্থায়ী, শক্তিমান্ রাজার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই সাম্রাজ্য চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যায়। কিন্তু এইরূপ রাজ্যবিপ্লবে রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের ধারা মধ্যে মধ্যে ছিন্ন হইলেও, হিন্দুসভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রবাহ একরূপ অব্যাহতই ছিল। অবিচ্ছিন্ন যুদ্ধবিগ্রহ ও বিপ্লবের মধ্যেও হিন্দুসভ্যতার অত্যাশ্চর্য্য বিকাশ এবং বিস্তার ঘটে। হিন্দুসভ্যতার প্রাণশক্তির ইহা এক অপূর্ব্ব নিদর্শন; এ যুগে সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, বাণিজ্য, প্রভৃতি সর্ব্ববিষয়েই হিন্দুসভ্যতা প্রভূত উৎকর্ষ লাভ করে। ইহা ব্যতীত সমাজে এবং ধর্ম্মেও তখন যুগোপযোগী পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়া, প্রাচীন ভারতীয় সমাজ, ধর্ম্ম ও সভ্যতাকে ক্ষয় ও ধ্বংসের মুখ হইতে সযত্নে রক্ষা করিয়াছিল।

সংস্কৃতি ও সভ্যতার নিরবচ্ছিন্নতা

ধর্ম্ম।—বৈদিক যুগের শেষ দিকে নিষ্ঠাহীন যাগযজ্ঞ ও জটিল ক্রিয়াকাণ্ডপূর্ণ ধর্ম্মব্যবস্থার উপর সাধারণ লোকের আস্থা লোপ পাইয়াছিল; ফলে দেশে বেদবিরোধী নানা ধর্ম্মসম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। ইহাদের মধ্যে জৈন ও বৌদ্ধধর্ম্মের সরল ও সহজ নীতিগুলি স্বতঃই জনসাধারণের মন আকৃষ্ট করে। ফলে এই দুইটি ধর্ম্ম দেশে অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিল। বৌদ্ধধর্ম্ম এক সময় শুধু যে সমগ্র ভারতেই প্রসার লাভ করিয়াছিল তাহা নয়, ভারতের বাহিরে সুদূর প্রাচ্যের বহুদেশেও বিস্তৃত হইয়াছিল। বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পরে ধীরে ধীরে বৌদ্ধধর্ম্মের নৈতিক আদর্শের বহুল পরিবর্ত্তন ঘটে এবং নানা কারণে ভারতবর্ষে এই ধর্ম্মের প্রভাব ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইয়া আসিলে ইহা ধীরে ধীরে হিন্দুধর্ম্মেরই অঙ্গীভূত হইয়া যায়; এবং বুদ্ধদেব হিন্দুদের অন্যতম অবতাররূপে পরিগণিত হন। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাধান্যের যুগে বৈদিকধর্ম্মেরও এক

ধর্ম্মের জটিলতা

জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের সংঘাত

মূর্ত্তিপূজা

বিরাট পরিবর্ত্তন হয়। এই পরিবর্ত্তনের ফলে, রূপান্তরিত এই ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম, "পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্ম" নামে পরিচিত হয়; তাহার মূলভিত্তি হয় "পুরাণশাস্ত্র"। পুরাণ কথাটির অর্থ প্রাচীন বা অনাদি। এই সকল গ্রন্থে সৃষ্টিতত্ত্ব, দেবদেবীগণের উদ্ভব ও লীলামাহাত্ম্য, প্রাচীন রাজগণের কীর্ত্তিকলাপ, প্রভৃতির বর্ণনার মধ্য দিয়া ধর্ম্মোপদেশ এবং ইতিহাস ও ভূগোল লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।

পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্ম

বৈদিকধর্ম্মের সহিত পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্মের অনেক পার্থক্য আছে। বৈদিকযুগের ইন্দ্র, বরুণ, ঊষা, প্রভৃতি দেবদেবীগণের স্থলে তখন পুরাণোক্ত ত্রিমূর্ত্তি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের পূজা প্রচলিত হয়। এ যুগের অন্যান্য দেবতার মধ্যে সূর্য্য ও গণপতি প্রধান। ক্রমে ব্রহ্মার পূজা অপ্রচলিত হইয়া পড়িল এবং হিন্দুগণ বিষ্ণুর প্রতি অধিক ভক্তি প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। ধর্ম্ম-বিপ্লবের যুগে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের জন্য পৃথিবীতে বিষ্ণু মানবরূপে অবতীর্ণ হন, এই মতবাদ জনচিত্ত আকর্ষণ করিল এবং বিষ্ণুপূজার সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীনযুগের মহাপুরুষগণ অবতাররূপে জনসমাজে পূজিত হইতে লাগিলেন। এই অবতারবাদ পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্মের একটি বিশেষত্ব। দেবীগণের মধ্যে দুর্গা বিশেষ মহাশক্তিরূপে সর্ব্বপ্রধান স্থান অধিকার করিলেন। এই সময়েই আবার ইষ্টদেবপূজারও প্রচলন হয়। নানা দেবদেবীর পূজার পরিবর্ত্তে একজন ইষ্টদেবতার পূজাই অনেকে মোক্ষলাভের শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। এইরূপে পৌরাণিক বা লৌকিক ধর্ম্মের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে মূর্ত্তিপূজার বহুল প্রচলন হইল এবং দেশের সর্ব্বত্র সুন্দর সুন্দর প্রতিমা ও মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইল। চিত্রকলারও প্রকৃষ্ট বিকাশ এই যুগে হয়।

বৈদিক ও পৌরাণিক ধর্ম্মের পার্থক্য

পৌরাণিক দেবদেবীগণ

অবতারবাদ

ইষ্টদেববাদ

বৌদ্ধধর্ম্মের মত জৈনধর্ম্ম আজিও ভারত হইতে নিশ্চিহ্ন হয় নাই। গুপ্তোত্তরযুগে জৈনধর্ম্ম গুজরাট ও দাক্ষিণাত্যে প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু পরবর্ত্তীকালে আচার্য্য রামানুজ ও মধ্বাচার্য্য-প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণবধর্ম্ম এবং বসবের বীরশৈব বা লিঙ্গায়ৎধর্ম্ম-প্রচারের ফলে দাক্ষিণাত্যে জৈনধর্ম্মের প্রভাব অনেক পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হইয়া যায়। কিন্তু রাজপুতনা, গুজরাট ও পশ্চিমভারতে এই

জৈন ও বৌদ্ধধর্ম্মের অবস্থা

ধর্ম্মের প্রভাব আজও প্রবলভাবে বিদ্যমান। মহীশূরের শ্রবণ-বেলগোলায় জৈনশিল্পের বিরাট নিদর্শন এখনও দেখা যায়।

ধর্ম্মগুরুগণের আবির্ভাব।—এই সময়ে কয়েকজন খ্যাতনামা ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকের আবির্ভাব হয়। ইঁহারা হিন্দুধর্ম্মের পুনরভ্যুদয় ও জনসাধারণের মধ্যে ধর্ম্মের প্রেরণাসঞ্চারে বিশেষ সহায়তা করেন। ইঁহাদের মধ্যে কুমারিল ভট্ট, শঙ্করাচার্য্য, রামানুজ, রামানন্দ, মধ্বাচার্য্য ও বসবের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহা ব্যতীত তামিলভূমির শৈবআচার্য্য সম্বন্দর এবং "আড়বার"-আখ্যাধারী বৈষ্ণবগুরুগণও প্রসিদ্ধ ছিলেন। কুমারিলভট্ট খৃষ্টীয় সপ্তম

কুমারিল ভট্ট ও পূর্ব্বমীমাংসা, শঙ্করাচার্য্য, রামানুজ, মধ্বাচার্য্য, বসব বৈষ্ণব ও শৈব গুরুগণ

নটরাজ শিব (মাদ্রাজ)

শতকে আবির্ভূত হন। তিনি দাক্ষিণাত্যবাসী মৈথিলী ব্রাহ্মণ ছিলেন। মীমাংসা-দর্শনের (পূর্ব্বমীমাংসা) শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাকারী

কুমারিলের প্রকৃষ্ট বিচারপদ্ধতির ফলে বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড, অর্থাৎ আচার-অনুষ্ঠানের শ্রেষ্ঠত্ব আবার নূতন করিয়া প্রচারিত হয়। তাঁহার মীমাংসা-দর্শনের ভাষ্য এবং বৈদিক দেবদেবীর ব্যাখ্যা নৈষ্ঠিক হিন্দুসমাজে প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। অষ্টম শতকে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য মালাবারদেশে কালাদি গ্রামের এক নম্বুদ্রি ব্রাহ্মণপরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনিও সমগ্র ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়া বৌদ্ধ ও অন্যান্য পণ্ডিতদের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হন। তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মমত "অদ্বৈতবাদ" নামে প্রসিদ্ধ; এই মতের মূল কথা হইল "ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা",—মায়ার প্রভাবেই ব্রহ্মে জগৎ-ভ্রম হইয়া থাকে। গীতা, উপনিষদ্ ও বেদান্ত দর্শনের ভাষ্য রচনায় ইনি যে প্রতিভার পরিচয় দান করিয়া গিয়াছেন তাহা অদ্বিতীয় বলিলে অত্যুক্তি করা হয় না। কিন্তু কেবল দার্শনিক মতবাদের ব্যাখ্যাই তাঁহার জীবনের একমাত্র কৃতিত্ব ছিল না। ভারতের নানাস্থানে তিনি অনেকগুলি মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়া যান; তন্মধ্যে পুরীর গোবর্দ্ধন মঠ, দ্বারকার সারদা মঠ, বদরিকাশ্রমের যোষী মঠ এবং মহীশূরের শৃঙ্গেরী মঠ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শঙ্করাচার্য্য অদ্বৈতবাদ প্রচার করিলেও কাহারো কাহারো মতে লৌকিক ধর্ম্মানুষ্ঠানে শিবের আরাধনা সমর্থন করিতেন। কথিত আছে, মাত্র বত্রিশ বা আটত্রিশ বৎসর বয়সে হিমালয়ের কেদারতীর্থে শঙ্করাচার্য্য দেহত্যাগ করেন।

শঙ্করাচার্য্য ও উত্তরমীমাংসা বা "বেদান্ত"

অদ্বৈতবাদ

দার্শনিক মতবাদ

রামানুজের আবির্ভাবকাল খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতক। মান্দ্রাজের নিকটবর্ত্তী শ্রীপেরুম্বুদুর নামক স্থানে এক ব্রাহ্মণবংশে তাঁহার জন্ম হয়। শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় ইনিও বেদান্তদর্শনের ভাষ্য রচনা করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু ইঁহার প্রবর্ত্তিত মতবাদের মূল কথা হইল "জীব মাত্রই পরব্রহ্মের অংশস্বরূপ"। শঙ্কর ছিলেন অদ্বৈতজ্ঞানবাদী; রামানুজ দ্বৈত-উপাসনামূলক ভক্তিকে ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ মনে করিয়া তাহাই প্রচারকরিয়াছেন। রামানুজাচার্য্য "শ্রীবৈষ্ণব"-সম্প্রদায়ের আদিগুরু। *শ্রীরঙ্গমেএই মহাপুরুষ দেহত্যাগ করেন,তাঁহার প্রধান শিষ্য রামানন্দ।*

রামানুজ

মধ্বাচার্য্য আর একজন খ্যাতনামা বৈষ্ণবধর্ম্ম-প্রচারক। ইঁহার শিষ্যসম্প্রদায় "মধ্বাচারী" নামে খ্যাত। দক্ষিণভারতের এই ভক্তিবাদ উত্তরাপথের রামানন্দ প্রমুখ বৈষ্ণবপন্থীদের প্রেরণা দিয়াছিল।

মধ্বাচার্য্য

বসব

শৈব প্রচারকগণের মধ্যে বসবের নামই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিজাপুরে এক ব্রাহ্মণবংশে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি কল্যাণীরাজ বিজ্জল কলচুর্য্যের মন্ত্রী ছিলেন। ইঁহার শিষ্যগণ "বীরশৈব" বা "লিঙ্গায়ৎ" নামে খ্যাত। লিঙ্গায়ৎগণ শিবলিঙ্গের পূজা করেন, কিন্তু বেদ ও ব্রাহ্মণের প্রাধান্য স্বীকার করেন না।

বর্ণাশ্রম

সমাজ।—বৌদ্ধযুগের প্রারম্ভ হইতেই হিন্দুসমাজে নানারূপ পরিবর্ত্তনের সূচনা হয়। স্মরণাতীতকাল হইতেই বর্ণাশ্রমধর্ম্ম হিন্দুসমাজের মূলনীতি বলিয়া স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু প্রথম অবস্থায় ইহা বর্ত্তমানকালের ন্যায় অনুদার ছিল না। বৈদিকযুগের শেষের দিক্ হইতেই ব্রাহ্মণগণ সমাজবন্ধন দৃঢ় করিবার অভিপ্রায়ে নানারূপ বিধিনিষেধ প্রবর্ত্তন করিতে আরম্ভ করেন। সুপ্রসিদ্ধ মনুসংহিতা ও যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি মৌর্য্যোত্তরযুগে রচিত হয়। যবন, শক, পহ্লব, কুষাণ ও হূণ প্রভৃতি নানা বৈদেশিক ম্লেচ্ছজাতির উপপ্লাবন হইতে সমাজরক্ষার অভিপ্রায়েও নানাপ্রকার বিধিনিষেধ রচিত হয়। কিন্তু হিন্দুসমাজ তখন পর্য্যন্ত সঙ্কীর্ণ বা অস্পৃশ্যতাবাদী ছিল না। কারণ যুগে যুগে এই সকল "ম্লেচ্ছ" বৈদেশিক জাতিসমূহ বৌদ্ধ অথবা হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ক্রমশ ভারতের বিশাল জনসমাজের সহিত মিশিয়া গিয়াছে। ইহারই ফলে গুপ্তোত্তরযুগে প্রাচীন জাতিগত ক্ষত্রিয়সমাজের স্থলে আমরা এক নূতন কর্ম্মগত ক্ষত্রিয়সমাজের উদ্ভব দেখিতে পাই। ইঁহারাই ইতিহাসে বীর রাজপুত জাতি নামে পরিচিত। খৃষ্টীয় অষ্টম শতক হইতে মুসলমান বিজয় পর্য্যন্ত ভারতের রাষ্ট্রীয় ইতিহাস যুদ্ধবিশারদ রাজপুত জাতিরই প্রাধান্যের কাহিনী। রাজপুত-নামধারী এই সকল বৈদেশিক জাতির মধ্যে যাহারাই শৌর্য্যবীর্য্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল, তাহারাই ক্ষত্রিয় সমাজের অন্তর্ভূত হইল এবং যাহারা সাধারণ স্তরের অ-হিন্দু ছিল, তাহারা আচারব্যবহার ও বৃত্তিঅনুযায়ী বৈশ্যশূদ্রাদি নিম্নস্তরের হিন্দুদের সমপর্য্যায়ভুক্ত হইয়া পড়ে এবং হিন্দুদের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া হিন্দু-সমাজে মিশিয়া যায়। তখনকার যুগে জাতিভেদ এত কঠোর ও অলঙ্ঘনীয় ছিল না। সমাজে তখন অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত ছিল। মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্তের সহিত যবন (গ্রীক) রাজকন্যার বিবাহ, শকরাজ

বর্ণাশ্রমের সংস্কার

ম্লেচ্ছগণ

নব ক্ষত্রিয়

বৈদেশিক জাতিসমূহের হিন্দু সমাজে প্রবেশ

ম্লেচ্ছ রুদ্রদামনের কন্যার সহিত ব্রাহ্মণ সাতবাহন রাজকুমারের বিবাহ, চেদিরাজ লক্ষ্মীকর্ণের সহিত "ম্লেচ্ছ" হূণ রাজকুমারীর বিবাহ, এবং তাঁহার দুই কন্যার সহিত বৌদ্ধরাজ ৩য় বিগ্রহপাল ও বৈষ্ণব-রাজ জাতবর্ম্মার বিবাহ, প্রভৃতি ব্যাপার হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, তখনকার হিন্দুসমাজ অনুদার ছিল না। কালক্রমে বিভিন্ন জাতির পরস্পর-সংমিশ্রণ, অবাধ অসবর্ণবিবাহ, প্রভৃতির ফলে সমাজে অনেক উপজাতির উৎপত্তি হইলে নূতন করিয়া সমাজ-বন্ধনের প্রয়োজন উপস্থিত হয়। কঠিনতর সমাজবন্ধনের ফলে জাতিভেদের কঠোরতা বৃদ্ধি পাইল, সমাজে কঠোর বিধিনিষেধ প্রবর্ত্তিত হইল। সংখ্যালঘিষ্ঠ ব্রাহ্মণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতি এবং সংখ্যা-গরিষ্ঠ ব্রাহ্মণেতর জাতিসমূহ নিকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত হইল। বিভিন্ন জাতির মধ্যে পরস্পর বৈবাহিক সম্বন্ধ ও সামাজিক আদানপ্রদান প্রায় রহিত হইল এবং নিম্নজাতীয়েরা উচ্চবর্ণ কর্ত্তৃক ঘৃণ্য ও অস্পৃশ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে লাগিল। একাদশ শতাব্দীতে সুলতান মামুদের সঙ্গে অল্‌বিরুণী ভারতবর্ষে আসেন। তাঁহার বিবরণ হইতে আমরা জানিতে পারি যে, তখন নানাবিধ কঠোর বিধি-নিষেধের ফলে হিন্দুসমাজ অতিশয় সঙ্কীর্ণ, দুর্ব্বল ও পরস্পরবিরোধী হইয়া পড়িয়াছিল। হিন্দুগণ বিদেশীদের ম্লেচ্ছ জ্ঞান করিয়া তাহাদের সহিত মিশিতে চাহিতেন না, এমন কি বিদেশীকে অপবিত্র-জ্ঞানে তাঁহারা হিন্দুধর্ম্মে শিক্ষাদীক্ষাও দিতেন না।

জাতিভেদের কঠোরতা

অস্পৃশ্যতা

সঙ্কীর্ণতা

সমাজে নারীজাতির স্থান।—বৈদিকযুগ হইতে হিন্দু-সমাজে নারীজাতি যথেষ্ট মর্য্যাদা লাভ করিয়া আসিয়াছেন। পরবর্ত্তী যুগেও তাঁহাদের মধ্যে অনেকে রাজ্ঞী, সেনানায়িকা, প্রাদেশিক শাসনকর্ত্রী; প্রভৃতি দায়িত্বপূর্ণপদে যোগ্যতার সহিত কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। সে যুগে নারীরা নৃত্যবিদ্যা, চিত্রাঙ্কন, নাট্যশিল্প, প্রভৃতি নানাবিধ বিদ্যা ও চারুকলায় উচ্চশিক্ষা লাভ করিতেন এবং প্রকাশ্য জনসভায় নিজেদের কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতেন। তবে পরবর্ত্তী কালে 'স্মৃতিকার'দের কঠোর বিধিনিষেধের ফলে নারীজাতির শিক্ষা ও স্বাধীনতা ক্রমেই ক্ষুণ্ণ হইতে থাকে। বাল্যবিবাহ-প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে দেশ হইতে স্বয়ংবরপ্রথা বিলুপ্ত হয় এবং কালক্রমে বিধবাবিবাহও লোপ পায়। এ যুগের শেষের

নারীজাতির অবস্থা

দিকে বিধবার সহমরণ ও অনুমরণের প্রথাও বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ করে। সমাজের অর্দ্ধাঙ্গিনী নারীর অবনতির সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র হিন্দুজাতি দুর্ব্বল ও পরপদানত হইয়া পড়িল।

স্বয়ংক্রিয় গ্রাম

শাসনপ্রণালী।—স্মরণাতীত কাল হইতেই ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মূল ভিত্তি ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বাবলম্বী গ্রামগুলি। প্রত্যেকটি গ্রাম আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে প্রায় সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিল,—গ্রামের মধ্যে শিক্ষাদীক্ষার প্রসার, জনকল্যাণ-সাধন, প্রভৃতি সকল প্রকার কাজ গ্রামিক সমাজপতিদের দ্বারাই অনুষ্ঠিত হইত। গ্রামের প্রধান ব্যক্তির নাম ছিল "গ্রামপতি" বা "মোড়ল"। সে যুগের রাজ্যগুলি বর্ত্তমান কালেরই ন্যায় বিভাগ, জেলা, মহকুমা ও থানাতে বিভক্ত ছিল। এই সকল বিভিন্ন বিভাগগুলি "ভুক্তি", "বিষয়", "মণ্ডল" ও "ভোগ" নামে অভিহিত হইত। "উপরিক" "বিষয়পতি","মণ্ডলেশ্বর","ভোগপতি"উপাধিধারী রাজকর্ম্মচারিগণ যথাক্রমে এই সকল বিভাগ শাসন করিতেন। রাজ্যের প্রত্যন্ত-দেশের (frontier) শাসনভার সাধারণতঃ "মহাসেনাপতি" বা "মহাদণ্ডনায়ক"-আখ্যাধারী সামরিক কর্তৃপুরুষের উপর ন্যস্ত হইত। যে সকল রাজ্যের নৌবহর ছিল, সেখানে ইহার শাসন-ভার "নৌকাধ্যক্ষ" নামক রাজকর্ম্মচারীর হস্তে ন্যস্ত থাকিত। ইহা ব্যতীত "মহাসন্ধিবিগ্রহিক" (যুদ্ধ ও সন্ধি প্রভৃতি বিষয়ের মন্ত্রী), "মহাবলাধিকৃত" (প্রধান সেনাপতি), প্রভৃতি প্রধান প্রধান রাজকর্ম্মচারিগণ শাসনকার্য্যে রাজার সহায়তা করিতেন। বিচার-বিভাগ 'মহাধর্ম্মাধ্যক্ষ' নামক কর্ম্মচারী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইত। অনেক সময় ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যে রাজকর্ম্মচারিগণ ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হইতেন কিন্তু রাষ্ট্রশাসনের মূলনীতি একই ছিল।

বিভিন্ন রাজনৈতিক বিভাগ

বিভিন্ন রাজকর্ম্মচারী

হিন্দুমনীষা

জ্ঞানভাণ্ডার।—অতি প্রাচীনকাল হইতেই হিন্দুগণ শিক্ষায় ও সভ্যতায় বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করেন। হিন্দুর সর্ব্বপ্রাচীন সাহিত্য বেদের কথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। পৌরাণিক যুগে রামায়ণ, মহাভারত, বিবিধ পুরাণাদি, ভক্তিশাস্ত্র, তন্ত্র ও স্মৃতিগ্রন্থসকল রচিত হইয়া ভারতের জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিয়াছে। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মগ্রন্থসমূহও ভারতীয় সাহিত্য ও দর্শনকে পরিপুষ্ট করিয়াছে। ধর্ম্ম-গ্রন্থ ব্যতীত মৌর্য্য, গুপ্ত ও গুপ্তোত্তরযুগে বহু কাব্য, নাটক, পুরাণ,

উপন্যাস, দর্শন, বিজ্ঞান, গণিত, শিল্পশাস্ত্র, ইতিহাস ও রাজনীতি-বিষয়ক গ্রন্থাদি রচিত হইয়া প্রাচীন ভারতের সাহিত্যকে পুষ্ট করিয়াছে এবং হিন্দুমনীষার চরমোৎকর্ষের পরিচয় দিয়াছে।

মৌর্য্য ও গুপ্তযুগের জ্ঞানোন্নতির কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। গুপ্তযুগের ন্যায় গুপ্তোত্তরযুগও সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, ললিতকলা, প্রভৃতির জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ। এ-যুগের অগণিত সাহিত্যিকের মধ্যে ভবভূতি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তিনি নাটকরচনায় যে অদ্ভুত প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন, সংস্কৃত সাহিত্যে এক কালিদাস ব্যতীত আর কেহই সেরূপ পারেন নাই,—সংস্কৃত-সাহিত্যিকগণের মধ্যে কালিদাসের পরই ভবভূতির স্থান। এ-যুগের অন্যান্য নাট্যকারগণের মধ্যে শ্রীহর্ষ, রাজশেখর, কৃষ্ণমিশ্র, মহেন্দ্রবর্ম্মা, প্রভৃতির নাম আজিও অমর হইয়া আছে। এ-যুগেই আবার ভারবি, মাঘ, শ্রীহর্ষ, প্রভৃতি কবিগণ মহাকাব্য রচনা করিয়া অক্ষয় যশের অধিকারী হইয়া গিয়াছেন। গীতিকবিদের মধ্যে ভর্ত্তৃহরি ও বঙ্গের জয়দেবের নাম সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। গদ্যরচনায় বাণভট্ট, সুবন্ধু ও দণ্ডী সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। গুপ্তোত্তরকালের সাহিত্যের বিশেষত্ব ছিল ঐতিহাসিক গ্রন্থরচনা। ঐতিহাসিক লেখকদের মধ্যে "হর্ষচরিত"-রচয়িতা বাণভট্ট, "গৌড়বহো" লেখক বাক্‌পতিরাজ, "রাজতরঙ্গিনী"-প্রণেতা কহ্লণ, "বিক্রমাঙ্ক চরিত"এর কবি বিহ্লন এবং "রামচরিত"-লেখক সন্ধ্যাকর নন্দী সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। এ-যুগের আর একটি বৈশিষ্ট্য লৌকিক ভাষার শ্রীবৃদ্ধি। লৌকিক ভাষার সাহিত্যিকদের মধ্যে "পৃথ্বিরাজ রাসো"-প্রণেতা কবি চাঁদ বরদাই, গীতার মারাঠা-টীকাকার জ্ঞানেশ্বর, "বৌদ্ধগান ও দোঁহা"-রচয়িতা বাঙ্গালী কাহ্নপাদ, লুইপাদ প্রভৃতি এবং তামিল "তিরুবাহসম্"-প্রণেতা মাণিক্ক বসহর ও কানাড়ী মহাভারতের কবি পম্পা সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ।

নাট্য-সাহিত্য

কাব্য সাহিত্য

গদ্যসাহিত্য

ঐতিহাসিক সাহিত্য

লৌকিক ভাষা

দর্শনশাস্ত্রের ভাষ্যকারগণের মধ্যে উদ্যোতকর, কুমারিল ভট্ট, বাচস্পতিমিশ্র, শঙ্করাচার্য্য ও রামানুজ গুপ্তোত্তর যুগেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন। জ্যোতিষশাস্ত্রের এ-যুগের মনস্বিবৃন্দের মধ্যে "সিদ্ধান্ত শিরোমণি" নামক গ্রন্থের রচয়িতা ভাস্করাচার্য্যের নাম সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য।

দর্শনশাস্ত্র

জ্যোতিষী - ভাস্করাচার্য্য

আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রেও হিন্দুগণ অসামান্য প্রতিভা দেখাইয়াছেন।

আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র

সুশ্রুত ও চরকের নাম পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। বাগ্ভট্ট, মাধবকর, চক্রপাণি দত্ত, প্রভৃতি গুপ্তোত্তরযুগে নানা চিকিৎসাগ্রন্থ রচনা করিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের কোন কোন রচনা ফার্সী ও আরবী ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল।

নালন্দা, বিক্রমশিলা, কাশী, কাঞ্চী, তক্ষশীলা, উজ্জয়িনী, ধারা, নবদ্বীপ

শিক্ষা।—হিন্দু-সভ্যতার যুগে ভারতে শিক্ষারও বিশেষ সুবন্দোবস্ত ছিল। নালন্দা, বিক্রমশিলা, সোমপুর, উদ্দণ্ডপুর, প্রভৃতি শিক্ষাকেন্দ্রের কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। কাশী, কাঞ্চী, তক্ষশিলা, উজ্জয়িনী, ধারা, নবদ্বীপ, প্রভৃতি বড় বড় নগরগুলিও বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায় ছিল। হিন্দু-রাজগণ সকলেই নিজ নিজ রাজ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য অপরিসীম যত্ন ও অর্থব্যয় করিতেন এবং শিল্পী, কলাবিৎ ও পণ্ডিতদের প্রকৃত মর্য্যাদা দিতেন।

বুদ্ধদেব কপিলবস্তুতে প্রত্যাগমন করিলে গোপা পুত্র রাহুলকে পিতৃধন যাচ্ঞা করিতে উপস্থাপিত করিতেছেন। (অজন্তাচিত্র)

শিল্পকলা।—মৌর্য্য ও গুপ্তযুগের শিল্পকলাসম্বন্ধে পূর্ব্বেই কিছু কিছু উল্লেখ করা হইয়াছে।* গুপ্তোত্তরযুগেও ভারতীয় শিল্পকলা যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছিল। পল্লব, চালুক্য, চোল, রাষ্ট্রকূট, পাল, উৎকল, প্রভৃতি বিভিন্ন রাজবংশের অনেক রাজাই চিত্র, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যশিল্পে নিজেদের নাম অক্ষয় করিয়া গিয়াছেন। মামল্লপুরমের মন্দিরসমূহ এবং কাঞ্চীর সুপ্রসিদ্ধ কৈলাসনাথের মন্দির পল্লব-

স্থাপত্য

পল্লব

* ষষ্ঠ ও অষ্টম অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

স্থাপত্যরীতির চরম উৎকর্ষের পরিচয়। রাষ্ট্রকূটরাজ ১ম কৃষ্ণ ছিলেন ইলোরার বহুবিখ্যাত পর্ব্বতখোদিত মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা; ইলোরার এই বিরাট মন্দির রীতিবৈচিত্র্যে ও সৌন্দর্য্যে বোধ হয় অতুলনীয়। স্থাপত্যশিল্পে ইলোরা এবং চিত্রশিল্পে অজন্তা প্রাচীন ভারতের তথা এশিয়ার ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া আছে। অজন্তাগুহার চিত্রাবলী গুপ্তযুগের অমর কীর্ত্তি; ইলোরার হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন মন্দিরগুলি গুপ্তোত্তরযুগের শ্রেষ্ঠ অবদান। চালুক্যরাজ ২য় বিক্রমাদিত্য-রচিত পট্টডকলের বিরূপাক্ষ মন্দিরের তুলনা খুব কমই মিলে। দোরসমুদ্র (হলেবীদ), সোমনাথপুর ও বেলুড়ে (মহীশূরের অন্তর্গত) হোয়সল রাজারাও অনেকগুলি মনোরম দেবায়তন নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন; তাঞ্জোরের চোল এবং মাদুরার পাণ্ড্য নৃপতিগণও পরম শিল্পানুরাগী ছিলেন। বিভিন্ন রাজবংশের স্থাপত্যরীতির মধ্যে যথেষ্ট বিশেষত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। উত্তর-ভারতের স্থাপত্যশিল্পের মধ্যে খজুরাহো (বুন্দেলখন্দ), ভুবনেশ্বর (উড়িষ্যা), কোণারক (উড়িষ্যা), এবং আবু পাহাড়ের (রাজপুতনা) জৈনমন্দির ও দেবায়তনসমূহ সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। এই সকল মন্দিরের গঠনরীতির সহিত দাক্ষিণাত্যের শিল্পরীতির অনেক পার্থক্য আছে; দ্রবিড়শিল্পে যেমন গোপুরম্ তেমনি মন্দিরচূড়া বা শিখরশোভা উত্তরাপথের স্থাপত্যশিল্পে নানা বিশেষত্বের মধ্যে অন্যতম। স্থাপত্যশিল্পের সহিত দেশে তখন ভাস্কর্য্যেরও যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। বিহার, মঠ, নাটমন্দির ও দেবায়তনসমূহ বিবিধ মূর্ত্তি ও মণ্ডনশিল্পে পরম রমণীয় হইয়াছিল। এক একটি বিখ্যাত মন্দির যেন এক-একখানি সচিত্র পুরাণ; রামায়ণ, মহাভারত, অবদান, জাতক, কল্পসূত্র, প্রভৃতি হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মগ্রন্থের ও মহাপুরুষগণের বিচিত্র জীবনীর আখ্যায়িকা এই সকল মন্দিরগাত্রে যেন জীবন্ত রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল। কিন্তু সেকালের শিল্পীরা সাধারণ সমাজ-জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন ছিলেন না, সমসাময়িক দৈনন্দিন জীবনের নানা উপাদান তাঁহারা প্রস্তরগাত্রে ও ভিত্তিচিত্রে অক্ষয় করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। পালযুগে বঙ্গদেশে এক অভিনব ভাস্কর্য্য ও চিত্ররীতি

রাষ্ট্রকূট

চালুক্য

হোয়সল

চোল-পাণ্ড্য

উত্তর-ভারত

ভাস্কর্য্য

গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই শিল্পকলার প্রভাব শুধু পালসাম্রাজ্যের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না, সুদূর ব্রহ্মদেশ, নেপাল ও তিব্বত হইয়া মধ্য এসিয়া ও চীনদেশেও প্রসারিত হইয়াছিল।

অর্থ নৈতিক অবস্থা।—ভারতের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনে ছিল অনৈক্য কিন্তু অর্থনৈতিক অবস্থায় ছিল প্রভূত উন্নতি। সমৃদ্ধিশালী দেশ বলিয়া ভারত জগতের নিকট পরিচিত ছিল। শুধু রাজন্য ও জমিদারশ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ না হইয়া ধনসম্পদ্ সাধারণের মধ্যেও বণ্টিত হইত। তাই যুগে যুগে সাধারণ ভারতবাসীর প্রাচুর্য্য ও ঐশ্বর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া বৈদেশিক আক্রমণকারিগণ ধনলুণ্ঠনের অভিপ্রায়ে এদেশে বারবার উপস্থিত হইয়াছে।

ভারতের ঐশ্বর্য

বৈদেশিক আক্রমণ ও লুণ্ঠন

গজনীর সুলতান মামুদ সে ঐশ্বর্য্য হস্তগত করিবার জন্য বারবার ভারত আক্রমণ করিয়াছেন। তিনি ভারতের বিভিন্ন স্থান লুণ্ঠন করিয়া যে অপরিমিত ঐশ্বর্য্য স্বদেশে লইয়া যান তাহা হইতে আমরা ভারতের বিপুল বৈভবের আংশিক পরিচয় লাভ করি। কথিত আছে, তিনি একমাত্র নগরকোট (কাংড়া) হইতেই সাতলক্ষ স্বর্ণমুদ্রা, দুইশত মণ স্বর্ণ, দুই সহস্র মণ রৌপ্য, সাতশত মণ স্বর্ণ ও রৌপ্যপাত্র এবং বিশ মণ মণিমুক্তা ও হীরক লইয়া যান। পরবর্ত্তীকালে সুলতান আলাউদ্দীন যাদবরাজ্য জয় করিয়াও অপরিমিত ধনরত্ন লাভ করিয়াছিলেন। দেশে তখন প্রচুর শস্য উৎপাদিত হইত; দুর্ভিক্ষ কদাচিৎ দেখা যাইত। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি ও নৈসর্গিক বিপদ্ হইতে দেশকে রক্ষার জন্য প্রতি রাজ্যে বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইত এবং প্রজাসাধারণের কল্যাণের দিকে শাসকবর্গের ও রাজার সর্ব্বদা দৃষ্টি থাকিত। কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য সর্ব্ববিষয়েই তখন দেশ উন্নত ছিল। জাতক, ধর্ম্মশাস্ত্র ও অর্থশাস্ত্রের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, ভারতীয় বণিক্‌গণ স্থলপথে এবং সমুদ্রপথে দূর দূর দেশে বাণিজ্য করিতে যাইতেন। এরূপে বহির্ব্বাণিজ্যের দ্বারা অভিজ্ঞতা ও প্রচুর অর্থলাভ হইত। ইহার ফলে গ্রামবাসী সাধারণ লোকেও সুখেস্বচ্ছন্দে সামাজিক জীবন যাপন করিত। শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দেশের নানাস্থানে পত্তন বা বন্দর ও হর্ম্ম্যমালাসুশোভিত বড় বড় নগর স্থাপিত হইত। নগরগুলি ব্যবসাবাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র ছিল। তখনকার দিনে গ্রামে ও নগরে বণিক্‌গণ

শস্যসম্পদ

কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য

সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া বাস করিতেন এবং তাহাকে 'নিগম' বা শ্রেণী (guild) নামে অভিহিত করা হইত। প্রাচীনযুগে আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের সুবিধার জন্য সুবিস্তীর্ণ স্থলপথ ও জলপথ উন্মুক্ত করা হইয়াছিল।

বণিক সঙ্ঘ বা 'শ্রেণী'

বাণিজ্যবিস্তার।—স্মরণাতীত কাল হইতে ভারতকে কেন্দ্র করিয়া পূর্ব্ব ও পশ্চিম উভয়দিকেই বাণিজ্য চলিত। এই বাণিজ্যে জলপথ ও স্থলপথ দুইই ব্যবহার করা হইত। এই সকল বাণিজ্য-পথ ধরিয়া ভারতীয় সভ্যতা দূরদূরান্তে বিস্তৃত হইয়া পড়ে।

বহির্বাণিজ্য

বাণিজ্যপথ-সমূহ

স্থলপথে একদিকে আফগানিস্থান, খোটান, কুচা, তুরফান্ ও মধ্যএশিয়া দিয়া চীন ও তাহার সন্নিহিত দেশসমূহ এবং অন্যদিকে পারস্য, বাবিলন ও পশ্চিম-এশিয়ার সহিত ভারতের শিল্পবাণিজ্যের আদানপ্রদান চলিত। এই পথেই মধ্যএশিয়ায়, চীনে, কোরিয়াতে ও জাপানে বৌদ্ধধর্ম্ম ও ভারতীয় সভ্যতা বিস্তার লাভ করে।

স্থলপথ

সামুদ্রিক বাণিজ্যেও হিন্দুগণ সুদূর অতীতে বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করেন। বঙ্গদেশের তাম্রলিপ্তি ছিল সে যুগের একটি প্রধান বন্দর। এই স্থান হইতে ভারতীয় বণিক্‌গণ জাহাজে করিয়া ব্রহ্মদেশ, মালয়, শ্যাম, কাম্বোজ, প্রাচ্য দ্বীপপুঞ্জ (সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বোর্ণিও, সেলিবিস্) ইত্যাদি ও সুদূর চীন পর্য্যন্ত বাণিজ্য করিতে যাইতেন। পশ্চিমে আরবসাগর দিয়া ভারতীয় বণিকেরা আরব ও পারস্যের উপকূলে পৌঁছিতেন এবং সেখান হইতে পূর্ব্ব-আফ্রিকা, পশ্চিম-এশিয়া ও ভূমধ্যসাগরের বন্দরগুলিতে পণ্য লইয়া যাইতেন। সেখান হইতে আবার ভারতীয় পণ্যসম্ভার মিশর, গ্রীস্ ও রোম পর্য্যন্ত চালান যাইত। সে যুগে উত্তরে উজ্জয়িনী ও দক্ষিণে ভৃগুকচ্ছ (বরোচ) এবং পাণ্ড্যদেশের কায়ল নগর ছিল পাশ্চাত্য বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র। কার্পাস বস্ত্র, সূক্ষ্ম মস্‌লিন, রেশমী বস্ত্র, নীল ও বিভিন্ন রং, নানাবিধ মশলা, চিনি, আদা, হীরা এবং অন্যান্য মূল্যবান্ প্রস্তর, প্রধান রপ্তানি দ্রব্য ছিল। পিতল, টিন, প্রভৃতি প্রধান আমদানি দ্রব্য ছিল। রোমান লেখক Pliny (খৃঃ ১ম শতক) আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছেন যে, প্রতি-বৎসর নানা মূল্যবান্ সামগ্রীর বিনিময়ে হিন্দুবণিক্‌গণ রোম-সাম্রাজ্য দোহন করিয়া অপরিমেয় অর্থ লইয়া দেশে ফিরিতেন।

জলপথ

পণ্যসম্ভার

উপনিবেশ-স্থাপন ও সভ্যতাবিস্তার।—বাণিজ্যের সূত্র

ধরিয়া প্রাচীন ভারতীয়গণ নানাদেশে অনেক উপনিবেশও গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। এই উপনিবেশগুলিকে কেন্দ্র করিয়া ভারতীয় শিল্প, সভ্যতা ও সংস্কৃতি দেশে দেশে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। বৌদ্ধযুগে বিদেশে ভারতীয় সভ্যতা ও ধর্ম্মপ্রচারের কাহিনী সর্ব্বজনবিদিত। ব্রহ্মদেশ ও মালয়ে, ইন্দোচীনের অন্তর্গত চম্পা, কাম্বোজ ও শ্যামরাজ্যে এবং সুমাত্রা, যবদ্বীপ, ফিলিপিন ও মালয়েশিয়ায় বহু হিন্দুউপনিবেশ এবং সম্ভবতঃ হিন্দুরাজত্বও স্থাপিত হইয়াছিল। এই সকল দেশে কলিঙ্গ, দ্বারাবতী, অমরাবতী, বিজয়পুর, অযোধ্যা, শ্রীবিজয়, প্রভৃতি প্রসিদ্ধ স্থান ভারতীয় রাজ্য ও নগরের নামানুসারে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ভারতের সহিত দক্ষিণ-এশিয়া ও পূর্ব্ব-এশিয়ার ঘনিষ্ঠ-সংযোগের সাক্ষ্য দান করিতেছে। এই সকল উপনিবেশে সংস্কৃত ও প্রাকৃতাদি ভাষায় লিখিত বহু অনুশাসনলিপি ও দলিলপত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহা হইতে জানা যায় যে, উপনিবেশসমূহে রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, ধর্ম্মশাস্ত্র, দর্শন, ব্যাকরণ, জাতক, বুদ্ধ-চরিত, প্রভৃতি গ্রন্থসমূহ বিশেষ সমাদর ও শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম্ম এখানে বিশেষ প্রসার লাভ করে। যবদ্বীপের "বোরো বুদুর"এর সুবিখ্যাত বৌদ্ধমন্দির ও তাহার অপূর্ব্ব ভাস্কর্য্য ভারতীয় শিল্পীগণের অক্ষয়কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। কাম্বোজের "আঙ্কোর-ভাট'এর বিশাল বিষ্ণুমন্দির হিন্দুসভ্যতার গৌরবের সাক্ষীস্বরূপ আজিও জগতের বিস্ময় উৎপাদন করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। ইহা ব্যতীত অন্যান্য বহু সংস্কৃতির নিদর্শন হিন্দুপ্রভাবের পরিচয় দিতেছে। এই সকল উপনিবেশে ভারতীয় নামধারী ও হিন্দু-সভ্যতাবলম্বী রাজবংশ রাজত্ব করিয়াছেন। এই সকল রাজবংশের মধ্যে সুমাত্রার "শৈলেন্দ্র বংশ" সর্ব্বপ্রধান। "শ্রীবিজয়" ইঁহাদের রাজধানী ছিল। অষ্টম শতকের শেষভাগে যবদ্বীপ, সুমাত্রা, মালয়েশিয়া ও পূর্ব্ব-উপদ্বীপের অনেক স্থানে শৈলেন্দ্রবংশের প্রভুত্ব বিস্তৃত হয়। প্রায় পঞ্চদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত যবদ্বীপে হিন্দুরাজত্ব বর্ত্তমান ছিল। মুসলমান আক্রমণের সময়, সেখান হইতে হিন্দুগণ বলীদ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং এখনও বহু হিন্দু বলীদ্বীপে আছেন; যদিও ইন্দো-নেশিয়ার বেশীর ভাগ অধিবাসী এখন মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে।

চম্পা, কাম্বোজ, শ্যাম, সুমাত্রা, যবদ্বীপ

বিদেশে হিন্দুরাজ্য

ধর্ম্মপ্রচার

শিল্পাদি

STUDIES AND QUESTIONS

1. Write a short account of the social, political and economic condition of India in the post-Gupta period.

2. Give an account of the progress in Art and Architecture during the post-Gupta period

3. Give an account of Pauranic Hinduism and compare it with the Vedic religion.

পঞ্চদশ অধ্যায়

ভারতে মুস্‌লিম শক্তির অভ্যুদয়

হজরৎ মুহম্মদ ও ইস্‌লামধর্ম্ম।—ইস্‌লামধর্ম্মের প্রবর্ত্তক হজরৎ মুহম্মদ আরবের সুবিখ্যাত কোরেশবংশে জন্মগ্রহণ করেন (আঃ ৫৭০ খৃঃ)। কিশোর বয়স হইতে আরব বণিক্‌গণের সহিত মিশর, আবিসিনিয়া, সিরিয়া, পারস্য, প্রভৃতি দেশে গমনাগমন করায় নানাধর্ম্ম ও নানাজাতির সহিত তাঁহার মিশিবার সুযোগ হইয়াছিল। আরবদেশ তখন ছিল পৌত্তলিকতার লীলাভূমি; তদুপরি বিভিন্ন সম্প্রদায় প্রায় সর্ব্বদাই ধর্ম্মকলহে লিপ্ত থাকিত। মুহম্মদ পৌত্তলিকতা বিলোপ করিয়া পরস্পর বিবদমান সম্প্রদায়গুলিকে একসূত্রে বাঁধিতে চেষ্টা করিয়া এক নূতন ধর্ম্মমত প্রচার করেন। তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের নাম "ইস্‌লাম"। ইস্‌লামের মূল কথা হইল "আল্লা এক এবং অদ্বিতীয়", "মুহম্মদ আল্লাপ্রেরিত শেষ পয়গম্বর (ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক)" এবং "আল্লার নিকট উচ্চনীচ, ধনীনির্ধন নির্ব্বিশেষে সকল মুস্‌লিমই সমান।" মুহম্মদের উপদেশাবলীর নাম "**হাদিস্‌**"; আর যে সকল ঐশীবাণী তাঁহার চিত্তপটে আবির্ভূত হইত তাহাই পবিত্র "**কুর-আন্‌**" (কোরাণ) নামক ধর্ম্মগ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে। এই নূতন ধর্ম্মের প্রচারে মক্কায় প্রবল বিক্ষোভের সঞ্চার হয় এবং ৬২২ খৃঃ অব্দে মুহম্মদ মক্কা ত্যাগ করিয়া মদিনায় আশ্রয় লইতে বাধ্য হন। মুহম্মদের মক্কাত্যাগের সময় হইতেই "**হিজ্‌রা**" অব্দ গণনা করা

আরব দেশে পৌত্তলিকতা ও ধর্ম্মকলহ

ইস্‌লাম ধর্ম্মের মূল উপদেশ

মদিনায় গমন ও হিজ্‌রা সাল

হইয়া থাকে। মদিনার অধিবাসীরা সাগ্রহে তাঁহার ধর্ম্মমত গ্রহণ করিলে মুহম্মদ মদিনা হইতে প্রথম "মুস্‌লিম"বাহিনী লইয়া মক্কায় প্রবেশ করেন। মক্কায় ইস্‌লামধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করিয়া মুহম্মদ আরবের অন্যান্য স্থানেও তাঁহার ধর্ম্মমত প্রচার করিতে লাগিলেন। ৬৩২ খৃঃ অব্দের জুন মাসে যখন এই অদ্ভুতকর্ম্মা ঈশ্বরভক্ত মহাপুরুষ মানবলীলা সংবরণ করেন তখন আরবের প্রায় সমুদয় অধিবাসী তাঁহার ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছে।

মক্কায় প্রত্যাবর্ত্তন ধর্ম্মপ্রচার

মৃত্যু

মুহম্মদ আরবজাতির মধ্যে এক অভূতপূর্ব্ব অনুপ্রেরণার সঞ্চার করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর আরবগণ দিকে দিকে ইস্‌লামের বাণী প্রচারের উদ্দেশ্যে দিগ্বিজয়ে মনোনিবেশ করেন। এই সময় **"খলিফা"** বা ধর্ম্মগুরুপদের সৃষ্টি হয়। তাঁহাদের নেতৃত্বে আরবগণ একদিকে মিশর জয় করিয়া উত্তর-আফ্রিকার মধ্য দিয়া ইউরোপের স্পেনদেশে প্রবেশ করেন, অপর দিকে সিরিয়া, প্যালেষ্টাইন, ইরাক বা বাবিলন, পারস্য ও ভারতবর্ষের সিন্ধুদেশ পর্য্যন্ত তাঁহাদের অধিকার বিস্তৃত হয়। এইভাবে আরবের স্থানীয় ধর্ম্ম ক্রমশঃ বিশ্বপ্রসারী সার্ব্বজনীন ধর্ম্মে বিকাশ লাভ করে।

খলিফা-পদ ও আরব জাতির দিগ্বিজয়

মুহম্মদ বিন্ কাশিমের সিন্ধুজয়।—অষ্টম শতকের প্রথম দিকে ইরাকের আরব শাসনকর্ত্তা হজ্জাজ খলিফার সম্মতিক্রমে সিন্ধুদেশ আক্রমণ করেন। সিন্ধুর দেবল নামক বন্দরে একদল জলদস্যু আরব বণিকদের কয়েকখানা বাণিজ্যতরী লুণ্ঠন করেন এবং সেজন্য হজ্জাজ সিন্ধুরাজ দাহিরের নিকট ক্ষতিপূরণ দাবি করিলে, দাহির সে দাবী অস্বীকার করিলেন। ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া হজ্জাজ দাহিরের রাজ্য আক্রমণ করেন। দাহিরের পরাক্রমে পর পর দুইবার তাঁহার আক্রমণ ব্যর্থ হইয়া যায়। তৃতীয়বার হজ্জাজ যে অভিযান প্রেরণ করেন তাহার সেনাপতি ছিলেন মুহম্মদ বিন্ কাশিম (অর্থাৎ কাশিমের পুত্র মুহম্মদ) নামে এক সপ্তদশবর্ষীয় তরুণ যুবক। দাহিরের সেনাপতিদের অনেকেই সঙ্কটকালে বিশাল আরববাহিনীর সঙ্গে গিয়া যোগদান করিল; সিন্ধুদেশের বৌদ্ধগণও ব্রাহ্মণরাজা দাহিরের সঙ্গে সহযোগিতা না করিয়া বিদেশীদের সাহায্য করিতে লাগিল। দাহির রণক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন দিলে তাঁহার মহিষী অমিতবিক্রমে যুদ্ধ চালাইয়াও শেষ রক্ষা করিতে পারিলেন

হজ্জাজ ও দাহির

মুহম্মদ বিন্ কাশিম ও

দাহিরের পরাজয়

না। মুহম্মদ সিন্ধুদেশ জয় করিলেন (৭১১—'১২ খৃঃ); ক্রমে মূলতান পর্য্যন্ত তাঁহার অধিকারভুক্ত হয়। কিন্তু আরবগণ আর অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই। বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মাবলম্বীগণের মধ্যে বিরোধ সে যুগে কতটা তীব্র ছিল তাহা সঠিক নির্ণয় করা শক্ত। কিন্তু মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যে তাহার স্পষ্ট আভাষ পাওয়া যায়। "ধর্ম্মমঙ্গল"-গ্রন্থের বৌদ্ধলেখক মুসলমান বিজেতাদের হিন্দুদলনকে যেন ইতিহাসের ন্যায়বিচার বলিয়াই প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে, সেই নির্ম্মম দলননীতি হইতে বৌদ্ধবিহার, মন্দির এবং বিক্রমশীলা ও জগদ্দলের মত বৌদ্ধ-বিশ্ববিদ্যালয়ও নিষ্কৃতি পায় নাই।

ভারতে আরব-অধিকার

আরব শাসনকালে হিন্দু ও আরবগণ সিন্ধুদেশে একত্র সদ্ভাবের সঙ্গে বসবাস করিতে লাগিল। মুসলমান শাসকগণ হিন্দুকর্ম্মচারী-দের হাতেই রাজস্বআদায় প্রভৃতি কাজের ভার ন্যস্ত করিতেন এবং হিন্দুদের ধর্ম্মানুষ্ঠানেও তাঁহারা কোনরূপ বাধার সৃষ্টি করেন নাই। তাঁহারা ভারতীয় গণিত, জ্যোতিষ, আয়ুর্ব্বেদ ও দর্শন-সম্বন্ধে নূতন জ্ঞান লাভ করিয়া, তাহা স্বদেশে প্রচার করেন; সেখান হইতে উহা ইউরোপে প্রচার লাভ করে।

সিন্ধুদেশে হিন্দু ও আরবের সদ্ভাব

আরবদের দ্বারা ইউরোপে হিন্দু-বিদ্যাপ্রচার

তুর্কমোঙ্গল-অধিকার

হজরত মুহম্মদের মৃত্যুর পর আরবগণ ইউরোপে স্পেনদেশ হইতে ভারতের সিন্ধুপ্রদেশ পর্য্যন্ত বিশাল ভূভাগ জয় করিয়া ইস্‌লাম-রাষ্ট্রতন্ত্র ইউরোপ, আফ্রিকা ও এসিয়ায় সুপ্রতিষ্ঠিত করে। খলিফাগণ দুইভাগে বিভক্ত ছিলেন: (১) উমিয়াদবংশ ও (২) আব্বাসিদ বংশ। প্রায় তিন শতাব্দী ধরিয়া (৬৩২—৯৬২) আরব-প্রভাব সর্ব্বত্র বিজয়ী হওয়ার পর, তুর্কমোঙ্গল, পারসিক ও আফ্‌গান, প্রভৃতি অন্য জাতিসঙ্ঘ ইস্‌লামধর্ম্ম-প্রসারের আগ্রহে ক্রমশঃ নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে থাকে।

আব্বাসিদ খলিফাদের প্রভাবপ্রতিপত্তি ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে লাগিলে, আরব-কর্ত্তৃক নবদীক্ষিত নানাজাতীয় মুসলমান-ধর্ম্মাবলম্বীরা জাতীয়তাবোধে ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ হইতে লাগিল। এই সব নব নব জাতির রাজবংশ আরব-খলিফার অধীনতাপাশ

হইতে ধীরে ধীরে মুক্ত হইল। তাহাদের মধ্যে পারসিক সামানি-বংশই প্রধান। খলিফা সাম্রাজ্যের পূর্ব্বসীমান্তে তুর্কী-মঙ্গোলগণও অতিশয় শক্তিশালী হইয়া ওঠে।

অলপ্‌তিগীন

গজনীরাজ্য।—অলপ্‌তিগীন নামে একজন তুর্কী বীর সুলেমানপর্ব্বত-অঞ্চলে স্বাধীন গজনীরাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন (আঃ ৯৬২)। অলপ্‌তিগীন প্রথমে ছিলেন ক্রীতদাস, পরে নিজ কর্ম্মকুশলতায় পারস্যের সামানিরাজ্যের এক উচ্চ রাজকর্ম্মচারীর পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর কিছু পরে (আঃ ৯৭৭) তাঁহার তুর্কী ক্রীতদাস ও জামাতা সবুক্তিগীন গজনীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইস্‌লামের ঐক্যনীতি দাসকেও সিংহাসনের অধিকার দিত ইহা স্মরণীয় ঘটনা।

সবুক্তিগীন

সবুক্তিগীনের আক্রমণ।—স্মরণাতীত কাল হইতেই বর্ত্তমান আফগানিস্থানের কিয়দংশ ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত ছিল। দশম শতকের শেষভাগে উদভাণ্ডপুরের (বর্ত্তমান উন্দ) শাহিবংশীয় হিন্দু রাজারা বিশেষ পরাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। সবুক্তিগীনের সমসময়ে এই রাজ্যের রাজা ছিলেন জয়পাল; তাঁহার রাজ্যসীমা একদিকে কাশ্মীর হইতে মূলতান এবং আর একদিকে কাবুল পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সবুক্তিগীন গজনীর সিংহাসনে আরোহণ করিবার পূর্ব্বেই একবার এই শাহিরাজ্য এবং আরব-শাসিত মূলতান আক্রমণ করিয়াছিলেন; রাজপদ লাভ করিয়াও তিনি আর একবার শাহিরাজ্যের প্রত্যন্তভাগে প্রবেশ করিয়া লুঠতরাজ করেন। ইহাতে বিরক্ত হইয়া জয়পাল গজনীরাজ্য আক্রমণ করিলেন। কিন্তু দৈববিপাকে সৈন্যদল নিদারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পড়ায় জয়পালকে বাধ্য হইয়া সিন্ধুপারের রাজ্যখণ্ড সবুক্তিগীনের হাতে সমর্পণ করিবার সর্ত্তে সন্ধি ভিক্ষা করিতে হইল। কিন্তু স্বরাজ্যে ফিরিয়াই তিনি এই সন্ধি অস্বীকার করিলেন। সবুক্তি-গীনও তখন জয়পালকে সমুচিত শিক্ষাদানের অভিপ্রায়ে, এক বিরাট বাহিনীগঠনে মনোনিবেশ করিলেন। প্রমাদ গণিয়া জয়-পাল ভারতবর্ষের অন্যান্য অনেক রাজার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন; দিল্লী-আজমীর, কলিঞ্জর ও কনৌজ হইতে সাহায্য

শাহিরাজ্য

জয়পাল

সবুক্তিগীনের লুণ্ঠনাভিযান

জয়পালের গজনী আক্রমণ ও সবুক্তিগীনের সহিত সন্ধি

আসিল এবং জয়পাল এক বিরাট বাহিনী লইয়া গজনী আক্রমণ করিলেন, কিন্তু যুদ্ধে তাঁহারই পরাজয় হইল,—সবুক্তিগীন সিন্ধুর পশ্চিমতট পর্য্যন্ত সমগ্র ভূভাগ অধিকার করিয়া লইলেন।

জয়পালের পরাজয় ও সিন্ধুতীর পর্য্যন্ত অধিকার

সুলতান মামুদ।—৯৯৭ খৃঃ অব্দে সবুক্তিগীন পরলোক গমন করিলে, তাঁহার পুত্র ইস্‌মাইল গজনীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু মাত্র সাতমাস রাজত্ব করার পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ বৈমাত্রেয় ভ্রাতা মামুদ তাঁহাকে বিতাড়িত করিয়া সিংহাসন অধিকার করেন। মামুদ ছিলেন অত্যন্ত রণকুশল। তাঁহার রাজ্যসীমা তখন পারস্য হইতে সিন্ধু পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

মামুদ ও ইস্‌মাইলের ভ্রাতৃকলহ, মামুদের সিংহাসনলাভ (৯৯৮)

১০০১ খৃঃ অব্দে মামুদ ভারতবর্ষের দিকে অগ্রসর হন। বৃদ্ধ রাজা জয়পাল তাঁহাকে বাধা দিবার জন্য সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন; পেশোয়ারের নিকট উভয় পক্ষে তুমুল সংগ্রাম হইল; কিন্তু জয়পাল পরাজিত ও বন্দী হইলেন। তখন প্রচুর ক্ষতিপূরণ এবং বার্ষিক করদান করিতে স্বীকৃত হইলে তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হয়। কিন্তু এই নিদারুণ অপমানে জয়পাল একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িলেন,—রাজ্যভার পুত্র আনন্দপালের হস্তে সমর্পণ করিয়া তিনি প্রজ্জ্বলিত চিতাগ্নিতে প্রাণ বিসর্জ্জন দিলেন। কিন্তু জয়পালের মৃত্যুতে এই বিবাদের অবসান হইল না।

মামুদের শাহিরাজ্য আক্রমণ (১০০১), জয়পালের পরাজয় ও চিতাগ্নিতে আত্মবিসর্জ্জন, আনন্দপাল

১০০৪ খৃঃ অব্দে সুলতান মামুদ বিতস্তাতীরের ক্ষুদ্র ভেরা-রাজ্য জয় করেন। পর বৎসর মামুদ মুলতানের আরব-রাজ্য আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করিলে, আনন্দপাল তাঁহাকে শাহি-রাজ্যের মধ্য দিয়া যাইতে নিষেধ করিয়া পাঠাইলেন। ফলে মামুদ আনন্দপালকে আক্রমণ করিয়া পরাভূত করেন। ইহার পর আনন্দপাল অন্যান্য রাজাদের নিকট সাহায্যের আবেদন করিলে, দিল্লী-আজমীর, কলিঞ্জর, কনৌজ, উজ্জয়িনী, প্রভৃতি রাজ্যের রাজারা তাঁহার নিকট সৈন্যদল প্রেরণ করেন; কথিত আছে, এই দুর্য্যোগের দিনে স্বাধীনতা-সংগ্রামের ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য হিন্দুনারীরা নিজেদের অলঙ্কারাদি পর্য্যন্ত দান করিয়াছিলেন। ১০০৮ খৃঃ অব্দে উন্দের নিকট মামুদের সহিত হিন্দুদের এই সম্মিলিত বাহিনীর

মামুদের ভেরা আক্রমণ (১০০৪), আনন্দপালের সহিত বিরোধ

উন্দের যুদ্ধ

আনন্দপালের পরাজয়

এক প্রবল সংঘর্ষ হয়। যুদ্ধে মামুদ জয়ী হইলেন, মুসলমান-আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য হিন্দুদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইল। ইহার পর মামুদ নির্ব্বিরোধে নগরকোট বা ভীমনগর (বর্ত্তমান কাংড়া) লুণ্ঠন করিলেন। শুনিতে পাওয়া যায়, সেখান হইতে তিনি সাত লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা, দুইশত মণ সুবর্ণ, দুই সহস্র মণ রৌপ্য, সাতশত মণ স্বর্ণ ও রৌপ্যপাত্র, এবং বিশ মণ মণিমুক্তা ও হীরক লইয়া প্রস্থান করেন। আনন্দপালের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র ত্রিলোচন পাল এবং পৌত্র "নিডর" ভীমপাল অনেকদিন পর্য্যন্ত মামুদকে বাধা দিয়াছিলেন। ১০১৪ খৃঃ অব্দে শাহিরাজ্যের নূতন রাজধানী নন্দনদুর্গের পতন হয় এবং তাহার পর ১০২১—২২ খৃঃ অব্দে ত্রিলোচন পাল মামুদের নিকট পরাজিত ও নিহত হন। ইহার পর ভীমপাল মামুদকে বাধা দিতে চেষ্টা করিলে ১০২৬ খৃঃ অব্দে শাহিবংশের বিলোপ সাধন করিয়া মামুদ সমগ্র রাজ্যটি নিজের অধিকারভুক্ত করিয়া লইলেন।

নগরকোট লুণ্ঠন (১০০৮)

ত্রিলোচন পালের পরাজয় ও মৃত্যু (১০২১—'২২)

শাহিবংশের পতন (১০২৬)

সুলতান মামুদ

উন্দের যুদ্ধের পর মামুদ মুলতানে প্রবেশ করিয়া উহাও অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন (১০১০)। যে বৎসর নন্দন-দুর্গের পতন হয়

মুলতান জয় (১০১০)

সম্ভবতঃ সেই বৎসরই মামুদ থানেশ্বর লুণ্ঠন করেন (১০১৪); মথুরা (১০১৮) লুণ্ঠনের পর (১০১৯) প্রতিহাররাজ রাজ্যপালকে পরাভূত করিয়া তিনি কনৌজ লুণ্ঠন করেন; ইহার পর সম্ভবতঃ ১০২০ খৃঃ অব্দে চন্দেল্লরাজ গণ্ড তাঁহার নিকট পরাজয় স্বীকার করিলে, মামুদ কর্ত্তৃক বুন্দেলখণ্ডের রাজধানী ও মন্দিরসমূহ লুণ্ঠিত হয়। মামুদের এই সকল লুণ্ঠনাভিযানের মধ্যে সোমনাথলুণ্ঠনই সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। ১০২৬ খৃষ্টাব্দে তিনি সোমনাথে উপস্থিত হন; গুজরাটের চৌলুক্য-রাজ ১ম ভীম তাঁহাকে বাধা দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু মামুদের গতিরোধ করার মত শক্তি তাঁহার ছিল না। মামুদ সোমনাথ অধিকার করিয়া মন্দিরের বিগ্রহটি স্বহস্তে চূর্ণ করিয়া ফেলেন। এই অভিযানের ফলে প্রায় দুই কোটি স্বর্ণ মুদ্রা তাঁহার হস্তগত হইয়াছিল। পর বৎসর জাঠদিগকে দমন করিবার জন্য তিনি যে সৈন্যদল প্রেরণ করেন তাহাই ভারতবর্ষে তাঁহার শেষ অভিযান। ইহার পর তিনি পারস্যদেশ লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়েন,—পশ্চিমে কাস্পিয়ান সাগর হইতে পূর্ব্বে পঞ্জাব পর্য্যন্ত তাঁহার অধিকার বিস্তৃত হইয়াছিল। ১০৩০ খৃঃ অব্দে গজনী নগরীতে মামুদের মৃত্যু হয়।

থানেশ্বর লুণ্ঠন (১০১৪), মথুরা (১০১৮), প্রতিহাররাজ রাজ্যপালের পরাজয় ও কনৌজ লুণ্ঠন (১০১৯), চন্দেল্লরাজ গণ্ডের পরাভব (১০২০), চৌলুক্যরাজ ১ম ভীমের পরাজয় ও সোমনাথ লুণ্ঠন (১০২৬), মামুদের রাজ্যসীমা

সুলতান মামুদ যে একজন বিচক্ষণ সেনানায়ক ছিলেন তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই; তাঁহার অগণিত বিজয়াভিযান তাহার অকাট্য প্রমাণ। কিন্তু তাঁহার সামরিক শক্তি ভারতে স্থায়ী মুস্‌লিমরাজ্য প্রতিষ্ঠা না করিয়া, প্রধানতঃ লুণ্ঠনকার্য্য আর দেবায়তন-ধ্বংসে নিয়োজিত হইয়াছিল, এমন কি, এদেশে ইস্‌লামধর্ম্মের প্রসারের জন্য তাঁহার কোনরূপ চেষ্টা ছিল না। পক্ষান্তরে তাঁহার অমানুষিক নিষ্ঠুরতা ভারতবর্ষে ইস্‌লামের অগ্রগতিকে অনেকটা ব্যাহত করিয়া দিয়াছিল। প্রসিদ্ধ মুস্‌লিম মনীষী অল্‌-বিরুণী বলিয়া গিয়াছেন যে, সুলতান মামুদ হিন্দুস্থানকে মরুভূমিতে পরিণত করিয়া গিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী যুগে তৈমুরের ন্যায় ভারত লুণ্ঠন করিয়া মামুদ যে অপর্য্যাপ্ত ধনরত্ন লইয়া গজনীতে প্রত্যাগমন করেন, তাহার দ্বারা তিনি সেখানে বহু সুদৃশ্য প্রাসাদাদি নির্ম্মাণ করাইয়া নগরীর সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করিয়া-ছিলেন। শিল্পানুরাগ আর বিদ্যোৎসাহ ছিল এই দিগ্বিজয়ী বীরের

মামুদের কৃতিত্ব

ইস্‌লামের অগ্রগতিরোধ

মামুদের চরিত্র
শিল্পানুরাগ
বিদ্যোৎসাহ

চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। গজনীতে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিয়া তাহার জন্য তিনি অকাতরে অর্থব্যয় করেন। "শাহনামা" রচয়িতা প্রসিদ্ধ কবি ফির্দৌসী তাঁহারই একজন সভাসদ ছিলেন। মনীষী অল্-বিরূণীও মামুদের একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। অল্-বিরূণী যে শুধু ভারতবর্ষসম্বন্ধে আরবী ভাষায় একখানি বিবরণ লিখিয়া প্রসিদ্ধ হইয়া গিয়াছেন তাহাই নয়, মধ্যযুগের বিজ্ঞানেও তাঁহার দান কম নয়;—তিনিই প্রথম মূল্যবান্ প্রস্তরাদির "বৈশেষিক গুরুত্ব" (Specific gravity) নির্ণয় করেন; কবি ওমর খৈয়ামের সহযোগিতায় তিনি গণিতশাস্ত্র-সম্বন্ধেও কয়েকখানি পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছিলেন বলিয়া কিংবদন্তী আছে।

ফির্দৌসী
অল্-বিরূণী

গজনী ও
ঘুরের কলহ

ঘুর রাজ্য। হিরাটের দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকে ঘুর নামে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল; সুলতান মামুদ উহা জয় করিয়া গজনীর সামন্ত শ্রেণীভুক্ত করিয়াছিলেন। দ্বাদশ শতকের মধ্যভাগে ঘুররাজ্য ক্রমশঃ শক্তিসঞ্চয় করে। পরিশেষে ঘুরের রাজা আলাউদ্দীন হুসেন গজনীর সম্রাট্ বহ্‌রামকে পরাজিত করিয়া গজনী জয় করেন (১১৬০)। বহ্‌রামের পুত্র খুসরু মালিক পলায়ন করিয়া পঞ্জাবে আশ্রয় লইলেন।

গজনীর পতন

আলাউদ্দীন হুসেন আবার সেলজুক তুর্ক সুলতান সঞ্জর কর্ত্তৃক পরাজিত ও বন্দী হইলেন। সঞ্জরের মৃত্যুর পর তাঁহার দুই ভাগিনেয় ঘিয়াসউদ্দিন ও শিহাব্উদ্দীন ঘুররাজ্য সদ্ভাবের সহিত শাসন করিতে লাগিলেন।

গিয়াস্উদ্দীন
ঘুরী

মুহম্মদ ঘুরী।—ঘিয়াস্উদ্দীন ঘুর রাজ্যের সিংহাসনে আরোহণ করিয়া তাঁহার ভ্রাতা শিহাব্উদ্দীন বা মুইজউদ্দীন মুহম্মদ বিন্ সামকে (সামের পুত্র মুইজউদ্দীন বা শিহাব্উদ্দীন) গজনী ও কাবুলের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিলেন (১১৭৩)। ইনিই ভারতবর্ষের ইতিহাসে মুহম্মদ ঘুরী, অর্থাৎ ঘুরের মুহম্মদ বলিয়া অধিক পরিচিত। সুলতান মামুদের মত তিনিও কয়েকবার ভারত আক্রমণ করেন। ভারতবর্ষে মুসলমান-অধিকার স্থাপন করাই তাঁহার ভারত-আক্রমণের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।

মুহম্মদ ঘুরী

প্রথমবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া তিনি মুলতানের মুস্‌লিম

(আরব) রাজাকে পরাজিত করেন, এবং উচ অধিকার করেন (১১৭৫)। কিন্তু দ্বিতীয় ভীমের হাতে পরাজিত হওয়ায় তাঁহার গুজরাট-অভিযান ব্যর্থ হয়। ১১৮৬ খৃঃ অব্দে মুহম্মদ ঘুরী জম্মুর হিন্দুরাজার সহিত মৈত্রী স্থাপন করিয়া, খুসরু মালিককে পরাজিত করিয়া লাহোর অধিকাব কবেন। এরূপে ঘুরসাম্রাজ্যের সীমা দিল্লী-আজমীরের চৌহান রাজ্যের প্রত্যন্তভাগ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হওয়ায়, মুহম্মদ ঘুরী ও পৃথ্বীরাজের সংঘর্ষ অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। মুহম্মদ ঘুরী পৃথ্বীরাজের (৩য়) সহিত শক্তিপরীক্ষার আয়োজন করিলে, পৃথ্বীরাজও অন্যান্য হিন্দুরাজগণের সহযোগিতায় এক বিরাট বাহিনী সংগ্রহ করিলেন। কিন্তু কনৌজরাজ জয়চন্দ্র তাঁহার সহিত যোগ দেন নাই। বরং শোনা যায়, জয়চন্দ্রের কন্যা সংযুক্তা বা সংযোগিতাকে স্বয়ংবরসভা হইতে পৃথ্বীরাজ বলপূর্ব্বক হরণ করিয়াছিলেন বলিয়া, সে অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য জয়চন্দ্র মুহম্মদ ঘুরীকে পৃথ্বীরাজের বিরুদ্ধে উৎসাহিত করিতেছিলেন। ১১৯১ খৃঃ অব্দে থানেশ্বরের নিকটবর্ত্তী তরাইন বা তলাবরী নামক স্থানে পৃথ্বীরাজের অধিনায়কত্বে হিন্দুবাহিনী তুর্কী সৈন্যদলের সম্মুখীন হইল। মুহম্মদ ঘুরী পরাজিত ও আহত হইয়া ফিরিয়া গেলেন; কিন্তু পর বৎসর (১১৯২) মুহম্মদ ঘুরী পুনরায় এক সুবৃহৎ বাহিনী গঠন করিয়া পৃথ্বীরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন; পুনরায় তরাইনের রণক্ষেত্রে উভয়পক্ষের সাক্ষাৎ হইল। এবারও অনেক হিন্দুরাজা পৃথ্বীরাজকে সৈন্যদল দিয়া সাহায্য করিয়াছিলেন। কিন্তু হিন্দুসৈন্যগণ প্রাণপণ যুদ্ধ করিয়াও সম্পূর্ণরূপে পরাজিত ও বিধ্বস্ত হইল। পৃথ্বীরাজ বন্দী হইলে তাঁহার প্রাণবধ করা হইল। এই সময় কবি চাঁদ বরদাই "পৃথ্বীরাজ রাসো" মহাকাব্য রাজস্থানী ভাষায় রচনা করিতে আরম্ভ করেন।

মুলতান ও উচ্ জয় (১১৭৫)
গুজরাট জয়ে অকৃতকার্য্যতা, লাহোর জয় (১১৮৬),

পৃথ্বীরাজ ও মুহম্মদ ঘুরী

তরাইনের প্রথম ও দ্বিতীয় যুদ্ধ (১১৯১—'৯২)

ইহার পর মুহম্মদ ঘুরী আজমীর অধিকার করিলেন। সেখানে একজন হিন্দুকে করদরাজার পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তিনি গজনীতে ফিরিয়া গেলে, তাঁহার প্রতিনিধি কুতব্ উদ্দীন আইবক দিল্লী অধিকার করেন (১১৯২—৯৩)। ইহার পর মুহম্মদ ঘুরী ফিরিয়া আসিয়া চন্দবার নামক স্থানে কনৌজরাজ জয়চন্দ্রকে

কুতব্ উদ্দীনের দিল্লী জয় (১১৯২—'৯৩)

জয়চন্দ্রের পরাজয় ও মৃত্যু (১১৯৪)

পরাজিত ও নিহত করিলেন (১১৯৪); এভাবে বারাণসী পর্য্যন্ত তাঁহার অধিকার বিস্তৃত হইল। তাঁহার জনৈক অনুচর, ইখ্‌তিয়ারউদ্দীন মুহম্মদ বিন্ বখ্‌তিয়ার খল্‌জী (বখ্‌তিয়ার খল্‌জীর পুত্র ইখ্‌তিয়ারউদ্দীন মুহম্মদ) আনুমানিক ১১৯৩ খৃঃ অব্দে পাল-

বিহার ও পশ্চিমবঙ্গ বিজয় (১১৯৩)

বংশীয় রাজাকে পরাভূত করিয়া বিহার জয় করেন এবং আরও অগ্রসর হইয়া সেনবংশের লক্ষ্মণসেনকে (মতান্তরে তাঁহার পুত্রকে) বিতাড়িত করিয়া পশ্চিমবঙ্গ কাড়িয়া লন। এদিকে কুতব্ ১১৯৮

গুজরাট আক্রমণ (১১৯৮) কলিঞ্জর জয় (১২০২)

খৃষ্টাব্দে গুজরাট আক্রমণ করিয়া রাজধানী অন্‌হিলবাড়া লুণ্ঠন করিলেন, কিন্তু গুজরাট জয় করিতে পারিলেন না। ১২০২ খৃঃ অব্দে কুতব্‌উদ্দীন কর্ত্তৃক কলিঞ্জর অধিকৃত হয়। এভাবে উত্তর-ভারতের অধিকাংশই ঘুরসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িল। ১২০৩ খৃঃ অব্দে ঘুরসুলতান ঘিয়াস্‌উদ্দীনের মৃত্যু হইলে মুহম্মদ

মুহম্মদ ঘুরীর রাজ্যলাভ (১২০৩)

ঘুরীই ঘুরের সিংহাসন লাভ করিলেন। কিন্তু নিরুপদ্রবে রাজ্যভোগ তাঁহার অদৃষ্টে ছিল না; নানাস্থানে বিদ্রোহ আরম্ভ হইল। ভারতে বিদ্রোহ দমন করিয়া যখন তিনি গজনীতে ফিরিতেছিলেন তখন সিন্ধুদেশে কয়েকজন অজ্ঞাত আততায়ীর হস্তে তাঁহার মৃত্যু হয় (১২০৬); তাঁহার কোন পুত্র ছিল না; তাই সে বিশাল সাম্রাজ্য নানা ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িল,—তাজউদ্দীন, নাসির্‌উদ্দীন এবং

কুতব্‌উদ্দীনের দিল্লী সিংহাসন আরোহণ (১২০৬)

কুতব্‌উদ্দীন যথাক্রমে গজনী, সিন্ধুদেশ এবং দিল্লীতে নিজ নিজ প্রাধান্য স্থাপন করিলেন। ইঁহারা সকলেই ছিলেন মুহম্মদ ঘুরীর তুর্কী ক্রীতদাস। কুতব্‌উদ্দীন হইলেন দিল্লীর প্রথম সুলতান।

STUDIES AND QUESTIONS

1. Write a narrative of the expeditions of Sultan Mahmud into India. Describe the Sultan's character and achievements. (C. U. '12; '39, '42.)

2. How was the conquest of Northern India effected by the Muslims ? (C. U. '10, '15, '44)

3. Write notes on Dahır and Prithvıraj. (C. U. '41.)

4. Briefly indicate the progress of Muslim arms in Northern India under the Houses of Ghazni and Ghor. (C. U. '31.)

মধ্যযুগ

ষোড়শ অধ্যায়

(তুর্কী-সুলতানী আমল)

আরব, পারস্যাদি পশ্চিম-এসিয়ার এবং তুর্কী, মুঘল, প্রভৃতি মধ্য এশিয়ার জাতিসঙ্ঘের সহিত ভারতবাসীদের সংঘর্ষ ও চরম সম্বন্ধনির্ণয় মধ্যযুগের ইতিহাসের মূল বিষয়বস্তু। জেতা ও বিজিতের সম্বন্ধ এ যুগে কঠিন ও নির্ম্মমরূপে প্রকাশ পাইলেও হিন্দু ও মুস্‌লিম ধর্ম্ম এবং সংস্কৃতির মধ্যে প্রচুর আদান প্রদান হয়। মুস্‌লিম রাষ্ট্রের উদ্ভব ও ব্যবস্থাদির সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুরাজ্যে তাহাদের প্রতিক্রিয়ার ইতিহাসও একযোগে পাঠ করা দরকার। জাতিগত ও ধর্ম্মগত প্রভেদ থাকিলেও মুস্‌লিমসঙ্ঘ হিন্দুদের সঙ্গে একই ভারতবর্ষে স্থায়ী বসবাস করে; সুতরাং প্রায় সহস্র বৎসর ধরিয়া ভারতবর্ষ সমভাবে দুইটি বিরাট ধর্ম্ম ও জাতিসঙ্ঘের মাতৃভূমি।

দাস রাজবংশ

দিল্লীর প্রথম সুলতান

কুতব্‌উদ্দীন আইবক।—১২০৬ খৃঃ অব্দে লাহোরে কুতব্‌-উদ্দীনের রাজ্যাভিষেক হয়। মুহম্মদ ঘুরীর ভ্রাতুষ্পুত্র, ঘিয়াস্‌উদ্দীন মামুদ তাঁহাকে 'সুলতান' উপাধি প্রদান করেন। কুতব্‌ ছিলেন মুহম্মদ ঘুরীর একজন ক্রীতদাস। তাঁহার অনুবর্ত্তী দুইজন সুলতানও প্রথমে ক্রীতদাস ছিলেন। এজন্য দিল্লীর সিংহাসনে তিনি যে রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন ইতিহাসে তাহা দাসবংশ (Slave Dynasty) নামে পরিচিত। দিল্লীর স্বাধীন সুলতানরা দাস পরিচয়ে কখনও কুণ্ঠিত বোধ করেন নাই। কারণ যে দেশে রাজাই হইল প্রজার ধন মান জীবনের স্বত্বাধিকারী, সেক্ষেত্রে রাজার খাস্‌ ভৃত্যের মর্য্যাদা পাওয়া তাঁহারা গৌরব মনে করিতেন। তদুপরি স্বীয় প্রতিভাবলে তাঁহারা রাজ্যের উচ্চপদে উন্নীত হইতেন

দিল্লীর রাষ্ট্র-কেন্দ্রে পরিণতি

'দাসবংশ'

সুতরাং এই সম্মানে তাঁহারা আরও প্রতাপান্বিত হইয়া উঠিতেন কথিত আছে নিঃসন্তান মুহম্মদ ঘুরীকে কেহ সমবেদনা জানাইলে তিনি বলিয়াছিলেন যে, একটি পুত্রের পরিবর্ত্তে তাঁহার সহস্র তুর্কীদাস আছে যাহারা তাঁহার খ্যাতি প্রতিপত্তি বজায় রাখিবে। কুতব্‌উদ্দীন এদেশে বেশি দিন রাজত্ব করিতে পারেন নাই; মাত্র চারি বৎসর রাজত্ব করার পর লাহোরে একদিন পোলো (চৌগন) খেলার সময় সহসা ঘোড়ার পিঠ হইতে পড়িয়া গিয়া তাঁহার মৃত্যু হয় (১২১০)।

মৃত্যু (১২১০)

সমসাময়িক লেখকগণ কুতব্‌উদ্দীনকে কদাকার বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার চরিত্রে ছিল বদান্যতা ও নৃশংসতার এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ। একদিকে যেমন তিনি লক্ষ লক্ষ টাকা বিতরণ করিতেন ('লাখবক্‌স্' বা লক্ষদাতা) অন্যদিকে নির্ম্মমভাবে লক্ষ লক্ষ লোকের জীবন হরণ করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। তাঁহার চরিত্রের আর একটি গুণ ছিল শিল্পানুরাগ; তিনিই দিল্লীর প্রসিদ্ধ কুতব্-মিনার ও কুতব্-মস্‌জিদের ভিত্তি স্থাপন করিয়া যান।

বদান্যতা ও নিষ্ঠুরতা

শিল্পানুরাগ

কুতব্‌উদ্দীনের মৃত্যুর পর লাহোরের ওমরাহ্‌গণের নির্ব্বাচনে তাঁহার পুত্র (মতান্তরে দত্তক পুত্র) আরম শাহ সুলতান পদ লাভ করেন, কিন্তু তিনি ছিলেন নিতান্তই অকর্ম্মণ্য এবং কয়েক মাস পরেই দিল্লীর ওমরাহ্‌দের নিমন্ত্রণে কুতবের জামাতা ইল্‌তুৎমিস্ বিহার হইতে আসিয়া সিংহাসন অধিকার করেন (১২১১)।

আরম শাহ

ইল্‌তুৎমিস্।—(১২১১—৩৬)। ইল্‌তুৎমিস্ প্রথম জীবনে ছিলেন দিল্লীশ্বর কুতব্‌উদ্দীনের একজন তুর্কী ক্রীতদাস। পরে কুতব্ নিজ কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ দিয়াছিলেন। যখন লাহোরে কুতবের মৃত্যু হয়, ইল্‌তুৎমিস্ তখন বিহারে প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তার পদে কাজ করিতেছিলেন।

ইল্‌তুৎমিস্

মাত্র চারি বৎসরের রাজত্বের মধ্যে কুতব্‌উদ্দীন সর্ব্বত্র যথোচিত শৃঙ্খলা-স্থাপন করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার মৃত্যুর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে বিদ্রোহ আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল;—সিন্ধুর শাসনকর্ত্তা নাসিরউদ্দীন কবাচ এবং বঙ্গদেশের খল্‌জীবংশীয় শাসনকর্ত্তারা দিল্লীর আধিপত্য অস্বীকার করেন; সুযোগ বুঝিয়া গজনীর তাজ্‌উদ্দীন ইল্‌দিজও পঞ্জাবে নিজের অধিকার স্থাপন

শাসনসঙ্কট

সিন্ধু, বঙ্গ, পঞ্জাব, গজনী,

করিতে উদ্যত হন; এদিকে আবার গোয়ালিয়র ও রণ্থম্ভোর হিন্দুদের দ্বারা অধিকৃত হয়। সিংহাসন লাভ করিয়াই ইল্তুৎমিস্কে এই ঘোরতর সঙ্কটের সম্মুখীন হইতে হয়। তাঁহার দীর্ঘ রাজত্ব-কালের অধিকাংশই এই সকল বিদ্রোহ দমনের ইতিহাস। ১২১৭ খৃঃ অব্দে তিনি পঞ্জাব অধিকার করেন; অতঃপর ১২২৬ খৃঃ অব্দে সিন্ধু ও রণ্থম্ভোর অধিকৃত হয়; পর বৎসর (১২২৭) বঙ্গের ওমরাহ্গণও দিল্লীর আধিপত্য স্বীকার করিতে বাধ্য হন; ১২৩২ খৃঃ অব্দে গোয়ালিয়র অধিকার করিবার পর তিনি উজ্জয়িনী লুণ্ঠন করেন,—তখনই মহাকালের প্রসিদ্ধ মন্দিরটি ধ্বংস হইয়া যায়।

গোয়ালিয়র ও রণ্থম্ভোর বিদ্রোহ

বিদ্রোহ দমন

উজ্জয়িনী লুণ্ঠন

ইল্তুৎমিসের রাজত্বকালেই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ 'মোগল' (মুঘল—মঙ্গোল) বীর চিঙ্গিজ খাঁ খারজমের পলাতক রাজার অনুসন্ধানে ভারতের সীমান্তে উপস্থিত হন। চিঙ্গিজ ১২২০ সালে খারজম্ ও পারস্য দেশ জয় করিয়া যে মঙ্গোল রাজ-বংশের প্রতিষ্ঠা করেন, সেই বংশের আর এক শাখা বিশাল চীন সাম্রাজ্য জয় করিয়া পিকিনে রাজধানী স্থাপন করে (১২৫০—৬০)। কুবলাই খাঁ এই বংশের একজন বিশ্ববিখ্যাত সম্রাট ও রণবীর এবং পারস্যেও মঙ্গোল খাঁ আখ্যেয় নরপতিদের এই সময়ে দেখা যায়। ইহারা সবাই ধর্ম্মে বৌদ্ধ ছিলেন। এই বংশের তৈমুরলঙ্গ ও বাবর ভাবী মুঘল সম্রাটদের পূর্ব্ব পুরুষ। চিঙ্গিজ অসাধারণ রণনৈপুণ্যের বলে পূর্ব্বে প্রশান্ত মহাসাগর হইতে পশ্চিমে কৃষ্ণসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। চিঙ্গিজের ভয়ে ইল্তুৎমিস্ পলাতক খারজম্-রাজকে আশ্রয় দিতে অসম্মত হইলে উপায়ান্তর না দেখিয়া তাঁহাকে পঞ্জাব ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে হইল। ভারতবর্ষও দৈবানুকুল্যে এক নিদারুণ বিপদের হাত হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিল।

চিঙ্গিজ খাঁ

ইল্তুৎমিসের রাজত্বকালের আর একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা খলিফা কর্ত্তৃক তাঁহাকে অভিনন্দন প্রেরণ। বোগ্দাদের খলিফা সমগ্র মুস্লিম-সমাজের ধর্ম্মগুরু ছিলেন। ১২২৯ খৃষ্টাব্দে খলিফার জনৈক প্রতিনিধি ভারতবর্ষে আগমন করিয়া, দিল্লীশ্বর ইল্তুৎমিস্কে নানাবিধ উপহারে ভূষিত করিয়া তাঁহাকে ধর্ম্মগুরুর অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন।

খলিফার অভিনন্দন

না। কিন্তু তিনি নিরতিশয় ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন, এবং তাঁহার শ্বশুর ও মন্ত্রী উলুঘ খাঁর সহায়তায় নির্ব্বিঘ্নে দীর্ঘ ২০ বৎসর রাজ্য-শাসন করিয়াছিলেন। উলুঘ খাঁই ছিলেন প্রকৃত শাসনকর্ত্তা; নাসিরুউদ্দীন তাঁহার সুদৃঢ় শাসনের অন্তরালে অধিকাংশ সময় ধর্ম্ম-চর্চ্চায় আত্মনিয়োগ করিয়াই দিন কাটাইতেন। নাসিরুউদ্দীনের রাজত্বকালে দেশের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হইয়া পড়ে। তাঁহার এবং তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী সুলতানগণের রাজত্বকালে মুঘলগণ বারবার আক্রমণ করিয়া পঞ্জাব বিধ্বস্ত করিতে থাকে এবং দোয়াব ও মেওয়াট অঞ্চলে বিদ্রোহের সূচনা হয়। উলুঘ খাঁ কঠোর হস্তে বিদ্রোহ দমন করিয়া এবং মুঘলগণকে দূরীভূত করিয়া রাজ্যে শান্তি স্থাপিত করেন। নাসিরুউদ্দীন স্বয়ং বিদ্বান ছিলেন এবং বিদ্যার আদর করিতেন। ১২৬৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

ঘিয়াসুউদ্দীন বল্‌বন—(১২৬৬—'৮৭)। নাসিরুউদ্দীন নিঃসন্তান ছিলেন। তাঁহার পর উলুঘ খাঁ ঘিয়াসুউদ্দীন বল্‌বন নামে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। বল্‌বন ছিলেন সুলতান ইল্‌তুৎমিসের "চল্লিশ ক্রীতদাসে"র একজন। এই ক্রীতদাসেরা সকলেই কালক্রমে বিশেষ প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী হইয়া উঠিয়াছিলেন। প্রধানতঃ তাঁহাদেরই পরস্পর প্রতিযোগিতার ফলে ইল্‌তুৎমিসের মৃত্যুর পর রাজ্যময় অরাজকতা আসিয়াছিল। সিংহাসন লাভ করিয়াই বল্‌বন ওমরাহ্‌গণের ক্ষমতা উচ্ছেদ করিয়া দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন করিতে অগ্রসর হইলেন। এবং কঠোর হস্তে সমস্ত অরাজকতা দূর করিয়া রাজশক্তির সর্ব্বময় প্রভুত্ব স্থাপিত করিলেন, দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হইল।

মুঘল (মোগল) আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্যও বল্‌বন যথোচিত ব্যবস্থা করিতে ত্রুটি করেন নাই। চিঙ্গিজ খাঁর প্রত্যাগমনের কিছুকাল পর হইতেই মুঘলেরা বারবার ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত লঙ্ঘন করিয়া এদেশে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিতেছিল। মুঘলদের আর এক বৌদ্ধ শাখা এই সময় কুবলাই খাঁর (Kublai Khan) নেতৃত্বে সুদূর পিকিঙ হইতে বলটিক সাগর পর্য্যন্ত বিরাট সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিয়াছিল। বল্‌বন নিজের জ্যেষ্ঠপুত্র মুহম্মদকে প্রত্যন্তদেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন।

(পার্শ্বটীকা: উলুঘ খাঁ; বল্‌বনের পূর্ব্বজীবন 'চল্লিশ ক্রীতদাস'; ওমরাহ্‌দের ক্ষমতা হ্রাস ও রাজশক্তি প্রতিষ্ঠা; মুঘল আক্রমণ; সীমান্তের অবস্থা)

কিন্তু ১২৮৫ খৃঃ অব্দে মুঘলদের সহিত সংঘর্ষে মুহম্মদের মৃত্যু হয়। ইহার পর বিভিন্ন সুলতানের রাজত্বকালে মুঘলদের উৎপাত ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে থাকে কিন্তু বাবুরের পূর্ব্বে সীমান্ত-সমস্যার কোন সমাধান হয় নাই।

মেওয়াটি দস্যুদের দমন

বলবনের শাসনকালের আর একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা মেওয়াটি রাজপুতদের দস্যুতা দমন। বর্ত্তমান আলোয়ারে ছিল মেওয়াট রাজ্য।

বঙ্গদেশে তুঘ্রিল খাঁর বিদ্রোহ দমন

বঙ্গের শাসনকর্ত্তা তুঘ্রিল খাঁর বিদ্রোহ দমন বল্‌বনের জীবনের আর এক কীর্ত্তি। তুঘ্রিল খাঁ ১২৭৯ খৃঃ অব্দে বঙ্গের স্বাধীনতা ঘোষণা করিলে, সুলতান পর পর দুইবার তাঁহার বিরুদ্ধে সৈন্যদল পাঠাইয়াও তাঁহাকে দমন করিতে পারেন নাই। সুলতান তখন নিজেই সসৈন্যে বঙ্গদেশের দিকে অগ্রসর হন। তুঘ্রিল খাঁ তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে সাহস না পাইয়া, জাজনগরের দুর্ভেদ্য অরণ্যে পলায়ন করিলেন। সেখান হইতে তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া তাঁহার প্রাণদণ্ড বিধান করা হইল। তারপর বিদ্রোহীদলকে সম্পূর্ণরূপে দমন করিয়া সুলতান নিজের দ্বিতীয় পুত্র বুঘ্‌রা খাঁকে বঙ্গের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া দিল্লীতে ফিরিয়া আসিলেন। তখন হইতে ১৩৩৮ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত বল্‌বনের বংশধরগণই বঙ্গদেশ শাসন করিতে থাকেন।

মৃত্যু (১২৮৬-৮৭)

১২৮৫ খৃঃ অব্দে জ্যেষ্ঠপুত্র মুহম্মদের আকস্মিক মৃত্যুতে অশীতি-পর বৃদ্ধ বল্‌বন একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িলেন। ইহার এক বা দুই বৎসরের মধ্যে তাঁহারও মৃত্যু হইল (১২৮৬—৮৭)।

কৃতিত্ব

বল্‌বনের সুকঠোর ন্যায়দণ্ডের নিকট পদমর্য্যাদা বা ধনসম্পদের কোনই মূল্য ছিল না। ন্যায়ের মর্য্যাদা ও রাজশক্তির সম্মান রক্ষার জন্য তিনি যে কোন পদস্থ ব্যক্তিকে যে কোনও শাস্তি দিতেন। তাঁহার মৃত্যু উপলক্ষ্য করিয়া একজন ঐতিহাসিক লিখিয়া গিয়াছেন,—"যেদিন প্রজাদের পিতৃতুল্য বল্‌বনের মৃত্যু হইল সেদিন হইতে লোকের জীবন ও ধনসম্পত্তি আর নিরাপদ রহিল না, রাজ্যের স্থিতিশীলতা সম্বন্ধেও কাহারও কোন আস্থা থাকিল না"। বল্‌বনের সুদীর্ঘ শাসনকালে তাঁহার যশ সমগ্র

আশ্রিত-বাৎসল্য ও বিদ্যোৎসাহ

এশিয়ায় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। দুর্দ্ধর্ষ মুঘলদের অত্যাচারে রাজ্য-হারা ১৭ জন রাজা আসিয়া তাঁহার সভায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। আশ্রিতদের মধ্যে সে যুগের অনেক বিদ্বান ও সাহিত্যিক ছিলেন; তাঁহাদের মধ্যে অলবিরুণীর ন্যায়, হিন্দু সাহিত্যের সমজদার সুপ্রসিদ্ধ আমীর খুসরু ছিলেন বল্‌বনের সভাকবি। তখনই দিল্লী নগরী মুস্‌লিম সংস্কৃতির একটি পীঠস্থানে পরিণত হইয়াছিল এবং উর্দ্দু ভাষা হিন্দু ও মুসলমানদিগের মধ্যে সংযোগের সেতু হইয়া উঠে।

কৈকোবাদ।—বল্‌বনের মৃত্যুর পর দিল্লীর ওমরাহ্‌গণ বুঘ্‌রা খাঁর পুত্র কৈকোবাদকে সুলতান নির্ব্বাচিত করেন। তরুণ সুলতান বিলাসে মত্ত হইয়া রাজকার্য্য অবহেলা করায় মন্ত্রী নিজাম-উদ্দীনই রাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া উঠিলেন। তাঁহার প্ররোচনায় মুহম্মদের পুত্র কৈখুস্‌রুকে হত্যা করা হইল। রাজ্যময় নানারূপ অত্যাচার অনাচারে ওমরাহগণ কৈকোবাদের কৈয়ুমর্স নামক শিশুপুত্রকে সুলতানপদে অধিষ্ঠিত করিলেন। এই সুযোগে খল্‌জী ওমরাহ্‌গণ কৈকোবাদ ও কৈয়ুমর্সকে হত্যা করিয়া তাঁহাদের নেতা ফীরুজ-শাহকে (পরে জলালউদ্দীন খল্‌জী) রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন (১২৯০)। এইভাবে "দাসবংশে"র অবসান হইল।

জলালউদ্দীন খল্‌জী ও দাসবংশের অবসান (১২৯০)

তুর্কশক্তির প্রথম অভ্যুদয়

দাস রাজাদের শাসন।—"দাস" রাজাদের রাজত্বকাল ছিল ভারতবর্ষে তুর্কশক্তির অভ্যুদয়ের প্রথম পর্ব্ব। তখন পঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ, বিহার, বঙ্গ, গোয়ালিয়র, সিন্ধু, এবং রাজপুতানা ও মধ্য ভারতের কোন কোন অংশে তাঁহাদের আধিপত্য স্থাপিত হয়। রাজ্যবিস্তারের এই পর্ব্বে সামরিক শক্তিই ছিল সুলতানদের এক-মাত্র বা প্রধান অবলম্বন। সুতরাং "দাস" রাজারা সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীণ শাসনসমস্যার কোনরূপ সমাধান করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাই একজন শক্তিশালী সুলতানের মৃত্যু হইলেই রাজ্যে অরাজকতার তাণ্ডবনৃত্য সুরু হইয়া যাইত। তথাপি বিচ্ছিন্ন বিদ্রোহী হিন্দুশক্তি সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া মুসলমানদের বিরুদ্ধে একযোগে দাঁড়াইতে পারে নাই। তার প্রধান কারণ বর্ণভেদ। হিন্দুমাত্রেই যে এক, এই শিক্ষা জাতীয় জীবনে সত্য হইয়া উঠে নাই। অতএব রণক্ষেত্রেও বিজেতাদের বিরুদ্ধে তাহারা একত্র হইতে

দাস সাম্রাজ্যের সীমা

সামরিক শাসন

পারে নাই। তাই অনায়াসে হিন্দুর পরাক্রম, সমৃদ্ধি, রণকৌশল ও চরিত্র-শক্তি ব্যর্থ করিয়া মুসলমানরা নবধর্ম্মের ঐক্য মন্ত্রের প্রেরণায় ও সঙ্ঘশক্তিতে হিন্দুস্থান অধিকার করিয়া বসিল।

STUDIES AND QUESTIONS

1. Who founded the Slave Dynasty? Why was it so called? Describe the reign of the greatest king of this dynasty. (C. U. '14).

2. Briefly narrate the history of the Slave Dynasty of Delhi. (C. U. '28, '45).

3. Briefly describe the career of Ghyasuddin Balban. (C. U. '37).

সপ্তদশ অধ্যায়

খল্‌জী রাজবংশ

জলাল্‌উদ্দীন ফীরুজ খল্‌জী।—ফীরুজ শাহ "জলাল্‌-উদ্দীন" নাম ধারণ করিয়া ৭০ বৎসর বয়সে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। তিনি ছিলেন "খল্‌জী" বংশীয়। সমসাময়িক ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দীন বরণী খল্‌জীগণকে তুর্কী বলিয়া স্বীকার করেন নাই। কিন্তু আসলে তাঁহারা তুর্কীই ছিলেন; তবে বহুকাল যাবৎ আফগানিস্থানে বসবাস করিয়া আসিতেছিলেন মাত্র। 'বর্ব্বর আফগান' আখ্যা দিয়া দিল্লীর তুর্ক ওমরাহ্‌গণ এবং একদল নাগরিক ফীরুজের সিংহাসনলাভে বাধা দিয়াছিল। লক্ষ্যের বিষয় এইটুকু যে, সে সময়েও রাজতন্ত্রে প্রজাদের মতামত উপেক্ষিত হইত না।

খল্‌জী বংশ

জলাল্‌উদ্দীন ছিলেন অত্যন্ত মৃদুস্বভাবের লোক। বল্‌বনের এক ভ্রাতুষ্পুত্র বিদ্রোহ করিয়া পরাজিত হইলে, তিনি বিদ্রোহীদের শুধু ক্ষমা করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না, সকলকে সাদরে অভ্যর্থনা

বিদ্রোহীদের ক্ষমা

পর্য্যন্ত করিলেন। দস্যু তস্কররাও ধরা পড়িয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিলে তিনি প্রায়ই তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিতেন। শুধু একবার তিনি তাঁহার প্রাণনাশের চক্রান্ত করার অভিযোগে সিদিমোল্লা নামে এক ফকিরের প্রাণদণ্ড বিধান করেন। ১২৯২ খৃঃ অব্দে মধ্য এশিয়ার বৌদ্ধ মুঘলরা পঞ্জাব আক্রমণ করে, কিন্তু তাহাদিগকেই পরাজয় স্বীকার করিতে হয়। তাহাদের মধ্যে যাহারা এখানেই রহিয়া গেল, সুলতান তাহাদিগকে বৌদ্ধধর্ম্ম ত্যাগ করাইয়া ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ ও দিল্লীর উপকণ্ঠে বাস করিতে অনুমতি দিলেন। তাহাদের নাম হইল "নব-মুসলমান"।

সিদিমোল্লা

মুঘল আক্রমণ

'নব মুসলমান'

তরাইনের যুদ্ধের পর তখন এক শতাব্দী কাটিয়া গিয়াছিল; কিন্তু তখনও মুস্‌লিম আক্রমণের তরঙ্গ দাক্ষিণাত্যে গিয়া আঘাত করে নাই। জলাল্‌উদ্দীনের ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা আলাউদ্দীন দাক্ষিণাত্যে প্রবেশের সঙ্কল্প করিলেন। আলাউদ্দীন ছিলেন কারা ও অযোধ্যার শাসনকর্ত্তা। মালবে অভিযান পরিচালনার জন্য সুলতানের অনুমতি লইয়া তিনি অকস্মাৎ একেবারে দেবগিরির যাদবরাজ রামচন্দ্রের রাজ্যে (মহারাষ্ট্র) গিয়া উপনীত হইলেন (১২৯৪)। বাধ্য হইয়া রামচন্দ্রকে একটি প্রদেশ (ইলিচপুর) ছাড়িয়া দিয়া, বার্ষিক করদানে স্বীকৃত হইতে হয়। আলাউদ্দীন দেবগিরি হইতে প্রচুর ধনরত্ন লইয়া কারায় ফিরিয়া আসিলেন। সুলতান তখন জামাতার সহিত দেখা করিবার জন্য নিজেই কারায় গমন করিলেন; কিন্তু সেখানে জনৈক গুপ্তঘাতক তাঁহাকে হত্যা করিল। আলাউদ্দীন তখন নিজেকে সুলতান বলিয়া ঘোষণা করিলেন (জুলাই, ১২৯৬)। দিল্লীর ওমরাহ্‌গণ জলাল্‌উদ্দীনের পুত্র রুকন্‌উদ্দীন ইব্রাহিমকে সুলতান বলিয়া স্বীকার করিলেন। কিন্তু কয়েক মাস পরেই আলাউদ্দীন সসৈন্যে দিল্লী প্রবেশ করিলে ওমরাহ্‌গণ তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করেন (নভেম্বর, ১২৯৬)।

আলাউদ্দীন ও দাক্ষিণাত্যে প্রথম তুর্কী আক্রমণ (১২৯৪)

দেবগিরি লুণ্ঠন

জলাল্‌উদ্দীনের অপমৃত্যু

রুকন্‌উদ্দীন ইব্রাহিম

আলাউদ্দীন খল্‌জী।—তবুও সিংহাসন লইয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা একেবারে ঘুচিল না। রাজ্যে নানারূপ বিদ্রোহ ও চক্রান্ত হইতে লাগিল। তাহার বিশ্বাস হইল যে, ওমরাহ্‌দের মধ্যে পরস্পর কুটুম্বিতা, মদ্যপান এবং প্রজাদের আর্থিক স্বচ্ছলতাই এরূপ বিদ্রোহ ও ষড়যন্ত্রের কারণ। আলাউদ্দীন তখন মদ্যপানের উপর নিষেধাজ্ঞা

সিংহাসন লাভ ও বিদ্রোহ দমন

জারি করিলেন ; সুলতানের অনুমতি ব্যতীত সম্ভ্রান্ত লোকদের মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন নিষিদ্ধ হইল, বড় বড় ওমরাহ্‌গণও সুলতানের অনুমতি ব্যতীত কোন কাজেই একত্রিত হইতে পারিতেন না ; আলাউদ্দীন প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা ও সৈন্যাধ্যক্ষদিগকে বেতন দিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত করেন। যাহাতে প্রজারা প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করিতে না পারে সেজন্য তাহাদের উপর দুর্ব্বহ করভার চাপাইয়া দেওয়া হইল বিশেষ করিয়া হিন্দুদের উপর। এদিকে সৈন্যদের ব্যয়ভার লাঘব করিবার জন্য তিনি কৃত্রিম উপায়ে জিনিষপত্রের দর কমাইয়া দিলেন। ইহাতে ব্যবসায়ের বিলক্ষণ ক্ষতি হইতে লাগিল। জমি জরিপ করিয়া শস্যের অর্দ্ধাংশ রাজস্ব বলিয়া আদায় করা হইতে লাগিল। গুপ্তচরের সহায়তায় সুলতান রাজ্যময় যথেচ্ছাচাব করিতে লাগিলেন। প্রজাদের দুর্দ্দশার আর সীমা রহিল না।

শাসন-রীতি· যথেচ্ছাচার

প্রজাদের দুর্দ্দশা

এদিকে তখন মুঘলরা বারবার ভারত আক্রমণ করিতেছিল। ১২৯৭-৯৮ খৃঃ অব্দের মধ্যে "নব মুসলমান"গণ একবার বিদ্রোহী হইয়া উঠিলে, সুলতানের আদেশে একদিন ১৫ হইতে ৩০ হাজার মুঘল বিদ্রোহীর প্রাণনাশ করা হয়। ইহার পরও বাহির হইতে মুঘল সৈন্যদল আসিয়া অনেকবার লুঠতরাজ করিয়া চলিয়া যায়। ১২৯৭ হইতে ১৩০৫ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত ভারত-সীমান্ত ইহাদের অত্যাচারে বিব্রত হইয়া উঠে। সুলতানের সৈন্যদল কয়েকবার তাহাদিগকে পরাজিত করিলেও, তাহাদের বিশেষ কোন ক্ষতি করিতে পারিত না ; পরাজিত বন্দীদের নৃশংসভাবে হত্যা করা হইত বটে, কিন্তু পুনরায় নূতন দল আসিয়া লুটপাট করিয়া চলিয়া যাইত। দুইবার (সম্ভবতঃ ১৩০৩ ও ১৩০৫ খৃঃ অব্দে) তাহারা দিল্লী পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল এবং একবার দুই মাস যাবৎ নগর অবরোধ করিয়াও রাখিয়াছিল ; অবশেষে প্রচুর উপঢৌকন দিয়া তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিতে হয়।

'নব মুসলমান"

মুঘল আক্রমণ-কারীদের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ

সিংহাসনে আরোহণ করিয়া আলাউদ্দীন ভারতের স্বাধীন রাজ্যগুলি জয় করিয়া সাম্রাজ্য বৃদ্ধির দিকে মনোনিবেশ করিলেন। ১২৯৭ খৃঃ অব্দে তিনি নসরৎ খাঁ ও উলুঘ খাঁ নামক দুইজন সেনাপতির উপর গুজরাট জয়ের ভার অর্পণ করিলেন। তখন বাঘেলারাজ ২য় কর্ণদেব গুজরাটের রাজা ছিলেন। তিনি এই

উত্তর-ভারতে বিজয়াভিযান

আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে পারিলেন না। সুলতানের সৈন্যেরা গুজরাটের সমৃদ্ধ বন্দরগুলি লুণ্ঠন করিয়া, অপর্য্যাপ্ত ধনরত্ন লইয়া দিল্লী ফিরিয়া আসিল। লুণ্ঠিত ধনরত্নের সঙ্গে আসিলেন কর্ণদেবের রাণী বন্দিনী কমলাদেবী; সুলতান আলাউদ্দীন তাঁহাকে নিজ অন্তঃপুরে প্রেরণ করিলেন। ইহার কিছুকাল পরে কমলাদেবীর কন্যা দেবলাদেবী ধৃত হইয়া দিল্লীতে আনীত হইলেন; তাঁহার সহিত আলাউদ্দীনের পুত্র খিজির খাঁর বিবাহ হইল। চৌহান বীর হম্মীরদেব কয়েকজন বিদ্রোহী কর্ম্মচারীকে আশ্রয়দান করিয়াছিলেন বলিয়া ১৩০০ খৃঃ অব্দে আলাউদ্দীন রাজপুতানার রণথম্ভোর দুর্গ (জয়পুর রাজ্যের অন্তর্গত রণস্তম্ভপুর) আক্রমণ কবিবার জন্য একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। হম্মীরদেব সৈন্যসহ দুর্গের বাহিরে আসিয়া তাহাদিগকে পবাজিত করিলেন। এই সংবাদ দিল্লীতে পৌঁছিলে আলাউদ্দীন নিজে একদল সৈন্য লইয়া পুনবায় বণথম্ভোর আক্রমণ করিলেন। বহুদিন যুদ্ধেব পব অবশেষে দুইজন সেনাপতিব বিশ্বাসঘাতকতায় হম্মীরদেব নিহত হন এবং আলাউদ্দীন বণথম্ভোব অধিকার কবেন (১৩০১)।

গুজরাট জয়

কমলাদেবী

দেবলাদেবী

বণথম্ভোর জয

১৩০৩ খৃঃ অব্দে আলাউদ্দীন মেবারের বাজধানী চিতোব আক্রমণ করিলেন। শোনা যায় যে, বাণা রতনসিংহের মহিষী পদ্মিনীব রূপলাবণ্যের কথা শুনিযাই সুলতান তাঁহাকে লাভ কবিতে বদ্ধপরিকব হন। স্বাধীনতা ও সম্মান বক্ষার জন্য রাজপুতগণ তখন যে অপূর্ব্ব শৌর্য্যবীর্য্যের পরিচয় দান করিয়াছিলেন তাহা যেরূপ গৌরবময় তেমনই মর্ম্মস্পর্শী। কিন্তু আলাউদ্দীনের বণকৌশলের নিকট সকলই ব্যর্থ হইয়া গেল। অবশেষে উপায়ান্তব না দেখিয়া পদ্মিনী কয়েক সহস্র সহচরীব সঙ্গে "জহর ব্রত" অনুষ্ঠান করিয়া চিতাগ্নিতে আত্মাহুতি দিলেন; রাজপুত বীরগণ বিপুল বিক্রমে শত্রুসৈন্যেব উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া যুদ্ধ করিতে করিতে মৃত্যু বরণ করিলেন। এইরূপে চিতোর অধিকৃত হইল। ইহাব প্রায় পনের বৎসর পরে মেবারেব রাণা বীর হম্মীর চিতোরের উদ্ধার সাধন কবেন। কিন্তু রণনৈপুণ্যে হিন্দুদের অধঃপতন হইতেছিল।

পদ্মিনীর জহর-ব্রত

চিতোর জয

চিতোর উদ্ধার

১৩০৫ খৃঃ অব্দে আলাউদ্দীন মালব আক্রমণ করিয়া উজ্জয়িনী, চন্দেরী, মণ্ডু ও ধারা নগরী অধিকার করেন। এইরূপে 'হিন্দুস্থানের

সমভূমি''র প্রায় সমগ্র ভাগ জয় করিয়া, তিনি দক্ষিণাপথ জয়ের আয়োজন করিতে লাগিলেন।

দাক্ষিণাত্যে বিজয়াভিযান

প্রথমবার পরাজয়ের পর দেবগিরির রাজা রামচন্দ্রদেব নিয়মিতভাবে কর দিতে অবহেলা করিতেছিলেন। তদুপরি তিনি গুজরাটের পলায়িত রাজা ২য় কর্ণদেবকে নিজ রাজ্যে আশ্রয় দিয়াছিলেন। তাই ১৩০৬ খৃঃ অব্দে আলাউদ্দীন সেনাপতি মালিক কাফুরের নেতৃত্বে দেবগিরিতে একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। মালিক কাফুর ছিলেন এক খোজা ক্রীতদাস; গুজরাট হইতে আনীত বন্দীদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম; কিন্তু দিল্লী আসিবার পর স্বীয় প্রতিভাবলে কালক্রমে তিনি সাম্রাজ্যের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রভাবশালী হইয়া উঠেন। মালিক কাফুরের নিকট পরাজিত হইয়া রামচন্দ্রদেব নিয়মিত করদানে স্বীকৃত হইলেন (১৩০৭)। ইহার পর ১৩০৯ খৃঃ অব্দে কাফুর অন্ধ্র বা তেলিঙ্গানা রাজ্য আক্রমণ করিলেন। অন্ধ্রের রাজধানী ছিল বরঙ্গল। কাকতীয়রাজ ২য় প্রতাপরুদ্র দেবগিরির যাদবদিগকে পরাজিত করিয়া কৃতিত্ব অর্জ্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি কাফুরকে প্রতিরোধ করিতে পারিলেন না, সমুদয় সঞ্চিত ধনসম্পদ উৎসর্গ করিয়া বাৎসরিক করদানের চুক্তিতে তিনি সন্ধি স্থাপন করিতে বাধ্য হন (১৩০৮—'০৯)। ইহার পর ১৩১০ খৃঃ অব্দে কাফুর দোরসমুদ্রে (মহীশূরের অন্তর্গত হলেবীদ) হোয়সলরাজ ৩য় বীরবল্লালকে পরাভূত করেন ও বীরবল্লালের রাজধানী দোরসমুদ্র লুণ্ঠন করিয়া তাঁহাকে দিল্লী প্রেরণ করেন। ইহার পর কাফুর মাদুরার পাণ্ড্যরাজকে পরাভূত করিয়া হিন্দুতীর্থ সেতুবন্ধ রামেশ্বরে বিজয়-গৌরবে একটি মস্‌জিদ স্থাপন করিলেন (১৩১০)। এইরূপে উত্তর সীমান্ত অঞ্চল হইতে দক্ষিণে সেতুবন্ধ রামেশ্বর পর্য্যন্ত আলাউদ্দীনের সাম্রাজ্য বিস্তৃত হইল। ১৩১১ খৃঃ অব্দে মালিক কাফুর জয়োল্লাসে দিল্লী প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ১৩০৯ খৃঃ অব্দে রামচন্দ্রদেবের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র দেবগিরির স্বাধীনতা ফিরাইয়া আনিতে চেষ্টা করিলে, কাফুরের হস্তে তাঁহাকে পরাজিত ও নিহত হইতে হয় (১৩১২—১৩)।

মালিক কাফুর

দেবগিরি (১৩০৭)

তেলিঙ্গানা (১৩০৯)

দোরসমুদ্র (১৩১০)

আলাউদ্দীনের সাম্রাজ্য

দেবগিরিতে বিদ্রোহ দমন (১৩১২—১৩)

আলাউদ্দীন প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষের অবিসম্বাদী সুলতান হইয়া

উঠিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার শেষজীবন শারীরিক ও মানসিক অশান্তিতে বিষময় হইয়া উঠিল। কাফুরের ষড়যন্ত্রে তাঁহার পরিবারে গৃহবিচ্ছেদ দেখা দিল এবং তাঁহার কঠোর শাসনের ফলে রাজ্যের নানাস্থানে বিদ্রোহ হইতে লাগিল। ১৩১৬ খৃঃ অব্দে আলাউদ্দীনের মৃত্যু হয়। কথিত আছে, কাফুরই তাঁহাকে ঔষধ বলিয়া বিষ দিয়া মারিয়া ফেলিয়াছিলেন।

শেষজীবন ও মৃত্যু (১৩১৬)

আলাউদ্দীনের রাজত্বকালেই মুসলিম-শক্তি প্রথম প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষে পরিব্যাপ্ত হয়। সুতরাং তিনি যে একজন দিগ্বিজয়ী সুলতান ছিলেন তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। তাঁহার রণকৌশল বাস্তবিক উচ্চস্তরের ছিল। পুনঃপুনঃ জয়লাভ করিয়া সুলতান নিজের শক্তিমত্তায় অগাধ আস্থা স্থাপন করিয়াছিলেন এবং নিজেকে তিনি "দ্বিতীয় সেকেন্দর শাহ" (২য় আলেকজাণ্ডার) নামে প্রচার করিবার জন্য তৎকালীন মুদ্রায় উক্ত নাম উৎকীর্ণ করিবার আদেশ দিয়াছিলেন; "খুৎবা" উপাসনায় তাঁহাকে "২য় সেকেন্দর শাহ" বলিয়া উল্লেখ করিতে হইত। নিজেকে ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক বলিয়া প্রচার করিবার ইচ্ছাও তাঁহার হইয়াছিল, কিন্তু পরে জনৈক স্পষ্টবাদী অমাত্যের পরামর্শে তিনি সে দুরাকাঙ্খা পরিত্যাগ করেন। আলাউদ্দীনের সামরিক প্রতিভা যাহাই হউক, তাঁহার ন্যায় কুটিল, নির্মম চরিত্রের সুলতান খুব অল্পই দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। ঐতিহাসিক বরণী লিখিয়া গিয়াছেন যে, "সুলতান আলাউদ্দীন যত নির্দ্দোষ লোকের প্রাণনাশ করিয়া গিয়াছেন মিশরের ফেরো (সম্রাট্) তত লোকের প্রাণদণ্ড বিধান করেন নাই"। রাজ্য-শাসনের দিক দিয়াও তিনি কোনও কৃতিত্ব দেখাইয়া যাইতে পারেন নাই। এ বিষয়ে ইল্‌তুৎমিস্ ও বল্‌বনের স্থান আলাউদ্দীনের অপেক্ষা অনেক উচ্চে।

চরিত্র

রণকৌশল

দুরাকাঙ্খা

'২য় সেকেন্দর শাহ'

'ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক'

নিষ্ঠুরতা

শাসন-প্রতিভার অভাব

অধিকাংশ সুলতানের ন্যায় আলাউদ্দীনও শিল্পকলায় নিজের নাম অক্ষয় করিয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। তিনি দিল্লীর নিকটবর্ত্তী আধুনিক শাহ্‌পুর নামক গ্রামে "সীরী" নাম দিয়া এক নূতন শহর গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত তিনি সাম্রাজ্যের মধ্যে বহু মস্‌জিদ, বিদ্যালয় ও পান্থশালা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

শিল্পানুরাগ

খল্‌জী ও তুঘলুক
শক্তির অভ্যুদয়
পেশোয়ার
লাহোর
মুলতান
ভাটিন্দা
তরাইন
দিল্লী
বদাউন
কনৌজ
আজমীড়
গোয়ালিয়র
চন্দবার
রণথম্ভোর
চিতোর
চন্দেরী
উজ্জয়িনী
কালিঞ্জর
কাশী
গৌড়
ব্রহ্মপুত্র
আসাম
নদীয়া
জুনাগড়
নর্মদা
ইলিচপুর
দেবগিরি
যাদব
মহানদী
বিদার
বরঙ্গল
গোদাবরী
গুলবর্গা
কাকতীয়
রায়চুর
কৃষ্ণা
নেলোর
হোয়সল
কাঞ্চী
পাণ্ড্য
তাঞ্জোর
মদুরা
রামেশ্বর
কায়ল
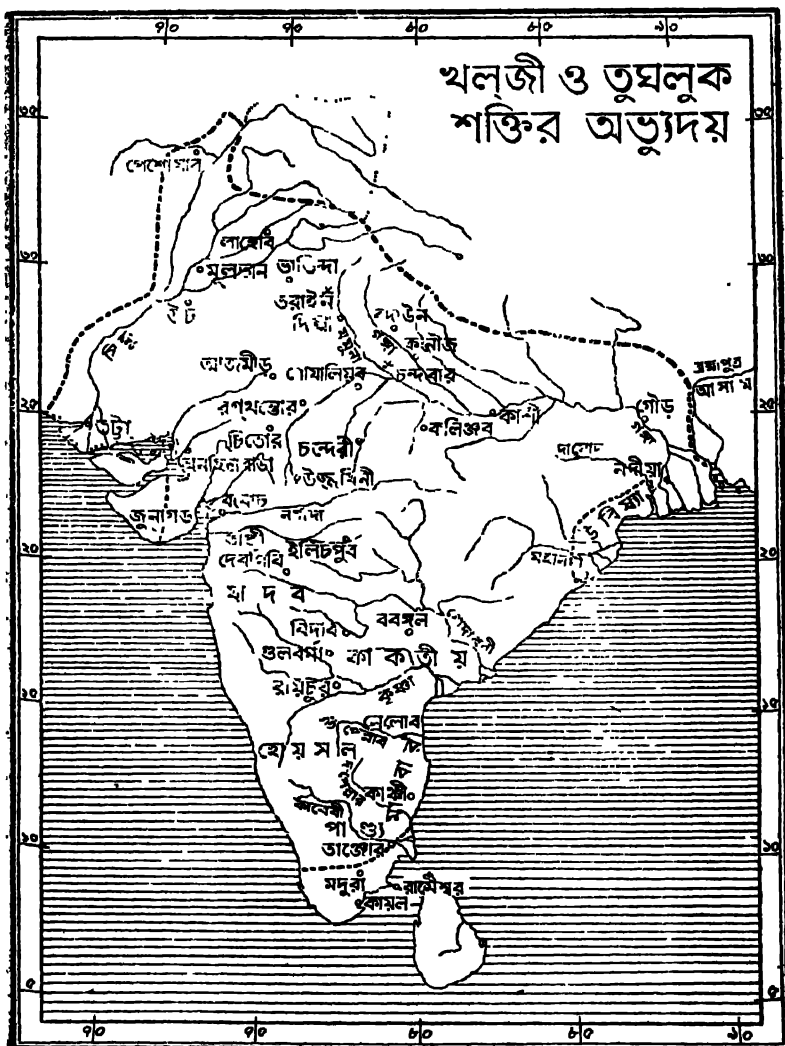
বিখ্যাত কবি, সঙ্গীতজ্ঞ ও সাহিত্যিক আমীর খুসরু আলাউদ্দীনের একজন সভাসদ ছিলেন।

খল্‌জী বংশের অবসান।—আলাউদ্দীনের মৃত্যুর পর মালিক কাফুরই রাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া উঠিলেন। আলাউদ্দীনের এক শিশু পুত্রকে সিংহাসনে বসাইয়া তিনি রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার ক্ষমতা স্থায়ী হইল না,—মাত্র ৩৫ দিন পরেই দেহরক্ষীদের হাতে কাফুর ও নূতন সুলতানের প্রাণ গেল। তারপর কুতুব্‌উদ্দীন মুবারক নামে আলাউদ্দীনের আর এক পুত্রকে সিংহাসনে বসান হইল। কিছুকাল পরে দেবগিরির রাজা রামচন্দ্রের জামাতা হরপালদেব স্বাধীনতা ঘোষণা করিলে কুতুব্‌উদ্দীন মুবারক নিজেই তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়া তাঁহাকে পরাজিত করিলেন (১৩১৮) এবং তাঁহাকে বন্দী করিয়া আনিয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হইল। ইহাতে দেবগিরির যাদববংশ নির্ম্মূল হইয়া যায়। সেখানে একজন মুসলমান শাসনকর্ত্তা রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। ইহার পর সুলতান পুনরায় বরঙ্গল (অন্ধ্র বা তেলিঙ্গানার কাকতীয় রাজাদের রাজধানী) জয় করেন। অতঃপর খুস্‌রু নামে এক ইস্‌লাম ধর্ম্মাবলম্বী নীচজাতীয় হিন্দুর উপর শাসনভার ছাড়িয়া দিয়া তিনি ব্যভিচারে মত্ত হইলেন। অবশেষে একদিন এই প্রিয় অনুচরের হাতেই তাঁহাকে প্রাণ হারাইতে হইল (১৩২০)। খুস্‌রু "নাসির্‌উদ্দীন" উপাধি ধারণ করিয়া সুলতান হইয়া বসিলেন। বসিয়াই তিনি সাড়ম্বরে প্রকাশ্য দরবারে মূর্ত্তি পূজার অনুষ্ঠান করিয়া ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণের কপটতা প্রকাশ করেন। তখন পঞ্জাবের অন্তর্গত দীপালপুরের শাসনকর্ত্তা গাজী মালিক তাঁহাকে পরাজিত ও নিহত করেন (অক্টোবর, ১৩২০)। খল্‌জী বংশের কেহই আর জীবিত ছিলেন না; সুতরাং ওমরাহ্‌দের অনুমোদনে গাজী মালিক "ঘিয়াস্‌উদ্দীন তুঘ্‌লুক শাহ" নাম ধারণ করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন।

কাফুর

কুতব্‌উদ্দীন মুবারক

হরপালদেব ও যাদব বংশের অবসান (১৩১৮)

খুস্‌রু

মুবারকের মৃত্যু ও খুস্‌রুর রাজ্যাপহরণ

ঘিয়াস্‌উদ্দীন তুঘ্‌লুক

STUDIES AND QUESTIONS

1. Briefly narrate the history of the Khalji Dynasty. (C. U. '29).

2. Give an estimate of the reign and character of Alauddin Khalji. (C. U. '14).

3. Give a brief estimate of Alauddin Khalji as a general, king and administrator. (C. U. '26, '39, '42).

4 When was the Deccan first invaded by the Mahomedans ? Give an estimate of the character and reign of the second emperor of the Khalji Dynasty. (C. U. '19).

5. Sketch the career of Alauddin Khalji. (C. U. '32, '34, '36).

6. Sketch the fortunes of the Muslim power in India under the Khalji Dynasty (C U. '43)

অষ্টাদশ অধ্যায়

তুঘ্‌লুক রাজবংশ

১ম ঘিয়াসুদ্দীন তুঘ্‌লুক।—(১৩২০—২৫) ঘিয়াস্‌উদ্দীন তুঘ্‌লুক দিল্লীর সিংহাসনে যে রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করিয়া যান তাহার নাম "তুঘ্‌লুক বংশ"। বৃদ্ধ বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করিলেও, তিনি শাসনকার্য্যে যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দান করেন। নূতন সুলতান কৃষকদের গুরু করভার লাঘব করিয়া দিলেন। ডাক-বিভাগেও তিনি শৃঙ্খলা স্থাপন করিলেন; শাসনবিভাগে নীতি ও শৃঙ্খলা প্রবর্ত্তিত হওয়ায় দেশে শান্তি স্থাপিত হইল। তিনি "তুঘ্‌লুকাবাদ" নামে দিল্লীর নিকট একটি নূতন শহরেরও পত্তন করিয়াছিলেন।

তুঘ্‌লুক বংশ

শাসন-সংস্কার

আলাউদ্দীনের মৃত্যুর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দাক্ষিণাত্যে বিদ্রোহ আরম্ভ হয়। অনেক রাজা দিল্লীতে অরাজকতার অবসরে, মুসলমানদের অধীনতাপাশ ছিন্ন করিয়াছিলেন। ঘিয়াস্‌উদ্দীন তাঁহার পুত্র ফকর্‌উদ্দীন মুহম্মদ জৌনাকে বিদ্রোহ দমনের জন্য বরঙ্গলে

বরঙ্গল অধিকার

প্রেরণ করিলেন (১৩২১)। বরঙ্গলে তখনও কাকতীয়-রাজ প্রতাপরুদ্রদেব রাজত্ব করিতেছিলেন। প্রথম অভিযান ব্যর্থ হইলে ১৩২৩ খৃঃ অব্দে পুনরায় বরঙ্গল আক্রমণ করিয়া জৌনা খাঁ প্রতাপ-রুদ্রদেবকে বন্দী করিয়া ফেলিলেন। ওদিকে বুঘ্‌রা খাঁর বংশধরগণ বাঙ্গালায় প্রায় স্বাধীন শাসন-তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। এই সময় তাঁহাদের মধ্যে গৃহবিবাদের সুযোগে ঘিয়াস্‌উদ্দীন স্বয়ং স্বসৈন্যে বাঙ্গালায় অভিযান করেন এবং সেখানে দিল্লীর শাসন প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রত্যাবর্ত্তনের পথে ত্রিহুত জয় করিলেন। জৌনা খাঁ দিল্লীতে এক সুবৃহৎ দারুমণ্ডপ নির্ম্মাণ করাইয়া সেখানে মহাসমারোহে পিতাকে অভ্যর্থনা করেন। অকস্মাৎ দারুমণ্ডপটি ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং সুলতান তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র মামুদের সহিত মৃত্যু-মুখে পতিত হইলেন (১৩২৫)।

বাঙ্গালায় প্রভুত্ব স্থাপন, ত্রিহুত জয়

ঘিয়াস্‌উদ্দীনের মৃত্যু (১৩২৫)

মুহম্মদ বিন্ তুঘ্‌লুক।—অতঃপর জৌনা খাঁ সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। তিনি "মুহম্মদ বিন্ তুঘ্‌লুক" (তুঘ্‌লুক-পুত্র মুহম্মদ) নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ। মুহম্মদ ছিলেন দোষে-গুণে এক অদ্ভুত স্বভাবের লোক। গণিত, বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য, প্রভৃতি নানাশাস্ত্রে তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন। সুকবি বলিয়াও তাঁহার খ্যাতি ছিল। তাঁহার অসাধারণ স্মরণশক্তি এবং তর্কশাস্ত্রে অসামান্য অধিকার সমসাময়িক পণ্ডিতদের বিস্ময় উৎপাদন করিত। তাঁহার ব্যক্তিগত চরিত্রও ছিল সম্পূর্ণ নিষ্কলুষ। প্রত্যহ তিনি নিয়মিতভাবে নমাজ পড়িতেন, কখনও মদ্যপান করিতেন না এবং প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় নিরলসভাবে ইস্‌লামের অনুশাসন মানিয়া চলিতেন। রণক্ষেত্রে বীরত্ব ও কর্ম্মপটুতার জন্যও তাঁহার খ্যাতি ছিল। কিন্তু তাঁহার স্বভাবে বিন্দুমাত্র সামঞ্জস্য ছিল না। স্বভাবতঃ তিনি ছিলেন ন্যায়পরায়ণ, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে প্রায়ই তিনি ন্যায়ের মর্য্যাদা পদদলিত করিয়া গিয়াছেন। অর্থনীতিক সংস্কার করিতে গিয়া তিনি দেশের আর্থিক জীবনে এক মহাবিপর্য্যয় বাধাইয়া তুলিয়াছিলেন। রাজ্য-জয়ের অদম্য উচ্চাভিলাষের ফলে তাঁহারই রাজত্বকালে তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্য ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছিল। রাজভাণ্ডারের অপরিমেয় ধনরাশিও প্রায় নিঃশেষ হইয়া পড়িয়া-ছিল। অধিকাংশ যুদ্ধেই তিনি জয়লাভ করিয়াছিলেন, তবুও

মহম্মদ তুঘ্‌লুকের চরিত্র

আসন্ন বিনাশের কবল হইতে সাম্রাজ্য রক্ষা করিতে পারেন নাই। প্রজার উপকার করিতে গিয়া প্রজাপীড়নের যে অদ্ভুত দৃষ্টান্ত তিনি রাখিয়া গিয়াছেন তাহার তুলনা পাওয়া কঠিন।

আভ্যন্তরীণ শাসননীতি

রাজপদ লাভ করিয়াই তিনি সাম্রাজ্যের সব প্রাদেশিক শাসকদের দিল্লীতে আহ্বান করিয়া সমগ্র রাজত্বের রাজস্ব ও জমির হিসাব রাখার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু তিনি রাজকর এমনভাবে বাড়াইয়া দিলেন যে, দরিদ্র কৃষকদের দুর্দ্দশার আর সীমা রহিল না। অনেকেই বনজঙ্গলে গিয়া আশ্রয় লইল। সুলতানের আদেশে বন ঘিরিয়া ফেলিয়া যাহাকে পাওয়া গেল তাহারই প্রাণবধ করা হইতে লাগিল। কৃষিকার্য্য একরকম বন্ধ হইয়া গেল, দেশে দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হইল। প্রতিকারার্থে তিনি ছয় মাস ব্যাপী সমস্ত প্রজাদের শস্যাদি এবং অন্নব্যঞ্জনাদি বিতরণ করিয়াছিলেন এবং কৃষিচালনার জন্য নিঃস্ব চাষীদেব রাজকোষ হইতে অর্থ ধার দিয়াছিলেন।

করবৃদ্ধি, কৃষকদের দুরবস্থা

'মানুষ-শিকার'

দেবগিরিতে রাজধানী পরিবর্ত্তন

খেয়ালী সুলতান হঠাৎ দিল্লী হইতে দেবগিরিতে রাজধানী পরিবর্ত্তন করিতে মনস্থ করিলেন। দক্ষিণাপথে তখন দিল্লীর আধিপত্য সবেমাত্র স্থাপিত হইয়াছে। সেখানে বারবার বিদ্রোহও হইতেছিল। দেবগিরিতে একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া তাহার নূতন নামকরণ করা হইয়াছিল "দৌলতাবাদ"। তিনি দিল্লীর সকল অধিবাসীকে জোর করিয়া দৌলতাবাদে পাঠাইলেন। ইহাতে সাধারণ লোকদের দুর্দ্দশার অবধি রহিল না। আট বৎসর পরে "দৌলতাবাদ" সুলতানের আর ভাল লাগিল না, তখন সকলকে লইয়া তিনি পুনরায় দিল্লীতে ফিরিয়া আসিলেন।

দিগ্বিজয়ের সখ

দিগ্বিজয়ের অভিপ্রায়ে সুলতান রাজত্বের প্রথম দিকেই একবার পারস্যের অধীনস্থ ইরাক ও খোরাসান জয় করিবার জন্য তিন লক্ষ সত্তর হাজার সৈন্য সংগ্রহ করিলেন। এক বৎসর যাবৎ এই বিশাল বাহিনীর রসদ যোগাইয়া অবশেষে পারস্য জয় অসম্ভব বিবেচনায় সৈন্যদের বিদায় দিতে হইল। কথিত আছে, আর একবার তিনি চীনদেশ জয়ের কল্পনায় মাতিয়া উঠিয়াছিলেন। সুলতানের ভাগিনেয় খুসরু মালিকের নেতৃত্বে এক বিরাট বাহিনী নেপালের দিকে প্রেরিত হইল (১৩৩৭—৩৮) কিন্তু পার্ব্বত্য প্রদেশে তাহা বিধ্বস্ত হইয়া গেল।

চীন জয়ের সঙ্কল্প

এই সকল অভিযানের ফলে রাজকোষ শূন্য হইয়া আসিল। তখন সুলতান চীনদেশে প্রচলিত কাগজের নোটের অনুকরণে এদেশে তামার নোট চালাইবার ব্যবস্থা করিলেন। মুদ্রানীতির দিক হইতে এ ব্যবস্থা শাস্ত্রসম্মত। কিন্তু এই নোট যাহাতে কেহ জাল করিতে না পারে, এরূপ কোন সতর্কতা না থাকায় লোকে অবাধে নোট জাল করিয়া অর্থশালী হইতে লাগিল; রাজকোষ জাল নোটে ভরিয়া গেল। বিদেশী বণিকগণ উহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিল। ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য প্রায় বন্ধ হইবার উপক্রম হইল। বাধ্য হইয়া সুলতান নোটের প্রচলন বন্ধ করিয়া দিলেন; রাজকোষে যত জাল নোট জমিয়া উঠিয়াছিল তাহার বিনিময়ে পূর্ণ মূল্য ফিরাইয়া দিলেন। ইহাতে রাজকোষের বিলক্ষণ ক্ষতি হইয়া গেল।

তামার নোট

সুলতানের এই সকল কার্য্যের ফলে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহ দেখা দিল এবং বাঙ্গালা, অযোধ্যা, মালব, গুজরাট, মথুরা ও বিদর প্রভৃতি স্থানের শাসনকর্তারা স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন। সুলতান কয়েকটি বিদ্রোহ দমন করিলেন। কিন্তু বাঙ্গালাদেশে সাম্‌সউদ্দীন ইলিয়াস শাহের নেতৃত্বে একটি স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইল। এদিকে মা'বারে জালাল্‌উদ্দীন আহ্‌শান শাহ বিদ্রোহ করিয়া স্বাধীন হইয়া গেলেন।* সুলতান তাঁহাকে দমন করিতে সক্ষম হইলেন না। মাদুরা ও তেলিঙ্গানা স্বাধীন হইল। দাক্ষিণাত্যে তখন হিন্দু ও মুসলমানগণ দিল্লীর বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ হন এবং তাহারই ফলে কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণে বিজয়-নগরের হিন্দুরাজ্য (১৩৩৬) এবং কৃষ্ণার উত্তরে মুস্‌লিম বাহ্‌মনী রাজ্য স্থাপিত হয় (১৩৪৭)। সুলতান বিদ্রোহ দমনের জন্য সাম্রাজ্যের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত অবধি কেবলই ধাবিত

বিদ্রোহ ও রাষ্ট্রবিপর্য্য

বঙ্গদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা

মা'বারের স্বাধীনতা

মাদুরা ও তেলিঙ্গানার স্বাধীনতা

বিজয়নগর ও বাহ্‌মনী রাজ্য

* মা'বার কথাটিকে অনেকেই 'মালাবার' শব্দের সংক্ষিপ্ত অপভ্রংশ মনে করিয়া ভুল করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে উহা মাদুরার সন্নিহিত স্থান হইতে করমণ্ডল উপকূলের নেল্লোর পর্য্যন্ত ভূ-ভাগকে বুঝাইত। নেল্লোর উত্তর-পেন্নার নদীর মোহনার কাছে অবস্থিত। 'মা'বার' বলিতে ঠিক মালাবারের বিপরীত দিকই বুঝিতে হইবে।

হইতেছিলেন। অবশেষে সিন্ধুদেশের তট্টা নামক স্থানে তিনি পীড়িত হইয়া পড়েন ; সেখানেই তাহার মৃত্যু হয় (মার্চ্চ, ১৩৫১)।

মহম্মদ তুঘ্‌লুকের মৃত্যু (১৩৫১)

খলিফার সহিত সম্বন্ধ।—গোঁড়া মুসলমানের মত মুহম্মদ মনে করিতেন যে, খলিফা মর্ত্ত্যে ভগবানের প্রতিনিধি এবং তাঁহার সম্মতি ব্যতীত কেহই রাজ্য শাসনের অধিকারী হইতে পারেন না। সুতরাং সুলতান খলিফার নিকট একজন দূত প্রেরণ করেন। খলিফা তখন রাজ্যচ্যুত হইয়া মিশরের সুলতানের আশ্রয়ে বাস করিতেছিলেন। ১৩৪৪ খৃষ্টাব্দে খলিফার দূত সনন্দসহ দিল্লীতে উপস্থিত হইলে মুহম্মদ তাঁহাকে সসম্মানে অভ্যর্থনা করিয়া প্রচুর ধনরত্ন উপহার দিযাছিলেন।

ইব্‌ন্ বতুতা

ইব্‌ন্‌ বতুতা নামক উত্তর আফ্রিকার অন্তর্গত মরক্কো নিবাসী একজন খ্যাতনামা আরব পর্য্যটক মুহম্মদ তুঘ্‌লুকের রাজত্বকালে ভারতে উপস্থিত হন। সুলতান তাঁহাকে দিল্লীর কাজীর পদে নিযুক্ত করেন। কয়েক বৎসর পরে তিনি তাঁহাকে চীনদেশে দৌত্যকার্য্যে প্রেরণ করেন। বতুতা চীন যাইবার পথে বাঙ্গালা দেশের চট্টগ্রাম ও শ্রীহট্টে আসিয়াছিলেন। বাঙ্গালাদেশে জিনিষ-পত্রের মূল্য তখন অত্যন্ত সস্তা ছিল। তাঁহার লিখিত বিবরণ হইতে সমসাময়িক চীন ও ভারতের বহু তথ্য জানা যায়। বতুতা ভারতের সহিত চীনের সাংস্কৃতিক সম্বন্ধ উপলক্ষে যাহা লিখিয়াছেন তাহার সহিত ক্যাথলিক পাদ্রী Odoric এবং ভিনিসীয় পর্য্যটক Marco Polo র বিবরণ একত্রে পাঠ করিলে মধ্যযুগের ভারতবাসীরা যে ব্যবসা বাণিজ্যে ও অর্থগৌরবে পূর্ব্ব ও পশ্চিমে সুপ্রসিদ্ধ ছিল ইহা প্রমাণিত হয়। সুতরাং মধ্যযুগে ভারতীয়েরা কুসংস্কারাচ্ছন্ন হইয়া বহির্জগতের সহিত যোগ রাখিতে ভুলিয়া গিয়াছিল ইহা সত্য নয়। মঙ্গোল সম্রাট কুবলাই খাঁ ও তাঁহার আত্মীয়গণ- বৌদ্ধ ছিলেন ইহা সুবিদিত এবং কুবলাই নেপাল, বঙ্গ ও পূর্ব্বভারত হইতে বৌদ্ধ প্রচারক পণ্ডিত ও বিশেষ ভাবে মূর্ত্তি-নির্ম্মাণদক্ষ শিল্পীদের সমাদরে তাঁহার রাজধানী পিকিনে লইয়া যান। কুবলাই ব্রহ্মদেশ ও ইন্দোচীনে সৈন্য প্রেরণ করিয়া ভারতের পূর্ব্ব সীমান্ত পর্য্যন্ত নিজের রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। ভারতীয় নাবিক ও বণিক্‌সংঙ্ঘ চৈনিকদের সহিত বরাবর সম্বন্ধ রাখিয়াছিল। সুতরাং তুঘ্‌লুকযুগে

চীন ও ভারতের সম্বন্ধ

এক ভারতীয় সম্রাটের চীন জয়ের কল্পনা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই। চীনা কাগজের নোট ভারতীয় বণিকদের সাহায্যে যে সুপরিচিত হয় তাহাতে অর্থনৈতিক সম্বন্ধও প্রমাণিত হয়। ১৪০০ সালেও দেখা যায় যে, চীনা নাবিকগণ ভারত ও অন্য পশ্চিম দেশের বহু মানচিত্র প্রস্তুত করিয়াছিল। এইরূপে মুহম্মদ তুঘ্‌লুকের শাসনকালের অনেক নূতন তথ্য জানা গিয়াছে।

রাজ্যলাভ

ফীরূজ শাহ।—সিন্ধুদেশে অকস্মাৎ মুহম্মদের মৃত্যু হইলে সৈন্যদল নায়কহীন হইয়া পড়িল। তখন সৈন্যাধ্যক্ষগণ মুহম্মদের জ্ঞাতিভ্রাতা ফীরূজকে সুলতান নির্ব্বাচন করিলেন।

কবীর (প্রাচীন চিত্র)

বঙ্গদেশ জয়ের ব্যর্থ চেষ্টা

১৩৫৩—৫৪ খৃঃ অব্দে ফীরূজ বাঙ্গালা দেশ অধিকার করিবার চেষ্টা করেন। সামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ ইকডালা দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বিপুল বিক্রমে সুলতানকে বাধা দিয়া তাঁহার সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিলেন। পরে আর একবার (১৩৬০) সামসুদ্দীনের পুত্র সিকন্দরের রাজত্বকালে সুলতান বাঙ্গালা আক্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তখনও তাঁহাকে ব্যর্থমনোরথ হইয়াই ফিরিয়া যাইতে হইয়াছিল। সিন্ধুদেশেও তিনি দুইবার অভিযান করিয়াছিলেন; শেষ পর্য্যন্ত বহুকষ্টে জয়লাভ করিলেও তাহাতে কোন ফল হয়

সিন্ধুদেশে অভিযান

নাই। দাক্ষিণাত্যে যে সকল স্থান দিল্লীর সুলতানের হস্তচ্যুত হইয়া পড়িয়াছিল সেগুলির পুনরুদ্ধারের জন্য তিনি বিশেষ চেষ্টা করেন নাই। স্বভাবতঃই ফীরূজ ছিলেন দয়ালু প্রকৃতির লোক, —নিরীহ, শান্ত ও নির্ব্বিরোধী। সেকালে অপরাধীদের প্রতি অমানুষিক শাস্তিবিধান করার রীতি ছিল। সুলতান ইহা রহিত করিলেন। আলাউদ্দীন রাজকর্ম্মচারীদিগকে নগদ বেতন দিতেন। ফীরূজের রাজত্বকালে পুনরায় জায়গীর প্রথার প্রবর্ত্তন করা হয়। অনেক অন্যায় কর ও শুল্ক তুলিয়া দেওয়ার ফলে দেশে কৃষি ও বাণিজ্যের উন্নতি হইয়াছিল।

দাক্ষিণাত্য

শাসন-সংস্কার

কিন্তু দয়ালু হইলেও ফীরূজ ধর্ম্ম সম্বন্ধে ছিলেন অত্যন্ত অনুদার। তাঁহার মাতা ছিলেন হিন্দু রাজকন্যা (রাজপুতানী); তথাপি তাঁহার হিন্দুবিদ্বেষ ছিল অপরিসীম। হিন্দুদিগকে প্রকাশ্যভাবে ধর্ম্মাচরণ করিতে নিষেধ করিয়া দেওয়া হইল। হিন্দুদের উপর 'জিজিয়া' নামক কর পূর্ব্বেই স্থাপিত হইয়াছিল, কিন্তু এ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণগণকে সে কর দিতে হয় নাই; ফীরূজের সময় তাঁহাদিগকেও উহা দিতে বাধ্য করা হয়। শিয়া সম্প্রদায়ের মুসলমানদিগের উপরেও তিনি অত্যাচার করিতে ত্রুটি করেন নাই।

ধর্ম্মান্ধতা

হিন্দুবিদ্বেষ, জিজিয়া কর

ফীরূজ শাহ দিল্লীর উপকণ্ঠে "ফীরূজাবাদ" নামে এক নগর স্থাপন করেন। জৌনপুর শহরও তাঁহার প্রতিষ্ঠিত। এতদ্ভিন্ন তিনি অনেকগুলি মস্‌জিদ, মাদ্রাসা, আরোগ্যশালা, প্রভৃতি নির্ম্মাণ করেন। কৃষির উন্নতির জন্য বহু খাল কাটাও তাঁহার আর এক কীর্ত্তি। দুইশত মাইল দীর্ঘ সুপ্রসিদ্ধ যমুনার খাল তাঁহারই সময়ে খনন করা হইয়াছিল।

শিল্পকার্য্য

ফীরূজ সুদীর্ঘ ৩৭ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। ১৩৮৮ খৃঃ অব্দে প্রায় আশী বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়।

মৃত্যু (১৩৮৮)

অরাজকতা।—ফীরূজের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যময় অরাজকতা আরম্ভ হইয়া গেল। ১৩৮৮ হইতে ১৩৯৮ খৃঃ অব্দের মধ্যে পাঁচজন অযোগ্য সুলতান পর পর সিংহাসন লাভ করেন। অবশেষে এই বংশের শেষ সুলতান মামুদ তুঘ্‌লুক সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার রাজত্বকালে প্রসিদ্ধ তৈমুরলঙ্গ ভারত

আক্রমণ করেন। বিশাল দিল্লী সাম্রাজ্য তখন সঙ্কুচিত হইয়া দিল্লী ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী কয়েকটি জেলায় সীমাবদ্ধ হইয়াছিল।

তৈমুরের আক্রমণ।—১৩৯৮ খৃঃ অব্দে সমরকন্দের আমীর পারস্য ও ইরাক-বিজয়ী তৈমুর বেগ ভারতবর্ষ আক্রমণ করিলেন। তৈমুর ছিলেন মঙ্গোলজাতির অন্তর্গত তুর্কীদের চাঘ্‌তাই শাখার নায়ক। তাঁহার একটি পা ছিল খোঁড়া; তাই ইতিহাসে তিনি "তৈমুরলঙ্গ" নামে পরিচিত। চিঙ্গিজ খাঁর পরে এশিয়ায় তাঁহার ন্যায় পরাক্রান্ত দিগ্বিজয়ী আর কেহ ছিল না। চিঙ্গিজ বাবুরের মাতামহকুলের পূর্ব্ব পুরুষ এবং তৈমুর বাবুরের পিতৃকুলের ঊর্দ্ধতন পঞ্চম পুরুষ। সুতরাং তুর্ক-মঙ্গোল বংশ সারা এশিয়ায় বহু সম্রাট্ ও রণনিপুণ বিজেতাকে জন্ম দিয়াছে।

তৈমুরের পরিচয়

তৈমুরের বহুপূর্ব্বেই ভারতবর্ষ মুস্‌লিমদের পদানত হইয়াছিল; তবুও তিনি "হিন্দুস্থানের" বিরুদ্ধে ধর্ম্ম যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। কারণ ভারতবাসী সুলতানগণ হিন্দু পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে যথেষ্ট দৃঢ়তা দেখান নাই। পানিপথের নিকট মামুদ তুঘ্‌লকের সেনাপতি মল্লু খাঁর নেতৃত্বে হিন্দু-মুসলমানের এক সম্মিলিত বাহিনী তৈমুরের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইল, কিন্তু তৈমুর অনায়াসে তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া সগৌরবে দিল্লী প্রবেশ করিলেন। মামুদ তুঘ্‌লুক্ ইতিপূর্ব্বেই গুজরাটে পলায়ন করিয়াছিলেন। দিল্লীতে প্রবেশের পথেই একলক্ষ বন্দীকে হত্যা করা হইয়াছিল। সেখানে প্রবেশ করিয়া একাদিক্রমে পাঁচদিন নগরী লুণ্ঠন করা হইল, সহস্র সহস্র স্ত্রীপুরুষ, বালকবালিকার প্রাণনাশ করা হইল। তারপর শত শত বৎসরের সঞ্চিত ধনরাশি লুণ্ঠন করিয়া তৈমুর সমরকন্দে ফিরিয়া গেলেন। এই সময়ে পারস্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি হাফেজের সহিত তৈমুরের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তৈমুর সহস্র সহস্র নরনারীকে বন্দী করিয়া লইয়া দেশে ফিরিলেন; বন্দীদের মধ্যে অনেক ভারতীয় শিল্পীও ছিলেন; তাঁহাদিগকে সমরকন্দের প্রাসাদ, অট্টালিকা, প্রভৃতি নির্ম্মাণে নিযুক্ত করা হয়, অপর সকলকে দাসদাসীরূপে বিক্রয় করিয়া দেওয়া হয়। তৈমুর দেশে ফিরিবার পর দুর্ভিক্ষ ও মহামারীতে ধনজনপূর্ণ দিল্লী নগরী শ্মশানে পরিণত হইল।

অমানুষিক অত্যাচার

তৈমুর চলিয়া গেলে সুলতান দিল্লীতে ফিরিয়া আসিলেন বটে,

কিন্তু সে মহাশ্মশানে বসিয়া তুঘ্লুক বংশের লুপ্ত গৌরব ফিরাইয়া আনিবার কোনই সম্ভাবনা আর ছিল না। অবশেষে দীর্ঘ তেইশ বৎসর নামেমাত্র রাজত্ব করিবার পর ১৪১৩ খৃঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হইল,—মামুদ শাহের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তুঘ্লুক বংশও নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল।

তুঘ্লুক বংশের অবসান (১৪১৩)

STUDIES AND QUESTIONS

1. Briefly narrate the history of the Tughlaq Sultans of Delhi. (C. U. '27).

2. Give some account of the reign of Muhammad Tughlaq, and show how his measures led to the decline of the Empire of Delhi. (C. U. '31,'45).

3. "The reign of Muhammad Bin Tughlaq stands out as one of the most calamitous periods in Indian history".—Discuss. (C. U. '24).

4. Give some account of the services rendered to his people by Firoz Shah Tughlaq. (C. U. '16, '29), and indicate the causes which led to the downfall of the Pathan Empire. (C. U,'16).

5. Give an account of the invasion of Timur. Compare it with the invasion of Nadir Shah (C.U.'22, '26).

ঊনবিংশ অধ্যায়

সৈয়দ ও লোদী সুলতানগণ

সৈয়দগণ।—মামুদ তুঘ্লুকের মৃত্যুর পর দৌলত খাঁ লোদী নামে জনৈক অমাত্য সামান্য কিছুকাল দিল্লী শাসন করেন। তারপর মুলতানের শাসনকর্ত্তা খিজ্র খাঁ দিল্লী অধিকার করিলেন (১৪১৪)। খিজ্র খাঁ এবং তাঁহার বংশধরগণ "সৈয়দ" নামে পরিচিত, কারণ তাঁহারা নিজেদের হজরত মুহম্মদের দৌহিত্র-বংশ বলিয়া পরিচয় দিতেন। খিজ্র খাঁ কখনও নিজেকে সুলতান বলিয়া পরিচয় দেন নাই, তিনি তৈমুর এবং তাঁহার পুত্রদের প্রতিনিধি হিসাবেই দিল্লী শাসন করিতেন। দিল্লী রাজ্য তখন

খিজ্র খাঁ

দিল্লী ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু ১৪২১ খৃঃ অব্দে খিজ্‌র খাঁর মৃত্যু হইলে, মুইজউদ্দীন মুবারক শাহ সুলতান বলিয়া নিজেকে ঘোষণা করিলেন এবং তৈমুর বংশধরদের প্রতিনিধিত্ব অস্বীকার করেন। ১৪৫১ খৃঃ অব্দে পঞ্জাবের আফগান শাসনকর্ত্তা বহ্‌লুল লোদী দিল্লী অধিকার করিলেন।

বহ্‌লুল লোদীর দিল্লী অধিকার (১৪৫১)

লোদীবংশ।—বহ্‌লুল লোদীই ছিলেন দিল্লীর প্রথম আফগান সুলতান। তৈমুরের আক্রমণের পর জৌনপুরে এক স্বাধীন রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল। বহ্‌লুল জৌনপুররাজ হুসেন শাহকে পরাভূত করিয়া নিজ পুত্র বার্‌বক শাহকে সেখানকার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিলেন। পূর্ব্বে কাশী এবং দক্ষিণে বুন্দেলখণ্ডের সীমা পর্য্যন্ত তাঁহার আধিপত্য মোটামুটিভাবে স্বীকৃত হইল। অনেকদিন অরাজকতার পর আবার দিল্লীতে শৃঙ্খলা ফিরিয়া আসিল।

জৌনপুর জয়

১৪৮৯ খৃঃ অব্দে বহ্‌লুলের মৃত্যুর পর তাঁহার এক পুত্র নিজাম খাঁ "সিকন্দর শাহ" উপাধি ধারণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। ইহাতে দিল্লীর আফগান ওমরাহ্‌গণ আপত্তি তুলিয়াছিলেন কারণ তাঁহার মাতা ছিলেন একজন হিন্দু স্বর্ণকারের কন্যা। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জৌনপুরের বার্‌বক শাহের সহিতও বিরোধ বাধিয়া গেল। সিকন্দর তাঁহাকে পরাভূত করিয়া জৌনপুর অধিকার করিয়া লইলেন। তারপর বিহার জয় করিয়া তিনি ত্রিহুত পর্য্যন্ত রাজ্যসীমা বিস্তার করেন। সিকন্দরের রাজত্বকাল দ্রব্যাদির সুলভ মূল্যের জন্য প্রসিদ্ধ হইয়া আছে। ন্যায়পরায়ণতা এবং সুশাসনের জন্যও তিনি বিখ্যাত ছিলেন। ইহাতে জমিদার ও ওমরাহ্‌দের স্বেচ্ছাচার হ্রাস পাইতে থাকে প্রজারাও অরাজকতার হাত হইতে পরিত্রাণ লাভ করে। কিন্তু সুশাসক হইলেও সিকন্দর ছিলেন অত্যন্ত হিন্দুবিদ্বেষী। মথুরার হিন্দুমন্দিরগুলির ধ্বংসকার্য্য তিনি সম্পূর্ণ করেন। বহুকাল পূর্ব্বে গজনীর সুলতান মামুদ আগ্রা শহরটি বিধ্বস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। সিকন্দর লোদী উহার সংস্কার সাধন করিয়া শ্রীহীন শহরটিকে নূতন করিয়া গড়িয়া তোলেন।

সিকন্দর লোদী

দেশের সমৃদ্ধি

ন্যায়বিচার

হিন্দুবিদ্বেষ

আগ্রার সংস্কার সাধন

১৫১৭ খৃঃ অব্দে সিকন্দরের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র ইব্রাহিম সুলতান-পদে অভিষিক্ত হইলেন। ওমরাহ্‌দের চক্রান্তে রাজ্যে

ইব্রাহিম লোদী

পুনরায় অরাজকতা দেখা দিল; সুলতানও কঠোর হইতে কঠোরতর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে লাগিলেন। তাহাতে অসন্তোষ আরও বাড়িয়া গেল। শেষে একদিকে বিহারের শাসনকর্ত্তা দরিয়া খাঁ লোহানী স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন, অপর দিকে লাহোরের আফগান শাসনকর্ত্তা দৌলত খাঁ লোদী কাবুলের মুঘল রাজা বাবুরকে দিল্লীজয়ের জন্য সসম্মানে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। পানিপথের প্রসিদ্ধ রণাঙ্গণে বাবুর ও ইব্রাহিম লোদীর যুদ্ধ হইল। শেষ আফগান সম্রাট্ ইব্রাহিম বীরের ন্যায় যুদ্ধ করিয়া রণক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিলেন (২১শে এপ্রিল, ১৫২৬)। বাবুর দিল্লী অধিকার করিলেন; দিল্লীতে পুনরায় তুর্কী আধিপত্য স্থাপিত হইল।

আভ্যন্তরীণ ষড়যন্ত্র

পানিপথের ১ম যুদ্ধ (১৫২৬)

STUDIES AND QUESTIONS

1. How long did the Pathan Dynasty (Sultanate) last in India? What were the causes of their downfall? (C. U. '10, '13, '16, '19, '23)

2. Describe the political condition of India at the time of Babur's invasion. (C. U. '11, '18).

3. Describe the Mogul incursions into India previous to the invasion of Babur (C U '14).

বিংশ অধ্যায়

প্রাদেশিক রাজ্যসমূহের অভ্যুত্থান

(উত্তর-ভারত)

পূর্ব্বাভাষ।—কুতব্ উদ্দীনের সিংহাসনের আরোহণ (১২০৬) হইতে পানিপথের যুদ্ধে বাবুরের জয়লাভ (১৫২৬) পর্য্যন্ত কিঞ্চিদধিক তিনশত বৎসরের ইতিহাস ছিল ভারতবর্ষে তুর্কীশাসনের প্রথম অধ্যায়। এই সুদীর্ঘ কালকে দুইটি পর্ব্বে ভাগ করা যাইতে পারে। প্রথম পর্ব্বে আমরা পাই দিল্লীর তুর্কী সুলতানদের প্রাধান্য বিস্তার, —ইহা ১২০৬ খৃঃ অব্দ হইতে ১৩৩৮ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত একশত বত্রিশ বৎসরের ইতিহাস। ইহার প্রথম ভাগ (১২০৬—১২৯০)

তুর্কী-আধিপত্যের প্রথম অধ্যায় (১২০৬-১৫২৬)

সুলতানী আধিপত্য বিস্তারের যুগ (১২০৬-১৩৩৮)

ব্যয়িত হয় উত্তরভারতে তুর্কীপ্রাধান্য প্রতিষ্ঠায় এবং দ্বিতীয় ভাগের মূল রাজনীতিক ঘটনা দাক্ষিণাত্যে মুসলমান অধিকার বিস্তার। ১৩৩৮ খৃঃ অব্দ হইতে ১৫২৬ পর্য্যন্ত আমরা দুইশত বৎসর ধরিয়া সমগ্র ভারতে দিল্লীর সুলতানদের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া দেখিতে পাই। তখন হইতে তুর্কীশাসনের দ্বিতীয় পর্ব্বের সূচনা হয়। এই সময়ে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে বহু স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে দিল্লী সাম্রাজ্যের পতন আরম্ভ হয়।

সুলতানগণের পতনের যুগ (১৩৩৮-১৫২৬)

বঙ্গদেশ।—ইখ্‌তিয়ার্‌উদ্দীন মুহম্মদ লক্ষ্মণসেনের নিকট হইতে পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গ অধিকার করিয়াছিলেন। কিন্তু সমগ্র বঙ্গদেশ কখন তুর্কীদের পদানত হয় তাহা বলা কঠিন। সম্ভবতঃ ত্রয়োদশ শতকের শেষার্দ্ধে সমগ্র বাঙ্গালায় তুর্কী আধিপত্য বিস্তৃত হয়। ইখ্‌তিয়ার্‌উদ্দীনের মৃত্যুর পর "দাসরাজ" কুতব্‌উদ্দীনের আদেশে আলিমর্দ্দান খল্‌জী বঙ্গের শাসনভার গ্রহণ করেন। ইখ্‌-তিয়ার্‌উদ্দীনও খল্‌জী বংশীয় ছিলেন। এ ভাবেই বঙ্গদেশে খল্‌জী ওমরাহ্‌দের শাসন প্রবর্ত্তিত হয়। দিল্লী হইতে বঙ্গদেশের দূরত্ব অল্প নয়; তাই সুযোগ পাইলেই বঙ্গের শাসকগণ দিল্লীশ্বরের অধীনতাপাশ ছিন্ন করিতে চেষ্টা করিতেন।

তুর্কী-বিজয়

খল্‌জী শাসন

অশান্তি

সুলতান ইল্‌তুৎমিসের সময় বাঙ্গালার শাসক ইবাজ খাঁ প্রতাপশালী হইয়া উঠেন এবং দিল্লীর প্রাধান্য অস্বীকার করেন। কিন্তু অবশেষে ইল্‌তুৎমিসের নিকট তাঁহাকে বশ্যতা স্বীকার করিতে হয় (১২২৭)। ইহার পর বাঙ্গালার শাসকগণ প্রতিবেশী রাজ্য-গুলির (উড়িষ্যা, আসাম) সহিত যুদ্ধবিগ্রহ করিয়া দিন কাটাইতে লাগিলেন। অবশেষে সুলতান বল্‌বনের রাজত্বকালে বঙ্গের শাসনকর্ত্তা তুগ্রিল খাঁ স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া দুই-দুইবার দিল্লীর সৈন্যদলকে পরাজিত করিলে বল্‌বন স্বয়ং বাঙ্গালায় প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে পরাজিত ও নিহত করেন (১২৭৯—৮২); এবং বল্‌বনের পুত্র বুঘ্‌রা খাঁর উপর বঙ্গের শাসনভার ন্যস্ত হয়। তখন হইতে বুঘ্‌রা খাঁর বংশধরগণই বাঙ্গালা শাসন করিতে থাকেন। আলা-উদ্দীন খল্‌জীর মৃত্যুর পর দিল্লীতে অরাজকতার সুযোগে বঙ্গদেশে পুনরায় বিদ্রোহ দেখা দেয়। আবার সঙ্গে সঙ্গে বুঘ্‌রা খাঁর উত্তরা-ধিকারীদের মধ্যেও গৃহবিবাদ আরম্ভ হইয়া যায়। ঘিয়াস্‌উদ্দীন

ইল্‌তুৎমিসের হাতে বিদ্রোহীদের পরাজয়

তুগ্রিল খাঁর বিদ্রোহ ও পরাজয়

তুঘ্‌লুক (১ম) স্বয়ং বাঙ্গালায় গমন করিয়া বিদ্রোহীদিগকে দমন করিলেন। তারপর সেখানকার অন্তর্বিপ্লব দূর করিবার অভিপ্রায়ে মুহম্মদ বিন্‌ তুঘ্‌লুক বঙ্গদেশকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক অংশে একজন শাসক নিযুক্ত করেন,—পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী হইল লক্ষ্মণাবতী, পূর্ব্ববঙ্গের রাজধানী সোনার গাঁ, আর দক্ষিণবঙ্গের সপ্তগ্রাম। কিন্তু ইহাতে অশান্তি না কমিয়া বরং বাড়িয়াই গেল, বিভিন্ন অঞ্চলের শাসকগণ নিজেদের মধ্যে কেবলই যুদ্ধবিগ্রহ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। ১৩৩৮—৩৯ খৃঃ অব্দে মুহম্মদ তুঘ্‌লুকের রাজত্বকালে অরাজকতার সুযোগ লইয়া সোনার গাঁ হইতে ফকর্‌উদ্দীন মুবারক শাহ পূর্ব্ববঙ্গে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। কিছু কালের মধ্যেই আলাউদ্দীন আলী শাহের নেতৃত্বে লক্ষ্মণাবতী হইতে পশ্চিমবঙ্গেও বিদ্রোহ ঘোষিত হয়। তাহার পর সাম্‌স্‌উদ্দীন ইলিয়াস্‌ শাহ সমগ্র বঙ্গদেশ অধিকার করিলেন এবং পাণ্ডুয়ার রাজধানী স্থাপন করিয়া স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। সাম্‌স্‌উদ্দীন ইলিয়াস্‌ শাহ সম্ভবতঃ ১৩৪২ হইতে ১৩৫৭ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। শুনিতে পাওয়া যায় যে, বঙ্গদেশ হইতে বারাণসী পর্য্যন্ত সমগ্র ভূ-ভাগ তাঁহার করায়ত্ত হইয়াছিল। সুলতান ফীরূজ শাহ স্বয়ং তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিয়াও তাঁহাকে বশ্যতা স্বীকার করাইতে পারেন নাই (১৩৫৩)। সাম্‌স্‌উদ্দীন ইলিয়াস্‌ শাহের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র সিকন্দর শাহ বাঙ্গালার সিংহাসনে আরোহণ করেন। এবারও দিল্লীশ্বর ফীরূজ শাহ বঙ্গদেশ আক্রমণ করিয়া ব্যর্থমনোরথ হন। সিকন্দরের রাজত্বকালে পাণ্ডুয়ায় বিখ্যাত আদিনা মস্‌জিদ নির্ম্মিত হয়। সিকন্দরের পুত্র ঘিয়াস্‌উদ্দিন আজম সম্ভবতঃ ১৩৯৩ খৃঃ অব্দ হইতে ১৪১০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত কৃতিত্বের সহিত বঙ্গদেশ শাসন করেন। সিকন্দর শাহ যখন পাণ্ডুয়ায় রাজত্ব করিতেছিলেন তখন তাঁহার পুত্র ঘিয়াস্‌-উদ্দীন সোনার গাঁয় নিজ রাজধানী স্থাপন করিয়া স্বাধীন ভাবে শাসন করিতে থাকেন। তিনি একদিকে যেমন পারস্যের সুপ্রসিদ্ধ কবি হাফেজকে বাঙ্গলায় আমন্ত্রণ করেন, তেমনি চীনদেশের সহিতও সম্বন্ধ স্থাপনে সচেষ্ট ছিলেন। মিং বংশের সম্রাট ইয়ং-লোর নিকট ১৪০৮ সালে ঘিয়াস্‌ বাংলাদেশের বিচিত্র শিল্প-সম্ভার সমেত দূত প্রেরণ

গিয়াস্‌উদ্দীন তুঘ্‌লুক অশান্তি দমন

বঙ্গবিভাগ

পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গে বিদ্রোহ

সামস্‌উদ্দীন ইলিয়াস শাহের স্বাধীনতা

সিকন্দর শাহ

ঘিয়াস্‌উদ্দীন আজম ও চীন সাম্রাজ্যে দৌত্য (১৪০৮-১৪১৮)

করেন, এবং ১৪৩৮ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত বাংলার স্বাধীন সুলতানদের সহিত মিং সম্রাটদের আদান প্রদান চলিয়াছিল। সম্রাট ইয়ং-লো সুদক্ষ চীনা নাবিকদের সাহায্যে জলপথে মৈত্রীদূতগণকে বাঙ্গালা-দেশে প্রেরণ করেন। ৬২ খানি চীনাজাহাজ ৩০,০০০ হাজার সৈন্য লস্কর ও রাজপ্রতিনিধির সহিত কোচিনচীন ও মালয় অতি-বাহন করিয়া সুমাত্রা নিকোবর দ্বীপ পার হইয়া চাটগাঁ হইতে ক্রমশঃ মেঘনানদীর তীরস্থ সোনার গাঁ এবং শেষে পাণ্ডুয়ায় আসিয়া উপস্থিত হয়। চীনা দোভাষী পণ্ডিতপ্রবর মাহুয়ান (Ma Huan) এই সময়ে যে বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন তাহার নাম Ying yai sheng lan : এই বইটি মিং (Ming) রাজবংশের ইতিহাসের মধ্যে সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাতে লিখিত আছে—বাঙ্গালীরা চামড়াব জুতা ব্যবহার করিত, মেয়েরা রেশমের জামা ও শাড়ী এবং বহুবিধ মূল্যবান অলঙ্কার পরিত। পুরুষরা অত্যন্ত লম্বা, চওড়া ও বলিষ্ঠ ছিল। বাংলার সঙ্গীত, বাদ্যযন্ত্র, নটীদের নৃত্যকলা, নারীদের বহুমূল্য অলঙ্কার, মসলিন, গাছের ছালের কাগজে নির্ম্মিত পঞ্জিকা (Calendar), প্রভৃতি বহু কারুশিল্পের (arts & crafts) উচ্ছ্বসিত প্রশংসা উক্ত চীনা ঐতিহাসিক করিয়া গিয়াছেন। ঘিয়াসের পৌত্র সাম্‌সুদ্দিন (১৪৩১—৪২) ও চীনা রাজদরবারের সহিত সম্বন্ধ বজায় রাখিয়া-ছিলেন এবং ১৪৩৮ সালে যে উপঢৌকন বাংলাদেশ হইতে প্রেরণ করা হইয়াছিল তাহার মধ্যে গণ্ডারের খড়্গ, ময়ূব, পুচ্ছ ও বিচিত্র মণিখচিত আসবাব, কিংখাপ, শুক পাখী, জিরাফ্, প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশের বদান্যতা ও ঐশ্বর্য্যের প্রচুর সুখ্যাতি এই সময়কার চীনা ইতিবৃত্তে পাওয়া যায়। ইহার দুই শতাব্দী পরে মাঞ্চু (Manchu) বংশের এক সম্রাট সাজাহানকে একটি চীনা ঘড়ি উপহার দিয়াছিলেন, তাহা দিল্লীব যাদুঘরে এখনও রক্ষিত আছে।

Ma Huan চীনা ঐতি-হাসিকের বঙ্গ-দর্শন

বাঙলার কারুশিল্প

১৪১০ খৃঃ অব্দের পর কোনও এক সময় উত্তরবঙ্গে দিনাজপুর ও ভাতুড়িয়ার জমিদার রাজা গণেশ অত্যন্ত প্রতাপশালী হইয়া উঠেন। ইলিয়াস্ শাহের কোনও একজন বংশধরকে সিংহাসনচ্যুত

করিয়া তিনি রাজপদ অধিকার করিলেন। রাজা গণেশের নামাঙ্কিত কোন মুদ্রা না পাওয়ায় অনেকে মনে করেন যে, তিনি কোন মুস্লিম নরপতিকে ক্রীড়াপুত্তলি স্বরূপ পুরোভাগে রাখিয়া রাজ্যশাসন করিতেন। যে সময় গণেশ ও তাঁহার পুত্র যদু রাজত্ব করিতেন বলিয়া অনুমিত হয়, সেই সময়ে দনুজমর্দ্দনদেব নামে আর একজন হিন্দু নরপতিও উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গে নিজের প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছিলেন। পাণ্ডুয়া, সুবর্ণগ্রাম (সোনার গাঁ) ও চট্টগ্রামের টাকশালে উৎকীর্ণ তাঁহার মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। কেহ কেহ বলেন যে, এই দনুজমর্দ্দনদেবই রাজা গণেশ। কিন্তু এ মতটি সর্ব্ববাদিসম্মত নয়।

রাজা গণেশ

দনুজমর্দ্দনদেব

গণেশ ও দনুজমর্দ্দন কি অভিন্ন ?

গণেশের পর তাঁহার পুত্র যদু জয়মল্ল রাজপদ লাভ করেন। জৌনপুরের রাজা ইব্রাহিমের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া গণেশ তাঁহাব পুত্র যদুকে ইস্লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া তবে রেহাই পান। এই যদুই জলাল্উদ্দীন নাম ধারণপূর্ব্বক পরে বাজপদে আসীন হইয়া হিন্দুদের নিষ্ঠুরভাবে দমন কবিয়াছিলেন। বাঙ্গালার মুসলমান সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য জালাল্উদ্দীন বদ্ধপরিকর ছিলেন এবং এই সমস্ত নব্য মুসলমানরা হিন্দুবংশজাত। ইহার পর পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রাজক্ষমতা পুনরায় ইলিয়াস্ শাহের বংশধবদের হস্তগত হয়। তাঁহারা শ্রীহট্ট পর্য্যন্ত নিজেদের অধিকার বিস্তার করেন। আনুমানিক ১৪৮৬ খৃঃ অব্দে জনৈক হাবসী খোজা ইলিয়াস্ শাহী বংশের শেষ রাজাকে হত্যা করিয়া বাঙ্গালার সিংহাসন অধিকার করে; হাবসীরা হইল আফ্রিকার আবিসিনিয়া দেশের অধিবাসী।

গণেশ-পুত্র জলাল্উদ্দীন

ইলিয়াস্ শাহী বংশ

হাব্সী শাসন

এই সময়ের ইতিহাস কেবলই কুটিল ষড়যন্ত্র ও হত্যার বীভৎস কাহিনী। অবশেষে ১৪৯৩ খৃঃ অব্দে রাজ্যের প্রধানদের নির্ব্বাচনে আলাউদ্দীন হুসেন শাহ বাঙ্গালার সিংহাসনে আরোহণ করিলে পুনরায় দেশে শান্তি ফিরিয়া আসিল। বাঙ্গালার ইতিহাসে হুসেন শাহের ন্যায় জনপ্রিয় নৃপতি বিরল। রাজপদ লাভ করিয়াই তিনি অত্যাচারী হাব্সী সেনাদলের শক্তি খর্ব্ব করেন। দেশজয়ে

প্রজা-নির্ব্বাচিত হুসেন শাহ

হাব্সীদের শক্তি খর্ব্ব

রাজ্য জয়

মনোনিবেশ করিয়া হুসেন শাহ কামরূপ (আসাম), কামতাপুর (রংপুর ও কোচবিহার) এবং উড়িষ্যা জয় করিয়াছিলেন। উত্তর-পশ্চিমে আধুনিক বিহারের কোন কোন অংশ এবং দক্ষিণ-পূর্ব্বে ত্রিপুরার কিয়দংশ পর্য্যন্তও বোধ হয় তাঁহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

রাজ্যসীমা

বাঙ্গালা সাহিত্য

হুসেন শাহ বাঙ্গালা সাহিত্যের একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এই সময়ই চট্টগ্রামের কবি শ্রীকর নন্দী মহাভারতের কিয়দংশ এবং বরিশালের বিজয়গুপ্ত পদ্মপুরাণের বাঙ্গালা পদ্যানুবাদ করেন। বর্দ্ধমানের কবি মালাধর বসুকে হুসেন শাহ "গুণরাজ খাঁ" উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। এই সময়ই আবার পুরন্দর, রূপ, সনাতন, গোপীনাথ বসু, প্রভৃতি হিন্দু কর্ম্মচারিগণ উচ্চ রাজকীয় পদ লাভ করেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক শ্রীচৈতন্যদেবও হুসেন শাহের রাজত্বকালেই আবির্ভূত হন। হুসেন শাহ সম্ভবতঃ ১৫১৮ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁহার পুত্র নসরৎ শাহও একজন সহৃদয় নরপতি ছিলেন। তাঁহারই আদেশে মহাভারতের বাঙ্গালা পদ্যানুবাদ লিখিত হয়। তিনি শিল্পানুরাগের জন্যও প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পিতা মালদহ জেলায় গৌড়ের "ছোট সোনা মস্‌জিদ" নির্ম্মাণ করান। নসরতের সময়ে "বড় সোনা মস্‌জিদ" ও "কদমরসুল মস্‌জিদ" নির্ম্মিত হয়। নসরৎ শাহ ত্রিহুত অধিকার করিয়াছিলেন এবং মুঘল-বীর বাবুরের সহিত সম্মানজনক সন্ধিও স্থাপন করেন। এই সময়ই পর্ত্তুগীজদের চট্টগ্রাম অধিকার ও উপদ্রবের কথা প্রথম শোনা যায়। এই বংশের শেষ নরপতির নাম ঘিয়াস্‌উদ্দীন মামুদ। তিনি সুবিখ্যাত শের শাহ (তখন শের খাঁ) কর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত হন (১৫৩৬—৩৮); শের শাহ ছিলেন সুর বংশীয় আফগান। সুর বংশের পতনের পর বাঙ্গালাদেশ কর্‌রাণী বংশের হস্তগত হয়। অতঃপর কর্‌রাণী বংশীয় দায়ুদ খাঁকে পরাভূত করিয়া মুঘল সম্রাট্ আকবর বঙ্গদেশ অধিকার করেন (১৫৭৬)। এই সময় বৈষ্ণব পণ্ডিত কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রসিদ্ধ "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত" লিখিতে আরম্ভ করেন।

শ্রীচৈতন্য

নসরৎ শাহ

গৌড়শিল্প

গিয়াস্‌উদ্দীন মামুদ ও শের শাহ

আকবর কর্ত্তৃক বঙ্গ বিজয়

জৌনপুর।—ফীরূজ শাহ তুঘ্‌লুক জৌনপুর নগরের পত্তন

করেন। ১৩৯৪ খৃঃ অব্দে খাজা জহান নামে জনৈক ওমরাহ্ জৌনপুরে আপনার প্রভুত্ব স্থাপন করেন। খাজা জহানের উপাধি ছিল "মালিক-উশশর্ক"। তাঁহার উত্তরাধিকারীগণ এজন্য শর্কী বংশীয় বলিয়া পরিচিত হইয়া থাকেন। তৈমুরের আক্রমণে দিল্লী সাম্রাজ্যের ধ্বংসোন্মুখ অবস্থায় খাজা জহানের পোষ্যপুত্র মুবারক শাহ শর্কী স্বাধীনতা ঘোষণা করেন (১৩৯৯)। মুবারকের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ইব্রাহিম প্রায় ৪০ বৎসর স্বাধীন নরপতিরূপে এই রাজ্য শাসন করেন; তিনিই এই বংশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নরপতি ছিলেন। ইব্রাহিমের পুত্র মামুদও একজন শক্তিশালী নরপতি ছিলেন। শর্কীবংশের শেষ স্বাধীন নরপতির নাম ছিল হুসেন শাহ। দীর্ঘকাল যুদ্ধের পর তিনি দিল্লীর সুলতান বহ্লুল লোদী কর্তৃক পরাভূত হইয়া বাঙ্গালা দেশের হুসেন শাহের আশ্রয় গ্রহণ করেন (১৪৭৯)। বহ্লুল লোদী নিজের জ্যেষ্ঠপুত্র বার্বক শাহকে জৌনপুরের শাসক নিযুক্ত করিলেন; এইভাবে শর্কীবংশের পতন হয়। শর্কীবংশের সুলতানগণ শিল্পানুরাগী ও মুস্লিম সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহাদের সময় জৌনপুর আরবিক, পারসিক ও উর্দ্দু সাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল; জৌনপুরের বিখ্যাত "অতাল" মস্জিদের নির্ম্মাণ কার্য্য ইব্রাহিম শর্কীর রাজত্বকালে সমাপ্ত হয়। হুসেন শাহ শর্কীর রাজত্বকালে "জাম্-ই-মস্জিদ" নির্ম্মিত হইয়াছিল। মামুদ শর্কীও কয়েকটি স্থাপত্য নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন।

খাজা জহান

মুবারক শাহ শর্কী

ইব্রাহিম

মামুদ

হুসেন শাহ

জৌনপুরের স্থাপত্য শিল্প

উড়িষ্যা।— মুস্লিম আমলে উড়িষ্যা প্রাচ্য গঙ্গ বংশীয় রাজগণের শাসনাধীনে ছিল এবং তাঁহাদের সহিত মুস্লিমদের বহু সংঘর্ষও হইয়াছিল। কোণারকের সুবিখ্যাত সূর্য্যমন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা ১ম নরসিংহদেব বাঙ্গালার তুঘ্রিল খাঁকে বারবার পরাজিত করেন। চতুর্দ্দশ শতকে প্রাচ্য গঙ্গবংশের ৩য় ভানুদেবের আমলে বাঙ্গালার সুলতান সাম্সুদ্দীন ইলিয়াস্ শাহ উড়িষ্যা আক্রমণ করেন। ইহার কিছুকাল পরে দিল্লীর সুলতান ফীরূজ শাহ কর্তৃক পুনরায় উড়িষ্যা আক্রান্ত হয়। গঙ্গরাজগণের দুর্ব্বলতার সুযোগে জৌনপুর, মালব, গুলবর্গা, প্রভৃতি বিভিন্ন মুস্লিম রাজ্যের নরপতিগণও বারবার উড়িষ্যা আক্রমণ করিতেন।

গঙ্গবংশ

১ম নরসিংহ ও তুঘ্রিল খাঁ, ৩য় ভানুদেব এবং সাম্স্-উদ্দীন ইলিয়াস্ শাহ ও ফীরূজ

মুস্লিম আক্রমণ

আনুমানিক ১৪৩৫ খৃঃ অব্দে গঙ্গবংশের শেষ রাজার মৃত্যুর পর কপিলেন্দ্র দেব নামে তাঁহার জনৈক মন্ত্রী উড়িষ্যার রাজপদ অধিকার করেন। কপিলেন্দ্র নিজেকে সূর্য্যবংশীয় বলিয়া পরিচয় দিতেন। তাঁহার রাজ্যসীমা উত্তরে গঙ্গা হইতে দক্ষিণে কৃষ্ণা বা কাবেরী নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এতদ্ব্যতীত তিনি তখনকার বহমনী রাজ্যের অন্তর্গত বরঙ্গল ও বিদার অথবা কোণ্ডবীণ্ড পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। কপিলেন্দ্রের পর পুরুষোত্তম রাজা হন; তিনিও একজন পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। তাঁহার পর প্রতাপরুদ্র (আঃ ১৪৯৬—১৫৩৯) উড়িষ্যার সিংহাসনে আরোহণ করেন। প্রতাপরুদ্র চৈতন্যদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। আনুমানিক ১৫৪২ খৃঃ অব্দে সূর্য্যবংশের পতন হয় এবং ভোইবংশ উড়িষ্যা সাম্রাজ্য অধিকার করে। কিন্তু কয়েক বৎসর পরেই অন্ধ্র-দেশীয় মুকুন্দ-হরিচন্দন বা মুকুন্দ-হরিচন্দ্র উড়িষ্যার সিংহাসন অধিকার করেন। ইনি সম্ভবতঃ ১৫৫৯ হইতে ১৫৬৮ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। ১৫৬৮ খৃঃ অব্দে বাঙ্গালার কররাণী সুলতানগণ উড়িষ্যা জয় করিয়া উহা বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইলেন।

সূর্য্য-বংশীয় কপিলেন্দ্রের রাজ্যসীমা

পুরুষোত্তম

প্রতাপরুদ্র

সূর্য্যবংশের পতন

ভোই বংশ

মকুন্দ হরিচন্দন

উড়িষ্যার পতন

মেবার।—এ যুগের হিন্দু রাজাদের মধ্যে বীরত্ব ও আত্ম-ত্যাগের জন্য রাজপুতগণই ছিলেন সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। আনুমানিক ৭২৮ খৃঃ অব্দে বাপ্পারাও নামে এক বীর চিতোর অধিকার করিয়া যে রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করিয়া যান তাহা গুহিলোৎ বা "শিশোদীয় বংশ" নামে পরিচিত। ত্রয়োদশ শতকের শেষদিকে শিশোদীয়রাজ সমরসিংহের অধীনে মেবার বিশেষ শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু চতুর্দ্দশ শতকে আলাউদ্দীন খলজী চিতোর অধিকার করেন (১৩০৩)। এই ভীষণ পরাভবের পনেরো বৎসরের মধ্যেই বীর হম্মীর চিতোরের লুপ্ত গৌরব উদ্ধার করিয়াছিলেন। তখন হইতে মেবারের শক্তি দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। তাঁহার পুত্র ও পৌত্র দিল্লীর সুলতান ও অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বী রাজাদের পরাভূত করিয়া মেবারের রাজ্যসীমা বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত করেন। ইহার পর মহারাণা কুম্ভ বা কুম্ভা শিশোদীয় শক্তিকে বিশেষ পরাক্রমশালী করেন। তিনি আনুমানিক ১৪৩৩ হইতে ১৪৬৮ খৃঃ অব্দ অবধি

রাজপুত জাতি

বাপ্পারাও, মেবারের গুহিলোৎ বা শিশোদীয় বংশ, সমরসিংহ, আলাউদ্দীনের চিতোর জয়, হম্মীর কর্ত্তৃক চিতোর উদ্ধার

কুম্ভ

রাজত্ব করিয়াছিলেন। মালব ও গুজরাটের সুলতানগণ বহুবার তাঁহার হস্তে পরাভূত হন। চিতোরে যে বিশাল জয়স্তম্ভ রাণা কুম্ভের নামের সহিত জড়িত, তাহা বোধ হয় এইরূপ কোন বিজয়োপলক্ষেই নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে। কুম্ভের পৌত্র ছিলেন সুবিখ্যাত সংগ্রামসিংহ বা "রাণা সাঙ্গা"। তিনি ১৫০৮ হইতে ১৫২৭ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। সংগ্রামসিংহ ভারতবর্ষ হইতে মুস্‌লিমগণকে বিতাড়িত করিয়া এখানে অখণ্ড হিন্দু-সাম্রাজ্য স্থাপনের বাসনা অন্তরে পোষণ করিতেন। তিনিও মালব এবং গুজরাটের সুলতানদিগকে পরাভূত করিয়াছিলেন। মালবের সুলতান এক যুদ্ধে তাঁহার হস্তে বন্দী হন। কিন্তু খানুয়ার যুদ্ধে এই "সমর-শত-বিজয়ী" রাজপুত নরপতি মুঘল বীর বাবুরের হস্তে পরাজিত হইয়া ভগ্নহৃদয়ে প্রাণত্যাগ করেন (১৫২০)।

সংগ্রামসিংহ

গুজরাট।—সুলতান আলাউদ্দীন খল্‌জী বাঘেলাবংশীয় রাজপুত রাজা কর্ণদেবকে পরাভূত করিয়া গুজরাট জয় করেন (১২৯৭) কিন্তু মুহম্মদ তুঘ্‌লুকের সময় হইতেই সেখানে বারবার বিদ্রোহ হইতেছিল। ১৩৯১ খৃঃ অব্দে জাফর খাঁ নামে জনৈক মুস্‌লিম ধর্ম্মাবলম্বী রাজপুতের উপর গুজরাটের শাসনভার ন্যস্ত হয়। জাফর খাঁর সুশাসনে রাজ্যের যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি হয়। ১৩৯৮ খৃঃ অব্দে তৈমুর যখন দিল্লী আক্রমণ করেন তখন দিল্লীশ্বর মামুদ তুঘ্‌লুক সেখান হইতে পলায়ন করিয়া প্রথমে এই জাফর খাঁরই আশ্রয় ভিক্ষা করেন; কিন্তু জাফর খাঁ পলায়নপর প্রভুকে আশ্রয় দেন নাই। ইহার পর ১৪০১ খৃঃ অব্দে জাফর খাঁ "মুজফ্‌ফর শাহ" উপাধি ধারণ করিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ১৪১১ খৃঃ অব্দে মুজফ্‌ফর (জাফর খাঁ) পৌত্র অল্‌প খাঁ কর্ত্তৃক বিষপ্রয়োগে নিহত হন। অল্‌প খাঁ "আহ্‌ম্মদ শাহ" নামে গুজরাটের সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই আহ্‌ম্মদ শাহই ছিলেন স্বাধীন গুজরাট-রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। তিনি মালবরাজ এবং প্রতিবেশী রাজপুতগণকে পরাজিত করিয়া প্রায় সমগ্র গুজরাট প্রদেশ অধিকার করেন। তিনি আহ্‌মদাবাদ নগর প্রতিষ্ঠা করিয়া সেখানে রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন। আহ্‌মদাবাদের "তিনদরওয়াজা" এবং "জাম্‌-ই-মস্‌জিদ" তাঁহারই আদেশে নির্ম্মিত হয়। দীর্ঘ ৩১ বৎসর

জাফর খাঁ

আহ্‌ম্মদ শাহ

রাজত্ব করিয়া ১৪৪২ খৃঃ অব্দে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। এই বংশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন আহম্মদ শাহের পৌত্র মামুদ বিগড়হ। ১৪৫৮ খৃঃ অব্দে মাত্র ১৩ বৎসর বয়সে তিনি রাজপদ লাভ করেন। মামুদ আহ্মদনগরের সুলতান এবং অন্যান্য অনেক রাজাকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়াছেন। বড়োদার উত্তর-পূর্ব্বে অবস্থিত চম্পানীর দুর্গ এবং কাথিয়াবাড়ের অন্তর্গত জুনাগড় দুর্গ তাঁহার হস্তগত হয়। এই সকল দুর্ভেদ্য দুর্গ জয় করিয়াই তিনি "বিগড়হ" (বিজয়ী) আখ্যা লাভ করেন। কচ্ছ ও কাথিয়াবাড়ের অনেক হিন্দু রাজাকেও তাঁহার নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছিল। তবে মেবারের মহারাণা কুম্ভ তাঁহাকে কয়েক্বার পরাজিত করিয়াছিলেন। তুরস্কের সুলতান তাঁহার সহিত একযোগে পর্ত্তুগীজ জলদস্যুদিগকে দমন করিবার অভিপ্রায়ে সুয়েজ (Suez) হইতে এক বিরাট নৌবাহিনী গুজরাটে প্রেরণ করেন। প্রথমে পর্ত্তুগীজরা পরাজিত হয় (১৫০৮) কিন্তু পরবৎসর নৌ সমরকুশল পর্ত্তুগীজগণেরই জয় হয়। তখন মামুদ দিউ বন্দরে পর্ত্তুগীজদিগকে একটি বাণিজ্যকুঠি নির্ম্মাণ করিবার অনুমতি দান করেন।

মামুদ বিগড়হ

পর্ত্তুগীজদের সহিত জলযুদ্ধ

মামুদ বিগড়হ ৫২ বৎসর রাজত্ব করার পর ১৫১১ খৃঃ অব্দে পরলোক গমন করেন। একজন সমসাময়িক মুস্লিম ঐতিহাসিক তাঁহার উদারতা, ন্যায়নিষ্ঠা ও বিদ্যাবুদ্ধির গভীরতার যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন।

বাহাদুর শাহ

মামুদ বিগড়হের পৌত্র বাহাদুর শাহ এই বংশের শেষ উল্লেখযোগ্য নরপতি। তিনি ১৫২৬ হইতে ১৫৩৭ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনি মালবের সুলতানকে পরাজিত করিয়া উহা গুজরাট রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লন এবং ১৫৩৪ খৃঃ অব্দে চিতোর বিধ্বস্ত করেন। পর বৎসর (১৫৩৫) মুঘল বাদশাহ হুমায়ুন বাহাদুর শাহকে পরাজিত করিলে তিনি মালবে পলায়ন করিতে বাধ্য হন। কিন্তু জয়লাভ সম্পূর্ণ না করিয়াই হুমায়ুনকে ভ্রাতা আস্কারী ও শের খাঁর (পরে শের শাহ) বিরুদ্ধে অগ্রসর হইতে হইল। বাহাদুর শাহ পুনরায় তাঁহার হৃতরাজ্য ফিরিয়া পাইলেন। তাঁহার পুত্রসন্তান ছিল না। তাঁহার মৃত্যুর পর গুজরাটে ভীষণ বিশৃঙ্খলা

দেখা দিল। বহুদিন এইভাবে চলিবার পর ১৫৭২ খৃষ্টাব্দে আকবর গুজরাট জয় করেন।

মালব।—দিল্লী সুলতানদের মধ্যে আলাউদ্দীন খল্‌জী মালব দেশ জয় করেন (১৩০৫ খৃঃ)। তুঘ্‌লুক সুলতানদের পতনের সময় দিল্‌ওয়ার খাঁ ঘুরী ছিলেন মালবের শাসনকর্তা। তিনি স্বাধীনভাবেই মালব শাসন করিতেন বটে, কিন্তু কখনও নিজেকে স্বাধীন নরপতি বলিয়া ঘোষণা করেন নাই। ১৪০৬ খৃষ্টাব্দে দিলওয়ার খাঁর পুত্র পিতাকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করিয়া হুসং শাহ নামে নিজেকে স্বাধীন সুলতান বলিয়া ঘোষণা করেন। হুসং শাহের রাজত্বকালে যুদ্ধবিগ্রহের বিরাম ছিল না। উড়িষ্যা, গুজরাট ও বহ্‌মনী রাজ্যের সহিত তাঁহার সংঘর্ষ হইয়াছিল। হুসং শাহ মাণ্ডু নামক স্থানে তাঁহার রাজধানী স্থাপন করেন। ১৪৩৫ খৃষ্টাব্দে হুসং শাহের মৃত্যু হয় এবং তাঁহার পুত্র মুহম্মদ শাহ মালবের সিংহাসনে আরোহণ করেন। মুহম্মদ শাহ অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল ও অকর্ম্মণ্য ছিলেন। তাঁহাকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করিয়া তাঁহার মন্ত্রী মামুদ খাঁ খল্‌জী ১৪৩৬ খৃঃ অব্দে সিংহাসন অধিকার করেন। এইরূপে মালবে খল্‌জী বংশের শাসন আরম্ভ হয়। মামুদ খল্‌জী বিচক্ষণ ও সহৃদয় নরপতি ছিলেন; যুদ্ধবিদ্যায়ও তাঁহার যথেষ্ট নৈপুণ্য ছিল। গুজরাট এবং মেবারের সহিত তাঁহাকে যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। দিল্লীর সহিত যুদ্ধে পরাভূত হইলেও, তাঁহার স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ ছিল। বহ্‌মনী রাজ্যের সঙ্গে যুদ্ধে তিনি জয়লাভ করিয়াছিলেন। মাণ্ডুতে তাঁহার সপ্ততল জয়স্তম্ভটি তাঁহার মেবার যুদ্ধ জয়ের স্মারক হিসাবে নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। মামুদ সম্বন্ধে ঐতিহাসিক ফিরিস্তা লিখিয়া গিয়াছেন যে, তিনি "বিনয়ী, বীর, ন্যায়নিষ্ঠ এবং সুপণ্ডিত ছিলেন; তাঁহার রাজত্বকালে হিন্দু-মুসলমান-নির্ব্বিশেষে প্রজারা সকলেই সুখী ছিল এবং পরস্পরের সহিত সৌহার্দ্দ রক্ষা করিয়া চলিত"। ১৪৬৯ খৃষ্টাব্দে মামুদের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র ও পৌত্রদের শাসনকালে মালবের শক্তি হ্রাস পায়। ১৫১২ খৃঃ অব্দে ২য় মামুদ সিংহাসন লাভ করেন। ইনিই এই বংশের শেষ নরপতি। তাঁহার সময় রাজ্যে ভয়ানক বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয় এবং রাণা সংগ্রামসিংহ মামুদকে

দিলওয়ার খাঁ ঘুরী

হুসং শাহ

মুহম্মদ শাহ

১ম মামুদ খাঁ খল্‌জী

২য় মামুদ

খল্‌জী বংশের পতন ও গুজরাটের মালব অধিকার

বন্দী করিয়া চিতোরে লইয়া যান। কিন্তু শেষে তাঁহাকে মুক্তিদান করা হয়। ১৫৩১ খৃষ্টাব্দে গুজরাটের বাহাদুর শাহ মালব জয় করিয়া মামুদকে বধ করেন। আকবর এই রাজ্য পুনরায় দিল্লীর অধিকারভুক্ত করেন (১৫৭২—৭৩)।

শাহ মীর সামসুদ্দীন

কাশ্মীর।—১৩৩৯ খৃঃ অব্দে কাশ্মীরের শেষ হিন্দু রাজার মৃত্যুর পর তাঁহার মন্ত্রী শাহ মির্জ্জা "শাহ মীর সামস্‌উদ্দীন" উপাধি ধারণ করিয়া কাশ্মীরের মুস্‌লিম রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। এই

সিকন্দর শাহ

বংশের ষষ্ঠ সুলতান সিকন্দর শাহ আনুমানিক ১৩৯৩ হইতে ১৪১৬ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি কাশ্মীরের বহু প্রাচীন দেবমন্দির ও বিগ্রহ ধ্বংস করিয়াছিলেন; কাশ্মীরের লক্ষ লক্ষ প্রজা তখন ইস্‌লাম ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে বাধ্য হয়, ফলে কাশ্মীরে এখন শতকরা আশী জন মুসলমান। কিন্তু এই বংশের

জয়নুল আবেদীন

অষ্টম সুলতান জয়নুল আবেদীন অভূতপূর্ব্ব উদারতা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। তিনি জিজিয়া কর রহিত করিয়া রাজ্যে শান্তি স্থাপন করেন। সঙ্গীত, চিত্রকলা, সাহিত্য, প্রভৃতিতেও তাঁহার প্রবল অনুরাগ ছিল। তিনি বহু আরবিক ও সংস্কৃত পুস্তকের অনুবাদ করাইয়া দেশে বিদ্যাচর্চ্চার নূতন পথ প্রস্তুত করিয়া দেন। আজও কাশ্মীরে তাঁহার স্মৃতি উজ্জ্বল হইয়া আছে। অর্দ্ধ শতাব্দী কাল কাশ্মীর শাসন করিবার পর জয়নুল আবেদীন সম্ভবতঃ ১৪৭০ খৃঃ অব্দে পরলোক গমন করেন। পরবর্ত্তী সুলতানগণ অলস বিলাসেই কালহরণ করিতেন; রাজক্ষমতা ক্রমে ক্রমে মন্ত্রীদেরই হস্তগত হইয়া পড়ে। ১৫৫১ খৃঃ অব্দে গাজী শাহ নামে জনৈক মন্ত্রী কাশ্মীরের সিংহাসন লাভ করেন। পরে আকবর এই রাজ্যটি

কাশ্মীরের পতন

জয় করিয়া লন এবং সৌন্দর্য্য প্রেমিক জহাঙ্গীর ও তাঁহার গুণবতী পত্নী নূরজাহানের করস্পর্শে কাশ্মীর প্রায় মুঘল-উদ্যানে পরিণত হয়।

আহোম জাতির আগমন

আসাম।—ত্রয়োদশ শতকের প্রথম দিকে শান্ অধিত্যকা হইতে শান্ জাতির একটি শাখা কামরূপে প্রবেশ করিয়া সেখানে একটি পরাক্রান্ত রাজ্য গড়িয়া তুলে। এই তেজস্বী মঙ্গোলীয় জাতিটি ইতিহাসে "আহোম" নামে পরিচিত। "আহোম" হইতে দেশের নাম "আসাম" হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ত্রয়োদশ শতকের

প্রারম্ভ হইতে মুসলমানগণ বার বার আসাম আক্রমণ করিয়া ব্যর্থমনোরথ হন।

আহোম রাজাদের মধ্যে সুহুংমুং-এর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি ১৪৯৭ হইতে ১৫৩৯ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত দীর্ঘকাল অপ্রতিহত প্রতাপে রাজত্ব করিয়াছিলেন। আহোম রাজ্য তখন কামরূপের সীমা অতিক্রম করিয়া সম্ভবতঃ উত্তর বঙ্গেরও কোন কোন স্থানে বিস্তার লাভ করিয়াছিল। এই সুহুংমুং রাজাই ভারতীয় রাজন্য-বর্গের মধ্যে প্রথম আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করেন। সুহুংমুং-এর রাজত্ব-কালে আহমিয়া বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আদিগুরু (ও চৈতন্যদেবের সমসাময়িক) ভক্ত শঙ্করদেবের আবির্ভাব হয়; আসাম ও বাঙ্গালার মধ্যে বৈষ্ণব ধর্ম্ম আজও আধ্যাত্মিক যোগসূত্র হইয়া আছে। সুহুংমুংএর পরে উল্লেখযোগ্য নরপতি ছিলেন প্রতাপসিংহ (১৬০৩—৪১)। তাঁহার রাজত্বকালে মুসলিমগণ বারবার আসাম আক্রমণ করে, কিন্তু তিনি তাহাদিগকে প্রত্যেকবারই পরাজিত করেন। জাহাঙ্গীরের আমলে আসামের অন্তর্গত গোয়ালপাড়া ও কামরূপ জেলার কিয়দংশ মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। ইহার পর সম্রাট্ ঔরঙ্গজীবের রাজত্বকালে বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা মীরজুমলা আসাম আক্রমণ করিয়া, আহোমরাজ জয়ধ্বজ সিংহকে বার্ষিক করদানে বাধ্য করেন (১৬৬২—৬৩)। কিন্তু এই পরাজয়ের পর চারি বৎসর উত্তীর্ণ হইতে না হইতেই স্থলযুদ্ধ ও জলযুদ্ধকুশল বীর আহোমগণ কামরূপ উদ্ধার করিয়া আসামের স্বাধীনতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। সে যুগের আসাম ভারত-ইতিহাসে গৌরবস্থল অধিকার করিয়াছিল।

সুহুংমুং

ভারতে প্রথম আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার

শঙ্করদেব

প্রতাপসিংহ

মীরজুমলার আক্রমণ

STUDIES AND QUESTIONS

1. What part did the Ranas of Mewar play in the history of mediæval India? (C. U. '28).

2. Sketch the history of Bengal during the rule of the Illias Shahi kings

3. Write notes on : Raja Ganesh, Hussain Shah of Bengal, Jaynul Abedin of Kashmir, and the Ahoms of Assam.

একবিংশ অধ্যায়

প্রাদেশিক রাজ্যসমুহের অভ্যুত্থান

(দক্ষিণ ভারত)

বহ্‌মনী রাজ্য (১৩৪৭—১৫২৬)।—মুহম্মদ বিন্ তুঘ্‌লুকের কু-শাসনের ফলে দক্ষিণাপথে বিদ্রোহের অগ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। বিদ্রোহের নেতা হাসান বা জাফর খাঁ ১৩৪৭ খৃঃ অব্দে দৌলতাবাদ (দেবগিরি) অধিকার করিয়া নিজেকে স্বাধীন নরপতি বলিয়া ঘোষণা করিলেন। কাহারও মতে হাসান নিজেকে প্রাচীন পারস্যের বিখ্যাত বীর নৃপতি বহ্‌মনের বংশধর বলিতেন, এজন্য তিনি আলাউদ্দীন 'বহ্‌মন' শাহ উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন ও তাঁহার রাজ্যের নাম হইয়াছিল "বহ্‌মনী রাজ্য"। ঐতিহাসিক ফিরিস্তা লিখিয়া গিয়াছেন যে, হাসান প্রথম জীবনে "গঙ্গু ব্রাহ্মণ" নামে এক ব্রাহ্মণের ভৃত্য ছিলেন এবং তাঁহারই চেষ্টায় উচ্চ রাজকীয় পদ লাভ করেন। তাই সুলতান হইয়া হাসান প্রভুর প্রতি কৃতজ্ঞতায় নিজেকে "বহ্‌মন" বংশীয় বলিয়া পরিচয় দিতেন।

বহ্‌মনী রাজ্য

দেখিতে দেখিতে দাক্ষিণাত্যের এক বিরাট অংশ তাঁহার হস্তগত হইয়া গেল,—তাঁহার রাজ্যসীমা ছিল উত্তরে পেনগঙ্গা নদী (বেরার অঞ্চল) হইতে কৃষ্ণা এবং পূর্ব্বে বর্ত্তমান নিজাম রাজ্যের অন্তর্গত ভোনগিরি নগর (বরঙ্গল অঞ্চল) হইতে পশ্চিমে কোঙ্কণ উপকূলের গোয়া ও দাভোল বন্দর অবধি বিস্তৃত। গুলবর্গা নগরে রাজধানী স্থাপন করিয়া আলাউদ্দীন উহার নাম রাখেন "হাসানাবাদ"। শাসনকার্য্যের জন্য তিনি বহ্‌মনী রাজ্যকে দৌলতাবাদ, গুলবর্গা, বেরার ও বিদর এই চারিটি প্রদেশে ভাগ করিয়াছিলেন। ১৩৫৮ খৃঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

রাজ্যসীমা

হাসানাবাদ

বহ্‌মনী বংশের মোট চৌদ্দজন সুলতান রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। আলাউদ্দীনের পুত্র ১ম মুহম্মদ শাহের রাজত্বকাল (১৩৫৮—'৭৩) প্রধানতঃ বিজয়নগর ও তেলিঙ্গানা (বরঙ্গল) রাজ্যের সহিত যুদ্ধবিগ্রহেই ব্যয়িত হয়। তিনি শাসন-বিভাগে প্রয়োজনীয় নানাবিধ পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছিলেন। সে সমস্ত ব্যবস্থা দাক্ষিণা-

১ম মুহম্মদ শাহ

ত্যের অন্যান্য মুসলমান রাজ্যে এবং শিবাজীর রাজ্যেও প্রবর্তিত হইয়াছিল। তাঁহার রাজ্যের সুচারু সুবর্ণমুদ্রা হিন্দু ব্যবসায়ীদের মারফৎ বিজয়নগরের মুদ্রাগারে চালান হইত। তিনি কঠোর ভাবে এই পুঁজিপতিদের দমন করিয়াছিলেন। ১৩৯৭ খৃঃ অব্দে ১ম মুহম্মদের কনিষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্র বিখ্যাত ফীরুজ শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। ফীরুজ শাহ রাজ্যশাসন ও যুদ্ধকার্য্যে সুদক্ষ ছিলেন। বিজয়নগরের রাজা ১ম দেবরায় দুইবার তাঁহার নিকটে পরাজিত হইয়া স্বীয় কন্যাকে ফীরুজের সহিত বিবাহ দিয়া সন্ধি স্থাপন করেন, তবুও উভয় রাজ্যের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপিত হইল না। ইহার পর ফীরুজ বিজয়নগর আক্রমণ করিলে নিদারুণভাবে পরাভূত হন (আঃ ১৪২০)। কয়েক বৎসরের মধ্যেই ভ্রাতা আহ্‌মদের হস্তে তাঁহার মৃত্যু হয় (১৪২২)। ফীরুজ শাহ্‌কে অনেকেই বহ্‌মনী বংশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নরপতি বলিয়া থাকেন। কেহ কেহ তাঁহাকে "দাক্ষিণাত্যের আকবর" আখ্যাও প্রদান করিয়াছেন। ফিরিস্তার মতে ফীরুজ শাহের সময়েই বহ্‌মনী রাজ্য গৌরবের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিয়াছিল। সুলতান শিল্পানুরাগী ছিলেন; গুলবর্গা শহরটিকে তিনি অনেক সুরম্য অট্টালিকার দ্বারা সুশোভিত করেন। এতদ্ব্যতীত ভীমা নদীর তীরে ফীরুজাবাদ শহরেও তিনি এক বিশাল রাজপ্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন। দুষ্প্রাপ্য দ্রব্যাদি এবং পুরাবস্তুর উপর তাঁহার খুবই আকর্ষণ ছিল; পর্ত্তুগীজদের ভারত আবিষ্কারের পূর্ব্বে ইউরোপ হইতে তিনি বহু দুষ্প্রাপ্য শিল্পদ্রব্য আনয়ন করিতেন।

ফীরুজ শাহ

বিজয়নগরের সহিত যুদ্ধ

ফীরুজ শাহ বহ্‌মনীর কৃতিত্ব

আহ্‌মদের রাজত্বকালেও বিজয়নগরের সহিত বহ্‌মনী রাজ্যের সংঘর্ষ চলিতে থাকে। কিছুকাল যুদ্ধবিগ্রহের পর উভয়পক্ষে সন্ধি স্থাপিত হয়। ১৪২৫ অথবা ১৭২৬ খৃঃ অব্দে বরঙ্গলের হিন্দু রাজ্য অধিকার করিয়া আহ্‌মদ শাহ গুলবর্গা হইতে বিদরে রাজধানী পরিবর্ত্তন করেন। তিনি মালব ও গুজরাটের সুলতানদের সহিতও যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ১৪৩৫ খৃঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

আহ্‌মদ শাহ বিজয়নগর আক্রমণ

বরঙ্গল অধিকার, মালব ও গুজরাটের সহিত যুদ্ধ

পঞ্চদশ শতকের শেষার্দ্ধে বহ্‌মনী রাজ্যের ইতিহাস আভ্যন্তরীণ নানা গোলযোগে জটিল। রাজ্যের প্রধান প্রধান ওমরাহ্‌গণ দুইটি দলে বিভক্ত হইয়া সুলতানদের দুর্ব্বলতার অবসরে

আপনাদের ক্ষমতা স্থাপনের আশায় নানা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকিত। অবশেষে ৩য় মুহম্মদ শাহের শাসনকালে বৈদেশিক (আরব, তুর্কী, পার্সী, প্রভৃতি) দলের নেতা খাজা মামুদ গাওয়ান প্রধান মন্ত্রীর পদ অধিকার করেন। ইনি পর পর তিন জন সুলতানের অধীনে মন্ত্রিত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় কর্ম্মদক্ষ রাজপুরুষ বহ্‌মনী রাজ্যে কেহই ছিল না; আভ্যন্তরীণ শাসনে তাঁহার যেরূপ অধিকার ছিল, যুদ্ধকার্য্যেও তিনি তেমনই পটু ছিলেন। যুদ্ধযাত্রা করিয়া তিনি স্বয়ং গোয়া বন্দর পুনরুদ্ধার করেন। ১৪৭৩ খৃঃ অব্দে মামুদ গাওয়ান বেলগাঁওয়ের দুর্গ অধিকার করেন। ১৪৮১ খৃঃ অব্দে কোণ্ডপল্লী বহ্‌মনী রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত হয়। সুদীর্ঘকাল যাবৎ অনন্যসাধারণ বিচক্ষণতার সহিত তিনি বহ্‌মনী রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন; কিন্তু ভারতীয় মুসলমান ও হাবসীগণের মিলিত দক্ষিণী দল তাঁহার বিরুদ্ধপক্ষ ছিল। তাহারা তাঁহার কর্ম্মকুশলতা প্রীতির চক্ষে দেখিত না এবং তিনি শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত পারসিক ছিলেন বলিয়া সুন্নী সম্প্রদায়ভুক্ত দক্ষিণী দলের নিকট তিনি ছিলেন বিধর্ম্মী ও বিদেশী। কয়েকজন দক্ষিণী নেতা সুলতানের নিকট মামুদ গাওয়ানের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ উত্থাপন করিলে সুলতান কোনরূপ বিচার-বিবেচনা না করিয়াই গাওয়ানের প্রাণদণ্ড বিধান করেন (১৪৮১)।

৩য় মুহম্মদ শাহ মন্ত্রী মামুদ গাওয়ান

কোণ্ডপল্লী অধিকার

মামুদ গাওয়ানের প্রাণদণ্ড (১৪৮১)

বহ্‌মনী রাজ্যের পতন

মামুদ গাওয়ানের চরিত্র ও কৃতিত্ব

মামুদ গাওয়ানের মৃত্যুর সঙ্গেই বহ্‌মনী রাজ্য অতি দ্রুত পতনের পথে নামিয়া চলিল। অসাধারণ মনীষার বলে তিনি এই রাজ্যটিকে বহুদিন অবশ্যম্ভাবী পতন হইতে রক্ষা করিয়া চলিয়াছিলেন। বহ্‌মনী রাজ্যের নানাস্থানে তিনি বহু দুর্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রত্যেকটি সঙ্কটক্ষেত্র সুরক্ষিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। সেগুলি যেমন রণবিজ্ঞানে তাঁহার গভীর অভিজ্ঞার পরিচায়ক, তেমনই বিদরে তিনি যে সুবৃহৎ শিক্ষায়তন ও গ্রন্থাগার স্থাপন করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার বিদ্যোৎসাহের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এতদ্ভিন্ন তাঁহারই প্রচেষ্টায় রাজ্যে জলসেচেরও সুব্যবস্থা হইয়াছিল। ব্যক্তিগত জীবনেও তিনি ছিলেন ন্যায়নিষ্ঠ, দয়ালু ও দাতা। শাসনকার্য্য ও রণনীতি উভয় ক্ষেত্রেই তিনি সমান নৈপুণ্য দেখাইয়া গিয়াছেন।

৩য় মুহম্মদ শাহের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র মামুদের সময়ে

কাশিম বারীদ নামে জনৈক তুর্কী মন্ত্রীই রাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া উঠিলেন। সুলতানদের অকর্ম্মণ্যতার সুযোগ লইয়া প্রাদেশিক শাসকগণ একে একে স্বাধীনতা ঘোষণা করিতে আরম্ভ করিলেন। বিশাল বহ্‌মনী রাজ্য ক্রমশঃ বিদর নগরের পার্শ্ববর্ত্তী ভূখণ্ডে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। ১৫২৬ খৃঃ অব্দে কাশিম বারীদের পুত্র আমীর বারীদ তখনকার হীনবল সুলতানকে রাজ্যচ্যুত করিয়া নিজেই সিংহাসন অধিকার করিয়া বসিলেন।

তুর্কী মন্ত্রী কাশিম বারীদ

সুলতান ৩য় মুহম্মদের রাজত্বকালে নিকিতিন (Athanasius Nikitin) নামে জনৈক রুশ বণিক বহ্‌মনী রাজ্যে আসিয়া ১৫ শতকের ভারতে ধনজনসমৃদ্ধির এক বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন। অবশ্য ঐশ্বর্য্য ও সমৃদ্ধি অভিজাত শ্রেণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। সাধারণ লোকের অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। সুলতান ও রাজ্যের ওমরাহ্‌দের বিরাট জঁাক-জমকের যে পরিচয় নিকিতিনের বিবরণীতে পাওয়া যায়, তাহাতে মনে হয় দেশের অভিজাত শ্রেণীর অতিরিক্ত বিলাস-ব্যসনের ফলেই জনসাধারণ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিল এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের ভিত্তি শিথিল হইয়াছিল। ফলে পাশ্চাত্য জাতির আক্রমণে হিন্দু ও মুস্‌লিম উভয় রাষ্ট্রই এক সঙ্গে ধ্বসিয়া যায়।

নিকিতিনের বর্ণনা

দাক্ষিণাত্যের রাজ্যপঞ্চক।—পঞ্চদশ শতকের শেষভাগ হইতে ষোড়শ শতকের প্রথম ভাগের মধ্যে বিশাল বহ্‌মনী রাজ্য একে একে পাঁচটি খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত হইয়া যায়। এই পাঁচটি রাজ্য হইল বেরার, বিজাপুর, আহ্‌মদনগর, গোলকুণ্ডা ও বিদর।

বেরারের ইমাদ-শাহী রাজ্য।—বেরার (প্রাচীন বিদর্ভ) প্রদেশটি ছিল বহ্‌মনী রাজ্যের উত্তর প্রান্তে অবস্থিত। ১৪৮৪ কিংবা ১৪৮৯ খৃঃ অব্দে, বেরারের শাসনকর্ত্তা ফথউল্লা ইমাদ-উল্ মুল্ক স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া ঐ প্রদেশে "ইমাদ-শাহী" রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। ইমাদ-শাহী রাজারা চার পুরুষ যাবৎ স্বাধীনভাবে বেরার শাসন করিবার পর ১৫৭৪ খৃঃ অব্দে আহ্‌মদনগরের সুলতান হুসেন শাহ ইহা অধিকার করিয়া স্বীয় রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত করিয়া লন।

ফথউল্লা

পতন

যুসুফ আদিল -শাহ

বিজাপুরের আদিল-শাহী রাজ্য।—বিজাপুর প্রদেশ ছিল বহ্মনী রাজ্যের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত। এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা যুসুফ আদিল শাহ প্রথম জীবনে খাজা মামুদ গাওয়ানের ক্রীত-দাস ছিলেন। কথিত আছে, তিনি তুরস্কের সুলতান ২য় মুরাদের পুত্র, কিন্তু ভাগ্যবিপর্য্যয়ে তাঁহাকে খাজা মামুদ গাওয়ানের ক্রীতদাস হইতে হইয়াছিল। মামুদ গাওয়ান যুসুফের বুদ্ধিমত্তা দর্শনে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে পরিশেষে বিজাপুরের শাসনকর্ত্তার পদে নিয়োগ করেন। ১৪৮৯ খৃঃ অব্দে যুসুফ স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন। নূতন রাজবংশের নাম হইল "আদিল-শাহী" বংশ। যুসুফ আদিল শাহ ছিলেন শিয়া মতাবলম্বী।

পর্ত্তুগীজদের গোয়া অধিকার

ইতিমধ্যে পর্ত্তুগীজগণ ভারতে উপস্থিত হয় এবং গোয়া বন্দর লইয়া পর্ত্তুগীজদেব সহিত বিজাপুরেব অনেক সংঘর্ষের পর গোয়া বন্দরটি অবশেষে পর্ত্তুগীজদের অধিকারভুক্ত হয়। পশ্চিম ভারতের নাবিকসংঙ্ঘ তিনটি প্রধান ভাগে বিভক্ত ছিল, প্রথম গুজরাটি, দ্বিতীয় মালাবারি এবং তৃতীয় মারাঠি। শিবাজীর রাষ্ট্রশক্তি শুধু স্থলবাহিনী নয় জলবাহিনীর উপরও প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাঁহার পিতা যে বিজাপুর রাজ্যের কর্ম্মচারী ছিলেন সেই বিজাপুরের অধীনে বহু মারাঠি বিচক্ষণ নাবিক পশ্চিম ভারতেব উপকূল রক্ষা কবিত। অথচ হিন্দু ও মুস্লিম শাসকগণ নৌযুদ্ধে প্রজাদের স্বাভাবিক নৈপুণ্যকে রাষ্ট্রীয় নৌশক্তিতে পরিণত করিতে পারেন নাই। এবং নৌবাহিনীর সার্থকতা না বুঝিবার ফলে এই বিশাল ভারতবর্ষ মুষ্টিমেয় পর্ত্তুগীজ, ফরাসী, ইংরাজ, প্রভৃতি নাবিকসংঙ্ঘ পরিচালিত নৌবহরের কাছে পরাজিত হইয়া স্বাধীনতা হারায়।

যুসুফ আদিল শাহ উদারহৃদয় ও বিদ্যোৎসাহী নরপতি ছিলেন। তিনি নিজে এক মারাঠি সর্দ্দারের ভগ্নীকে বিবাহ করেন। তাঁহাব রাজত্বকালে হিন্দুরাও গুরুদায়িত্বপূর্ণ রাষ্ট্রপদ লাভ করে। রাজকার্য্যও তখন প্রধানতঃ মারাঠি ভাষায় চলিত। যুসুফ পারস্য, তুর্কীস্থান ও রূম (ইস্তাম্বুল) হইতে বহু পণ্ডিতকে তাঁহার রাজসভায় নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছিলেন।

যুসুফেব পর তাঁহার পুত্র ইস্মাইল শাহ বিজয়নগরের রাজা অচ্যুত রায়কে পরাজিত করিয়া কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রার মধ্যবর্ত্তী রায়চুর

দোয়াব অধিকার করেন। তিনিও তাঁহার পিতার ন্যায় কর্ম্মকুশল ও উদার ছিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র ১ম ইব্রাহিম সুন্নি মতাবলম্বী ছিলেন। কিন্তু ইব্রাহিমের পুত্র আলী আদিল শাহ ছিলেন শিয়া মতাবলম্বী। ১৫৫৮ খৃঃ অব্দে আদিল শাহ বিজয়নগরের রাজা সদাশিবের মন্ত্রী রামরাজার সহিত মৈত্রী স্থাপন করিয়া আহ্‌মদ-নগরের সুলতানকে পরাস্ত করেন। কিন্তু পরে তিনি আহ্‌মদ-নগর, গোলকুণ্ডা ও বিদরের সহিত মিলিত হইয়া বিজয়নগর বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিলেন (১৫৬৫)। আলী আদিল শাহ, পরাজিত আহ্‌মদনগরের সুলতান হুসেন শাহের কন্যা বীরাঙ্গনা চাঁদবিবিকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ১৫৭০ খৃঃ অব্দে বিজাপুর ও আহ্‌মদ-নগরের মিলিত নৌ-বাহিনী পর্ত্তুগীজদের হাত হইতে গোয়া বন্দর উদ্ধার করিতে গিয়া ব্যর্থকাম হইয়া ফিরিয়া আসে।

আলী আদিল শাহ

বিজয়নগর ধ্বংস (১৫৬৫)

চাঁদবিবি

অতঃপর ২য় ইব্রাহিম আদিল শাহ বিজাপুরের রাজপদ লাভ করেন। তিনি সুশাসকরূপে খ্যাতি লাভ করেন। ১৫৯৫ খৃঃ অব্দে বিজাপুর ও আহ্‌মদনগর রাজ্যের মধ্যে এক যুদ্ধে আহ্‌মদ-নগরের সুলতানের মৃত্যু হয়। ইব্রাহিম আদিল শাহ নিজে সুন্নী মতাবলম্বী হইলেও অন্যান্য ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার ঔদার্য্যের অভাব ছিল না; সুলতান সমগ্র রাজ্য জরিপ করাইয়া রাজস্ব নিরূপণ করিয়াছিলেন। তাঁহার ভূমিরাজস্ব সংক্রান্ত কোন কোন ব্যবস্থা এখনও সেই সকল অঞ্চলে প্রচলিত আছে। তাঁহারই আদেশে সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ফিরিস্তা একখানি চমৎকার ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করেন। ১৬২৬ খৃষ্টাব্দে ইব্রাহিমের মৃত্যু হয়। ১৬৩৬ খৃষ্টাব্দে সম্রাট শাহ্‌জহান বিজাপুরকে সামন্ত রাজ্যে পরিণত করেন এবং ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দে ঔরঙ্গজীবের সময় উহা মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

২য় ইব্রাহিম

ঐতিহাসিক ফিরিস্তা

আহ্‌মদনগরের নিজাম-শাহী রাজ্য।—বহ্‌মনী রাজ্যের উত্তর-পশ্চিম অংশে দৌলতাবাদ প্রদেশ অবস্থিত ছিল। মামুদ বহ্‌মনীর রাজত্বকালে এই প্রদেশের শাসনকর্ত্তা মালিক আহ্‌মদ এক স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন (১৪৯০)। আহ্‌মদনগর ইঁহার রাজ-ধানী ছিল। স্বাধীন হইয়া তিনি আহ্‌মদ নিজাম শাহ উপাধি গ্রহণ করায় তাঁহার বংশের নাম হইল "নিজাম-শাহী" বংশ। এই বংশের

মালিক আহ্‌মদ

দ্বিতীয় সুলতান বুরহান নিজাম শাহ (১৫০৮-৫৩) সুন্নি মত ত্যাগ করিয়া শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত হন এবং বিজয়নগরের হিন্দুরাজার সহিত মৈত্রী স্থাপন করিয়া বিজাপুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। কিন্তু তাঁহার পরবর্ত্তী সুলতান হুসেন শাহ ১৫৬৫ খৃঃ অব্দে বিদর, বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার সহিত মিলিত হইয়া বিজয়নগর ধ্বংস করেন। ১৫৭৪ খৃঃ অব্দে আহ্‌মদনগর বেরার রাজ্য অধিকার করে। ইহার পর দিল্লীর মুঘল বাদশাহের সহিত আহ্‌মদনগরের নিজাম-শাহী সুলতানদের ভীষণ সংঘর্ষ আরম্ভ হয়। ১৫৯৬ খৃঃ অব্দে সুপ্রসিদ্ধা চাঁদবিবি আকবরের পুত্র মুরাদের সহিত বীরবিক্রমে যুদ্ধ করিয়াও পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হন এবং আহ্‌মদনগর রাজ্যের একটি অংশ আকবরের হস্তগত হয়। অবশেষে ১৬৩৭ খৃঃ অব্দে সম্রাট্ শাহ্‌জহান সম্পূর্ণরূপে এই রাজ্যটি জয় করেন।

পতন

গোলকুণ্ডার কুতব-শাহী রাজ্য।—গোলকুণ্ডার অবস্থান ছিল বহ্‌মনী রাজ্যের পূর্ব্বভাগে। কুলী কুতব নামে জনৈক তুর্কীকে মামুদ গাওয়ান গোলকুণ্ডার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়াদিলেন। সুলতান মামুদ শাহের মৃত্যুর পরে তিনি মন্ত্রী আমীর বারীদের কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিতে অসম্মত হইয়া ১৫১৮ খৃঃ অব্দে স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন। কুলী কুতব শাহ এইভাবে যে রাজবংশ স্থাপন করিয়া যান তাহার নাম হয় "কুতব-শাহী" বংশ। ভাগনগর নামক স্থানে রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়া তিনি তাহার নাম রাখিলেন হায়দরাবাদ,—বর্ত্তমানে ইহাই নিজাম রাজ্যের রাজধানী। ১৫৫০ খৃঃ অব্দে এই বংশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুলতান ইব্রাহিম শাহ সিংহাসন লাভ করেন। তিনি বিদর, বিজাপুর ও আহ্‌মদনগরের সুলতানদের সহিত মিলিত হইয়া বিজয়নগরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন (১৫৬৫)। ইব্রাহিম শাহ উদার ও সুশাসক বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়া গিয়াছেন; তাঁহার সময় উচ্চ রাজকীয় পদে কর্ম্মচারী নিয়োগে হিন্দুমুসলমান কাহারও প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখানো হইত না। ১৫৮০ খৃঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার পুত্র মুহম্মদ কুলী ১৬১১ খৃঃ অব্দ অবধি রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইহার পর মুঘল সম্রাট্ শাহ্‌জহান গোলকুণ্ডা রাজ্যটিকে করদ রাজ্যে

কুলী কুতব

পরিণত করেন (১৬৩৫) এবং ঔরঙ্গজীব ১৬৯৭ খৃঃ অব্দে উহা সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়া লন। — পতন

বিদরের বারীদ-শাহী রাজ্য।—বিদর ছিল বহ্‌মনী রাজ্যের মধ্যভাগে অবস্থিত এবং ইহার রাজধানী; বহ্‌মনী সুলতানগণ এখানেই বাস করিতেন। ১৫২৬ খৃঃ অব্দে মন্ত্রী আমীর বারীদ শেষ বহ্‌মনী সুলতানকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া নিজেই বিদর রাজ্যের রাজা হইয়া বসিলেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত রাজবংশের নাম হইল "বারীদ-শাহী" বংশ। এই রাজবংশের এক সুলতান বিজাপুর, আহ্‌মদনগর ও গোলকুণ্ডার সুলতানদের সহিত মিলিত হইয়া বিজয়নগরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। আনুমানিক ১৬০৯ খৃঃ অব্দে বিদর বিজাপুর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়। — আমীর বারীদ; পতন

খান্দেশ রাজ্য।—মালিক আহ্‌মদ নামে বহ্‌মনী রাজ্যের একজন ওমরাহ্‌ বিদ্রোহী হইয়া, কিছুদিন পরে (১৩৮২ বা ১৩৮৮ খৃঃ) তাপ্তী নদীর দক্ষিণ দিকে খান্দেশ নামে একটি স্বাধীন রাজ্যের পত্তন করেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বংশের নাম ছিল ফারুকী বংশ, এবং রাজারা খাঁ উপাধি ধারণ করিতেন বলিয়া রাজ্যের নাম হয় খান্দেশ বা খাঁর দেশ। মালিক আহ্‌মদের রাজধানী থাল্‌ন পরে আসীরগড় নামে বিখ্যাত হইয়াছিল। বুরহানপুরেও খান্দেশের এক রাজধানী ছিল। খান্দেশের একদিকে ছিল বহ্‌মনী রাজ্য, আর একদিকে গুজরাট। এখানকার সুলতানদিগকে প্রায়ই গুজরাট অথবা বহ্‌মনী রাজ্যের সহিত যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকিতে হইত। ১৬০১ খৃষ্টাব্দে আকবর খান্দেশ জয় করিলে রাজ্যটি মুঘল সাম্রাজ্যের অধিকারভুক্ত হয়। — মালিক আহ্‌মদ; পতন

বিজয়নগর রাজ্য।—(১৩৩৬—১৫৬৫) হরিহর ও বুক্ক প্রমুখ পাঁচ ভ্রাতা বিজয়নগর রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া প্রসিদ্ধ। অনেকে মনে করেন যে, দোরসমুদ্রের (বর্তমান হলেবীদ) হোয়সল বংশীয় রাজা ৩য় বীরবল্লাল (১২৯২—১৩৪২) তুঙ্গভদ্রা নদীর দক্ষিণে আনেগুণ্ডি নামক স্থানে মুস্‌লিম আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য এক সুদৃঢ় দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া, তাঁহার আত্মীয় সঙ্গমের পুত্র হরিহরের উপর উহার শাসনভার অর্পণ করেন। পরে এই আনেগুণ্ডি দুর্গের নিকটেই বিজয়নগর নামক বিরাট সহরটি গড়িয়া — বিজয়নগরের উৎপত্তি

উঠে এবং সেখানকার শাসনকর্ত্তারাও পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তেলিঙ্গানার (অন্ধ্র) বরঙ্গল নগর জৌনা খাঁ (মুহম্মদ বিন্ তুঘ্লুক) কর্ত্তৃক ১৩২৩ খৃঃ অব্দে বিধ্বস্ত হইলে সঙ্গম-পুত্র হরিহর, বুক্ক, প্রভৃতি পঞ্চভ্রাতা সেখান হইতে পলায়ন করিয়া আসিয়া বিজয়নগর প্রতিষ্ঠা করেন,—এইরূপ একটি জনশ্রুতিও আছে। সে যাহাই হউক, বিজয়নগরের প্রথম রাজারা যাদব বংশীয় বলিয়া প্রবাদ থাকিলেও ইতিহাসে তাঁহারা সঙ্গমবংশীয় বলিয়া পরিচিত। কিংবদন্তী অনুসারে ১৩৩৬ খৃঃ অব্দে এই রাজ্যটি প্রতিষ্ঠিত হয়। পঞ্চভ্রাতার মধ্যে ১ম হরিহর বা হক্ক এবং ১ম বুক্কই সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। উত্তরে তুঙ্গভদ্রা হইতে দক্ষিণে সম্ভবতঃ ত্রিচিনপল্লীর সীমা এবং পূর্ব্ব ও পশ্চিমে উপকূলভাগ অবধি তাঁহাদের অধিকার বিস্তৃত হইয়াছিল। বেদের স্বনামধন্য ভাষ্যকার সায়ন এবং তাঁহার ভ্রাতা পণ্ডিতপ্রবর মাধব এই সময়েই আবির্ভূত হইয়াছিলেন; তাঁহারা ছিলেন বুক্কের মন্ত্রী। তাঁহাদের সযত্নরক্ষিত বেদের পুঁথিগুলি হইতে পরে পাশ্চাত্য পণ্ডিত মোক্ষমূলর (Max Muller) ঋকবেদ সংহিতা বিলাতে ছাপেন। কথিত আছে, ১ম হরিহর ও ১ম বুক্ক রাজোপাধি ধারণ করেন নাই। ১৩৭৪ খৃঃ অব্দে বুক্ক সুদূর চীনদেশে দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ ইহার পূর্ব্বেই হরিহরের মৃত্যু হইয়াছিল। ১৩৭৬ বা ১৩৭৮ খৃঃ অব্দে বুক্ক মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তাঁহার পুত্র ২য় হরিহর সগৌরবে রাজোপাধি ধারণ করিয়া বিজয়নগরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ২য় হরিহর দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইয়া কাঞ্চী ও ত্রিচিনপল্লী অধিকার করেন। হরিহরের পুত্র ১ম দেবরায়ের রাজত্বকালে বহ্মনী সুলতান ফীরূজ শাহ (১৩৯৭—১৪২২) বিজয়নগর আক্রমণ করেন। যুদ্ধে হারিয়া দেবরায় সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন এবং নিজের এক কন্যাকে সুলতানের হস্তে দিয়া নিষ্কৃতি লাভ করিলেন। কিন্তু ইহাতেও দুই প্রতিবেশী রাজ্যের বিবাদের অবসান হইল না। দেবরায়ের পুত্র বীরবিজয়ের রাজত্বকালে ফীরূজ শাহ পুনরায় বিজয়নগর আক্রমণ করেন (আঃ ১৪২০) কিন্তু তাঁহাকেই পরাজয়ের গ্লানি লইয়া ফিরিতে হয়। ১ম দেবরায়ের পৌত্র ২য় দেবরায় নিজের সৈন্যদলে মুসলমান অশ্বারোহী ও তীরন্দাজ নিযুক্ত করিয়া-

সঙ্গমবংশ

১ম হরিহর ও ১ম বুক্ক

সায়ন ও মাধব

২য় হরিহর

১ম দেবরায়

বীরবিজয়

২য় দেবরায়

ছিলেন। তবুও বহ্‌মনী রাজ্যের সহিত যুদ্ধে সুফল ফলিল না। বহ্‌মনী সুলতান আহ্‌মদ শাহ ও তাঁহার পুত্র ২য় আলাউদ্দীনের নিকট পরাজিত হইয়া দেবরায় করদানে সম্মত হন এবং সন্ধি স্থাপন করেন। ২য় দেবরায়ের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই রাজবংশে গৃহবিচ্ছেদ দেখা দিল এবং ১৪৮৬ খৃঃ অব্দে চন্দ্রগিরির শাসনকর্ত্তা নরসিংহ শালুব সিংহাসন অধিকার করিলেন।

সঙ্গম বংশের পতন

নরসিংহ শালুব বিজয়নগরে যে রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করিলেন তাহা "শালুব" বা "শাড়ব" বংশ নামে পরিচিত। ইনি ছিলেন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত। নরসিংহ শিবভক্ত তামিলদের বিদ্রোহ দমন করিয়া রাজ্যে শান্তি স্থাপন করেন। ইতিমধ্যে পরাক্রান্ত বহ্‌মনী রাজ্যের পতন হইয়াছিল; কিন্তু বিজয়নগরের সহিত মুস্‌লিম রাজ্যগুলির শত্রুতার অবসান হয় নাই। নরসিংহকে প্রায়ই এই "প্রতিবেশিপঞ্চকের" আক্রমণ হইতে রাজ্যরক্ষা করিয়া চলিতে হইত। ১৫০৫ খৃঃ অব্দে নরসিংহের পুত্রকে হত্যা করিয়া তদীয় সেনাপতি নরস নায়ক সিংহাসন অধিকার করেন।

নরসিংহ শালুব

শালুবদের পতন

নরস নায়ক ছিলেন তুলুববংশীয়। এই বংশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নরপতি ছিলেন সুপ্রসিদ্ধ কৃষ্ণদেব রায়। তিনি ছিলেন নরস নায়কের পুত্র। কৃষ্ণদেব রায় ১৫০৯ খৃঃ অব্দ হইতে ১৫২৯ খৃঃ অব্দ অবধি রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রাজত্বকাল বিজয়নগরের তথা দক্ষিণ ভারতের ইতিহাসের উজ্জ্বলতম অধ্যায়। রাজ্যাভিষেকের অনতিকাল পরে তিনি উদয়-গিরির (নেল্লোর জেলায় অবস্থিত) দুর্ভেদ্য দুর্গ অধিকার করেন। তারপর তিনি দুর্গের পর দুর্গ জয় করিয়া চলিলেন। ১৫১৫ খৃঃ অব্দে উড়িষ্যার রাজা বীরভদ্র তাঁহার নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হন। ১৫২০ খৃষ্টাব্দে বিজাপুরের সুলতান ইস্‌মাইল আদিল শাহকে পরাভূত করিয়া তিনি কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রার দোয়াবে অবস্থিত রায়চুর দুর্গ অধিকার করেন। ইহার পর তিনি বিজয়গৌরবে একবার বিজাপুর শহরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। বহ্‌মনী সুলতানদের প্রথম রাজধানী গুলবর্গা অধিকার করিয়া তিনি সেখানকার দুর্ভেদ্য দুর্গটি ধূলিসাৎ করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার সময় বিজয়নগর রাজ্য বর্ত্তমান মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর প্রায় সমগ্র অংশ এবং মহীশূর,

নরস নায়ক ও তুলুব বংশ, কৃষ্ণদেব রায়

দিগ্বিজয়

কৃষ্ণদেব রায়ের বিশাল রাজ্য

ত্রিবাঙ্কুর, কোচিন, কুর্গ, প্রভৃতি দেশীয় রাজ্য এবং বর্ত্তমান বোম্বাই প্রেসিডেন্সীরও কিছু অংশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কিন্তু কৃষ্ণদেব রায় কেবল রাষ্ট্রশক্তি ও সমর-কৌশলের জন্যই বিখ্যাত নন; উদারতা,

কৃষ্ণদেব রায

চরিত্র

অমায়িকতা, শিল্প, সঙ্গীত ও সাহিত্যানুরাগ, প্রভৃতি বিবিধ সদ্‌গুণের জন্যও তিনি চিরপ্রসিদ্ধ। পণ্ডিতপ্রবর কৃষ্ণশাস্ত্রী লিখিয়াছেন,—"পরাজিত শত্রুর প্রতি দয়া, বিজিত নগরীর অধিবাসীদের প্রতি দাক্ষিণ্য প্রদর্শন ও সামরিক শক্তি কৃষ্ণরায়কে সামন্ত নরপতি ও প্রজাদেব নিকট সমভাবে প্রিয় করিয়া তুলিয়াছিল;……দাক্ষিণাত্যে যে সকল নরপতি ইতিহাসের পৃষ্ঠা সমুজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছেন কৃষ্ণরায় তাঁহাদের শীর্ষস্থানীয়।" পাএস্ (Paes) নামে একজন সমসাময়িক পর্ত্তুগীজ লেখকও কৃষ্ণদেবের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন।

অচ্যুত রায, সদাশিব বায

কৃষ্ণদেব রায়ের পর তাঁহার ভ্রাতা অচ্যুত রায় ও তাঁহাব পরে তাঁহাব ভ্রাতুষ্পুত্র সদাশিব বাজা হইলেন; কিন্তু সদাশিবেব সময় প্রকৃত ক্ষমতা ছিল মন্ত্রী রামরাজা বা বামবায়ের হাতে।

বামবাজা

১৫৫৮ খৃঃ অব্দে রামরাজা বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার সহিত মিলিত হইয়া আহ্‌মদনগর জয় করেন। যুদ্ধজয়ের পর হিন্দু সৈন্যেরা আহ্‌মদনগরের অধিবাসীদের প্রতি বর্ব্বরোচিত অত্যাচার করে; রামরাজাও তাঁহার মুস্‌লিম মিত্রগণের সহিত যথোচিত ব্যবহার করেন নাই। ফলে বিজাপুর, গোলকুণ্ডা, বিদর ও আহ্‌মদনগর এই চারিটি রাজ্য একত্র হইয়া বিজয়নগরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। বিজাপুর রাজ্যের অন্তর্গত তালিকোট নামক নগর

চতুঃশক্তি সম্মিলন

হইতে ত্রিশ মাইল দূরবর্ত্তী রাক্ষসতঙ্গড়ীতে উভয়পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হইল; ইতিহাসে ইহা "তালিকোটের যুদ্ধ" নামেই প্রসিদ্ধ। এই যুদ্ধে হিন্দুগণ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত ও বিধ্বস্ত হইল। রামরাজা বন্দী হইয়া প্রাণ হারাইলেন (১৫৬৫ খৃঃ)। সম্মিলিত মুস্‌লিম বাহিনী বিজয়নগরে প্রবেশ করিয়া সেখানকার অট্টালিকা, সুরম্য প্রাসাদ ও মন্দিরগুলি ধূলিসাৎ করিয়া দিল।

তালিকোটের যুদ্ধ (১৫৬৫)

সদাশিব ও রাজবংশের অন্যান্য সকলে পেনুগোণ্ডায় পলায়ন করিয়াছিলেন। সেখানে রামরাজার ভ্রাতা তিরুমল ১৫৭০ খৃঃ অব্দে রাজপদ অধিকার করিয়া 'আরবীড়ু' রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। এই বংশের প্রসিদ্ধ নরপতি ছিলেন ১ম বেঙ্কট। আনুমানিক ১৫৮৫ খৃঃ অব্দে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিয়া চন্দ্রগিরি নামক স্থানে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। রাজা প্রথম বেঙ্কট বৈষ্ণবধর্ম্ম ও তেলেগু সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কিন্তু রাজ্যের সুদিন আর ফিরিল না। প্রাদেশিক সামন্তগণ একে একে স্বাধীনতা ঘোষণা করিতে লাগিলেন; রাজ্যের অধিকাংশই বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা রাজ্যের কুক্ষিগত হইয়া পড়িল। বিজয়নগর বা চন্দ্রগিরির রাজারাও কালক্রমে ক্ষুদ্র স্থানীয় নায়কে পরিণত হইয়া গেলেন,—বর্ত্তমানে আনেগুণ্ডির ক্ষুদ্র সামন্তগণ রামরাজার বংশধররূপে বিরাজ করিতেছেন।

তিরুমল ও আরবীড়ু বংশ ১ম বেঙ্কট

আনেগুণ্ডির রাজা

বিজয়নগর যে বাস্তবিক কিরূপ সুসমৃদ্ধ সাম্রাজ্য ছিল আজ তাহা ধারণা করা কঠিন। ফিরিস্তা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে, বিজয়নগরের রাজারা ক্ষমতা, ঐশ্বর্য্য এবং রাজ্যবিস্তারে বহ্‌মনী সুলতানদিগকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছিলেন। গোয়া বন্দরটি প্রথম দিকে ছিল বিজয়নগরেরই অধীন; সেখানকার সামুদ্রিক বাণিজ্যের কল্যাণে রাজ্যে প্রচুর অর্থাগম হইত। রাজা ২য় বুক্ক তুঙ্গভদ্রা নদীতে এক প্রকাণ্ড বাঁধ দিয়া নগরে জলসরবরাহের সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন; পাহাড় কাটিয়া প্রায় ১৫ মাইল দীর্ঘ এক বিরাট জলাশয় নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল, সেই জলাশয় হইতে সমগ্র নগরে জল সরবরাহ করা হইত। বিজয়নগরের সমৃদ্ধির দিনে বিদেশ হইতে বহু বণিক ও পর্য্যটক সেখানে আসিতেন; তাঁহারা

বিজয়নগরের গৌরব, ফিরিস্তা

সকলেই ইহার ঐশ্বর্য্যাদির প্রশংসায় শতমুখ হইয়া উঠিয়াছেন। ১৪২০ খৃঃ অব্দে ইতালীয় বণিক নিকোলো কোন্তি (Nicolo Conti) এখানে আসেন; কোন্তির বর্ণনা হইতে জানিতে পারা যায় যে, শুধু বিজয়নগর শহরটিরই পরিধি ছিল ৬০ মাইল; চারিদিকে পর্ব্বতগাত্রের উপর দিয়া দুর্ভেদ্য শৈলবেষ্টনী নির্ম্মাণ করিয়া রাজধানী সুরক্ষিত করিয়া রাখা হইয়াছিল। ১৪৪৩ খৃঃ অব্দে মুস্‌লিম পরিব্রাজক আব্দুর রজ্জক বিজয়নগরে আগমন করেন। তিনি লিখিয়াছেন,—"পৃথিবীতে ইহার (বিজয়নগরের) ন্যায় নগর কেহ কখনও চক্ষে দেখে নাই, কানেও শোনে নাই। পর পর সাতটি দুর্ভেদ্য দুর্গপ্রাকারে ইহা সুরক্ষিত।...সপ্তম প্রাকারটি অপরগুলির মধ্যভাগে অবস্থিত; ইহার মধ্যবর্ত্তী ভূমিভাগ হিরাটের বড়বাজারের প্রায় দশগুণ। ইহার মধ্যে রাজপ্রাসাদ।...প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রাকারের মধ্যে কৃষিক্ষেত্র, বাগান ও ঘরবাড়ী। তৃতীয় হইতে সপ্তমের মধ্যে দোকান ও বাজার। যেখানে রাজপ্রাসাদ অবস্থিত সেখানে পাথর-কাটা মসৃণ জলপ্রণালীর মধ্য দিয়া অনেকগুলি স্রোতস্বতী প্রবাহিত হইতেছে। নগরটি যে কিরূপ জনবহুল তাহা ধারণা করা অসম্ভব। রাজপ্রাসাদের ধনাগার সুবর্ণে পরিপূর্ণ। সম্ভ্রান্ত লোক হইতে বাজারের সাধারণ কর্ম্মচারীরা পর্য্যন্ত, উচ্চনীচ সকলেই কানে, গলায়, বাহুতে, হাতের কব্জী এবং অঙ্গুলিতে নানাবিধ মণিরত্নখচিত অলঙ্কার পরিয়া থাকে"। ১৫২২ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণদেব রায়ের রাজত্বকালে দোমিঙ্গোজ্ পাএস্ (Domingos Paes) নামে জনৈক পর্ত্তুগীজ বিজয়নগর সম্বন্ধে একখানি চমৎকার বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি সমগ্র নগরটির আয়তন ও লোকসংখ্যা স্থির করিয়া উঠিতে পারেন নাই; কিন্তু নগরটিতে লক্ষাধিক বাসগৃহ ছিল বলিয়া তিনি অনুমান করিয়াছিলেন; তাঁহার মতে বিজয়নগর ছিল "পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সমৃদ্ধিশালী নগর"। পাএস্ একবার রাজপ্রাসাদের একাংশ পরিদর্শন করেন; সেখানে তিনি ৩৪টি রাজপথ দেখিতে পান; সেখানকার একটি গৃহ, ছাদ হইতে ভিত্তি পর্য্যন্ত, আগাগোড়া ছিল গজদন্তে নির্ম্মিত। ন্যুনিজ (Nuniz) নামে আর একজন পর্ত্তুগীজ অচ্যুত রায়ের রাজত্বকালে আসিয়া লিখিয়া গিয়াছেন যে,

নিকোলো কোন্তি

আব্দুর রজ্জক

পাএস্

ন্যুনিজ

রাজবাড়ীতে স্বর্ণ এবং রৌপ্য ব্যতীত অন্য কোনও ধাতুর বাসনপত্র ব্যবহার করা হইত না।

শাসন-ব্যবস্থা

সমগ্র সাম্রাজ্যটি অন্যূন দুই শত প্রাদেশিক রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল; আভ্যন্তরীণ কার্য্যে প্রত্যেক প্রাদেশিক শাসক প্রায় স্বাধীন ছিলেন, তবে সম্রাটের শুভেচ্ছার উপরই তাঁহাদের কার্য্যসাফল্য ও সৌভাগ্য নির্ভর করিত। তাঁহারা সম্রাটকে নিয়মিতভাবে কর এবং যুদ্ধবিগ্রহের সময় সৈন্য সংগ্রহ করিয়া দিতেন। সম্রাটের নিজেরও সৈন্যদল এবং ভূ-সম্পত্তি থাকিত। প্রত্যেক প্রদেশের মোট রাজস্বের অর্দ্ধাংশ সম্রাট গ্রহণ কবিতেন। প্রাচীন হিন্দুরীতি অনুসারে প্রজাদের নিকট হইতে উৎপন্ন দ্রব্যের এক-ষষ্ঠাংশ রাজস্ব আদায় করা হইত। বিদেশী পর্য্যটকদের বিবরণ হইতে বুঝা যায় যে, এই যুগে বিজয়নগর রাজ্যে জনসাধারণের অবস্থা বিশেষ স্বচ্ছল ছিল।

বিদ্যা ও শিল্প

বিজয়নগবের রাজাবা অনেকেই বিদ্যোৎসাহী এবং শিল্পানুরাগী ছিলেন। বেদ-সংরক্ষক পণ্ডিতপ্রবব সায়ন ও মাধবাচার্য্যের কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। এই সময়ই আবাব রাজাদের পৃষ্ঠ-পোষকতায় কানাডী ও তেলেগু সঙ্গীত ও সাহিত্যেব যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়। তেলেগু সুরশিল্পী ত্যাগরাজের অপূর্ব্ব রচনায় সারা দক্ষিণ-ভাবত আজও তাই মুগ্ধ হইয়া আছে। বিজয়নগবের মন্দির প্রাসাদাদির ধ্বংসাবশেষ সেখানকার স্থাপত্য-শিল্পের নীরব সাক্ষ্য আজিও বহন করিতেছে। তখনকার চিত্রশিল্পেব নিদর্শনগুলি বিলুপ্ত হইয়া গেলেও, আব্দর রজ্জক এবং পর্ত্তুগীজ লেখকদের বিবরণ হইতে নিঃসংশয়ে বুঝিতে পারা যায় যে, ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্যের ন্যায় বিজয়নগরের চিত্রকলাও একসময় উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিল।

STUDIES AND QUESTIONS

1. Sketch the history of the Bahamani Kingdom, and give some account of the various states that arose on its ruin. (C. U. '15, '17, '21, '34, '36).

2. Give an account of the rise and fall of the kingdom of Vijayanagar. (C. U '27, '31, '33, '39, '44).

দ্বাবিংশ অধ্যায়

সুলতানী আমলে ভারতবর্ষ

।ক-কর্তৃত্ব
।জতন্ত্র

শাসন-ব্যবস্থা।—শাসন-ব্যবস্থার নামে সুলতানগণ প্রকৃত-পক্ষে এক-কর্তৃত্ব (Autocracy) শাসনের প্রতিষ্ঠা করেন। একাধারে সম্রাট, সৈন্যাধ্যক্ষ ও বিচারপতিরূপে সুলতানই ছিলেন সে শাসন-ব্যবস্থার মূলাধার; তাঁহার কথাই ছিল দেশের আইন। মন্ত্রী, অমাত্য, প্রাদেশিক রাজপ্রতিনিধি, প্রভৃতি সকলেই ছিলেন সুলতানের ভৃত্যস্বরূপ। তাই যে কোনও মূহূর্তে কাহারও নিকট কোনরূপ কৈফিয়ৎ না দিয়া তাঁহাদিগকে পদচ্যুত এবং
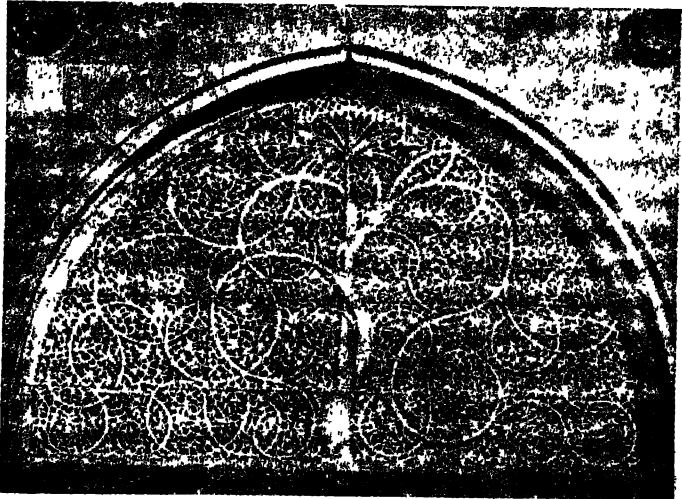
সিদি সৈয়দ মস্‌জিদের সচ্ছিদ্র শৈল গবাক্ষ [আহ্‌মদাবাদ]

প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা চলিত। দিল্লীর কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থার অনুকরণে প্রাদেশিক শাসকগণও নিজ নিজ প্রদেশে এক-কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন; সুলতানের আনুগত্য স্বীকার, নিয়মিত কর ও উপঢৌকন প্রদান এবং প্রয়োজনানুসারে

সৈন্য-সংগ্রহ করিয়া দেওয়া ব্যতীত সুলতানের নিকট তাঁহাদের আব কোন দায়িত্ব ছিল না। এরূপ স্বেচ্ছাচারী শাসনতন্ত্রের মূল ভিত্তি ছিল সামরিক শক্তি। সামরিক শক্তির বলেই সুলতান তাঁহার সমুদয় প্রভাব-প্রতিপত্তি রক্ষা করিয়া চলিতেন। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু সুলতানী আমলে ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ শাসন-ব্যবস্থার বিশেষ পরিবর্তন হয় নাই; কারণ যে সামরিক শক্তির উপর নির্ভর করিয়া সুলতানগণ রাজ্যশাসন করিতেন তাহা রাজধানী, দুর্গ, সৈন্যাবাস, প্রভৃতি কয়েকটি বিশিষ্ট স্থানেই কেন্দ্রীভূত থাকিত; অন্যান্য স্থানে হিন্দু সামন্তগণ স্বাধীন ভাবেই দেশের চিরাচরিত পদ্ধতিতে শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন; সুলতানের আনুগত্য স্বীকারের চিহ্নস্বরূপ তাঁহারা রাজধানীতে নিয়মিত রাজস্ব এবং কখন কখনও উপঢৌকন পাঠাইতেন মাত্র। বিশেষ অত্যাচারী সম্রাটের রাজত্বকাল ব্যতীত প্রজাসাধারণেব জীবনযাত্রায় মুস্‌লিম শাসকগণ হস্তক্ষেপ করিতেন না। হিন্দুদিগকে প্রায়ই 'জিজিয়া' কর নামে একটি অতিরিক্ত রাজস্ব দিতে হইত।

দেশের আভ্যন্তরীণ শাসন-ব্যবস্থা

হিন্দু শাসন-পদ্ধতি

জনসাধারণ

সমাজ ও ধর্ম্ম।—মুসলমানদের আগমনের পূর্ব্বে গ্রীক, শক, হূণ, প্রভৃতি যে সকল বৈদেশিক জাতি ভারতে আসিয়াছিল তাহারা ভারতীয় আচার-ব্যবহার ও ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া কালক্রমে হিন্দু-সমাজে মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু মুসলমানগণ তিনশত বৎসর এদেশে বাস করিয়াও নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়াছিলেন। তাঁহারা পূর্ব্বগামী বিদেশী জাতিদের ন্যায় হিন্দুসমাজের অঙ্গীভূত হন নাই। ইস্‌লাম ধর্ম্ম ও সমাজবিধি হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজ-ব্যবস্থা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। প্রতীক ও প্রতিমা-পূজা হিন্দু-উপাসনাদির বিশেষত্ব; কিন্তু মুসলমানগণ প্রতীক ও প্রতিমাকে ধর্ম্মোন্নতির প্রবল অন্তরায় বলিয়া মনে কবেন। হিন্দু-সমাজের মূলভিত্তি জাতিভেদমূলক বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, কিন্তু সাম্যবাদী মুসলমান-সমাজ সম্পূর্ণরূপে জাতিবর্জ্জিত ও গণতান্ত্রিক। এই সকল পার্থক্য, হিন্দু ও মুসলমান, এই দুইটি সমাজের মিলনের পথে বহু বাধা সৃষ্টি করিয়া রহিল। মুসলমান বিজয়ের পর মুস্‌লিম-ধর্ম্ম ধীরে ধীরে ভারতে বিস্তাব লাভ করিতে থাকে। নিম্নবর্ণের বহু হিন্দু উচ্চবর্ণের অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া এবং মুসলমান সমাজের উদারতা ও সাম্যনীতিতে আকৃষ্ট হইয়া

ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে লাগিল। ইহা ব্যতীত উচ্চ রাজপদ লাভ ও 'জিজিয়া' হইতে অব্যাহতির প্রলোভনেও বহু হিন্দু ইস্‌লাম-ধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছিল। এই সঙ্কটের অবস্থায় ইস্‌লাম প্রভাব যাহাতে হিন্দু-সমাজকে দুর্ব্বল করিতে না পারে, সেজন্য হিন্দু শাস্ত্রকারগণ কঠোর বিধি-নিষেধ ও সামাজিকশাসনের ব্যবস্থা করিলেন এবং প্রধানতঃ তাঁহাদের এই রক্ষণশীলতার জন্যই, অন্যান্য দেশে ইস্‌লাম ধর্ম্মের প্রচারকগণ যেরূপ পূর্ণ সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন, ভারতবর্ষে মুস্‌লিমগণ সেরূপ সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই। মধ্যযুগের রক্ষণশীল শাস্ত্রকারদের মধ্যে দক্ষিণের মাধবাচার্য্য ও বাঙলার রঘুনন্দন সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ।

মাধবাচার্য্য ও রঘুনন্দন

কিন্তু তথাপি বহুকাল একত্র বসবাসের এবং ভারতবর্ষকে স্থায়ী অধিষ্ঠান করার ফলে, হিন্দু ও মুসলমানগণ পরস্পর পরস্পরের প্রভাব হইতে মুক্ত থাকিতে পারেন নাই। যে সকল হিন্দু ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিতেন তাঁহাদের অনেকের পক্ষেই চিরাচরিত আচার-ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন করা সম্ভবপর হইত না। আবার, অনেক মুসলমান সুলতান ও ওমরাহ্‌ হিন্দু রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়া কোন কোন বিষয়ে হিন্দু আচার ব্যবহারের দ্বারাও প্রভাবিত হইতেন। এইভাবে কালক্রমে উভয় ধর্ম্ম ও সমাজের মধ্যে সংঘর্ষ কমিয়া সমন্বয়ের প্রচেষ্টা দেখা গেল। উভয় সম্প্রদায়ের উদারপন্থী নেতাগণ হিন্দু-মুস্‌লিম মিলনের বাণী প্রচার করিতে লাগিলেন। এই সকল মিলনপন্থী মহাপুরুষদের মধ্যে রামানন্দ, কবীর, শ্রীচৈতন্য, গুরু নানক, খাজা মুইনউদ্দীন চিশতি, নিজামউদ্দীন আউলিয়া, শাহ্‌জলাল, নুর কুতব্‌উল আলম্‌, একনাথ, নামদেব, প্রভৃতি বিশেষ প্রসিদ্ধ। এই সকল ধর্ম্মপ্রচারকগণ সাধারণের বোধগম্য হিন্দী, উর্দ্দু, বাঙ্গালা, মারাঠি, প্রভৃতি দেশীয় ভাষাতেই উপদেশ দান করিয়া গিয়াছেন। ইঁহাদের ধর্ম্মোপদেশের মূল কথা হইতেছে, "ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয় এবং তিনিই সকলের আরাধ্য। ভক্তি ও সেবা দ্বারাই প্রেমময় ভগবানকে লাভ করা যায়। যাগযজ্ঞ অথবা জটিল পূজা-পদ্ধতি ভগবানের আরাধনায় নিষ্প্রয়োজন। হিন্দুর ভগবান ও মুসলমানের ভগবানে কোন প্রভেদ নাই; কারণ ঈশ্বর এক। জাতিভেদ ধর্ম্মের অঙ্গ নহে; জীবমাত্রেই ভগবানের সন্তান।"

উদারতা ও হিন্দু-মুস্‌লিম মিলন প্রচেষ্টা

রামানন্দ

"রামাৎ বৈষ্ণব" সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা প্রসিদ্ধ ধর্ম্ম-প্রচারক রামানন্দ খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতকে আবির্ভূত হন। ভগবান রামচন্দ্রের উপাসক এবং জাতিতে ব্রাহ্মণ হইলেও তিনি ঈশ্বরের একত্ব প্রচার করিয়াছেন এবং জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে সকলকেই দীক্ষা দিয়াছেন। রামানন্দের শিষ্যদের মধ্যে মুসলমান জোলা ভক্ত কবীর সুপ্রসিদ্ধ।

বল্লভাচার্য্য

বৈষ্ণব প্রচারক বল্লভাচার্য্য পঞ্চদশ শতকে আবির্ভূত হন। তিনি ছিলেন দক্ষিণী ব্রাহ্মণ এবং শ্রীকৃষ্ণের উপাসক। তিনিও জাতিভেদ মানিতেন না; তাঁহার মতে জীবমাত্রেই ভগবানের সন্তান। তাঁহার প্রভাব সুদূর কাথিয়াবাড় গুজরাট পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়।

শ্রীচৈতন্য

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য ছিলেন নবদ্বীপের বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ। এ-যুগের সন্ন্যাসী-প্রচারকদের মধ্যে তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। মাত্র ২৪ বৎসর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া তিনি বৈষ্ণব ধর্ম্মের মূলমন্ত্র 'বৈরাগ্য-বিশুদ্ধ প্রেম ও জীবে দয়া' প্রচারে জীবন উৎসর্গ করেন। তিনিও জাতিভেদ স্বীকার করিতেন না। তাঁহার অগণিত শিষ্যের মধ্যে একজন ছিলেন মুসলমান.—তাঁহার নাম 'যবন' হরিদাস। চৈতন্য-দেবের আবির্ভাব বাঙ্গালার ও উড়িষ্যার ধর্ম্ম, সংস্কৃতি ও সাহিত্যের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

একনাথ

একনাথ ছিলেন মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ। তিনিও জাতিভেদ মানিতেন না। অধিকন্তু তিনি ছিলেন গার্হস্থ্য-ধর্ম্মের পৃষ্ঠপোষক। সমাজে যাহারা অস্পৃশ্য বলিয়া অবজ্ঞাত ছিল তাহারা তাঁহার গৃহে সাদরে স্থান পাইয়াছিল।

কবীর

এ-যুগের অব্রাহ্মণ ধর্ম্ম-প্রচারকদের মধ্যে কবীর এবং গুরু নানক সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। উভয়েই পঞ্চদশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হন। কবীর নিজে ছিলেন মুসলমান জোলা; কিন্তু হিন্দু-মুস্‌লিম কোন ধর্ম্মেরই বাহিরের আচার-ব্যবহার তিনি মানিতেন না। তাঁহার মতে যিনি হিন্দুর ঈশ্বর, তিনিই মুসলমানের আল্লা; কবীরের দোঁহা হিন্দী সাহিত্যের অমর অবদান।

নানক

গুরু নানক জাতিতে ছিলেন ক্ষত্রিয়। সত্যের সন্ধানে তিনি সুদূর মক্কা ও বোগদাদ পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়াছিলেন। ধর্ম্মের জটিল বাহ্যিক আচার হইতে মুক্ত হইয়া সত্যস্বরূপ ভগবানের আরাধনা করিতে হইবে—ইহাই তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের মূলমন্ত্র। তাঁহার

শিষ্যদের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই লোক ছিল। গুরু নানকের শিষ্যদের নাম ছিল "শিখ"—এই "শিখ" কথাটি বাস্তবিক সংস্কৃত "শিষ্য" শব্দেরই অপভ্রংশ। ইহা হইতেই তাঁহার শিষ্যবর্গ "শিখ সম্প্রদায়" নামে আজ সুপরিচিত।

সুফী সম্প্রদায় ও খাজা মুইন্ উদ্দীন চিশ্‌তি

এ-যুগে মুসলমান ফকিরদের মধ্যে খাজা মুইন্‌উদ্দীন চিশ্‌তি, নিজামউদ্দীন আউলিয়া, শাহ্‌জলাল এবং নুর কুতব্ উল আলম ছিলেন সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। সুফী সম্প্রদায়ভুক্ত খাজা মুইন্‌উদ্দীন চিশ্‌তি আজমীড়ে বাস করিতেন এবং সমভাবে সে যুগের ভক্তিবাদী হিন্দু ও মুসলমানের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। নিজামউদ্দীন আউলিয়া বাস করিতেন রাজধানী দিল্লী নগরীতে। আলাউদ্দীন খল্‌জীর ন্যায় পরাক্রান্ত সুলতানও তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতেন এবং তাঁহার দরগায় একটি মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। বিখ্যাত সাধু শাহ্-জলাল তব্‌রিজীর আস্তানা বাঙ্গালা ও আসামের অনেক স্থানে দেখা যায়। নুর কুত্‌বউল আলম জৌনপুর হইতে বাঙ্গালাদেশে আসেন, পাণ্ডুয়ায় তাঁহার সমাধি এখনও বর্ত্তমান। স্থানীয় হিন্দু ও মুসলমান-গণ আজও এই দুই সাধুর দরগায় "সিন্নি" দিয়া থাকেন। উত্তর-ভারতের লোক-সাহিত্য, পাঁচালী, ছড়া, পীরের গান, গ্রাম্যগীতি, প্রভৃতিতে হিন্দু ও মুসলমান ভাবধারা অঙ্গাঙ্গীভাবে মিশিয়া গিয়াছে।

নিজামউদ্দীন আউলিয়া

শাহ্‌জলাল ও নুর উল আলম

পল্লীগাথা ও লোক-সাহিত্য

ভাষা ও সাহিত্য।—তুর্কী-আধিপত্যের সঙ্গে সঙ্গে দেবভাষা সংস্কৃত রাজানুগ্রহ হইতে বঞ্চিত হইয়া পড়িল; তথাপি দেশের প্রাচীন শিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে ব্রাহ্মণগণ সংস্কৃতের চর্চ্চা অব্যাহত রাখিয়াছিলেন। দেশে টোল-চতুষ্পাঠির অভাব ছিল না। প্রধান প্রধান তীর্থসমূহ ছিল যেন সেকালের এক একটি বিশ্ববিদ্যালয়। রাজানুগ্রহ হইতে বঞ্চিত হইলেও সংস্কৃত চর্চ্চা এই সব নির্লোভ ব্রাহ্মণদের চেষ্টাতেই দেশ হইতে বিলুপ্ত হইয়া যায় নাই। এ যুগের সংস্কৃত লেখকগণের মধ্যে বেদের ভাষ্যকার সায়নাচার্য্য, তাঁহার ভ্রাতা দার্শনিক ও স্মার্ত্ত মাধবাচার্য্য, পণ্ডিত হেমাদ্রি, বোপদেব, জ্ঞানেশ্বর, স্মার্ত্ত রঘুনন্দন, জীব গোস্বামী, প্রভৃতি বিশেষ প্রসিদ্ধ।

প্রাচীন সংস্কৃতি

লৌকিক ভাষা ও পল্লী সাহিত্যের উত্তরোত্তর বিকাশই এ-যুগের সংস্কৃতির বিশিষ্ট দান। ধর্ম্মপ্রচারকগণ জনসাধারণের মধ্যে ধর্ম্ম-প্রচারের জন্য স্বভাবতঃই লৌকিক ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করেন

আধুনিক লৌকিক ভাষা ও সাহিত্য

এই ভাবেই বাঙ্গালা, হিন্দি, উর্দ্দু, মারাঠি, গুজরাটী, প্রভৃতি জনসাধারণের দৈনন্দিন কাজকর্ম্মের ভাষা কালক্রমে সাহিত্যের পর্য্যায়ে উন্নীত হইতে লাগিল। বাঙ্গালায় শ্রীচৈতন্যদেবের প্রেম-ধর্ম্ম প্রচারের ফলে বাঙ্গালা সাহিত্য নিরতিশয় সমৃদ্ধ হইয়া উঠিতে থাকে। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদাবলী শ্রীচৈতন্যের পূর্ব্ব হইতেই মৈথিলী ও বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীদাসের মহাভারত আজও বাঙ্গালার ঘরে ঘরে পঠিত হইয়া থাকে। বাঙ্গালার যে সকল সুলতানের নাম বাঙ্গালা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য অক্ষয় হইয়া আছে তাঁহাদের মধ্যে ইউসুফ শাহ, হুসেন শাহ ও হুসেন শাহের পুত্র নসরৎ শাহ বোধহয় সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। ইউসুফ শাহের আনুকূল্যে মালাধর বসু শ্রীমদ্ভাগবতের অনুবাদ করেন। কবীন্দ্র পরমেশ্বর হুসেন শাহকে 'কলির কৃষ্ণ' বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। নসরৎ শাহের আদেশে মহাভারতের এক বাঙ্গালা সংস্করণ রচিত হইয়াছিল। নসরৎ শাহের সেনাপতি পরাগল খাঁ এবং পরাগলের পুত্র ছোটে খাঁ বা ছুটি খাঁ মহাভারতের অনুবাদ করাইয়াছিলেন। রামানন্দ ও কবীর হিন্দী সাহিত্যে নবীন প্রেরণা সঞ্চার করেন। কবীরের দোঁহা, বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের পদাবলীর ন্যায় যে কোন সাহিত্যের গৌরবের বস্তু। নানক ও তাঁহার শিষ্যবর্গের রচনায় পঞ্জাবী ভাষা সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল এবং মহারাষ্ট্রের ধর্ম্ম-প্রচারক একনাথ মারাঠি ভাষায় নূতন প্রেরণা আনয়ন করেন এবং নামদেব ও তুকারাম তাহাতে পূর্ণতা দেন।

বাঙ্গালা সাহিত্য

হিন্দি সাহিত্য গুরুমুখী (পঞ্জাবী)

একনাথ ও মারাঠি সাহিত্য

দিল্লীর সুলতানরা ছিলেন পারসিক সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক। কবি ও সুরজ্ঞ আমীর খুস্‌রু বোধ হয় এ-যুগের পারসিক ভাষার সাহিত্যিকদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনকালে তিনি ঘিয়াস্‌উদ্দীন বল্‌বন হইতে ঘিয়াসউদ্দীন তুঘ্‌লুক পর্য্যন্ত প্রায় সকল সুলতানেরই আনুকূল্য লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার রচনাবলীতে হিন্দি শব্দেরও বহুল প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়; সেজন্য তাঁহাকে ফার্‌সি-হিন্দির মিশ্রণে উৎপন্ন উর্দ্দু সাহিত্যেরও একজন আদি লেখক বলা হইয়া থাকে। তিনি হিন্দু সভ্যতারও সমজদার ছিলেন। সেখ নাজিমউদ্দীন বা হুসন-ই-দিলবী নামে আর একজন

পারসিক সাহিত্য আমীর খুস্‌রু

ঐতিহাসিক গ্রন্থ

কবিও এ-যুগে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। উৎকৃষ্ট ঐতিহাসিক গ্রন্থ পারসিক সাহিত্যের বিশিষ্ট অবদান। নাসিরউদ্দীন মামুদের শাসনকালে, মিন্‌হাজউদ্দীন সিরাজ 'তবকৎ-ই-নাসিরী' নামে এক বিরাট ইতিহাস রচনা করেন। কবি আমীর খুস্‌রুও 'তারিখ-ই-আলাই' নামে একখানি ইতিহাস লিখিয়া গিয়াছেন। তাহাতে আলাউদ্দীন খল্‌জীর রাজত্বের প্রথম ভাগ অবধি বর্ণিত হইয়াছে। এ-যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দীন বরণী ছিলেন মুহম্মদ তুঘ্‌লুক ও ফীরুজ তুঘ্‌লুলের সমসাময়িক। তিনি 'তারিখ-ই-ফীরুজশাহী' নামে একখানি প্রসিদ্ধ ইতিহাস প্রণয়ন করেন। শম্‌স্‌-ই-সিরাজ অফিফ নামে আর একজন লেখকও 'তারিখ-ই-ফীরুজশাহী' নামে আর একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। পরবর্ত্তী ঐতিহাসিকগণ এই সমস্ত গ্রন্থের উপর নির্ভর করিয়া সে যুগের ইতিহাস রচনা করিয়াছিলেন।

মিন্‌হাজউদ্দীন

জিয়াউদ্দীন বরণী

শম্‌স্‌-ই-সিরাজ

হিন্দুস্থানী উর্দ্দু ভাষার উৎপত্তি

একদিকে সংস্কৃতজ হিন্দি অপরদিকে পারসিক, তুর্কী ও আরবী ভাষার সংমিশ্রণে এযুগে উর্দ্দূ ভাষার উদ্ভব হয়। 'উর্দ্দূ' কথাটি তুর্কী, ইহার অর্থ 'শিবির'। প্রধানতঃ সৈন্যশিবিরে ও হাটবাজারে হিন্দু ও মুস্‌লিম সৈন্যদলের পরস্পর কথাবার্ত্তার মধ্য দিয়া এই মিশ্র ভাষার উৎপত্তি হয়। দৈনন্দিন জীবনে সর্ব্বসাধারণের ব্যবসা-বাণিজ্য, মেলামেশা, প্রভৃতিও ইহার উৎপত্তির সহায়তা করে। উর্দ্দূ প্রকৃতপক্ষে হিন্দিরই বৈদেশিক-শব্দবহুল এক রূপ। ইহার ব্যাকরণ বিশুদ্ধ হিন্দিরই অনুরূপ, কিন্তু শব্দসম্পদ হিন্দি, পারসিক, আরবিক ও যৎসামান্য তুর্কী শব্দের মিশ্রণে গঠিত,—তন্মধ্যে আর্য্যভাষা-মূলক হিন্দি ও পারসিক শব্দেরই প্রাধান্য দেখা যায়।

অভিনব স্থাপত্য।—মুস্‌লিম শাসকগণ স্থাপত্য-শিল্পের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। এ-যুগে তাঁহাদের উৎসাহে এক অভিনব স্থাপত্য-শিল্প গড়িয়া উঠে, তাহাতে হিন্দু ও মুস্‌লিম স্থাপত্য রীতির সুষ্ঠু সংমিশ্রণ দেখিতে পাওয়া যায়। মুস্‌লিমগণ যে সকল প্রাসাদ, মস্‌জিদ, স্মৃতিসৌধ, প্রভৃতি নির্ম্মাণ করাইয়া গিয়াছেন, সে সকল কার্য্যে যথেষ্ট সংখ্যক হিন্দু শিল্পী নিয়োগ করিতেন। এই সকল মস্‌জিদ, প্রাসাদ, প্রভৃতির উপকরণ অনেক সময় হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন মন্দিরাদি ধ্বংস করিয়া সংগ্রহ করা হইত। সময়-বিশেষে

হিন্দু ও মুস্‌লিম

হিন্দু-মন্দিরাদিই কিছু পরিবর্তিত করিয়া মস্‌জিদ প্রভৃতিতে রূপান্তরিত করা হইত। ফলে উভয় রীতির মিশ্রণে এ-যুগে ভারতবর্ষে যে কেবল এক নূতন স্থাপত্য-শিল্পেই উদ্ভব হইল তাহাই নয়; স্থানভেদে তাহার মধ্যে প্রাদেশিক বৈশিষ্ট্যও স্পষ্ট হইয়া উঠিল। এ-যুগে

স্থাপত্য রীতির মিশ্রণ
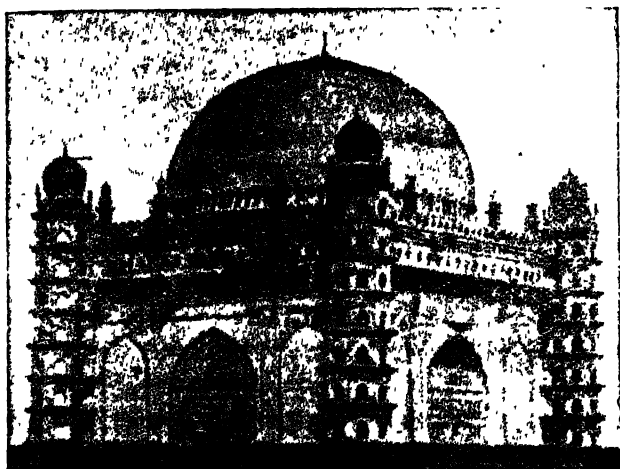
বিজাপুরের গোলগম্বুজ

দিল্লী, জৌনপুর, গুজরাট, বঙ্গদেশ, দাক্ষিণাত্য, প্রভৃতি এক এক স্থানে এক-এক রীতির স্থাপত্য-শিল্প দেখিতে পাওয়া যায়। দিল্লীর কুতব্‌ মিনার এবং নানা মস্‌জিদ ও সমাধিমন্দিরগুলিতে মুস্‌লিম রীতির প্রাধান্য দৃষ্ট হয়। প্রসিদ্ধ অতাল মস্‌জিদ ও জাম-ই-মস্‌জিদ জৌনপুর স্থাপত্য-রীতির উৎকৃষ্ট নিদর্শন। গুজরাটী স্থাপত্যের উৎকৃষ্ট নমুনা হইল আহ্‌মদ শাহের আদেশে নির্মিত তিন-দরওয়াজা এবং জাম-ই-মস্‌জিদ (আহ্‌মদাবাদ); বাঙ্গালাদেশে গৌড়ের সোনা মস্‌জিদ, লোটন মসজিদ্‌, কদম রসুল, প্রভৃতি এবং পাণ্ডুয়ার আদিনা মস্‌জিদ ও একলাখী সমাধিমন্দির মধ্যযুগের বঙ্গীয় স্থাপত্যের স্বকীয়তা প্রচার করিতেছে। দাক্ষিণাত্যের স্থাপত্য-শিল্পের মধ্যে দৌলতাবাদের চাঁদমিনার,

প্রাদেশিক রীতি

বিদরের মামুদ গাওয়ানের বিদ্যা-নিকেতন এবং বিজাপুরের গোল-গম্বুজ সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য।

বিজয়নগরের হিন্দুরাজগণ এবং রাজপুত নৃপতিগণও চারু-কলা ও স্থাপত্য-শিল্পের বিশেষ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কুম্ভের বিজয়স্তম্ভ এবং বিজয়নগরের পদ্মমহল ও বিঠলদেবের মন্দির সে যুগের রাজপুত স্থাপত্য-শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

দেশের অবস্থা।—এ-যুগে অবিরাম যুদ্ধবিগ্রহ প্রভৃতি অশান্তির কারণ সত্ত্বেও দেশ সম্পদশালী হইয়া উঠে। কৃষি ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের সবিশেষ উন্নতি হইয়াছিল এবং দ্রব্যাদির মূল্য অতিশয় সস্তা থাকায় জনসাধারণ মোটের উপর সুখে-স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিত। তৎকালীন বৈদেশিক ভ্রমণকারিগণের বিবরণ হইতে দেশের ঐশ্বর্য্য ও সমৃদ্ধির অনেক পরিচয় পাওয়া যায়।

STUDIES AND QUESTIONS

1 How did the Brahmins attempt to protect the Hindu society against Muhammedan influence? State what you know of the *Sannyasi* teachers and their works. (C U. '22, '26).

2 Account for the rise of the religious reformers during the early Muhammedan rule. Mention some of the most famous of them and give an account of their teachings. (C. U. '16).

3. Write an account of the literature, art and architecture during the early Muhammedan period

মুঘল সাম্রাজ্য

(তুর্কী-বাদশাহী আমল)

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

আফগান-মুঘল প্রতিদ্বন্দ্বিতা

(বাবুর, হুমায়ুন, শের শাহ)

বাবুর (১৪৮২—১৫৩০) ।—"বাবুর" দিল্লীর সিংহাসনে যে রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করিয়া যান তাহা "মুঘল বংশ" নামে পরিচিত। কিন্তু তিনি নিজে ছিলেন তুর্কী, তৈমুরেব অধস্তন পঞ্চম পুরুষ ; তাঁহার মাতার দিক দিয়া তিনি মোগল (মুঘল) চিঙ্গিজ খাঁর সহিত সম্বন্ধযুক্ত ছিলেন। তাঁহার মাতামহ ছিলেন চিঙ্গিজ খাঁর ত্রয়োদশ অধস্তন পুরুষ।

বাবুরের বংশ পরিচয়

বাবুরের পূর্ব্ব জীবন বডই বৈচিত্রময়। ১৪০৪ খৃঃ অব্দে তৈমুর মারা যান এবং ১৪৯৪ খৃঃঅব্দে দ্বাদশ বর্ষীয় বালক বাবব ফরঘণারাজ্য তৈমুরের উত্তরাধিকারীরূপে প্রাপ্ত হইয়া জীবন-সংগ্রাম সুরু করেন। তৈমুরের রাজধানী সমরখন্দের অধিকার লইয়াও তৈমুরের বংশধরদের মধ্যে তখন বিরোধ চলিতেছিল। বাবুরও এই বিবোধে যোগ দিয়াছিলেন। ১৪৯৭ খৃঃ অব্দে মাত্র ১৫ বৎসর বয়সে তিনি সমর খন্দ অধিকাব কবেন ; কিন্তু অল্পকাল পবেই সমরখন্দ ও ফরঘণা উভয়ই তাঁহাব হস্তচ্যুত হইয়া গেল। কিছুকাল পরে আবার তিনি এই রাজ্য দুইটি জয় করিলেন, কিন্তু পুনবায় দুইটি রাজ্যই তিনি হারাইলেন। অবশেষে ১৫০৪ খৃঃ অব্দে তিনি কাবুল জয় করিলেন। ১৫১১ খৃঃ অব্দে কাবুল হইতে তিনি আব একবাব সমরখন্দ জয় করিবাব জন্য এক অভি-যান প্রেরণ করেন, কিন্তু ইহা ব্যর্থ হওয়ায় তাঁহাকে পূর্ব্ব পুরুষদের সিংহাসন অধিকার করিবার আশা ত্যাগ করিতে হইল। অতঃপর

কাবুল জয়

কান্দাহার জয় ও সীমান্ত অভিযান

বাবুর তৈমুরের ন্যায় 'হিন্দুস্থান' জয়ের সঙ্কল্প করেন। ১৫২২ খৃঃ কান্দাহার জয় করিয়া বাবুর ভারতবর্ষের সীমান্ত অঞ্চলে একটি লুণ্ঠনাভিযানও করিলেন। এদিকে আফগান সুলতান ইব্রাহিম লোদির অত্যাচারে পঞ্জাবের শাসনকর্তা দৌলৎ খাঁ লোদী এবং ইব্রাহিমের এক পিতৃব্য আলম খাঁ, ইব্রাহিমকে সমুচিত শিক্ষা দিবার জন্য, বাবুরকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। এই সুযোগে বাবুর লাহোর জয় করিয়া তৈমুরের উত্তরাধিকারী স্বরূপ উহা নিজেই অধিকার করিয়া লইলেন। তখন দৌলত খাঁ তাঁহার বিরুদ্ধতা করিলেন সুতরাং ১৫২৫ খৃঃ অব্দে পুনরায় পঞ্জাব আক্রমণ করিয়া বাবুর তাঁহাকে বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য করেন। তারপর
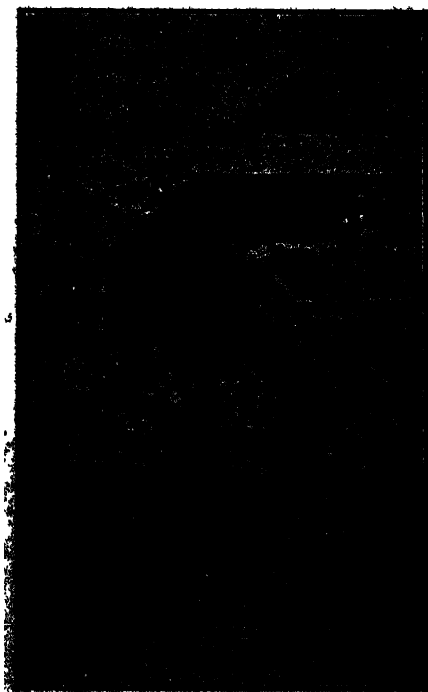
লাহোর অধিকার

বাবুর তাঁহার সখের বাগানবাড়ী নির্ম্মাণ তদারক করিতেছেন [প্রাচীন চিত্র]

পাণিপথের যুদ্ধ (১৫২৬)

পানিপথের রণক্ষেত্রে সুলতান ইব্রাহিম লোদীব সৈন্যদলকে কামান ও বন্দুক প্রভৃতি আগ্নেয় অস্ত্রের সুনিপুণ প্রয়োগে বিধ্বস্ত করিয়া (২১শে এপ্রিল, ১৫২৬) বিজয়গৌরবে বাবুব অবিলম্বে দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করিলেন। ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপিত

দিল্লী ও আগ্রা অধিকার

হইল। মুঘল (পর্তুগীজ-mogor) নামে পরিচিত হইলেও তৈমুর বংশধর বাবুর আসলে তুর্কী ছিলেন।

কিন্তু তখনও তাঁহার ভারতে মুঘল অধিকার স্থাপনের অন্তরায় দূর হয় নাই। মেবারের 'রাণা' (সংগ্রামসিংহ) পুনরায় হিন্দু আধিপত্য স্থাপনের চেষ্টা করিতেছিলেন। শুনিতে পাওয়া যায়, দৌলৎ খাঁ ও আলম খাঁর সহিত তিনিও বাবুরকে দিল্লী আক্রমণের জন্য উৎসাহিত করিয়াছিলেন। কিন্তু ইব্রাহিম লোদীর পতনের পর বাবুর দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিলে সংগ্রামসিংহ তাঁহার সহিত যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ফতেপুর সিক্রীর নিকট খানুয়া নামক স্থানে উভয় পক্ষে যুদ্ধ হইল* (মার্চ্চ ১৫২৭); কিন্তু বাবুরের রণকৌশল ও বন্দুক কামানের সম্মুখে মামুলি অস্ত্রশস্ত্রে-সজ্জিত বিশাল রাজপুত বাহিনী ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। রাণা সংগ্রামসিংহ রণক্ষেত্র হইতে প্রাণ লইয়া ফিরিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার জীবনব্যাপী সাধনার এই চরম ব্যর্থতায় তিনি ভগ্নহৃদয়ে প্রাণত্যাগ করিলেন (১৫২৯)। খানুয়ার যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া বাবুর বর্ত্তমান গোয়ালিয়র রাজ্যের অন্তর্গত চন্দেরী দুর্গ অধিকার করেন। ইতিমধ্যে সুলতান ইব্রাহিম লোদীর ভ্রাতা মামুদ লোদী বিহারের পাঠান ওম্‌রাহগণকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া বাবুরকে বাধা দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু পাটনার অনতিদূরে গোগ্রা নদীর তীরে সম্মিলিত আফগানবাহিনী পরাজিত হইল (১৫২৯)। এইরূপে একটি পর একটি করিয়া যুদ্ধ-জয়ের ফলে বাবুরের রাজ্য-সীমা একদিকে অক্ষুনদীর (Oxus) তীর হইতে বঙ্গের প্রত্যন্তসীমা এবং অপরদিকে হিমালয় হইতে গোয়ালিয়র অবধি বিস্তৃত হইল। বাবুরের বিজয়োল্লাসের চিহ্ন স্বরূপ কাবুলের প্রত্যেক নরনারী একটি করিয়া রৌপ্য মুদ্রা উপহার পাইয়াছিল এবং হুমায়ুন লাভ করিয়াছিলেন বিশ্ববিখ্যাত কোহিনুর মণি—ইহা ছিল রাজপুত রাণা বিক্রমাদিত্যের পরিবারভুক্ত সম্পত্তি।

সংগ্রামসিংহ খানুয়ার যুদ্ধ (১৫২৭)

গোগ্রার যুদ্ধ (১৫২৯)

বাবুরের সাম্রাজ্য সীমা

'কোহিনুর' মণি

১৫৩০ খৃঃ অব্দে মাত্র আটচল্লিশ বৎসর বয়সে বাবুর মৃত্যু মুখে পতিত হন। কথিত আছে, তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র হুমায়ুন কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইলে বাবুর পীড়িত পুত্রের শয্যা প্রদক্ষিণ করিয়া সর্ব্বশক্তিমান আল্লার নিকট একান্ত মনে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন,

বাবুরের মৃত্যু (১৫৩০)

তাঁহার জীবনের বিনিময়ে যেন পুত্রের প্রাণদান করা হয়। ক্রমে হুমায়ুন আরোগ্য লাভ করিলেন এবং বাবুর পীড়িত হইয়া কয়েক মাস পরে তাঁহার আগ্রার বাসভবনে ইহলোক হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করেন। তাঁহার অন্তিম ইচ্ছা অনুসারে কাবুলে তাঁহার মৃতদেহ সমাধিস্থ করা হয়।

বাবুরের চরিত্র

বাবুরের সাহস, বীরত্ব ও কর্ম্মদক্ষতা ছিল অসামান্য। সামান্য একজন ভাগ্যান্বেষী সৈনিক হিসাবে জীবন আরম্ভ করিয়া, কেবলমাত্র স্বীয় অনন্যসাধারণ প্রতিভা ও দক্ষতা-বলে বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া তিনি যে মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, ইহাই তাঁহার কৃতিত্বের চরম পরিচয়। তিনি যে কেবলমাত্র বীর ও রণনিপুণ সেনানায়ক ছিলেন, এমন নহে, সঙ্গীত, সাহিত্য ও চারুকলায়ও তাঁহার যথেষ্ট অধিকার ছিল। তিনি ফার্সী ও তুর্কী উভয় ভাষাতেই চমৎকার গীতিকবিতা রচনা করিতে পারিতেন। তিনি তাঁহার মাতৃভাষা তুর্কীতে একখানি মনোরম 'আত্মচরিত' রচনা করিয়াছিলেন।

হুমায়ুন (১৫৩০—৩৯ ও ১৫৫৫-৫৬)।—বাবুরের মৃত্যুর পর হুমায়ুন দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিলেন এবং পিতার নির্দ্দেশমত সাম্রাজ্যের কতিপয় অংশ ভ্রাতাদের মধ্যে ভাগ করিয়া দিলেন। কাবুল, কান্দাহার ও পঞ্জাব কামরাণের হস্তে গেল এবং হিন্দাল ও আস্কারী যথাক্রমে সম্বল ও মেওয়াট প্রদেশ পাইলেন।

বাবুর বিশাল সাম্রাজ্য জয় করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু শাসনকার্য্যের কোনরূপ ব্যবস্থা করিয়া যাইতে পারেন নাই। সুতরাং সিংহাসন লাভ করিয়াই নবীন সম্রাটকে নানা বিপদের সম্মুখীন হইতে হইল। এই সময়ে বিহার অঞ্চলে আফগানরা শের খাঁর নেতৃত্বে শক্তিসঞ্চয় করিতেছিল এবং গুজরাটের বাহাদুর শাহও আপনার আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করিতেছিলেন। হুমায়ুন তাঁহার পিতার ন্যায় উৎসাহী ও মানবচরিত্রে অভিজ্ঞ ছিলেন না। তিনি সুশিক্ষিত, সাহসী ও রণনিপুণ ছিলেন, কিন্তু অহিফেন সেবন হেতু তাঁহার চরিত্রে দৃঢ়তা ও কর্ম্মপটুতার অভাব ছিল। তাঁহার ভ্রাতারা বিপদের দিনে তাঁহার সাহায্য করেন নাই, বরং ব্যক্তিগত স্বার্থ-সাধনার জন্য তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন।

হুমায়ুনের চরিত্র

গুজরাটের বাহাদুর শাহ

খানুয়ার যুদ্ধে রাণা সংগ্রামসিংহের পতনের পর বাহাদুর শাহ মালব অধিকার করেন। এবার তিনি খোলাখুলি ভাবেই হুমায়ুনের শত্রুদের সঙ্গে যোগ দিলেন। তখন হুমায়ুন মালব ও গুজরাট আক্রমণ করিলেন। নানাস্থানে তাঁহার জয়লাভ হইতে লাগিল এবং অবশেষে তিনি চম্পানীর দুর্গ অধিকার করিয়া বিপুল বিক্রমে সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলেন (১৫৩৫)। এমন সময় তাঁহার

হুমায়ুনের মালব ও গুজরাট জয় (১৫৩৫)

হুমায়ুন (প্রাচীন চিত্র)

ভ্রাতা মির্জ্জা আস্‌কারী আগ্রায় বিদ্রোহী হইয়া উঠিলেন। ওদিকে বিহারে শের খাঁ চুনার ও রোটাস দুর্গ অধিকার করেন। হুমায়ুন আরব্ধ কার্য্য অসম্পূর্ণ রাখিয়াই আগ্রায় ফিরিয়া বিদ্রোহ দমন

করিলেন; এবং পরে বিহার অভিমুখে ধাবিত হইলেন। কিন্তু এদিকে মালব ও গুজরাট তাঁহার হস্তচ্যুত হইয়া গেল (১৫৩৬)।

শের শাহের পিতৃ-পরিচয়

শের শাহ।—শের শাহের বাল্য-নাম ছিল ফরিদ খাঁ স্থর। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ আফগানিস্থানের তখৎ-ই-স্থলেমান অঞ্চলে বাস করিতেন। তাঁহার পিতামহ ইব্রাহিম স্থর দিল্লীর উপকণ্ঠে হিস্‌সার ফীরুজা নামক স্থানে আসিয়া বাস করিতে থাকেন। তাঁহার পিতা হাসান স্থর সাসারামে জায়গীর লাভ করিয়া সেখানে বসতি স্থাপন করেন।

বাল্যজীবন

ফরিদ ছিলেন হাসান স্থরের জ্যেষ্ঠপুত্র। কিন্তু বিমাতার বিদ্বেষে তিনি পিতার স্নেহ হইতে বঞ্চিত হন। পনের বৎসর বয়সে গৃহ-ত্যাগ করিয়া তিনি জৌনপুরে যান এবং সেখানে পারসিক সাহিত্যে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন; ইহাতে তাঁহার পিতা সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে গৃহে আনিয়া তাঁহার উপর স্বীয় জায়গীর পরিচালনার ভার অর্পণ করিলেন। কিন্তু পুনরায় বিমাতার চক্রান্তে তাঁহাকে গৃহত্যাগ করিতে হইল। এবার তিনি সোজাসুজি আগ্রায় গিয়া জনৈক প্রভাবশালী ওমরাহের অধীনে চাকুরী গ্রহণ করেন (১৫১৯)। পিতার মৃত্যু হইলে স্থলতানের নিকট হইতে এক ফরমান্ (আদেশপত্র) পাইয়া তিনি পিতাব জায়গীর লাভ করিলেন। কিছুকাল পরে তিনি বিহারের স্বাধীন স্থলতান বহর খাঁ লোহানীর অধীনে চাকুরী গ্রহণ করেন। একদিন একাকী একটি ব্যাঘ্র শিকার করিয়া প্রভুর নিকট হইতে ফরিদ শের খাঁ উপাধি প্রাপ্ত হন। ইতিমধ্যে শত্রুদের চক্রান্তে আবার পৈতৃক জায়গীর হইতে বঞ্চিত হইলে শের খাঁ বাবুরের নিকট চাকুরী গ্রহণ করিয়া (১৫২৬) কারা প্রদেশের 'মুঘল' শাসনকর্ত্তার সহায়তায় সেই জায়গীর উদ্ধার করেন। কথিত আছে, কিছুকাল পরে শেরখাঁর ব্যবহারে বাবুর অসন্তুষ্ট হন; ফলে চাকুরী ছাড়িয়া তাঁহাকে পুনরায় বিহারে আসিয়া বহর খাঁর অধীনে কাজ লইতে হয়। কিছুকাল পরে বহর খাঁর মৃত্যু হইলে, নাবালক জলাল খাঁর অভিভাবক হিসাবে শের খাঁ বিহার শাসন করিতে থাকেন। এদিকে চুনার

চুনার দুর্গ অধিকার

দুর্গের কিল্লাদার তাজ খাঁর বিধবা পত্নী মালিকা শের খাঁকে বিবাহ করিয়া তাঁহার হাতে দুর্গ সমর্পণ করিলেন (১৫৩০)। শের খাঁর

আধিপত্যে ঈর্ষ্যান্বিত বিহারের ওম্‌রাহগণ বাঙ্গালার সুলতান ঘিয়াস্‌উদ্দীন মামুদ শাহের সহিত মিলিত হইয়া, তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন ; কিন্তু সুরজগড় নামক স্থানে শের খাঁর হস্তে বিহার-বঙ্গের সম্মিলিত বাহিনীর পরাজয় হইল এবং শের খাঁই বিহারের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া উঠিলেন।

সুরজগড়ের যুদ্ধ

বাবুরের মৃত্যুর পর পূর্ব্ব-ভারতেব আফগান ওম্‌রাহগণ মুঘল অধিকার উচ্ছেদ করিবার জন্য যে সম্মিলিত প্রচেষ্টা করিয়াছিলেন শের খাঁ তাহাতে যোগ দেওয়া যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করেন নাই। তবুও তাঁহার আধিপত্য-বৃদ্ধিতে শাঙ্কিত হইয়া হুমায়ুন ১৫৩১ খৃঃ অব্দে চুনার দুর্গ অবরোধ করিলেন। চারি মাস অবরোধেব পর শের খাঁ বাদশাহেব আনুগত্য স্বীকার করিলে অবরোধ প্রত্যাহার করা হয়। হুমায়ূন চুনার ত্যাগ করিয়া যখন গুজরাটে বাহাদুর শাহকে লইয়া ব্যস্ত ছিলেন, তখন শের খাঁ সহসা একবার বাঙ্গালা দেশ আক্রমণ করেন। নিরুপায় ঘিয়াস্‌উদ্দীন মামুদ তাঁহাকে প্রচুর উপঢৌকন দিয়া বিদায় করিলেন (১৫৩৭)। শের খাঁ তখনকার মত চলিয়া গেলেন ; কিন্তু পর বৎসর (১৫৩৮) তিনি পুনরায় বঙ্গদেশ আক্রমণ করিলেন। এদিকে আগ্রায় বিদ্রোহের সংবাদে, মালব ও গুজরাটের জয়কার্য্য অসম্পূর্ণ রাখিয়াই, হুমায়ূনকে আগ্রায় ফিরিয়া আসিতে হইল (১৫৩৬)। সেখানে হুমায়ূন সহজেই বিদ্রোহী-দিগকে পবাজিত করিলেন বটে কিন্তু এদিকে শের খাঁ বঙ্গদেশ জয়ে প্রবৃত্ত হইলেন। শের খাঁকে দমন করিবাব জন্য হুমায়ূন আবার চুনার দুর্গ অববোধ করিলেন। শের খাঁ ইতিপূর্ব্বেই সুকৌশলে বিহারের বোটাস দুর্গ অধিকার করিয়া আত্মীয়-পরিজনদিগকে রোটাস দুর্গে স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন। হুমায়ূন চুনারে থাকিতে থাকিতেই শের খাঁ গৌড় অধিকার করিয়া ফেলিলেন। হুমায়ুন চুনার অধিকার করিয়া গৌড়ের দিকে অগ্রসর হইলেন। শের খাঁ সাময়িকভাবে বঙ্গবিজয় সমাপ্ত করিয়া গৌড় হইতে সরিয়া গেলেন এবং সহজেই গৌড় হুমায়ুনের করায়ত্ত হইল। বিজয়গৌরবে তিনি ও তাঁহার সৈন্যেরা আমোদ-প্রমোদ মত্ত ছিলেন এমন সময় সংবাদ আসিল যে, শের খাঁ চুনার উদ্ধার করিয়া জৌনপুর অবরোধ করিয়াছেন এবং পাঠান সৈন্যেরা কনৌজ অবধি অগ্রসর হইয়াছে। তখন আলস্য

হুমায়ুনেব বশ্যতা স্বীকার

বঙ্গদেশ আক্রমণ

হুমায়ূনের সহিত যুদ্ধ

পরিহার করিয়া হুমায়ুনকে আগ্রার দিকে ছুটিতে হইল। শের খাঁ গঙ্গাতীরে বক্সারের অনতিদূরে চৌসা নামক স্থানে তাঁহার পথ-রোধ করিয়া মুঘল সৈন্যবাহিনীকে সম্পূর্ণরূপে ছত্রভঙ্গ করিয়া দিলেন (১৫৩৯)। হুমায়ুন প্রাণরক্ষার জন্য গঙ্গায় ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। এক ভিস্তি বাদশাহকে তাহার মশকের সাহায্যে নদীর অপর পারে আনিয়া পৌঁছাইয়া দিল। হুমায়ুনেব পত্নী এবং মুঘল অন্তঃপুরিকাগণ শের খাঁর হস্তে বন্দিনী হইলেন। কিন্তু বীরশ্রেষ্ঠ শের খাঁ সসম্মানে তাঁহাদিগকে হুমায়ুনের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। চৌসার যুদ্ধের পর শের খাঁ 'শের শাহ' উপাধি গ্রহণ করিয়া নিজেকে স্বাধীন সুলতান বলিয়া ঘোষণা করিলেন। পর বৎসর হুমায়ুন হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের আশায় আবাব শের শাহকে আক্রমণ করিলেন। কিন্তু এবারও কনৌজের নিকট বিলগ্রাম নামক স্থানে তাঁহার পবাজয় হইল (১৫৪০) এবং শের শাহ দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিলেন। 'কনৌজের যুদ্ধে' পরাভবের পর হুমায়ুন লাহোরে গিয়া ভ্রাতা কামরাণের সাহায্যপ্রার্থী হন। কিন্তু কামরাণ তাঁহাকে সাহায্য করার পবিবর্তে পঞ্জাবের অধিকার ত্যাগ করিয়া শেরশাহের সহিত সন্ধি করেন। কোনও স্থানে সাহায্য না পাইয়া অবশেষে হুমায়ুন কিছুকালের মত পারস্য-রাজের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

চৌসার যুদ্ধ (১৫৩৯) ও হুমায়ুনের পতন

'শের শাহ' উপাধি গ্রহণ

'কনৌজের যুদ্ধ' (১৫৪০)

দিল্লীর সিংহাসন লাভ করিয়াও শের শাহ নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। বাঙ্গালার শাসনকর্তা খিজব খাঁ বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন সংবাদ পাইয়া শের শাহ বঙ্গদেশে আসিয়া খিজর খাঁকে কারারুদ্ধ করিলেন। বিদ্রোহের সম্ভাবনা দূর করিবার জন্য তিনি প্রাদেশিক শাসনকর্তার পদ উঠাইয়া দিলেন এবং বঙ্গদেশকে ১৯টি 'সরকারে' বিভক্ত করিয়া এক-একজন আমীরের উপর এক-একটি সরকারের শাসনের ভার দিলেন। আমীরদের মধ্যে শাসন-কার্য্যে কোনরূপ সংযোগ রহিল না। এইভাবে বঙ্গদেশে নিজের কর্তৃত্ব সুদৃঢ় করিয়া শের শাহ মালব জয়ে অগ্রসর হইলেন। মালব দেশ ইতিমধ্যে ত্রিধাবিভক্ত হইয়া গিয়াছিল; শের শাহ দুইটি অংশের মুসলিম রণনায়কদ্বয়কে পরাভূত করিয়া তাঁহাদের শাসিত রাজ্য নিজের অধিকারভুক্ত করিয়া লইলেন (১৫৪২)। গোয়ালিয়র ও রণথম্ভোর দুর্গও তাঁহার হস্তগত হইল। অতঃপর তিনি

শের শাহের রাজ্যবিস্তার

বঙ্গদেশে নূতন বিধিব্যবস্থা

মালব জয়

মালবের তৃতীয় অংশের মালিক রাজপুত-সর্দার পূরণমলের অধীন রায়সীন দুর্গ অধিকার করিলেন। দুর্গের অধিবাসীগণকে দুর্গ ছাড়িয়া যাইবার আশ্বাস দিয়া তিনি সে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়াছিলেন। এদিকে শের শাহের অধীনস্থ পঞ্জাবের শাসনকর্তা সিন্ধু ও মুলতান অধিকার কবিলেন (১৫৪৪)। তারপর শের শাহ কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া রাজপুতানার অন্তর্গত মারবাড়ের পরাক্রান্ত রাজা মালদেবকে পরাজিত করেন। এইরূপে আজমীড় হইতে আবু পর্য্যন্ত সমগ্র ভূ-ভাগের উপর তাঁহার অধিকার বিস্তৃত হয়। তারপর চিতোর দুর্গও তাঁহার হস্তগত হইল। ফিরিবার পথে কালঞ্জর দুর্গ অবরোধ কালে বারুদের স্তূপে আগুন লাগায় শের শাহ সেই অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন (১৫৪৫)। কিন্তু তাঁহার সৈন্যদল দুর্গ অধিকার করিল।

রায়সীন দুর্গ অধিকার

সিন্ধু ও মুলতান জয় (১৫৪৪)

চিতোর দুর্গ অধিকার

শের শাহের মৃত্যু (১৫৪৫)

শের শাহের শাসনপদ্ধতি।—শের শাহ মাত্র পাঁচ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। শের শাহের অভ্যুত্থানের সময় রাজ্যে বিশৃঙ্খলার অন্ত ছিল না; সুলতানী রাষ্ট্রতন্ত্র তখন বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল, আর বাদশাহী প্রাধান্য স্থাপিত হইলেও শাসনব্যাপারে বিশৃঙ্খলা দূর হয় নাই। দেশ ছিল অসংখ্য রাজ্যে বিভক্ত। এরূপ অবস্থায় নিজের প্রতিভাবলে সামান্য অবস্থা হইতে নানা বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া তিনি 'দিল্লীর' সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন এবং নিয়ত যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও বিশৃঙ্খল সাম্রাজ্যে শৃঙ্খলা স্থাপনে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন ইহাই তাঁহাব অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয়। বিজিত প্রদেশগুলিকে তিনি অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 'সরকারে' বিভক্ত করিয়াছিলেন। প্রত্যেকটি 'সরকার' আবাব ছিল কয়েকটি 'পরগণায়' বিভক্ত। সমগ্র সাম্রাজ্য জরিপ করাইয়া তিনি প্রত্যেক প্রজার জমির সীমা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্যে কবুলিয়ৎ ও পাট্টাব প্রবর্ত্তন করা হয়। প্রজারা এই প্রথম তাহাদের অধিকার ও দেয় কব সম্বন্ধে স্পষ্ট লিখিত দলিল পাইল। উৎপন্ন শস্যের এক চতুর্থাংশ ছিল রাজকর; প্রজারা ইচ্ছামত শস্য অথবা অর্থের দ্বারা রাজস্ব দিতে পারিত। শের শাহ দেশের মুদ্রানীতিরও সংস্কার সাধন করেন। দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য মুদ্রানীতির সহিত অবিচ্ছেদ্য সূত্রে জড়িত। এইজন্য তিনি প্রচুর রৌপ্যমুদ্রা মুদ্রিত করিয়া-

সরকার ও ও পরগণা.

জমি জরিপ এবং কবুলিয়ৎ ও পাট্টা প্রবর্ত্ত

রাজকর, মুদ্রানীতির সংস্কার

ছিলেন। এই সকল 'তঙ্কা'র (টাকা) উপর ফার্সি এবং দেবনাগরী অক্ষরে তাঁহার নাম খোদাই করা থাকিত। দেশের মধ্যে যাতা-য়াতের সুব্যবস্থার জন্যও তিনি পথঘাটের সংস্কার সাধন করেন। বাঙ্গালা দেশ হইতে পাঞ্জাব পর্য্যন্ত একটি সুদীর্ঘ রাজপথ তিনি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন—এই রাস্তাটিই বর্ত্তমান 'গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড' (Grand Trunk Road). পথের উভয় পার্শ্বে বৃক্ষরোপণ ও জলাশয় খননের ব্যবস্থাও প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিতেছিল; শের শাহও এ বিষয়ে যথেষ্ট উৎসাহী ছিলেন। পথিক ও বণিকদের জন্য তিনি পথের পাশে অনেকগুলি হিন্দু ও মুসলিমদের উপযোগী পৃথক পৃথক সরাইখানাও স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার সময় ডাক বিভাগেরও যথেষ্ট উন্নতি হয়। শের শাহ ন্যায়বিচারের অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন; অপরাধীকে শাস্তিদানের সময় তিনি তাহার পদমর্য্যাদার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করিতেন না। সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র শান্তি-রক্ষার জন্য তিনি প্রত্যেক গ্রামের মোড়লের উপর এই কার্য্যের ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। সেনাবিভাগেও কঠোর নিয়মানুবর্ত্তিতা প্রবর্ত্তন করা হইয়াছিল। যোগ্যতা থাকিলে হিন্দুগণও তাঁহার সেনাবিভাগে উচ্চতম পদে নিযুক্ত হইত। অশ্বারোহী সৈন্যদলে প্রতারণা নিবারণের জন্য ঘোড়াগুলিকে সরকারী ছাপে চিহ্নিত করিয়া দেওয়া হইত। মাত্র পাঁচ বৎসরের ঝটিকাক্ষুব্ধ রাজত্বকালের মধ্যে শের শাহ আভ্যন্তরীণ শাসনকার্য্যে যে প্রতিভার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন তাহার তুলনা পাওয়া কঠিন। মহামতি আকবর রাজ্য-শাসনে শের শাহের প্রবর্ত্তিত নীতি অনুসরণ করিয়া ইতিহাসে অমর হইয়া গিয়াছেন।

পথঘাট নির্ম্মাণ

ডাকবিভাগের উন্নতি, আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যবস্থা,

সেনা-বিভাগ

শের শাহের চরিত্র।—শের শাহ যেরূপ রণনিপুণ তদপেক্ষাও শাসনপটু ছিলেন। জন্ম-গৌরব অপেক্ষা শাসন-প্রতিভার জন্যই তিনি সমধিক প্রসিদ্ধ। রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রয়োজনবোধে ছলনার আশ্রয় লইলেও, ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন অতিশয় ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি। কিন্তু তাঁহার ধর্ম্মভাব পরধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষে পর্য্যবসিত হয় নাই। তাঁহার আনুকূল্যে মুসলিম কবি মালিক মুহম্মদ জয়সী "পদ্মাবতী" কাব্য রচনা করেন (১৫৪০)। বস্তুতঃ রাজনীতির ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমানের মৈত্রীর প্রথম সূচনা হয় সম্রাট শের শাহেরই

রাজত্বকালে। তাঁহার পূর্ব্বে কোন কোনও প্রাদেশিক সুলতান এই ভাব পোষণ করিতেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের কার্য্যক্ষেত্র সুদূরবিস্তৃত ছিল না। তবে শের শাহ, মহামতি আকবরের ন্যায়, হিন্দু-মুস্‌লিম মিলনের জন্য উল্লেখযোগ্য কোন কাজ করিয়া যাইবার অবসর পান
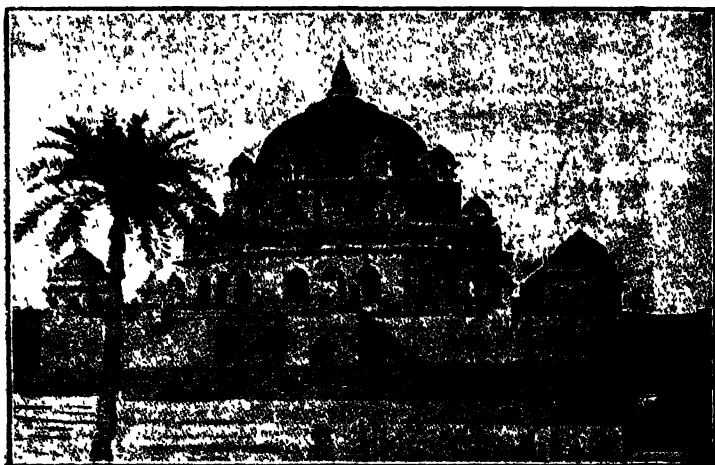
শের শাহের সমাধি (সাসারাম)

নাই ; কিন্তু "পদ্মাবতী" কাব্য তাঁহার রাজত্বকালের অমরকীর্ত্তি ও হিন্দু-মুস্‌লিম মৈত্রীর শ্রেষ্ঠ প্রতীক হইয়া আছে। সাহিত্য-প্রেমিক শের শাহের শিল্পানুরাগও উল্লেখযোগ্য। তিনি দিল্লীর উপকণ্ঠে অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর প্রাসাদ পথঘাট, প্রভৃতি নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। তাঁহার আমলের স্থাপত্যশিল্পের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন হইল বিহারের অন্তর্গত সাসারামে তাঁহার নিজের সমাধিভবন ; মৃত্যুর পূর্ব্বেই তিনি এই বিরাট সমাধিসৌধটি নির্ম্মাণ করাইয়া গিয়াছিলেন।

শের শাহের বংশধরগণ।—শের শাহের মৃত্যুর পর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই, আফগান রণনায়কগণ এবং সুরবংশীয় রাজারা বিবাদ-বিসংবাদ আরম্ভ করিয়া দিলেন। শের শাহের পুত্র ইস্‌লাম বা সলীম শাহ পিতার মৃত্যুর পর সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার রাজত্বকাল বিদ্রোহ দমনেই পর্য্যবসিত হয়। ১৫৫৪

ইস্‌লাম শাহ

ফীরুজ

খৃঃ অব্দে ইস্‌লাম শাহের মৃত্যু হইলে তাঁহার শিশুপুত্র ফীরুজ শাহকে রাজপদে অভিষিক্ত করা হয়; কিন্তু শের শাহের ভ্রাতুষ্পুত্র মুহম্মদ আদিল শাহ এই শিশুকে হত্যা করিয়া সিংহাসন অধিকার করেন। মুহম্মদ আদিল শাহ ছিলেন অকর্ম্মণ্য। হিমু নামে এক হিন্দু বণিকের হাতে রাজ্যভার ছাড়িয়া দিয়া তিনি নিশ্চিন্ত বিলাসে দিন কাটাইতে লাগিলেন। এদিকে হিমুর সৌভাগ্যে ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া আফগান ওম্‌রাহগণ সুলতানের বিরুদ্ধতা করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে বঙ্গদেশ ও মালব দিল্লী সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল; শের শাহের দুইজন জ্ঞাতি-ভ্রাতাও পঞ্জাবে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া সিংহাসন দাবি করিলেন। এই সুযোগে হুমায়ূন পুনরায় ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া পঞ্জাব, দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করিয়া লইলেন (১৫৫৫)।

আদিল শাহ

হিমু

বিদ্রোহ

হুমায়ূনের প্রত্যাবর্ত্তন, রাজ্যাধিকার (১৫৫৫)

হুমায়ূনের প্রত্যাবর্ত্তন।—১৫৪০ খৃঃ অব্দে বিলগ্রামে ('কনৌজের যুদ্ধে') শের শাহের হস্তে পরাজিত হইয়া হুমায়ূন নানাস্থানে আশ্রয়ের আশায় ঘুরিতে ঘুরিতে অবশেষে পারস্য-রাজের আনুকূল্য লাভ করেন (১৫৪৫)। এই দুঃখ-দুর্দ্দশার মধ্যে সিন্ধু দেশের অন্তর্গত অমরকোট নামক স্থানে তাঁহার পুত্র আকবরের জন্ম হয় (২৩শে নভেম্বর, ১৫৪২)। ১৫৪৫ খৃষ্টাব্দে পারসিক সৈন্যের সহায়তায় হুমায়ূন কান্দাহার জয় করিলেন। অল্পকাল পরেই তিনি ভ্রাতা কামরাণকে কাবুল হইতে বিতাড়িত করেন। অতঃপর নিশ্চিন্ত হইয়া হুমায়ূন ভারতবর্ষের দিকে মনোযোগ দিলেন। সুরবংশে তখন নিদারুণ গৃহবিচ্ছেদ আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল। সুযোগ বুঝিয়া হুমায়ূন লাহোর অধিকার করেন; তারপর সিকন্দর সুরকে পরাজিত করিয়া তিনি দিল্লী ও আগ্রা জয় করিলেন (১৫৫৫)। কিন্তু বাবুরের ন্যায় হুমায়ূনের অদৃষ্টেও বেশীদিন রাজ্যভোগ ছিল না। একদিন তিনি তাঁহার পাঠাগারে বসিয়া নিবিষ্টচিত্তে অধ্যয়ন করিতেছিলেন, এমন সময় নিকটবর্ত্তী মসজিদ্ হইতে নমাজের আজান শুনিতে পাইয়া উপাসনার জন্য সিঁড়ি বাহিয়া নীচে নামিতে গিয়া সহসা পা পিছলাইয়া পড়িয়া গেলেন। এই আঘাতের ফলেই তাঁহার মৃত্যু হয় (জানুয়ারী ১৫৫৬)।

কান্দাহার ও কাবুল জয়

লাহোর, দিল্লী ও আগ্রা অধিকার

STUDIES AND QUESTIONS

1. Give a sketch of Babur's career and character. (C. U. '18).

2. Review the career of Sher Shah with special reference to his struggle with Humayun, Give an estimate of his administrative abillity. (C. U. '15,'29, '30, '32, '35, '39, '45).

3. Give an account of Emperor Humayun and his struggle with Sher Shah. (C. U. '20).

4 Indicate the greatness of Sher Shah as a ruler and conqueror. (C. U. '41, '43).

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়

মহামতি আকবর

আকবরের রাজ্যাভিষেক।—হুমায়ুনের মৃত্যুর সময় বালকবীর আকবর ও বৈরাম খাঁ পঞ্জাবে সিকন্দর সুরের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন। সেইখানেই গুরুদাসপুর জেলার অন্তর্গত কালনৌর নামক স্থানে আকবরকে রাজপদে অভিষিক্ত করা হইল (ফেব্রুয়ারী, ১৫৫৬)। তাঁহার বয়স তখন তেরো বৎসর মাত্র। প্রবীণ বৈরাম খাঁ তাঁহার অভিভাবক রূপে রাজ্য চালাইতে লাগিলেন।

মুঘল-পাঠান সংঘর্ষ।—হুমায়ুন কেবল লাহোর, দিল্লী ও আগ্রার পুনরুদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন। যখন তাঁহার মৃত্যু হয় তখন দিল্লী ও আগ্রার পার্শ্ববর্ত্তী ভূ-ভাগেই 'মুঘল' অধিকার ছিল। উত্তর-ভারতের অধিকাংশ স্থান তখনও সুরবংশীয় আফগানদের অধিকারে ছিল। বৈরাম ও আকবরের হাতে সিকন্দর সুর শিরহিন্দ নামক স্থানে পরাভূত হইয়া, শিবলিক পর্ব্বতের দিকে পলায়ন করিলেন। সুর রাজ্যের সামান্য এক হিন্দুবণিক বংশজ হিমু প্রথমে রাজার পরিচারকরূপে জীবন আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ রাজনৈতিক প্রতিভা ও সমরদক্ষতা দেখাইয়া আদিল শাহের সেনাপতি ও দক্ষিণ-হস্ত স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিল। পরে আগ্রা ও দিল্লী অধিকার করিয়া, বিক্রমজিৎ নামে নিজেকেই দিল্লীর অধিপতি বলিয়া তিনি ঘোষণা করিলেন। বৈরাম খাঁ ও আকবরের সহিত পানিপথের যুদ্ধক্ষেত্রে হিমুর সাক্ষাৎ হইল। প্রথম দিকে হিমুই জয়লাভ করিতেছিলেন,

রাজনীতিক পরিস্থিতি

পাণিপথের ২য় যুদ্ধ (১৫৫৬)

কিন্তু অকস্মাৎ একটি তীর তাঁহার চক্ষে বিঁধিয়া যাওয়ায় তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেলে যুদ্ধের গতি ফিবিয়া গেল। হিমুর বিরাট বাহিনী বৈরাম ও আকবরের হস্তে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হইল এবং বৈরামের আদেশে আকবর তরবারির আঘাতে হিমুকে হত্যা করিয়া গাজী উপাধি গ্রহণ করিলেন। পানিপথেব যুদ্ধে মুঘলদেব জয় হইল (৫ই নভেম্বর, ১৫৫৬)। আকবব ও বৈরাম খাঁ দিল্লী ও আগ্রা পুনরুদ্ধার করিলেন। হিমুর হিন্দু-সাম্রাজ্য স্থাপনের আশা ভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে সুরবংশ ও পাঠানদের সকল আশা-ভরসা নির্ম্মূল হইয়া গেল। পানিপথের যুদ্ধের পব গোয়ালিয়র, আজমীড় ও জৌনপুর এক এক করিয়া আকবরের হস্তগত হইল (১৫৫৮—'৬০)। গোয়ালিয়র, আজমীড় ও জৌনপুব অধিকৃত হওয়ায় যথাক্রমে মধ্যভারত, রাজপুতানা ও পূর্ব্ব-ভারতের তিনটি প্রধান কেন্দ্র আকবরের অধিকারে আসে এবং অদূর ভবিষ্যতে তাঁহার দিগ্বিজয়ের পথও প্রশস্ত হয়।

মহামতি আকবর (সমসাময়িক চিত্র হইতে)

সুর বংশেব পতন

গোযালিয়র, আজমীড, জৌনপুর অধিকার (১৫৫৮— ৬০)

রাজ্যভার গ্রহণ।—১৫৬০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বৈরাম খাঁ নাবালক সম্রাটের অভিভাবক রূপে রাজ্য চালাইয়াছিলেন। কিন্তু বৈরাম খাঁর অভিভাবকত্ব আকবরের মনঃপূত হইতেছিল না। মাতা হামিদা বানু বেগম, ধাত্রীমাতা মাহম অনগ, মাহম অনগের পুত্র আধম খাঁ, প্রভৃতির প্ররোচনায় আকবর বৈরাম খাঁকে অবসর দান করিয়া স্বয়ং রাজ্যভার গ্রহণ করিতে মনস্থ করিলেন

বৈরামের পদচ্যুতি

এবং তাঁহাকে মক্কায় যাইতে আদেশ দিলেন (১৫৬০)। ধাত্রী-মাতার অসদ্ব্যবহারে বৈরাম বিদ্রোহ করিলেন কিন্তু সহজেই তাঁহাকে পরাজিত করা হইল। বৈরামের প্রতি তাঁহার কৃতজ্ঞতা স্মরণ করিয়া আকবরও তাঁহাকে ক্ষমা করিলেন। মক্কার পথে গুজরাটের পাটন (আনূহিলবাড়া) নগরে লোহানী বংশের জনৈক আফগান, পূর্ব্বের শত্রুতার জন্য, বৈরামকে হত্যা করিল (১৫৬১)। কিন্তু তখনও আকবর স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করিবার মত সাহস সঞ্চয় করিয়া উঠিতে পারেন নাই। তাঁহার ধাত্রীমাতা এবং ধাত্রীমাতার পুত্র আধম খাঁ এবং পীর মুহম্মদ প্রভৃতি উচ্চাভিলাষী কর্ম্মচারিগণই রাজ্য চালাইতে লাগিলেন। ইঁহাদের কু-শাসন ও অত্যাচারে রাজ্যের সর্ব্বত্র বিশৃঙ্খলা ও বিদ্রোহ দেখা দেওয়ায় ১৫৬২ খ্রীঃ অব্দে বিশ বছর বয়সে আকবর স্বয়ং রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন এবং অনতিবিলম্বে বিদ্রোহ দমন ও বিশৃঙ্খলা দূর করিয়া রাজ্যে শান্তি স্থাপিত করিলেন।

বৈরামের মৃত্যু

আকবরের সাম্রাজ্য গঠন।—পানিপথের যুদ্ধের (১৫৫৬) পর পাঁচ বৎসরের মধ্যে পশ্চিমে পঞ্জাব ও মূলতান হইতে পূর্ব্বে প্রয়াগ (এলাহাবাদ) এবং দক্ষিণে আজমীড় ও গোয়ালিয়র অবধি আকবরের অধিকারভুক্ত হয়। কাবুল নামেমাত্র 'হিন্দুস্থানী সাম্রাজ্যের' অধীন সামন্ত রাজ্য হইলেও কার্য্যতঃ আকবরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মির্জ্জা মুহম্মদ হকীমের শাসনাধীন রাজ্যই ছিল। কান্দাহার রাজ্য ইতিমধ্যে পারসিক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূত হইয়া পড়িয়াছিল। বৈরাম খাঁর পতনের পর আধম খাঁ ও পীর মুহম্মদ, মালবের আফগান সুলতান বজবাহাদুরকে পরাজিত করিয়া মালবদেশ আকবরের অধিকারভুক্ত করেন (১৫৬১)। ইহার কয়েক বৎসর পরে বজবাহাদুর উপায়ান্তর না দেখিয়া আকবরের বশ্যতা স্বীকার করেন। ইতিমধ্যে রাজপুতানার অন্তর্গত মীর্থা বা মেরতা দুর্গও অধিকৃত হয় (১৫৬২)। আকবরের আদেশে কারাপ্রদেশের শাসনকর্ত্তা আসফ খাঁ ১৫৬৪ খৃঃ অব্দে মালবের পূর্ব্বদিকে গোণ্ডয়ানা আক্রমণ করিলেন. সেখানকার রাজা ছিলেন নাবালক, রাজমাতা দুর্গাবতী পুত্রের অভিভাবিকা হইয়া রাজ্য শাসন করিতে-ছিলেন। রাণী দুর্গাবতীর রাজপুত বাহিনী মুঘল সৈন্যদলের

রাজ্য বিস্তার (১৫৫৬—'৬১)

মালব জয় (১৫৬১)

মেরতা দুর্গ জয় (১৫৬২)

রাণী দুর্গাবতী

গোণ্ডয়ানা জয় (১৫৬৪)

গতিরোধ করিতে পারিল না। পরাজয় নিশ্চিত জানিয়া দুর্গাবতী আসন্ন অপমানের কবল হইতে মুক্তির জন্ত তীক্ষ্ণধার ছুরিকা নিজের বক্ষে বিদ্ধ করিয়া প্রাণ-ত্যাগ করিলেন; তাঁহার নাবালক পুত্রও বীরের ন্তায় যুদ্ধ করিয়া নিহত হইলেন। প্রাক্-আর্য্য গোণ্ড জাতি (Gond)-দের আদিভূমি গোণ্ড-য়ানা মুঘলদের পদানত হইল (১৫৬৪)।

আকবরের রাজপুতানী বেগম ও সম্রাট্ জহাঙ্গীরের মাতা (অম্বরাধিপ বিহারীমল্লের কন্যা)

অতঃপর আকবর রাজপুতানার দিকে মনঃ-সংযোগ করিলেন। তিনি জানিতেন, কেবল যুদ্ধের দ্বারা দুর্দ্ধর্ষ রাজপুত জাতিকে বশ্যতা স্বীকার করাইবার চেষ্টা বৃথা; তাই তিনি রাজপুত সর্দ্দারদের সহিত মৈত্রী স্থাপনে যত্নবান হইলেন।

রাজপুত জাতির বশ্যতা স্বীকার

তাঁহার এই উদার নীতির ফলে একে একে অম্বর (জয়পুর), মাড়বার (যোধপুর), বিকানীর, জয়শল্মীর, বুন্দী, প্রভৃতি বিভিন্ন রাজ্যের রাজারা তাঁহার আধিপত্য স্বীকার করিলেন। রাজপুতদের সহিত মৈত্রী স্থাপনের উদ্দেশ্যে আকবর ইতিপূর্ব্বেই অম্বরের রাজা বিহারী-মল্লের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন (১৫৬২) এবং বহু রাজপুত রাজাকে দরবারে উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত করেন। কিন্তু মেবারের রাণা বশ্যতা স্বীকার করিলেন না। এই মেবারের রাণাকেই সমগ্র রাজপুত জাতি নেতা বলিয়া স্বীকার করে। সুতরাং মেবার জয়ের জন্য আকবর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। মেবারের রাণা সংগ্রাম-সিংহের পুত্র উদয়সিংহ পিতার যোগ্য পুত্র ছিলেন না। আকবর মেবারের রাজধানী চিতোর আক্রমণ করিলে (১৫৬৭) তিনি

মেবারের সহিত সংঘর্ষ

উদয়সিংহ

উদয়পুরে পলায়ন করেন (বর্ত্তমান উদয়পুর নগরটির তিনিই স্থাপন-কর্ত্তা)। মেবারের রাজপুত বীরগণ জয়মল্ল ও পত্ত নামক দুইজন নায়কের নেতৃত্বে প্রাণপণে মুঘল সৈন্যের গতিরোধ করিতে লাগিলেন। আকবর চারি মাস চিতোর অবরোধ করিয়াও নগর অধিকার করিতে পারিলেন না। অবশেষে একরাত্রে জয়মল্ল অতর্কিতে আকবরের গুলিতে নিহত হইলেন। রাজপুত রণ-নায়কগণ নিরুৎসাহ হইয়া আত্মোৎসর্গের জন্য প্রস্তুত হইলেন। মহিলাগণ জহরব্রত অনুষ্ঠান করিয়া অগ্নিতে আত্মাহুতি দান করিলেন, পুরুষেরা সম্মুখসমরে প্রাণত্যাগ করিলেন। দুর্ভেদ্য চিতোর দুর্গ আকবরের অধিকারভুক্ত হইল (১৫৬৮)।

জয়মল্ল ও পত্ত

চিতোরের পতন (১৫৬৮)

চিতোরের পতনে অনেক রাজপুত রাজা আশঙ্কিত হইলেন বটে, কিন্তু মেবারের বীরগণ আকবরের বশ্যতা স্বীকার করিলেন না; তাঁহারা দুর্গম পার্ব্বত্য অঞ্চলে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। রণথম্ভোরের রাজা রায় সুরজন আকবরের বশ্যতা স্বীকার করিয়া তাঁহার অধীনে চাকুরি লইলেন; বিকানীর ও জয়শল্মীরের রাজারা বাদশাহকে কন্যাদান করিলেন। অতঃপর কালঞ্জর দুর্গও আকবরের হস্তগত হইল। কিন্তু উদয়সিংহের পুত্র প্রতাপ সিংহ মেবারের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। রাজপুতানার ইতিহাস ও গাথা সাহিত্যে যাঁহাদের বীরত্ব ও আত্মত্যাগ আজিও উজ্জ্বল হইয়া আছে, প্রতাপসিংহ তাঁহাদের অন্যতম। আকবর প্রতাপের বিরুদ্ধে যুবরাজ সলীম্ (পরে সম্রাট্ জহাঙ্গীর) ও অম্বরের রাজা মানসিংহকে প্রেরণ করিলেন। হলদীঘাটের গিরিসঙ্কটে উভয় পক্ষের যুদ্ধ হইল (১৫৭৬)। প্রতাপ এবং তাঁহার অনুচরবর্গ অশেষ বীরত্ব প্রদর্শন করিলেও, দিল্লীর বিশাল বাহিনীর গতিরোধ করিতে পারিলেন না। প্রতাপ সিংহ পরাজিত হইলেন। দুর্গম পার্ব্বত্য অঞ্চলে তাঁহার নিজের ও স্ত্রী-পুত্র-কন্যার দুর্দ্দশার আর সীমা রহিল না। বৎসরের পর বৎসর এইভাবে কাটিতে লাগিল, তবুও তিনি বশ্যতা স্বীকার করিলেন না। তাঁহার এই অপূর্ব্ব আত্মত্যাগ আকবরেরও অন্তর স্পর্শ করিয়াছিল। রাজসভায় তিনি মুক্তকণ্ঠে এই মহান

রণথম্ভোর লাভ, কালঞ্জর অধিকার (১৫৬৯)

প্রতাপসিংহ

মানসিংহ, হলদিঘাটের যুদ্ধ (১৫৭৬)

শত্রুর প্রশংসা করিতেন। ক্রমে প্রতাপের অদৃষ্ট প্রসন্ন হইতে লাগিল; ধীরে ধীরে তিনি অনেক গুলি বিজিত দুর্গ পুনরুদ্ধার করিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি স্বদেশের অধিকাংশই উদ্ধার করিয়াছিলেন, কেবল মণ্ডলগড়, আজমীড় ও চিতোরের পুনরুদ্ধার সাধন করিতে পারেন নাই। প্রতাপ সিংহ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষদের পরম গৌরবের চিতোর নগরী উদ্ধার না করা অবধি তিনি কখনও তৃণশয্যা ভিন্ন অপর কোন শয্যায় শয়ন করিবেন না, বৃক্ষপত্র ভিন্ন অপর কোন পাত্রে আহার করিবেন না। আজীবন সে প্রতিজ্ঞা তিনি পালন করিয়া গিয়াছেন। ১৫৯৭ খৃঃ অব্দে রাণা প্রতাপ মানবলীলা সংবরণ করেন।

প্রতাপের রাজ্য উদ্ধার

রাণা প্রতাপ

স্বদেশ-প্রেম কৃচ্ছ্র সাধন

১৫৬৯ খৃঃ অব্দে রণথম্ভোর ও কালঞ্জর অধিকারের ফলে আকবরেব পক্ষে যথাক্রমে পশ্চিম ও পূর্ব্বদিকে সাম্রাজ্য বিস্তারের পথ যুগপৎ খুলিয়া গিয়াছিল। হুমায়ুন তাঁহার রাজত্বকালের প্রথম ভাগে গুজরাট জয় করিয়াছিলেন (খৃঃ অঃ ১৫৩৫); কিন্তু স্থায়ী অধিকার স্থাপনের অবসর পান নাই। তদবধি সেখানে

অন্তর্দ্বন্দ্ব লাগিয়াই ছিল এবং অবশেষে সেখানকার বিবদমান দলগুলির জনৈক নেতা আকবরকে গুজরাট অধিকার করিতে আহ্বান করেন। এই সুযোগে আকবর নিজেই গুজরাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন (১৫৭২)। এক বৎসর যুদ্ধের পর এই সমৃদ্ধিশালী প্রদেশটি তাঁহার সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়া গেল।

গুজরাট জয় (১৫৭৩)

গুজরাটের পর আকবর বঙ্গদেশ জয় করেন। সুরবংশের পতনের পর সেখানে কর্‌রাণী সুলতানের আধিপত্য স্থাপিত হইয়াছিল। এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা সুলেমান কর্‌রাণী দক্ষিণ-বিহারের শাসনকর্ত্তা ছিলেন, পরে বঙ্গদেশ জয় করিয়া বাঙ্গালা ও বিহারের স্বাধীন সুলতান হইয়া বসেন। সুলেমান কর্‌রাণী গৌড় হইতে তাণ্ডায় রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। তিনি নামমাত্র আকবরের বশ্যতা স্বীকার করিয়া প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনভাবেই রাজ্য শাসন করিতেন। তাঁহার পুত্র দায়ুদ খাঁ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন, কিন্তু আকবরের সেনাপতি মুনিম খাঁ ও রাজা তোড়রমলের হাতে রাজমহলের যুদ্ধে তিনি পরাজিত ও নিহত হইলেন। এইরূপে বঙ্গদেশও আকবরের সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়া গেল (১৫৭৬); কিন্তু বাঙ্গালার প্রসিদ্ধ "বার-ভূঁঞা'র পরাক্রমে মুঘল শাসনকর্ত্তাদের প্রায় দুইশত বৎসর ধরিয়া বিব্রত হইতে হইয়াছিল। ইঁহারা ছিলেন বাঙ্গালার ভূম্যধিকারী। ইঁহাদের মধ্যে ভাওয়ালের ইশা খাঁ, বিক্রমপুরের চাঁদ রায় ও কেদার রায়, যশোহরের প্রতাপাদিত্য এবং বাকলা বা বাখরগঞ্জের রামচন্দ্র রায় বা কন্দর্পনারায়ণ বিশেষ প্রসিদ্ধ। পারসিক ঐতিহাসিকগণ বিরক্ত হইয়া বাঙ্গালাকে "বিদ্রোহের দেশ" বলিয়া অভিহিত করেন। বাঙ্গালীরা সেযুগে শুধু নিরীহ বৈষ্ণব নয় তেজস্বী ও শক্তির উপাসক ছিল।

বঙ্গবিজয় (১৫৭৬

বাঙ্গালার 'বারভূঁঞা'

কাবুলের শাসনকর্ত্তা মির্জ্জা মুহম্মদ হকীম ছিলেন আকবরের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। তিনি বারবার জ্যেষ্ঠভ্রাতার বিরুদ্ধতা করিতে লাগিলেন। ১৫৮০ খৃঃ অব্দে তিনি পঞ্জাব পর্য্যন্ত অগ্রসর হন। তখন আকবর স্বয়ং যুদ্ধযাত্রা করিয়া অনায়াসে কাবুল অধিকার করিলেন (১৫৮১), কিন্তু ভ্রাতাকে রাজ্য হইতে বঞ্চিত করিলেন না। অবশেষে ১৫৮৫ খৃঃ অব্দে হকীমের মৃত্যু হইলে তিনি কাবুল রাজ্য শাসনের ভার নিজের ভগ্নীকে দেন। ইহার পর একে

কাবুল অধিকার (১৫৮১—'৮৫)

কাশ্মীর, সিন্ধু, উড়িষ্যা, বেলুচিস্থান ও কান্দাহার (১৫৮৬-৯৫)

একে কাশ্মীর (১৫৮৬), সিন্ধু (১৫৯১), উড়িষ্যা (১৫৯২), বেলুচিস্থান (১৫৯৪) এবং কান্দাহার (১৫৯৫) আকবরের হস্তগত হয়। একদিকে হিন্দুকুশ হইতে ব্রহ্মপুত্র এবং আর একদিকে হিমালয় হইতে নর্ম্মদা অবধি তাঁহার সাম্রাজ্য বিস্তৃত হইল। এইরূপে উত্তর ভারত বিজয় সম্পূর্ণ করিয়া তিনি দাক্ষিণাত্য জয়ের জন্য প্রস্তুত হইলেন।

আকবর খান্দেশ, আহ্‌ম্মদনগর, গোলকুণ্ডা, বিজাপুর, প্রভৃতি রাজ্যে, তাঁহার বশ্যতা স্বীকারের জন্য, দূত প্রেরণ করিলেন। কিন্তু এক খান্দেশ ব্যতীত অপর কোন রাজ্যই বিনা যুদ্ধে বশ্যতা স্বীকার করিতে সম্মত হইল না। তখন তিনি নিজ পুত্র মুরাদ ও বৈরামের পুত্র আব্দার রহিমের নেতৃত্বে আহ্‌মদনগরের বিরুদ্ধে এক অভিযান প্রেরণ করিলেন। আহ্‌মদনগর তখন এক নাবালক সুলতানের অধীন ছিল কিন্তু বিজাপুরের বিধবা রাজমহিষী এবং আহ্‌মদনগরের রাজকন্যা বীরাঙ্গনা চাঁদ সুলতানা বিপুল বিক্রমে নগর রক্ষা করিতে লাগিলেন।

চাঁদ বিবি (সমসাময়িক চিত্র হইতে)

বেরার অধিকার (১৫৬৯)
চাঁদবিবির মৃত্যু (১৫৭৩) ও আহ্‌মদনগর জয়

আহ্‌মদ্‌নগর তখন অন্তর্দ্বন্দ্বে দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছিল, ১৫৬৯ খৃঃ অব্দে উভয় পক্ষে এক সন্ধি হইল,—সন্ধির সর্ত্ত অনুসারে আহ্‌মদনগরের সুলতান আকবরকে বেরার প্রদেশ সমর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন। ইহার চারি বৎসর পরে চাঁদবিবি আততায়ীর হস্তে নিহত হইলে আহ্‌মদনগর রাজ্যের কিয়দংশ আকবরের অধিকার-ভুক্ত হইয়াছিল। আহ্‌মদনগরের পতনের পর খান্দেশের দুর্ভেদ্য

অসীরগড় দুর্গ আকবরের হস্তগত হয় (১৬০১)। সম্রাট শাহজহানের রাজত্বকালে আহ্‌মদনগর সম্পূর্ণভাবে মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় (১৬৩৩)।

খান্দেশ জয় (১৬০১)

বিদ্রোহ।—আকবর প্রায় অপরাজেয় শক্তিতে বিশাল ভারতের ন্যূনাধিক তিন-চতুর্থাংশ ব্যাপিয়া সাম্রাজ্য বিস্তার করিলেও নিরুপদ্রবে রাজত্ব করিতে পারেন নাই। তাঁহার অনুচরদের মধ্যে অনেকেই সুযোগ-সুবিধা বুঝিলে বিদ্রোহ করিতে দ্বিধা করিতেন না। কিন্তু যে সকল রাজপুত রাজা ও রণনায়ক তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন তাঁহারা কখনও সম্রাটের বিশ্বাসভঙ্গ করেন নাই। আকবর যখন চিতোর অভিযানের আয়োজন করিতেছিলেন তখন কয়েকজন উজ্‌বেগ রণনায়ক বিদ্রোহী হইয়া, কামরাণের পুত্রকে সিংহাসনে বসাইবার উদ্যোগ করিল। বিদ্রোহের মূলোৎপাটনের অভিপ্রায়ে আকবর গোপনে তাঁহার এই জ্ঞাতিভ্রাতার প্রাণনাশ করেন শুনা যায়। আবদুল্লা খাঁ উজ্‌বেগ খৃঃ ১৫৪৬ অব্দে মালব প্রদেশে বিদ্রোহ ঘোষণা করিবার পর খাঁ জমান ও বাহাদুর খাঁ নামক অপর দুইজন উজ্‌বেগ দলপতিও বিদ্রাহী হইয়া উঠিলেন (১৫৬৫)। আকবরের ভ্রাতা মির্জা হকীমও এই সকল বিদ্রোহীর সঙ্গে যোগ দেন। ১৫৬৭ খৃঃ অব্দে এই বিদ্রোহ দমন করা হয়। তারপর আসফ খাঁ বিদ্রোহী হইলেন। কিন্তু বাদশাহের নিকট পরাজিত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলে, আকবর তাঁহাকে ক্ষমা করেন। এদিকে ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে বিহার ও বঙ্গের আফগান রণনায়কেরা প্রবল ভাবে বিদ্রোহ করিলে আকবর অতিকষ্টে এই বিদ্রোহ দমন করেন। অবশেষে আকবর যখন দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন তখন যুবরাজ সলীম বিদ্রোহ করিয়া এলাহাবাদে নিজেকে বাদশাহ বলিয়া ঘোষণা করেন এবং আকবরের প্রিয় মন্ত্রী আবুল ফজলকে গোপনে হত্যা করাইলেন। অতঃপর ১৬০৩ খৃঃ অব্দে সলিমা বেগমের মধ্যস্থতায় পিতা-পুত্রের বিবাদ নিষ্পত্তি হইল। সলীম ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বশ্যতা স্বীকার করিলেন।

উজ্‌বেগ বিদ্রোহ

আসফ খাঁর বিদ্রোহ

সলীমের বিদ্রোহ

শেষ জীবন। আকবরের শেষ জীবন শান্তিতে অতিবাহিত হয় নাই। সলীমের বিদ্রোহ ও প্রিয়বন্ধু আবুল ফজলের শোচনীয়

ভারতবর্ষ
১৬০৫
কাশ্মীর
লাহোর
দিল্লী
আজমীর
সিন্ধু
জয়পুর
যোধপুর
আজমীড়
আগ্রা
লক্ষ্ণৌ
পাটনা
গৌড়
এলাহাবাদ
বিহার
চিতোর
গুজরাট
মালব
আহম্মদাবাদ
নর্মদা
উড়িষ্যা
খন্দেশ
বেরার
আহম্মদনগর
কৃষ্ণা
কাবেরী

মৃত্যুতে তিনি মর্ম্মান্তিক আঘাত পাইয়াছিলেন। দুই পুত্র মুরাদ ও দানিয়ালের অকাল মৃত্যুতে তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া যায়। ইহার অল্পকাল পরেই আকবর সহসা পীড়িত হইয়া পড়েন এবং ৬৩ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয় (১৭ই অক্টোবর, ১৬০৫)।

আকবরের মৃত্যু (১৬০৫)

আকবরের শাসনপদ্ধতি।—কেবল রাজ্যজয়েই নয়, শাসন-কার্য্যেও আকবর ছিলেন অনন্যসাধারণ। অবশ্য সে যুগের সুলতান ও বাদশাহের ন্যায় তাঁহার ব্যক্তিগত ইচ্ছা অনুসারেই রাজকার্য্য পরিচালিত হইত। কিন্তু এই স্বেচ্ছাতন্ত্রের মধ্যেও তিনি রাষ্ট্রশাসনে ন্যায়পরতা, উদারতা ও অনুপম শৃঙ্খলা আনয়ন করিয়াছিলেন।

প্রাদেশিক শাসন

পঞ্চদশ সুবা

সমগ্র সাম্রাজ্যটিকে আকবর ১৫টি 'সুবা' অর্থাৎ প্রদেশে বিভক্ত করিয়াছিলেন ; যথা—(১) কাবুল, (২) লাহোর, (৩) মুলতান, (৪) দিল্লী, (৫) আগ্রা, (৬) অযোধ্যা, (৭) এলাহাবাদ, (৮) আজমীড়, (৯) আহ্‌মদাবাদ, (১০) মালব, (১১) বিহার, (১২) বাঙ্গালা (উড়িষ্যা সহ), (১৩) খান্দেশ, (১৪) বেরার এবং (১৫) আহ্‌মদনগর। প্রত্যেক সুবায় একজন করিয়া 'নাজিম' বা 'সিপাহ-সলার' থাকিতেন ; পরবর্ত্তীকালে তাঁহাদেরই নাম হয় 'সুবাদার'। সে-যুগে সামরিক শক্তিই সাম্রাজ্যের ভিত্তিস্বরূপ গণ্য হইত বলিয়া এই প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তারা ছিলেন সামরিক কর্ম্মচারী এবং বাদশাহের প্রতিনিধি। প্রত্যেক সুবায় 'সিপাহ-সলারের' অধীনে একজন করিয়া 'দেওয়ান' থাকিতেন,—তিনি ছিলেন রাজস্ব-বিভাগের কর্ত্তা। প্রত্যেকটি সুবা আবার কয়েকটি 'সরকার' অর্থাৎ জেলায় বিভক্ত ছিল। জেলার শাসনকর্ত্তার উপাধি ছিল 'ফৌজদার' ; তিনিও সামরিক কর্ম্মচারী বলিয়া গণ্য হইতেন। শহরের শান্তিরক্ষার ভার ছিল 'কোতোয়াল' উপাধিধারী কর্ম্মচারীদের উপর। বিচারকার্য্যের ভার ছিল 'কাজী' ও 'মীর আদল" নামক কর্ম্মচারীদের উপর। "মুফতী" নামক কর্ম্মচারীরা কাজিদের বিচারকার্য্যে সাহায্য করিতেন। প্রধান প্রধান শহর এবং গ্রামে কাজী থাকিতেন। অন্যান্য কর্ম্মচারীদের মধ্যে বক্‌সী (বেতনবিভাগের কর্ত্তা), সদর্ (মস্‌জিদ ও দাতব্য বিভাগের কর্ত্তা), আমিল (রাজস্ব আদায়কারী), বিতিকৃচি (আমিলের অধস্তন

সিপাহ-সলার,

দেওয়ান, সরকার,

ফৌজদার, কোতোয়াল

কাজী, মীর-আদল, মুফতী ও অন্যান্য কর্ম্মচারী

কর্ম্মচারী), মীর বহর (ফেরিঘাট, নৌ ও ডাক-বিভাগের কর্ত্তা), বাকিয়া নবীশ (দলিল-বিভাগের কর্ত্তা), পোতদার (কোষাধ্যক্ষ), ওয়াকিয়া নবীশ (সংবাদ লেখক), প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

কেন্দ্রীয় শাসন

কেন্দ্রীয় শাসনে বাদশাহ নিজেই ছিলেন সর্ব্বময় কর্ত্তা,—একাধারে সম্রাট, সেনানায়ক, বিচারক ও ধর্ম্মমীমাংসক। তবে তাঁহার অধীনে 'উকীল' (প্রধান মন্ত্রী), 'উজির' (রাজস্ব সচিব), 'মীর বক্সী' (খাজাঞ্চী), প্রধান 'সদর্', প্রভৃতি অগণিত কর্ম্মচারী থাকিতেন। বস্তুতঃ প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রতন্ত্রের আদর্শেই গড়িয়া উঠিয়াছিল। রাজধানীতে বাদশাহ নিজেই দেওয়ানী ও ফৌজদ[illegible]ী মামলার বিচার করিতেন। তবে তাঁহার অধীনে 'সদর্' ছ[illegible] । কেন্দ্রী[illegible] বিচার-বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী।

জায়গীর প্রথার বিলোপ

আকবরের পূর্ব্বে রাজক[illegible]রীদিগকে জায়গীর দানের প্রথাই ছিল সমধিক প্রচলিত; ইহাতে একদিকে যেমন রাজস্বের বিস্তর ক্ষতি হইত, অপরদিকে তেমনই জায়গীরদারেরা সামরিক শক্তি-বৃদ্ধিরও সুযোগ পাইতেন,—ইহাতে বাদশাহের রাষ্ট্রীয় ও সামরিক শক্তি ক্ষুণ্ণ হইত। তাই জায়গীর-প্রথা তুলিয়া দিয়া আকবর সেখানে 'মন্‌সব'-প্রথার প্রবর্ত্তন করেন।

মন্‌সবদার-প্রথা

প্রত্যেক মন্‌সবদার নির্দ্দিষ্ট হারে রাজকোষ হইতে বেতন ভোগ করিতেন। তিনি মন্‌সবদারগণকে ৩৩টি শ্রেণীতে বিভক্ত করেন; নিম্নতম মন্‌সবদারগণ সাধারণতঃ ছিলেন দশ জন সৈন্যের অধিনায়ক, উচ্চতর শ্রেণীর কর্ম্মচারীদের অধীনে ৫,০০০ সৈন্যও থাকিত; সাতহাজারী হইতে দশহাজারী মন্‌সবগুলি প্রায়ই রাজকুমারদের জন্য নির্দ্দিষ্ট থাকিত।

জমি জরিপ ও রাজা তোড়রমল

আকবরের রাজস্ব-বিভাগের সুব্যবস্থা আজিও স্মরণীয় হইয়া আছে। এ-কার্য্যে তাঁহার প্রধান সহায় ছিলেন রাজা তোড়রমল। তোড়রমল সমগ্র সাম্রাজ্য জরিপ করাইয়া উর্ব্বরতা ও কৃষির অবস্থা অনুযায়ী জমিগুলিকে কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেন; এবং তদনুসারে প্রত্যেক ভূমিখণ্ডের রাজস্ব নির্দ্ধারণ করিয়া দেন।

রাজস্ব

কৃষকগণ অর্থের দ্বারা অথবা উৎপন্ন দ্রব্যের এক-তৃতীয়াংশ ফসলের দ্বারা রাজকর দিত। অবশ্য আকবর যে রাজস্বের পরিমাণ স্থির করিয়াছিলেন তাহা হিন্দু রাজকরের তুলনায় যথেষ্ট বেশি ছিল; কিন্তু তাঁহার রাজত্বকালে জিজিয়া প্রভৃতি কতকগুলি অন্যায় করভার

উঠিয়া যাওয়ায় এবং দেশে কৃষির উন্নতি হওয়ায়, উৎপন্ন শস্যাদির এক-তৃতীয়াংশ রাজস্ব দিতে প্রজাদের বিশেষ অসুবিধা হইত না।

আকবরের ধর্ম্মমত।—আকবরের ধর্ম্মমত বাস্তবিক কি ছিল তাহা আজও ঐতিহাসিকগণের গবেষণার বিষয় হইয়া আছে। বাল্যকালে তিনি নৈষ্ঠিক সুন্নি মুসলমানরূপে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। সিংহাসনে আরোহণ করার পর তিনি সুফী সম্প্রদায়ের সংস্পর্শে আসেন। সম্ভবতঃ উহাই ছিল তাঁহার ধর্ম্মজীবনে প্রথম পরিবর্ত্তনের সূচনা। তিনি ফতেপুর সিক্রিতে 'ইবাদৎখানা' নামে এক ধর্ম্মসভাগৃহ প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মুস্‌লিম আচার্য্যগণ সমবেত হইয়া তাঁহার সহিত স্বাধীনভাবে ধর্ম্মচর্চ্চা করিতেন। ক্রমে ইবাদৎখানায় হিন্দু, জৈন, পার্সি, খৃষ্টান, প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্ম্মের আচার্য্যগণও নিমন্ত্রিত হইয়া ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে সম্রাটের সহিত আলোচনা করিতেন। সমসাময়িক লেখকদের বর্ণনা হইতে জানিতে পারা যায় যে, তিনি সময় বিশেষে জরথুষ্ট্র-প্রবর্ত্তিত পার্সিধর্ম্মের বিধান অনুসারে সূর্য্য ও অগ্নির উপাসনা করিতেন; আকবর জৈনদিগকেও মন্দির গড়িবার ভূমি দান করেন; আবার হিন্দুদের ন্যায় ফোঁটাতিলক ধারণ, নিরামিষ আহার, প্রভৃতি নিয়ম ও পালন করিয়া এক সময় তিনি সম্রাট অশোকের ন্যায় নিজ রাজ্যে হিন্দু ও জৈন তিথিবিশেষে পশুবধও নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন। ক্রমে গোবধ, নমাজপাঠ, শ্মশ্রুরক্ষা, মক্কা তীর্থ ভ্রমণ, মস্‌জিদ নির্ম্মাণ ও সংস্কার এবং রমজান-ব্রত-পালন নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করায় মুসলমানদের মধ্যে দারুণ বিক্ষোভের সৃষ্টি হইয়াছিল। ১৫৭৯ খৃঃ অব্দে তিনি এক অনুজ্ঞা দ্বারা ঘোষণা করেন যে, ইস্‌লাম ধর্ম্ম সম্বন্ধে বাদশাহের সিদ্ধান্তই সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র চূড়ান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। তাহাতে রাজ্যের নানাস্থানে—বিশেষতঃ বিহার ও বঙ্গে এবং কাবুল রাজ্যে—বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। বিদ্রোহ দমনের পর বিভিন্ন ধর্ম্মমতের সমন্বয়ের চেষ্টায় বাদশাহ চল্লিশ বৎসর বয়সে, "দীন-ইলাহী" নামে এক নূতন মতবাদ প্রচার করেন (১৫৮২)—ঈশ্বরে বিশ্বাস ছিল ইহার মূলমন্ত্র। রাজকীয় আড়ম্বরের সহিত দীন-ইলাহী মতবাদের প্রতিষ্ঠা করা হইলেও, ইহাতে জনচিত্ত আকৃষ্ট হয় নাই। আকবর বলপূর্ব্বক কাহাকেও তাঁহার ধর্ম্মমত

সুফী প্রভাব

ইবাদৎখানা স্থাপন ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণের সহিত ধর্ম্মালোচনা

'দীন-ইলাহী'

ধর্ম্ম-সমন্বয়ের ব্যর্থ প্রয়াস

গ্রহণ করাইতে চেষ্টা করেন নাই। তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই ইহা বিলুপ্ত হইয়া যায়। দীন-ইলাহী ধর্ম্মমত লইয়া অনেকেই আকবরকে বিদ্রূপ করিয়া গিয়াছেন। নিষ্ফল হইলেও মধ্যযুগে ধর্ম্মসমন্বয়ের এই প্রয়াসের মধ্যে তাঁহার অনুসন্ধিৎসু হৃদয় ও মনীষার স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, কেবল মাত্র ব্যক্তিগত প্রভাব ও মানসিক উৎকর্ষের ফলে নূতন ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর নয়। সেইজন্যই দীন ইলাহী ধর্ম্মে কেবল ৯৯ জন মুস্‌লিম এবং মাত্র একটি হিন্দু অনুবর্ত্তীরূপে দেখা দিয়াছিল। সে ধর্ম্মের মোটেই প্রসার হয় নাই, শুধু আকবরের স্বপ্ন যেন তাঁহার প্রপৌত্র দারাশিকোহ্‌র ধর্ম্মতত্ত্ব-সমন্বয়ের মধ্যে পরে রূপ গ্রহণ করে।

শিল্প ও সাহিত্যের উন্নতি।—আকবর নিজে ছিলেন নিরক্ষর, কিন্তু তাঁহার জ্ঞানপিপাসা যেরূপ অপরিসীম ছিল, চারু-কলায় অনুরাগও ছিল তেমনই অনন্যসাধারণ। দিল্লীতে হুমায়ূনের সমাধি-ভবন এবং ফতেপুর-সিক্রির সুরম্য প্রাসাদপুর তাঁহার সৌন্দর্য্যবোধের অপূর্ব্ব নিদর্শন। ফতেপুর সিক্রি শহরটির তিনিই প্রতিষ্ঠাতা। আগ্রা ও লাহোরে তিনি রমণীয় প্রাসাদ-দুর্গও নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। তাঁহার উৎসাহে সে সময় ভারতীয় চিত্রকলায় এক অভিনব প্রেরণার সঞ্চার হইয়াছিল। হুমায়ুন শের শাহের নিকট পরাজিত হইয়া পারস্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলে সেখানকার কয়েকজন কলাকুশল চিত্রশিল্পীর সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। তাঁহাদের কেহ কেহ ভারতবর্ষে হুমায়ুন ও আকবরের অধীনে কার্য্য গ্রহণ করেন। এইভাবে হিন্দু-পারসিক বা 'মুঘল চিত্ররীতি'র সূত্রপাত হয়। পরিশেষে ভারতীয় চিত্রশিল্পীরাও এই রীতির অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলে পারসিক ও হিন্দু-চিত্ররীতির সমন্বয়ে 'মুঘল চিত্রকলা'র উদ্ভব হয়। আকবরের রাজত্বকালেই তাহার সূচনা হয়, পরে সম্রাট জহাঙ্গীরের রাজত্বকালে আমরা 'মুঘল চিত্রকলা'র পূর্ণ পরিণতি দেখিতে পাই। শুধু চিত্রশিল্পে নয় সঙ্গীতকলার উৎকর্ষের জন্যও আকবরের রাজত্বকাল চিরস্মরণীয়। অমর গায়ক ও রাগশিল্পী তানসেন ছিলেন তাঁহারই সভাসদ। তানসেন ব্যতীত আকবরের সঙ্গীত-শাস্ত্রাভিজ্ঞ কলাবিদ-সভাসদগণের মধ্যে মালবের আফগান

হুমায়ূনের সমাধি

ফতেপুর-সিক্রি

চিত্রশিল্প

পারসিক ও হিন্দু চিত্র-রীতির সমন্বয়

'মুঘল চিত্রকলা'

সঙ্গীতকলা

তানসেন

সুলতান বজবাহাদুরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ভারতীয় সঙ্গীতকলার গুজরাটী রীতিতে বজবাহাদুর বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন।

বজবাহাদুর

আকবরের রাজত্বকাল ফারসি ও হিন্দি সাহিত্যের উন্নতির জন্যও প্রসিদ্ধ। তাঁহার প্রিয় অমাত্য আবুল ফজল 'আইন-ই-আকবরী' ও 'আকবর-নামা' নামে দুইখানি অমূল্য ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচনা করিয়া অমর হইয়াছেন। আবুল ফজলের পারসিক গদ্য রচনা এখনও আদর্শস্থানীয় হইয়া আছে। আবুল ফজলের

সাহিত্য
আবুল ফজল

মুঘল অন্তঃপুরিকারা পোলো খেলিতেছেন (মুঘল চিত্রশিল্প)

ভ্রাতা নলদময়ন্তীর অনুবাদক ফৈজী ছিলেন বিখ্যাত কবি। এইসময়েই আবার নিজামউদ্দীন ও বদাউনী দুইখানি প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। আকবরের আগ্রহ ও পৃষ্ঠপোষকতায় অথর্ব্ববেদ, রামায়ণ, মহাভারত, হরিবংশ, কথাসরিৎসাগর, প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থের সচিত্র পারসিক অনুবাদ রচিত হয়। আকবরের আদেশে সুপ্রসিদ্ধা লীলাবতীর গণিতশাস্ত্রও পারসিক ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। উত্তরকালে সম্রাট শাহ্‌জহানের জ্যেষ্ঠপুত্র দারা শিকোহ্‌ তাঁহার প্রপিতামহের পদাঙ্ক অনুসরণ

ফৈজী,
নিজামউদ্দীন
ও বদাউনী

সংস্কৃত গ্রন্থের
পারসিক
অনুবাদ

করিয়া ধর্ম্মসমন্বয়ের উদ্দেশ্যে উপনিষদের পারসিক অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

বীরবল, তুলসীদাস ও সুরদাস

ফারসি সাহিত্যের এইরূপ উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এ-সময় হিন্দি ও উর্দ্দু সাহিত্যেরও যথেষ্ট উন্নতি হয়। রাজা বীরবল ছিলেন আকবরের একজন বিশিষ্ট অন্তরঙ্গ; তিনি হিন্দি ভাষায় নানা কবিতা রচনা করিয়া সুরসিক বলিয়া খ্যাত হইয়াছিলেন। এই সময়ে ভক্তকবি তুলসীদাস ও পদাবলী-রচয়িতা সুরদাস আবির্ভূত হন। তুলসীদাসের 'রামচরিত মানস' (১৫৭৬) নামক হিন্দি রামায়ণ মধ্যযুগের ভারতীয় সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। অবশ্য রাজসভার সহিত তুলসীদাস বা সুরদাসের কোন সম্বন্ধ ছিল না।

নলদময়ন্তী

[আকবর মহাভারতের যে পারসিক অনুবাদ প্রকাশ করেন তাহার একখানি চিত্রের নিদর্শন।

বিরোধী গুণের সামঞ্জস্য

আকবরের চরিত্র ও কৃতিত্ব।—আকবরের সভাসদ ও বন্ধুবান্ধবের মধ্যে কয়েকজন ছিলেন বিদেশী। তাঁহাদের একজন লিখিয়া গিয়াছেন যে, বাদশাহের চরিত্র ছিল বিরোধী গুণের সমাবেশে মনোহর। তিনি একাধারে ছিলেন কোমল ও কঠোর,

অমায়িক অথচ গম্ভীর। শত্রুর তিনি আতঙ্ক ছিলেন। বন্ধুরাও তাঁহাকে যেরূপ ভালবাসিত তেমনই ভয় করিত। বাদশাহ ছিলেন "মহতের নিকট মহৎ, দীনের কাছে দীন"। ইহাই ছিল তাঁহার চরিত্রের অনুপম মাধুর্য্য। বাল্যকালে তিনি লেখাপড়া শিখেন নাই—আজীবন নিরক্ষর ছিলেন; অথচ তাঁহার জ্ঞানপিপাসা ছিল অপরিসীম। সাহিত্য, ইতিহাস, ধর্ম্মতত্ত্ব, প্রভৃতি নানা বিষয়ের পুস্তক-সমূহ তাঁহার নিকট নিয়মিতভাবে পাঠ করা হইত এবং তিনি সে সকল তথ্য যথাযথ স্মরণ রাখিতেন। দর্শন ও ধর্ম্মতত্ত্বের উপর তাঁহার স্বাভাবিক আকর্ষণ ছিল। তিনি ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রায় বিশেষজ্ঞের ন্যায়ই আলোচনা করিতে পারিতেন। এইরূপ আলাপ-আলোচনা ও স্বাধীন-চিন্তার মধ্য দিয়া তাঁহার চিত্তের বিকাশ হইয়াছিল। কাব্য, চিত্রকলা, সঙ্গীত, স্থাপত্য-শিল্প, প্রভৃতি বিভিন্ন কলাশাস্ত্রের গুণাগুণ বিচারে তিনি প্রায় অদ্বিতীয় ছিলেন; আবার যন্ত্রপাতির কাজকর্ম্ম করিতেও তিনি খুব ভালবাসিতেন। কামান নির্ম্মাণ এবং দিয়াশলাই প্রস্তুতে তিনি যথেষ্ট আনন্দ অনুভব করিতেন। তিনি রাত্রি অবধি পোলো খেলার আগ্রহে পলাশকাষ্ঠ দ্বারা এক প্রকার বল তৈয়ারী করেন, উহা ঘষিলেই আলো জ্বলিয়া উঠিত এবং সেই আলোর সাহায্যে রাত্রেও খেলা চলিত। রাজকার্য্যেও তাঁহার ছিল অসামান্য অধিকার। বিশাল সাম্রাজ্যের সামরিক এবং শাসন উভয় বিভাগের প্রত্যেকটি বিষয় তাঁহার নখদর্পণে ছিল। শুধু পাশ্চাত্য শত্রু ও তাহাদের নৌ-বলের বিপদ সম্বন্ধে তিনি যেন সজাগ ছিলেন না।

নিরক্ষরতা, জ্ঞান-পিপাসা

ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা

চারু কলার গুণাগুণ বিচারের ক্ষমতা

যান্ত্রিক কার্য্যে অনুরাগ

অসামান্য প্রতিভাবলে অগণিত বাধাবিপত্তি অতিক্রম করিয়া আকবর যে কার্য্যসাধন করিয়া গিয়াছেন তাহাই তাঁহার প্রতিভার সাক্ষ্য দিতেছে। তাঁহার ন্যায় মনীষী, কষ্টসহিষ্ণু ও পরিশ্রমী নর-পতি জগতে বিরল। হিন্দু-মুস্‌লিম মিলনের জন্য তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে আর কোন মুস্‌লিম নরপতি হিন্দু-মুসলমানের ভাবধারার আদান প্রদান ও সামঞ্জস্যের জন্য এমন আন্তরিকভাবে প্রয়াসী হন নাই। কিন্তু হিন্দু-মুসলমানের মিলন অপেক্ষাও মহামতি আকবরের জীবনাদর্শ মহত্তর ছিল,—তিনি চাহিয়াছিলেন ধর্ম্মসমন্বয়ের ভিত্তিতে সমগ্র মানবজাতিকে একসূত্রে

গাঁথিয়া তুলিতে। কিন্তু দেশের শিক্ষা-দীক্ষা, ঐতিহ্য সকলই ছিল সে যুগে উহার প্রতিকূল। সুতরাং হয়ত ইহাই তাঁহার ব্যর্থতার প্রধান কারণ; কিন্তু বিফল হইলেও এক্ষেত্রে তিনি একজন যুগ-প্রবর্ত্তক।

STUDIES AND QUESTIONS

1. Sketch the career of Akbar as a conqueror. (C. U. '10, '29, '30, '33,'44).
2. Estimate Akbar as an administrator. (C. U. '29, '25).
3. In what sense may Akbar be regarded as the real founder of the 'Mughul Empire'? (C U. '38, '44).
4. Indicate with the help of a sketch-map the extent of Akbar's empire. (C. U. '40)
5 Give an account of Akbar's policy towards the Hindus (C. U. '12, '17, '33).
6. What were the difficulties which Akbar had to face on his accession to the throne of Delhi? Give an estimate of his character and the policy which enabled him to build up the Mughul Empire. (C. U. '16).
7. What steps did Akbar take to place the Mughul dominion in India on firm foundations? (C. U. '42).

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

মুঘল শক্তির চরমোন্নতি

জহাঙ্গীর, শাহ্‌জহান ও ঔরঙ্গজীব

জহাঙ্গীর—(১৬০৫—২৭)। আকবরের মৃত্যুর এক সপ্তাহ পরে আগ্রায় যুবরাজ সলীমের রাজ্যাভিষেক হয় (২৪শে অক্টোবর, ১৬০৫)। অভিষেককালে তিনি 'নূরউদ্দীন মুহম্মদ জহাঙ্গীর পাদশাহ (বাদশাহ) গাজী' উপাধি ধারণ করেন। সিংহাসনে আরোহণের কয়েক মাস পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র খুস্‌রু পঞ্জাবে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। খুস্‌রু ছিলেন আকবরের

রাজ্যাভিষেক

খুস্‌রুর বিদ্রোহ

প্রিয় পৌত্র এবং মহারাজ মানসিংহের ভাগিনেয়; তাঁহার শ্বশুর খান-ই-আজমও দরবারের মধ্যে একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন। আকবরের জীবদ্দশাতেই একবার সলীমের স্থলে খুস্‌রুকেই সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মনোনয়নের কথা উঠিয়াছিল। এরূপ ক্ষেত্রে পুত্রের বিদ্রোহে জহাঙ্গীর অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া সসৈন্যে পুত্রের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। অনায়াসেই খুস্‌রুকে পরাজিত ও বন্দী করা হইল (২৭শে এপ্রিল, ১৬০৬)। তারপর পুত্রকে অন্ধ করিয়া জহাঙ্গীর দুশ্চিন্তার হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিলেন। দীর্ঘকাল বন্দী অবস্থায় থাকিবার পর ১৬২২ খৃঃ অব্দে খুস্‌রুর মৃত্যু হয়।

জহাঙ্গীর

খুস্‌রুর পরাজয় ও মৃত্যু

খুস্‌রুকে যাহারা বিদ্রোহে সহায়তা করিয়াছিল তাহাদের মধ্যে শিখগুরু অর্জ্জুনের নাম উল্লেখযোগ্য। রাজদ্রোহের অভিযোগে জহাঙ্গীর গুরু অর্জ্জুনের দুই লক্ষ টাকা জরিমানা করিলেন। অর্জ্জুন এক কপর্দ্দকও দিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। সেজন্য পাঁচদিন ধরিয়া বর্ব্বরোচিত উৎপীড়ন করিয়া তাঁহার প্রাণনাশ করা হয় (জুন, ১৬০৬)।
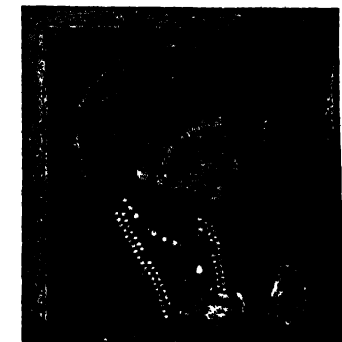
'গ্রন্থ-সাহব' সম্পাদক শিখগুরু অর্জ্জুনের প্রাণদণ্ড

[যোধবাই জহাঙ্গীরের রাজপুতানী বেগম]

আকবরের রাজত্বকালে পারস্য হইতে গিয়াস্ বেগ নামক জনৈক ভদ্রলোক আসিয়া বাদশাহের অধীনে কার্য্য করেন (১৫৯১)। তাঁহার কন্যা মিহ্‌রুন্নিসা ছিলেন অপূর্ব্ব রূপ-গুণবতী। যুবরাজ সলীম মিহ্‌রুন্নিসাকে বিবাহ করিতে চাহিলে আকবর তাহাতে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন এবং আলী কুলী নামক এক ব্যক্তির সহিত এই বালিকার বিবাহ হয়। আলী কুলীর উপাধি ছিল 'শের আফগান'। তিনি ছিলেন বর্দ্ধমানের (বঙ্গদেশ) জায়গীরদার। সিংহাসনে আরোহণের কিছুকাল পরে জহাঙ্গীর বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা কুতবউদ্দীন খাঁকে আদেশ করিলেন শের আফগানকে বন্দী করিয়া দিল্লী প্রেরণ করিতে। কুতবউদ্দীন এই আদেশ পালনে অগ্রসর হইলে উভয় পক্ষে যুদ্ধ বাধিল এবং যুদ্ধে কুতব ও শের—দু'জনেরই মৃত্যু হয়। মিহ্‌রুন্নিসাকে দিল্লীর রাজপ্রাসাদে লইয়া আসা হইল। বাদশাহের হারেমে আসিয়া মিহ্‌রুন্নিসা স্বামিহন্তাকে বিবাহ করিতে অসম্মত হইলেন। অবশেষে বহু সাধ্য-সাধনার ফলে, দীর্ঘ চারি বৎসর পরে, মিহ্‌রুন্নিসা তাঁহাকে বিবাহ করিলেন (১৬১১)। জহাঙ্গীর ইতিপূর্ব্বেই তাঁহাকে 'নূরমহল' (ঘরের আলো) উপাধি দিয়াছিলেন; এখন হইতে মিহ্‌রুন্নিসার উপাধি হইল 'নূর-জহান' অর্থাৎ জগতের আলো।

মিহ্‌রুন্নিসা (নূরজাহান)

শের আফগানের মৃত্যু

নূরজহান

এদিকে নুরজহানের পিতা ও ভ্রাতা যথাক্রমে 'ইতিমাদুদ্দৌলাহ' ও 'আসফ খাঁ' উপাধি লাভ করিয়া প্রধান ওম্‌রাহ শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন। নুরজহান কেবল যে বাদশাহের প্রধানা বেগম হইলেন তাহাই নয়, রাজকীয় মুদ্রাদিতেও জহাঙ্গীরের নামের সহিত তাঁহার নাম অঙ্কিত হইল, এবং তিনিই সাম্রাজ্যের প্রকৃত শাসনকর্ত্রী হইয়া দাঁড়াইলেন। তিনি পর্দাপ্রথা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়া স্বামীর সহিত প্রকাশ্যে বাহির হইতেন এবং প্রজাদের দর্শন দিতেন। তাঁহার স্বাক্ষরে ফর্মান প্রকাশিত হইত। আরামপ্রিয় ও বিলাসী জহাঙ্গীর তাঁহার পত্নীর রূপগুণের অন্তরালে ছায়ার ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ললিত কলা ও উদ্যানবিন্যাস-শিল্পে নুরজাহান সত্যই বিশেষ গুণবতী ছিলেন। তিনি ফার্সীতে চমৎকার কবিতা লিখিতেন এবং মেয়েদের পোষাক পরিচ্ছদে অভিনব পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রভাবেই কাশ্মীর ভূ-স্বর্গে পরিণত হয়।

শান্তিপ্রিয় জহাঙ্গীরের রাজত্বকালেও কয়েকটি যুদ্ধ-বিগ্রহ হইয়াছিল। এই সকল যুদ্ধের ফলে মুঘল সাম্রাজ্য, আরও বিস্তৃতি লাভ করে। আকবর বঙ্গদেশ জয় করিলেও বাঙ্গালার হিন্দু-মুস্‌লিম ভূ-স্বামীদের সম্পূর্ণরূপে দমন করিয়া যাইতে পারেন নাই। জহাঙ্গীরের রাজত্বকালে সুবাদার ইস্‌লাম খাঁ কর্ত্তৃক এই কার্য্য সাধিত হয়। ১৬১১ খৃঃ অব্দে শ্রীহট্টে ওস্‌মান খাঁ নামক জনৈক ওমরাহ্ বিদ্রোহ ঘোষণা করিলে ইস্‌লাম খাঁ তাঁহাকে

জহাঙ্গীরের রাজসভা

বাঙ্গালায় বিদ্রোহ দমন ১৬১২)
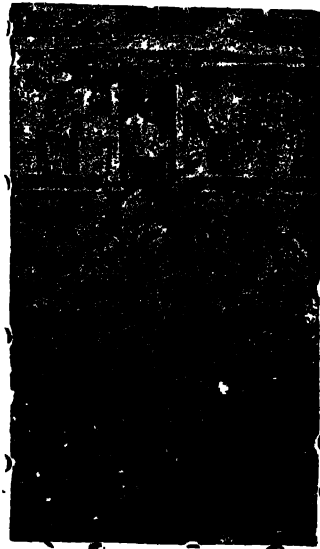
পরাজিত করেন; ওস্‌মান খাঁ এই যুদ্ধে আহত হন এবং উহারই ফলে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুতে তাঁহার আত্মীয়-স্বজন বাদশাহের বশ্যতা স্বীকার করেন (১৬১২)। ইহার পর মেবারের প্রতাপসিংহের পুত্র রাণা অমরসিংহ সম্রাটপুত্র খুর্‌রমের (শাহ্‌জহান) নিকট পরাভূত হইয়া বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হন (১৬১৪)। পিতার ন্যায় তাঁহার দৃঢ়তা বা সহিষ্ণুতা কিছুই ছিল না, এবং খুর্‌রম মেবার রাজ্য এমনভাবে অবরোধ করিয়া ফেলিয়াছিলেন যে, অমরসিংহের পক্ষে সন্ধির প্রস্তাবে সম্মত হওয়া ছাড়া উপায়ান্তর ছিল না। তবে বশ্যতা স্বীকার করিলেও মেবারের রাণাকে বাদশাহের দরবারে উপস্থিত হইয়া তাঁহার আনুগত্য গ্রহণ করার দায় হইতে মুক্তি দেওয়া হইয়াছিল; মেবারের রাজ-পরিবারের কোন মহিলাকেও বাদশাহের অন্তঃপুরে প্রেরণ করা হয় নাই।

মেবার জয় (১৬১৪)

জহাঙ্গীরও আকবরের ন্যায় দাক্ষিণাত্য জয়ের উদ্যোগ করিয়াছিলেন। আহ্‌মদনগরের সহিত দীর্ঘকাল ধরিয়া যুদ্ধ চলিতে লাগিল, কিন্তু সেখানকার সুযোগ্য হাবসী (Ethiopian) মন্ত্রী মালিক অম্বর বার বার বাদশাহের সৈন্যদলকে পরাভূত করিতে লাগিলেন। অবশেষে খুর্‌রমকে সেখানে প্রেরণ করা হইলে তিনি আহ্‌মদনগর জয় করিয়া (১৬১৬) পিতার নিকট হইতে 'শাহ্‌জহান' উপাধি লাভ করিলেন। কিন্তু তাঁহারা পর্তুগীজ ও ইংরাজ নৌ শক্তি প্রতিহত করার কোন আয়োজন করেন নাই।

আহ্‌মদনগর জয় (১৬১৬)

তাহার পর পঞ্জাবের উত্তর পূর্ব্বে কাঙ্গড়া দুর্গ জহাঙ্গীরের অধিকারভুক্ত হইল (১৬২০)। কিন্তু ইহার দুই বৎসর পরেই পারস্য-রাজ শাহ্‌ আব্বাসের আক্রমণে কান্দাহার রাজ্য জহাঙ্গীরের হস্তচ্যুত হইয়া গেল (১৬২২)। পারস্য ও ভারত মৈত্রীবদ্ধ হইলে হয়ত পাশ্চাত্য জাতিদের প্রভাব এত শীঘ্র বাড়িত না। সেযুগে গোয়া ও করাচি খৃষ্টীয় রাষ্ট্রের ভিত্তি পত্তন হইতেই ছিল অথচ মুঘল সম্রাটগণ যেন প্রাচ্য জাতির ভবিষ্যৎ ও পররাষ্ট্র-নীতি বিষয়ে (Diplomacy) সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ও উদাসীন ছিলেন।

কাঙ্গড়া দুর্গ জয় (১৬২০)

কান্দাহার হস্তচ্যুত (১৬২০)

জহাঙ্গীর শাহ্‌জহানকে কান্দাহার পুনরুদ্ধারের জন্য আদেশ করিলে তিনি পিতার আজ্ঞা পালন না করিয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন। এতদিন পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের প্রয়োজন ছিল না।

খুর্‌রমের বিদ্রোহ

নূরজহানের ভ্রাতুষ্পুত্রী ও আসফ খাঁর কন্যা আর্জুমন্দ বানু বেগমের (মমতাজমহল) সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। নিজের কর্ম্মদক্ষতায় খুর্‌রম সম্রাট্ ও সম্রাজ্ঞী উভয়েরই প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। জহাঙ্গীরের জ্যেষ্ঠপুত্র খুস্‌রু পূর্ব্বেই নিহত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র পর্ব্বীজ ছিলেন একেবারে অকর্ম্মণ্য। এইসব কারণে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী সম্বন্ধে এতদিন তাঁহার কোন আশঙ্কা ছিল না। কিন্তু জহাঙ্গীরের কনিষ্ঠ পুত্র শাহ্‌রীয়রের সঙ্গে ইতিমধ্যে নূরজহান ও শের আফগানের কন্যার বিবাহ হওয়ায় নূরজহান জামাতাকে সিংহাসনে বসাইবার নিমিত্ত খুর্‌রমের বিরুদ্ধে চক্রান্ত আরম্ভ করেন। আবার ঠিক এই সময়েই জহাঙ্গীর পীড়িত হইয়া পড়েন। তখন রাজ্যের বাহিরে গিয়া বিপজ্জনক কার্য্যে লিপ্ত থাকিয়া সিংহাসন হারাইবার ইচ্ছা শাহ্‌জহানের ছিল না। তাঁহার অনুপস্থিতিতে নূরজহানের চক্রান্ত সার্থক হইয়া উঠিতে পাবে এ-ভয়ও তাঁহার ছিল। এইসব কারণে তিনি বিদ্রোহী হইলেন। কিন্তু পরাভূত হইয়া কিছুকাল পলায়ন করিয়া থাকিবার পর অবশেষে ১৬২৫ খৃঃ অব্দে তিনি পিতার আনুগত্য স্বীকার করিতে বাধ্য হন।

খুর্‌রমের পরাজয় ও বশ্যতা স্বীকার (১৬২৫

এদিকে অকস্মাৎ এক নূতন বিদ্রোহ উপস্থিত হইল। মহাবৎ খাঁ নামে জনৈক আফগান মন্‌সবদার নিজ কর্ম্মকুশলতায় যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছিলেন। শাহ্‌জহানের বিদ্রোহ দমনে তিনিই ছিলেন বাদশাহের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ। কিন্তু নূরজহানেব কর্তৃত্বে তিনি বিরক্ত হইয়া অকস্মাৎ একদিন বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন; এবং জহাঙ্গীর ও নূবজহান কাবুল যাইবার পথে যখন বিতস্তাতীরে শিবির স্থাপন করিয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন, তখন শিবির আক্রমণ করিয়া তিনি বাদশাহকে বন্দী করিয়া ফেলিলেন। যুদ্ধ করিয়া স্বামীকে উদ্ধারের চেষ্টা বিফল হইলে, কূটনীতিজ্ঞা নূরজহান স্বেচ্ছায় বন্দিনী হইয়া কৌশলে স্বামীকে মুক্ত করিলেন। মহাবৎ খাঁ নিরুপায় হইয়া রাজপুতানায় পলায়ন করেন। সেখানে শাহ্‌জহান মেবারেব রাণার সহায়তায় পুনরায় বিদ্রোহের আয়োজন করিতেছিলেন, তাঁহার সহিত মহাবৎ খাঁও আসিয়া যোগ দিলেন। ইহার অল্পকাল পরেই কাশ্মীর হইতে ফিরিবার পথে সম্রাট জহাঙ্গীরেরও মৃত্যু

মহাবৎ খাঁর বিদ্রোহ

জহাঙ্গীর বন্দী

জহাঙ্গীরের মৃত্যু (১৬২৭)

হইল (অক্টোবর, ১৬২৭)। লাহোরে তাঁহাকে সমাধিস্থ করা হয়। সুরম্য উদ্যানে সে সমাধি দেখিবার যোগ্য।

স্যর টমাস রো

জহাঙ্গীরের রাজত্বকালে, ইংলণ্ডের রাজা প্রথম জেমস্, স্যার টমাস্ রো নামক একজন দূতকে তাঁহার দরবারে প্রেরণ করেন। রো সম্রাটের নিকট হইতে বাণিজ্যবিষয়ক অনেক সুবিধা লাভ করেন। তাঁহার লিখিত বিবরণ হইতে জহাঙ্গীরের রাজত্বকালের অনেক কথা জানা যায়। কিন্তু মুঘল সম্রাটগণ কূট রাষ্ট্রনীতিতে সুদক্ষ পাশ্চাত্য জাতিদের সঙ্গে চরম শক্তি পরীক্ষার কথা কল্পনাও করেন নাই এবং সেই অনুসারে স্থলসৈন্য উন্নতির ও নৌশক্তি বাড়াইবাব এপর্য্যন্ত কোন চেষ্টাই করেন নাই।

জহাঙ্গীরের চরিত্র

জহাঙ্গীরের চরিত্রে দোষ ও গুণ দুইই দেখা যায়। সময় বিশেষে তিনি অত্যন্ত খামখেয়ালীর এবং নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিয়াছেন। আবার, কখনও বা তাঁহার অন্তরে করুণার প্লাবন বহিতে দেখা গিয়াছে। জহাঙ্গীরেব 'আত্মকথায' তাঁহার সাহিত্য-প্রতিভা ও শিল্পানুরাগের যথেষ্ট পবিচয় পাওয়া যায়। এই 'আত্মকথা' হইতে আমরা তাঁহার ন্যায়ানুরাগেব কথাও জানিতে পাবি। বাদশাহ হইয়া ন্যায়বিচাবের জন্য তিনি এক নূতন উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। সম্রাটের দরবারে এক বিরাট লৌহশৃঙ্খলে ৬০টি ঘণ্টা বাঁধিয়া রাখা হইয়াছিল। রাজ্যের দীনতম প্রজাও এই ঘণ্টা বাজাইয়া বাদশাহের নিকট তাহার অভিযোগ জানাইতে পারিত। অনেক অন্যায় কব ও শুল্ক রহিত করিয়া তিনি প্রজাদের নিকট দয়ালু ও ন্যায়নিষ্ঠ বলিয়া সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন। পিতার ন্যায় জহাঙ্গীরের পরধর্ম্মমতসহিষ্ণুতা ছিল। হকিন্ নামে এক ইংরাজের বিবরণ হইতে জানা যায় যে, তিনি প্রত্যহ প্রাতঃকালে পশ্চিমদিকে (মক্কার) মুখ করিয়া মালা জপিতেন এবং সেই ঘরেই মেরীমাতা ও যীশুখৃষ্টের প্রস্তর-ক্ষোদিত মূর্ত্তি বিরাজ করিত। তিনি খৃষ্টান মিসনারীদের সহিত এমন সমধর্ম্মীর মত ব্যবহার করিতেন যে, গোঁড়া মুসলমানরা তাঁহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইতেন। রো সাহেব এক স্থানে বলিয়াছেন যে, জহাঙ্গীর ভস্মলিপ্ত এক হিন্দু সন্ন্যাসীর উচ্ছিষ্ট প্রসাদও একদিন গ্রহণ করিয়াছিলেন। অদ্ভুত ছিল তাঁহার ধর্ম্ম আবেগ। কিন্তু তাঁহার চরিত্রের প্রধান দুর্ব্বলতা ছিল মদ্যপান

ও অহিফেন সেবন; উহার ফলে তিনি দুর্ব্বল ও অলস হইয়া পড়িয়াছিলেন। অন্যদিকে তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুণ ছিল শিল্পানুরাগ ও কবিজনোচিত মনোভাব। নূরজহানের পিতা ইতিমাদুদ্দৌল্লাহ সমাধিভবন মুঘল-স্থাপত্যের একটি বিশিষ্ট নিদর্শন। কিন্তু স্থাপত্য অপেক্ষা চিত্রকলার বিকাশের জন্যই জহাঙ্গীরের রাজত্বকাল অধিকতর প্রসিদ্ধ। এই সময়েই 'মুঘল চিত্রকলা' গৌরবের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিয়াছিল। তিনি নিজেও একজন সুদক্ষ চিত্রশিল্পী ও সমজদার ছিলেন।

সিংহাসন লাভ

শাহজহান (১৬২৭—৫৮)।—জহাঙ্গীরের মৃত্যুকালে শাহ্‌জহান ছিলেন সুদূর দাক্ষিণাত্যে। পিতার মৃত্যুর পর তিনি শ্বশুর আসফ খাঁ এবং সেনাপতি মহাবৎ খাঁর সাহায্যে সহজেই সিংহাসন দখল করিলেন এবং ভবিষ্যতে যাহাতে আর কেহ সিংহাসন দাবী করিতে না পারে সেজন্য ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্র প্রভৃতি অন্যান্য দাবিদারগণকে হত্যা করাইলেন। নূরজাহানের সকল ক্ষমতারই অবসান হইল। অবশ্য শাহ্‌জহান তাঁহার ভরণ-পোষণের জন্য উপযুক্ত সম্পত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দিলেন। ইহার পরে নূরজহান আরও ২০ বৎসর জীবিত ছিলেন। মৃত্যুর পরে জহাঙ্গীরের পার্শ্বে লাহোরে তাঁহাকে সমাহিত করা হয়।

ঝুঝর সিংএর বিদ্রোহ.

কিন্তু সিংহাসনে বসিয়াও শত্রুর উপদ্রবের হাত হইতে শাহ্‌জহান একেবারে নিষ্কৃতি পাইলেন না; ঝুঝর সিং নামে একজন বুন্দেলা সামন্ত বুন্দেলখণ্ডে বিদ্রোহ করিলে (১৬২৮ ও ১৬৩৫) তাঁহাকে দমন করা হয়। ইহার পর খাঁ জহান লোদী নামে জনৈক পাঠান ওম্‌রাহ আহ্‌মদনগরের সুলতানের সহিত মৈত্রী স্থাপন করিয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন (১৬২৯); তিনি পূর্ব্বে দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। শীঘ্রই পরাজিত হইয়া তাঁহাকেও বশ্যতা স্বীকার করিতে হইল। পরে আবার বিদ্রোহ করিলে এক যুদ্ধে তিনি পরাজিত ও নিহত হন (১৬৩১)।

খাঁ জহান লোদীর বিদ্রোহ

পর্ত্তুগীজদের অত্যাচার

এই সময় পর্ত্তুগীজ বণিকরা প্রভূত শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। ক্রমে ক্রমে চৌল, গোয়া, চট্টগ্রাম, হুগলী, প্রভৃতি বন্দরে তাহারা নিজেদের আধিপত্য স্থাপন করে। তাহাদের অত্যাচারে এই সকল বন্দর ও পার্শ্ববর্ত্তী স্থান প্রায় বিনষ্ট হইবার

উপক্রম হয়। ১৪৯৮ সালে এদেশে আসিয়া তাহারা বাণিজ্যের নামে করিত দস্যুবৃত্তি ; তার উপর ছিল তাহাদের বর্ব্বরোচিত ধর্ম্মান্ধতা এবং ততোধিক নীচ পশুপ্রবৃত্তি। তাহারা হিন্দু মুসলমান, পুরুষ নারী সকলের উপরেই অমানুষিক অত্যাচার করিত, দেবদেবীর মূর্ত্তি ভাঙ্গিত, মুস্‌লিম তীর্থ-যাত্রীদের জাহাজ লুঠ করিত, ভারতীয় বাণিজ্যতরী অধিকার করিয়া লইত। যে সকল বন্দরের উপর তাহাদের কর্ত্তৃত্ব ছিল সে সকল স্থানে জোর করিয়া শুল্ক আদায়

ময়ূরাসনে শাহ্‌জহান (সমসাময়িক চিত্র হইতে)

করিত, অতর্কিতে নরনারী, বালকবালিকাকে বন্দী করিয়া দাস-দাসীরূপে বিক্রয় করিত এবং জোর করিয়া খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিত।

বাঙালীর নৌবল

হিন্দু-মুসলমান নির্ব্বিশেষে বঙ্গোপসাগরে বাঙ্গালীরা যে পর্ত্তুগীজ বর্ব্বরতার বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া সংগ্রাম করিবে ইহা সহজেই বুঝা যায়। বঙ্গোপসাগর তখন ছিল বাঙ্গালী নাবিক ও বণিকদের লীলাক্ষেত্র। ১৬টি বাঙ্গালী রণপোত (ঘড়াল) সুদূর মালদ্বীপে অভিযান করিয়া নৌযুদ্ধের নৈপুণ্য দেখাইয়াছিল। বিক্রমপুরের নৌযুদ্ধকুশল এক জমিদার আরকানিদের সঙ্গে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া মুঘল বাহিনীকে প্রতিহত করিয়াছিলেন। যশোহরের প্রতাপাদিত্য মুঘল কর্ত্তৃক পরাজিত হইলেও উক্ত বিক্রমপুর ভুঁইয়াদেরই সমপর্য্যায়ভুক্ত। সম্রাট শাহ্‌জহান বাঙ্গালী জাতিব এই নৌযুদ্ধ-কুশলতাব রাষ্ট্রীয় উপযোগীতা ভাল করিয়া বুঝিতে না পারিলেও, পর্ত্তগীজদের সহিত জলযুদ্ধে একবাব জয়ী হইয়াছিলেন বাঙ্গালী নাবিকদেরই বীরত্বের ফলে। তাহারাই মুঘল সাম্রাজ্যের পূর্ব্বসীমান্ত বিশেষতঃ উপকূল বিভাগ নৌবলে রক্ষা করিয়া আসিতেছিল। একবার প্রায় ৪০০০ বাঙ্গালী ঘড়ালী নাবিক পর্ত্তুগীজ নৌবাহিনী পরিত্যাগ কবিয়া বাদশাহের দলে যোগদান করিয়া পর্ত্তুগীজদের সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করে। নানাবিধ অত্যাচারে ক্ষুব্ধ হইয়া শাহ্‌জহান একবার পর্ত্তুগীজ মাত্রকেই বন্দী করিতে এবং ভারতবর্ষে খৃষ্টধর্ম্মের অনুষ্ঠান বন্ধ করিবার আদেশ দিয়াছিলেন। ক্যাথলিক পর্ত্তুগীজদের প্রতিপত্তি বিনষ্ট করিবার জন্য তিনি প্রটেষ্টান্ট্ ওলন্দাজ বা ডাচ্‌দের সহিত একবার সন্ধিও করিয়াছিলেন। তথাপি তাহাদের অত্যাচার নিবারিত হয় নাই। একবার তাহারা সম্রাজ্ঞী মমতাজমহলের দুইজন বাঁদীকে বন্দী করিল। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া শাহ্‌জহান বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা কাশিম খাঁকে হুগলী আক্রমণের আদেশ দিলেন (১৬৩১)। কাশিম খাঁ হুগলী অধিকার করিয়া প্রায় ৪০০০ বন্দীকে আগ্রায় পাঠাইয়া দিলেন (১৬৩২)। শাহ্‌জাহানও প্রতিশোধার্থে তাহাদের হয় ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ নতুবা মৃত্যু বরণ করিতে আদেশ দেন। অধিকাংশ পর্ত্তুগীজ মৃত্যুবরণই শ্রেয় বিবেচনা করিয়াছিল। সাময়িক ভাবে শাহ্‌জাহান পাশ্চাত্য নৌশক্তিকে প্রতিহত করিলেও তাহাদের আসল শক্তি যে কোথায় এবং কতখানি সে বিষয়ে শাহ্‌জাহান অথবা তাঁহার বংশধরগণ মোটেই

শাহ্‌জহানের আদেশে হুগলী অধিকার ও পর্ত্তুগীজ অত্যাচার নিরোধ

অনুসন্ধান করেন নাই। রাষ্ট্রনায়কদের এই অদূরদর্শিতার ফলেই এই বিশালদেশ পাশ্চাত্য বণিকদের পদানত হইল। দুর্ভাগ্যক্রমে ভারতবর্ষের প্রধান দুর্ব্বলতা যে সাম্রাজ্যের নৌ-শক্তির অভাব, সেই উপযুক্ত নৌ-বহর গঠন করিয়া পাশ্চাত্য জাতিদের প্রতিরোধের কোন চেষ্টা করা হইল না।

কান্দাহার পুনরুদ্ধার (১৬৩৮)

হুমায়ূনের সময় হইতেই কান্দাহারের অধিকার লইয়া দিল্লীর সম্রাট ও পারস্যরাজের মধ্যে বরাবর দ্বন্দ্ব চলিয়া আসিতেছিল। ১৬৩৮ খৃঃ অব্দে আলী মর্দ্দান খাঁ নামে পারস্যরাজের জনৈক কর্ম্মচারী বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া ইহা শাহ্‌জহানের হস্তে সমর্পণ করেন। পিতৃপুরুষদের প্রাচীন রাজ্যজয়ের জন্যও তিনি বিশেষ উদ্যোগী হইয়া উঠিলেন। সম্রাটের চতুর্থ পুত্র মুরাদ বক্স ও আলি মর্দ্দান বল্‌খ্‌ ও বদখ্‌সান অধিকার করিলেন। কিন্তু দূরতম প্রদেশে এই অধিকার এক বৎসরের বেশী স্থায়ী হয় নাই।

বল্‌খ্‌ ও বদখ্‌সান হস্তচ্যুত

এদিকে কান্দাহারও কয়েক বৎসর পরে বাদশাহের হস্তচ্যুত হইয়া গেল (১৬৪৯)। শাহ্‌জহান তিন তিনবার উহার পুনরুদ্ধার সাধনের চেষ্টা করিয়া বিফলমনোরথ হন।

দাক্ষিণাত্যে অভিযান

আহ্‌মদনগর জয় (১৬৩৩)

আকবর ও জহাঙ্গীরের রাজত্বকালে আহ্‌মদনগর রাজ্যের কিছু অংশ মুঘল সাম্রাজ্যের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। শাহ্‌জহান পিতা ও পিতামহের আরব্ধ কার্য্য সম্পূর্ণ করিবার অভিপ্রায়ে সমগ্র আহ্‌মদনগর রাজ্যটি অধিকার করিলেন (১৬৩৩)। তারপর বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা রাজ্য দু'টির উপর আপনার আধিপত্য বিস্তারে উদ্যোগী হইয়া শাহ্‌জহান নিজেই দাক্ষিণাত্যে গমন করিলেন।

গোলকুণ্ডার বশ্যতা স্বীকার

গোলকুণ্ডার সুলতান বাদশাহকে অবজ্ঞা করিতে সাহসী না হইয়া অবিলম্বে বাদশাহের আনুগত্য স্বীকার করিলেন এবং বাৎসরিক করদানে সম্মত হইলেন।

বিজাপুরের সহিত সন্ধি (১৬৩৬)

বিজাপুরের সহিত যুদ্ধে শাহ্‌জহানের জয় হইল। বিজাপুর-রাজ বশ্যতা স্বীকার করিয়া সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন। বিজিত আহ্‌মদনগর রাজ্যের এক ক্ষুদ্র অংশ তিনি বাদশাহের উপহার স্বরূপ লাভ করিলেন। এইভাবে দক্ষিণাপথে মুঘল প্রাধান্য স্থাপিত হইল (১৬৩৬)।

ঔরঙ্গজীব দাক্ষিণাত্যের

শাহ্‌জহান তাঁহার তৃতীয় পুত্র ঔরঙ্গজীবকে দাক্ষিণাত্যের রাজ-

প্রতিনিধি নিযুক্ত করিলেন। ঔরঙ্গজীব প্রথমবার একাদিক্রমে প্রায় আট বৎসর কাল দাক্ষিণাত্য শাসন করেন।

সুবাদার নিযুক্ত (১৬৩৬-৪৪)

বহুকাল যাবৎ দাক্ষিণাত্যের শাসনকার্য্যে নানারূপ গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলা চলিতেছিল। খান্দেশ, বেরার, তেলিঙ্গানা ও আহ্‌মদনগর এই চারিটি প্রদেশ হইতে যে রাজস্ব আদায় হইত তাহার দ্বারা প্রাদেশিক শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করাও দুরূহ হইয়া উঠিয়াছিল। ১৬৫৩ খৃষ্টাব্দে ঔরঙ্গজীবকে পুনরায় দাক্ষিণাত্যের সুবাদার নিযুক্ত করা হইলে তিনি প্রথমেই রাজস্ব-বিভাগে শৃঙ্খলা স্থাপনের ব্যবস্থা করিলেন; এই কার্য্যে তাঁহার প্রধান সহায় ছিলেন মুর্শিদকুলী খাঁ। ঔরঙ্গজীবের সঙ্গে তিনি দাক্ষিণাত্যের একজন দেওয়ানরূপে তথায় আসেন এবং ১৬৫৬ খৃঃ অব্দে সমগ্র সুবার দেওয়ান পদে উন্নীত হন। মুর্শিদকুলী খাঁ তোড়রমলের দৃষ্টান্তে সমগ্র সুবা জরিপ

ঔরঙ্গজীব দ্বিতীয়বার দাক্ষিণাত্যের সুবাদার নিযুক্ত (১৬৫৩)

মুর্শিদকুলী খাঁ। রাজস্ব-ব্যবস্থার সংস্কার
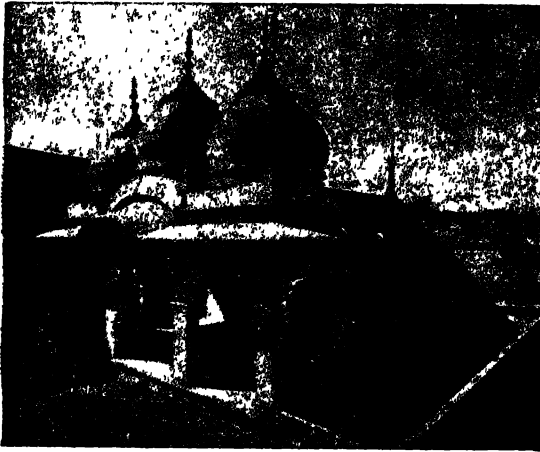
আগ্রার প্রাসাদ দুর্গে শাহ্‌জহানের মোতি মস্‌জিদ

করিয়া রাজস্বের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। কৃষকদিগকে *সরকারী ঋণ দিয়া সাহায্য করায় দুই বৎসরের মধ্যে কৃষির অবস্থা* ফিরিয়া গেল।

রাজস্ব সম্বন্ধে বিধিব্যবস্থা স্থির করার পর ঔরঙ্গজীব রাজ্য-

গোলকুণ্ডা আক্রমণের উদ্যোগ, মীরজুম্‌লার সহায়তা লাভ

বিস্তারে উদ্যোগী হইলেন। গোলকুণ্ডার সুলতান তাঁহার প্রতিশ্রুত কর প্রদান করেন নাই, এই অজুহাতে তিনি গোলকুণ্ডা আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলেন। এদিকে দৈবক্রমে গোলকুণ্ডার প্রধান মন্ত্রী মীরজুম্‌লা ঔরঙ্গজীবের পক্ষে যোগ দিলেন। মীরজুম্‌লার প্রকৃত নাম ছিল মুহম্মদ সৈদ; পারস্য হইতে ভারতবর্ষে আসিয়া তিনি জহরতের ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছিলেন। গোলকুণ্ডার সুলতান আবদুল্লা কুতব্‌ শাহ তাঁহার বুদ্ধিমত্তা দর্শনে
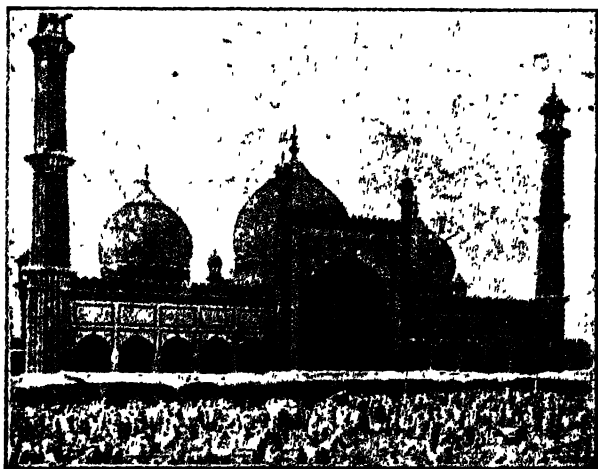
শাহ্‌জহানের জাম-ই-মস্‌জিদ (দিল্লী)

মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে প্রধান মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করেন। মীরজুম্‌লা চন্দ্রগিরির রাজাকে (বিজয়নগর রাজবংশের উত্তরাধিকারী) পরাস্ত করিয়া কর্ণাটদেশে আপন প্রভুত্ব স্থাপন করেন। প্রধান মন্ত্রীর এরূপ ক্ষমতাবৃদ্ধি সুলতান কুতব্‌ শাহ প্রীতির চক্ষে দেখিতে পারেন নাই। গোলকুণ্ডার সুলতান, মীরজুম্‌লার পুত্রকে ঔদ্ধত্যের অপরাধে বন্দী করায়, মীরজুম্‌লা ঔরঙ্গজীবের শরণাপন্ন হইলে তিনি তাঁহার পক্ষাবলম্বন করিয়া অতর্কিতে গোলকুণ্ডা আক্রমণ করিলেন। কিন্তু সম্রাট্‌ শাহ্‌জহান যুদ্ধের বিরুদ্ধে ছিলেন।

সুতরাং বাধ্য হইয়া ঔরঙ্গজীবকে গোলকুণ্ডার সুলতানের সহিত সন্ধি স্থাপন করিতে হয় (১৬৫৬)। তবে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ তাঁহার নিকট হইতে রামগির জেলা এবং প্রচুর অর্থ আদায় করা হইল। এই বৎসরেই মন্ত্রী সাদুল্লা খাঁর মৃত্যুতে মীরজুম্‌লা বাদশাহের মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত হন।

গোলকুণ্ডার সহিত সন্ধি (১৬৫৬), মীরজুম্‌লার মন্ত্রিত্ব লাভ

কিন্তু কেবল গোলকুণ্ডার উপরেই ঔরঙ্গজীবের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল না, তিনি বিজাপুর রাজ্যও মুঘল সম্রাজ্যভুক্ত করিতে চাহিয়াছিলেন। ১৬৫৬ খৃঃ অব্দে তিনি মীরজুম্‌লার সহায়তায় বিজাপুর আক্রমণ করিলেন। কিন্তু এক্ষেত্রেও সম্রাটের আদেশে ঔরঙ্গজীবকে বিজাপুরের সহিত সন্ধি করিতে হইল (১৬৫৭)। যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ বিজাপুর রাজ্যের কিয়দংশ মুঘলদের অধিকারভুক্ত হইল। গোলকুণ্ডা ও বিজাপুর জয় করিতে পারিলে ঔরঙ্গজীব অত্যন্ত শক্তিশালী হইয়া উঠিবেন, সম্ভবতঃ এই আশঙ্কায় শাহ্‌জহান, জ্যেষ্ঠ-পুত্র দারা ও কন্যা জহানারার পরামর্শে, ঔরঙ্গজীবকে বাধা দিয়াছিলেন।

বিজাপুর জয় ও সন্ধিস্থাপন (১৬৫৭)

এই ঘটনার অনতিকাল পরেই সম্রাট্ শাহ্‌জহান কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইলেন (সেপ্টেম্বর ১৬৫৭)। অবিলম্বে তাঁহার পুত্রদের মধ্যে সিংহাসন লইয়া কাড়াকাড়ি পড়িয়া গেল। ঔরঙ্গজীবও দাক্ষিণাত্য ছাড়িয়া রাজধানীর দিকে অগ্রসর হইলেন।

শাহজহানের পীড়া ও পুত্রদের বিরোধ

শাহ্‌জহানের চারি পুত্রের মধ্যে দারা শিকো ছিলেন সর্ব্বজ্যেষ্ঠ। তাঁহাকে সম্রাট সর্ব্বাপেক্ষা ভালবাসিতেন এবং তাঁহার সহায়তায় রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেন। দারা ছিলেন বিদ্যোৎসাহী ও অত্যন্ত উদার। বিশেষ করিয়া হিন্দু-মুস্‌লিম ভাববিনিময়ের জন্য তিনি উপনিষদের পারসিক অনুবাদ 'ওপ্‌নিখৎ' প্রকাশ করিয়াছিলেন। ধর্ম্মবিষয়ে তিনি আকবরের ন্যায় উদার মত পোষণ করিতেন। খৃষ্টধর্ম্মের প্রতি তাঁহার পক্ষপাতিত্বের জন্য গোঁড়া মুসলমানগণ তাঁহাকে মোটেই পছন্দ করিতেন না। শাহ্‌জহানের দ্বিতীয় পুত্র সুজা ছিলেন বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তা। সাহসী ও রণকুশল হইলেও তিনি ছিলেন আরামপ্রিয় ও বিলাসী। ইহাই পরবর্ত্তীকালে তাঁহার পতনের প্রধান কারণ হইয়াছিল। তদুপরি শিয়া শ্রেণীভুক্ত ছিলেন বলিয়া তিনি গোঁড়া মুসলমানদের বিরাগভাজন ছিলেন।

দারা শিকো

সুজা

ঔরঙ্গজীব

তৃতীয় পুত্র ঔরঙ্গজীব ছিলেন ভ্রাতাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান, চতুর ও কর্ম্মকুশল। তিনি ছিলেন নিষ্ঠাবান সুন্নি মুসলমান। এই কারণে এবং তাঁহার প্রবল স্বধর্ম্মানুরাগ ও পরধর্ম্মবিদ্বেষের জন্য গোঁড়া মুসলমান সম্প্রদায় ঔরঙ্গজীবের উপব অত্যন্ত প্রীত ছিল। শাহ্ জহানের কনিষ্ঠ পুত্র মুরাদ বক্স শৌর্য্যবীর্য্যে সুখ্যাতি অর্জ্জন করিলেও, নির্ব্বোধ, ধর্ম্মসম্বন্ধে উদাসীন, মদ্যপায়ী ও উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির ছিলেন। এই ভ্রাতৃকলহের মধ্যে শাহ্ জহানের দুই কন্যা জহানারা এবং রোশনারা বিশেষ অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। জহানারা ছিলেন সম্রাটের জ্যেষ্ঠা কন্যা, দারার অগ্রজা; তিনি দারার পক্ষ সমর্থন করিতেন। আর রোশনারার ছিল ঔরঙ্গজীবের প্রতি পক্ষপাতিত্ব। ভ্রাতা-ভগ্নীরা সকলেই ছিলেন সম্রাজ্ঞী মমতাজের সন্তান, তবুও সিংহাসনের জন্য তাঁহারা পরস্পরের উচ্ছেদের চেষ্টায় কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করেন নাই।

মুরাদ

জহানারা ও রোশনারা

দেওযান-ই-খাসের অভ্যন্তর

সৌভাগ্যক্রমে এই মর্ম্মন্তুদ ব্যাপার আরম্ভ হইবার বহুকাল পূর্ব্বেই ভাগ্যবতী মমতাজমহল মৃত্যুর ক্রোড়ে আশ্রয়লাভ করিয়াছিলেন (১৬৩১)।

জ্যেষ্ঠপুত্র দারার প্রতি সম্রাটের আকর্ষণ চিরকালই তাঁহার অন্যান্য ভ্রাতাদের চক্ষুশূল ছিল; শাহ্‌জহান তাঁহাকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী স্থির করিয়াছিলেন। শাহ্‌জহানের পীড়ার সময় দারা আগ্রায় পিতার পার্শ্বেই ছিলেন। কিন্তু তাঁহার ভ্রাতাদের সন্দেহ হইল, সিংহাসনের লোভে দারা পিতার মৃত্যুসংবাদ গোপন করিয়াছেন। সুতরাং প্রত্যেকেই নিজেকে সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিলেন। সুজা রাজমহলে নিজেকে বাদশাহ ঘোষণা করিয়া আগ্রার দিকে অগ্রসর হইলেন। মুরাদ আহ্‌মদাবাদে নিজেকে সম্রাট ঘোষণা করিয়া রাজ্য ভাগাভাগি করিবার সর্তে মালবে আসিয়া ঔরঙ্গজীবের সহিত মিলিত হইলেন। ইতিমধ্যে শাহ্‌জহান

সুজার বিদ্রোহ, মুরাদ ও ঔরঙ্গজীবের মৈত্রী

তাজমহল—আগ্রা

সুস্থ হইয়া বিদ্রোহ দমনের ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন। সুজাকে দমন করিবার জন্য দারার জ্যেষ্ঠপুত্র সুলেমান শিকোকে এবং ঔরঙ্গজীব ও মুরাদের বিরুদ্ধে কাশিম খাঁ ও যশোবন্ত সিংহকে প্রেরণ করা হইল। কিন্তু উজ্জয়িনীর নিকট ধর্ম্মাট নামক স্থানে সম্রাটের সৈন্যদলকে পরাভূত করিয়া ঔরঙ্গজীব ও মুরাদ আগ্রার দিকে অগ্রসর হইলেন (১৫ই এপ্রিল, ১৬৫৮)। তখন আগ্রার অনতিদূরে সামুগড় নামক স্থানে দারা নিজে বিদ্রোহী বাহিনীর

গতিরোধ করিয়া দাঁড়াইলেন; কিন্তু তাঁহার পরাজয় হইল (২৯শে মে, ১৬৫৮)। ঔরঙ্গজীব ও মুরাদ বিজয়গৌরবে আগ্রায় প্রবেশ করিয়া আগ্রার প্রাসাদ-দুর্গ অবরোধ করিলেন এবং কয়েকদিনের মধ্যেই দুর্গ হস্তগত করিয়া ঔরঙ্গজীব পিতাকে বন্দী করিলেন (৮ই জুন, ১৬৫৮)। অতঃপর তিনি কৌশলে মুরাদকে বন্দী করিয়া গোয়ালিয়র দুর্গে প্রেরণ করিলেন। তিন বৎসর পরে মিথ্যা অভিযোগে তাঁহার প্রাণদণ্ড হইল (১৬৬১)।

শাহজহান বন্দী (১৬৫৮)

মুরাদের বিচার ও মৃত্যু (১৬৬১)

সুলেমানের হস্তে সুজার পরাজয় (১৬৫৮)

এদিকে সুলেমান কাশীর নিকট বাহাদুরপুর নামক স্থানে সুজাকে পরাজিত করেন (ফেব্রুয়ারী, ১৬৫৮); কিন্তু পিতার সাহায্যে অগ্রসর হইবার পূর্ব্বেই সামুগড়ে ঔরঙ্গজীব ও মুরাদের হস্তে পরাভূত হইয়া দারাকে পলায়ন করিতে হইল। ঔরঙ্গজীব দারার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া দিল্লী ও লাহোর হইয়া মূলতান পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। এই সুযোগে সুজা পুনরায় সৈন্য সংগ্রহ করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তখন ঔরঙ্গজীব ফিরিয়া আসিয়া খাজুয়া নামক স্থানে সুজাকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিলেন (৭ই জানুয়ারী, ১৬৫৯)। মীরজুম্‌লার উপর তাঁহার পশ্চাদ্ধাবনের ভার পড়িল। সুজা বঙ্গদেশে প্রবেশ করিয়া প্রথমে ঢাকায় আশ্রয় লইলেন। সেখান হইতে তিনি আরাকান নৌবলের সাহায্যে আবাকানের দিকে পলায়ন করিলেন (মে, ১৬৬০)। সম্ভবতঃ আরাকানীদের হাতে তিনি সপরিবারে নিহত হন। ঔরঙ্গজীবের জ্যেষ্ঠ পুত্র মুহম্মদ সুলতানের সহিত সুজার কন্যার বিবাহ হইয়াছিল। মুহম্মদ সুজার পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। এই অবিমৃষ্যকারিতার জন্য মুহম্মদকে আজীবন কারাগারে বন্দী করিয়া রাখা হয়।

ঔরঙ্গজীবের হস্তে সুজার পরাজয় (১৬৫৯)

সুজার দুর্ভাগ্য

যুবরাজ মুহম্মদ

ঔরঙ্গজীবের সাফল্যে প্রমাদ গণিয়া সুলেমান শিকোর সৈন্যেরা একে একে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে লাগিল। তখন নিরুপায় হইয়া তিনি গাড়োয়াল রাজ্যে গিয়া আশ্রয় লইলেন (১৬৫৮)। দুই বৎসর পরে তিনি ঔরঙ্গজীব কর্ত্তৃক বন্দী হইয়া প্রাণ হারাইলেন।

সুলেমান শিকো

এদিকে দারা মূলতান ও সিন্ধুদেশ অতিক্রম করিয়া গুজরাটে গিয়া উপস্থিত হইলেন। গুজরাটের শাসনকর্ত্তা শাহ নওয়াজ খাঁ তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিলেন। কিছু সৈন্য সংগ্রহ করিয়া তিনি

আজমীড়ের দিকে অগ্রসর হইলেন এবং আজমীড়ের দক্ষিণে দেওরাই গিরিবর্ত্মে তিনদিন ব্যাপী ভীষণ যুদ্ধের পর পরাজিত হইলেন (এপ্রিল, ১৬৫৯)। পরাভূত দারা তখন পারস্যে আশ্রয় ভিক্ষার অভিপ্রায়ে সীমান্তের দিকে অগ্রসর হইয়া মালিক জীভন নামে জনৈক আফগান সর্দ্দারের আশ্রয় গ্রহণ করিলে, জীভন বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া তাঁহাকে ঔরঙ্গজীবের হস্তে সমর্পণ করিলেন। ঔরঙ্গজীব বন্দী দারাকে ভিখারীর বেশে হাতীর পিঠে চড়াইয়া দিল্লীর পথে পথে সকলকে দেখাইয়া বেড়াইবার আদেশ দিলেন। তারপর ধর্ম্মবিদ্বেষের মিথ্যা অভিযোগে দারার প্রাণদণ্ড হইল(১৬৫৯)।

দেওরাই এর যুদ্ধে দারার পরাজয় (১৬৫৯

দারার প্রাণদণ্ড (১৬৫৯)

সিপার শিকো

দারা ও তাঁহার কনিষ্ঠপুত্র সিপারকে একই সঙ্গে বন্দী করা হইয়াছিল। সিপার তখন বালক মাত্র। বহুকাল বন্দী রাখিয়া সিপারকে মুক্তিদান করা হয় এবং ঔরঙ্গজীব নিজের তৃতীয়া কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ দেন। মুরাদের পুত্র ইজিদ্ বক্সকেও মুক্তি দান করিয়া তিনি নিজ পঞ্চম কন্যার সহিত বিবাহ দেন।

আবজুমন্দ বানু বেগম মমতাজ

ইজিদ্ বখশ

এদিকে সিংহাসনচ্যুত বৃদ্ধ সম্রাট শাহ্ জহান আগ্রার প্রাসাদ-দুর্গে বন্দী জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। ঔরঙ্গজীব পিতার পরিচর্য্যার জন্য জ্যেষ্ঠা ভগ্নী জহানারাকে অনুমতি দিয়াছিলেন। জহানারার পিতৃভক্তি ও কবিত্বশক্তি চিরস্মরণীয়। সম্রাট-নন্দিনী তাঁহার কবরের উপর কোন স্মৃতি-সৌধ নির্ম্মাণ

করিতে দেন নাই; তাঁহার আদেশে, সাধারণ মানুষের কবরের মত, তাঁহার কবরের উপর শুধু সবুজ ঘাস ও উদার আকাশ ছিল। শুনিতে পাওয়া যায় এক হিন্দুরাজার পবিত্র স্মৃতি বুকে বহন করিয়াই তিনি আমরণ কুমারী থাকেন। দুঃখ, শোক এবং অপমানে শাহ্‌জহানের সুদীর্ঘ অন্তিম জীবন দুর্ব্বিষহ হইয়া উঠিল। এইরূপে প্রায় আট বৎসর বন্দিশালায় কাটাইয়া ৭৪ বৎসর বয়সে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন (২২শে জানুয়ারী, ১৬৬৬)। বন্দী হইবার (৮ই জুন ১৬৫৮) পর হইতে পিতাপুত্রে আর কখনও সাক্ষাৎ হয় নাই।

শাহজহানের শেষ জীবন ও মৃত্যু (১৬৬৬)

পূর্ব্বতন ঐতিহাসিকগণ শাহ্‌জহানের চরিত্র সম্বন্ধে যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। সম্রাটের অতুল ঐশ্বর্য্য, আড়ম্বর, শিল্পানুরাগ বিশেষতঃ তৎনির্ম্মিত তাজমহলের অনুপম সৌন্দর্য্য তাঁহার চরিত্রের ত্রুটিগুলিকে প্রায় সম্পূর্ণরূপে ঢাকিয়া দিয়াছে। কিন্তু আমরা তাজমহলের অতুলনীয় সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া শাহ্-জহানকে যেরূপ মহৎ বলিয়া ভাবিতে শিখিয়াছি, ব্যক্তিগত জীবনে কিম্বা কর্ম্মক্ষেত্রে তিনি ঠিক সেরূপ ছিলেন না। পুত্র হিসাবে শাহজহান পিতার অন্তরে অন্যায় আঘাত করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। রাজনীতিক হিসাবে শাহ্‌জহান ছিলেন মধ্যম শ্রেণীর। কয়েকটি যুদ্ধে জয়লাভ করিলেও, তিনবার তাঁহার কান্দাহার উদ্ধারের চেষ্টা নিষ্ফল হইয়া যায়। বল্‌খ ও বদখ্‌সানেও তিনি কর্ত্তৃত্ব রক্ষা করিতে পারেন নাই। নিজে রাজপুত নারীর পুত্র হইয়াও ধর্ম্মবিষয়ে শাহ্‌জহান হিন্দু-বিদ্বেষী ছিলেন; কাশীতে তিনি ৭৬টি হিন্দু মন্দির ধ্বংস করিয়াছিলেন। হুগলীর খৃষ্টানদেরও তিনি বিধর্ম্মী বলিয়াই যথেচ্ছ উৎপীড়ন করিতে সঙ্কুচিত হন নাই।

শাহজহানের চরিত্র ও কৃতিত্ব

রাজনীতি জয়-পরাজয়

ধর্ম্মবিদ্বেষ

শাহ্‌জহানের চরিত্রের সর্ব্বপ্রধান গুণ তাঁহার পত্নী-প্রেম। ১৬১২ খৃঃ অব্দে বিশ বৎসর বয়সে তিনি নূরজহানের ভ্রাতা আসফ খাঁর কন্যা কুমারী আর্‌জুমন্দ বানু বেগমের পাণিগ্রহণ করেন। অপরূপ সুন্দরী আর্‌জুমন্দের উপাধি ছিল "মমতাজমহল" (প্রাসাদালঙ্কার)। কিন্তু তাঁর ক্ষমতা রাজপ্রাসাদের বাহিরে রাজ্য-শাসন কর্ম্মেও নিবদ্ধ ছিল। নূরজহানের মত তিনিও নিজনাম-স্বাক্ষরে রাজকীয় ফর্মান বাহির করিতেন। ১৬৩১ খৃঃ অব্দে মাত্র

পত্নী-প্রেম

৩৮ বৎসর বয়সে বুরহানপুরে মমতাজের মৃত্যু হয়। প্রথমে সেখানে তাঁহাকে সমাহিত করা হইয়াছিল; তারপর তাঁহার দেহাবশেষ আগ্রায় আনিয়া (১৬৩২) তাঁহার সমাধির উপর শাহ্‌জহান তাজমহল নামে যে স্মৃতিসৌধ নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন তাহা স্থাপত্য-শিল্পের এক অনুপম নিদর্শন। ১৬৩২ হইতে ১৬৫৩ খৃঃ অব্দ অবধি দীর্ঘ ২১ বৎসর ইহার নির্ম্মাণ-কার্য্যে ব্যয়িত হইয়াছিল। এই অপূর্ব্ব স্মৃতিসৌধ নির্ম্মাণের কার্য্যে মুকর্‌রমৎ খাঁ ও মীর আবদুল করিম নামক দুইজন শিল্পী অধ্যক্ষের কাজ করিয়াছিলেন।

তাজমহল

আগ্রার মোতি মস্‌জিদ শাহ্‌জহানের আর এক কীর্ত্তি। দিল্লীতে তিনি "শাহ্‌জহানাবাদ" নামে এক নগর স্থাপন করেন। বিখ্যাত দেওয়ান-ই-খাস ও দেওয়ান ই-আম এবং জাম-ই-মস্‌জিদ সেখানেই অবস্থিত। এগুলি 'হিন্দু-পারসিক' স্থাপত্যশিল্পের চরম উৎকর্ষের নিদর্শন। শাহ্‌জহানের আর এক অদ্ভুত কীর্ত্তি ছিল তাঁহার বিশ্ববিখ্যাত "ময়ূরাসন"। ইহা ছিল দৈর্ঘ্যে ৬ ফুট ও প্রস্থে ৪ ফুট, সিংহাসনখানি আগাগোড়া পেটানো সোনায় তৈয়ারী ছিল; সিংহাসনের মিনা করা চন্দ্রাতপখানি ছিল হীরা ও মরকত-মণি-খচিত দ্বাদশটি স্তম্ভের উপর স্থাপিত; প্রত্যেক স্তম্ভের মাথায় হীরামণিমাণিক্যের একজোড়া ময়ূর মুখামুখি বসানো ছিল; ময়ূর দু'টির মাঝে থাকিত মণিমুক্তার একটি গাছ,—দেখিলে মনে হইত ময়ূর দু'টি যেন পেখম মেলিয়া আনন্দে সেই গাছের মুক্তাফল খাইতেছে! এই অপূর্ব্ব সিংহাসনটির মূল্য অন্যূন ৭।৮ কোটি টাকা। ১৭৩৯ খৃঃ অব্দে নাদির শাহ ভারত লুণ্ঠন করিয়া উহা পারস্যে লইয়া যান। উল্লিখিত ময়ূরসিংহাসন, তাজমহল, ইত্যাদি নির্ম্মাণে কত যে অর্থ ব্যয় হইয়াছে তাহা স্থির করা দুষ্কর। শাহ্‌জহানের অতুল ঐশ্বর্য্য সম্পদ আজও তাই স্মরণীয়। এ-যুগের সাহিত্য ও চিত্র-শিল্প সম্রাটের আনুকূল্যে প্রভূত উন্নতি লাভ করিয়াছিল।

মোতি মস্‌জিদ

দেওয়ান-ই-খাস

দেওয়ান-ই-আম

জাম-ই-মসজিদ

ময়ূরাসন

STUDIES AND QUESTIONS

1. Give an account of the leading features of Indian history during the rule of Jahangir and Shahjahan. (C. U. '11).

2. Sketch the history of India during Shahjahan's reign. (C. U. '14, '20).

3. Indicate the importance of the reign of Shahjahan as a landmark in Indian History. (C. U. '28).

4. "Shahjahan's reign is best known for its pomp and splendour".—Explain. (C. U, '37).

ষড়বিংশ অধ্যায়

মুঘল শক্তির পতন ও মারাঠা শক্তির অভ্যুদয়

ঔরঙ্গজীব ও শিবাজী

ঔরঙ্গজীবের রাজ্যাভিষেক

ঔরঙ্গজীব।—(১৬৫৮—১৭০৭)।—আগ্রা অধিকারের পর দিল্লীর উপকণ্ঠে ঔরঙ্গজীবের রাজ্যাভিষেক হয় (২১শে জুলাই, ১৬৫৮)। তিনি "আলমগীর" (বিশ্বজয়ী) উপাধি গ্রহণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। উপাধি সমেত তাঁহার পূর্ণ নাম ছিল "আবুল মুজফ্ফর মহীউদ্দীন মুহম্মদ ঔরঙ্গজীব গাজী"।

সিংহাসনারোহণের পর ঔরঙ্গজীব রাজ্যবিস্তারে মনোনিবেশ করিলেন। ভ্রাতৃবিরোধের সময় মীরজুম্লা ছিলেন ঔরঙ্গজীবের দক্ষিণহস্তস্বরূপ। ঔরঙ্গজীব তাঁহাকে বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত করিলেন। সম্রাট জহাঙ্গীরের রাজত্বকালে শ্রীহট্ট এবং কোচবিহার রাজ্যের পূর্ব্বাংশ পর্য্যন্ত বাদশাহী প্রাধান্য বিস্তৃত হওয়ায় আহোম রাজাদের সহিত মুঘল শক্তির সংঘর্ষ হয় এবং অবশেষে ১৬৩৮ খৃঃ অব্দে (শাহ্জহানের রাজত্বকালে) এক সন্ধিও হয়। শাহ্জহানের পুত্রগণ যখন ভ্রাতৃবিরোধে ব্যস্ত তখন আহোমগণ গুয়াহাটির (বর্ত্তমান গৌহাটি) মুঘল শাসনকর্ত্তাকে অনায়াসে পরাজিত করিয়া শহরটি অধিকার করে (১৬৫৮)।

মীরজুম্লার আসাম আক্রমণ

ইহাতে মীরজুম্লা এক বিশাল জল-বাহিনী লইয়া আসাম আক্রমণ করেন। ইউরোপীয় জাতি, আরাকানী ও আহোমদের আক্রমণ

হইতে বঙ্গদেশকে রক্ষা করিবার একমাত্র উপায় যে নৌশক্তি বৃদ্ধি করা মীরজুম্‌লা তাহা বুঝিয়াছিলেন এবং নৌবহর গঠনে মনোনিবেশ করেন। আহোম সৈন্যদল তাঁহাকে বিশেষ বাধা না দেওয়ায় তিনি আহোমরাজ জয়ধ্বজসিংহের রাজধানী বড়গাঁও অবধি অগ্রসর হন (১৬৬২) এবং আহোমদের নৌশক্তিকে বিধ্বস্ত করিয়া দেন। জয়ধ্বজসিংহ বাৎসরিক করদানের এবং তাঁহার এক কন্যাকে দিল্লীর মুঘল অন্তঃপুরে পাঠাইবার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া সন্ধি করিলেন। ফিরিবার পথে মীরজুমলার মৃত্যু হইল (১৬৬৩)। ইহার কিছুকাল পরেই কামরূপ ঔরঙ্গজীবের হস্তচ্যুত হইয়া যায়।

শায়েস্তা খাঁ বাঙ্গালার সুবাদার নিযুক্ত

মীরজুম্‌লার পর বাদশাহের মাতুল শায়েস্তা খাঁকে বাঙ্গালার সুবাদার পদে নিযুক্ত করা হয়। তিনি প্রথমবার একাধিক্রমে ১৪ বৎসর বাঙ্গালা শাসন করেন। এবং সন্দীপ জয় করিয়াছিলেন। এই সময় পর্ত্তুগীজ জলদস্যুরা বাঙ্গালার দক্ষিণ অঞ্চল ছারখার করিয়া বেড়াইতেছিল। তিনি তাহাদিগকে দমন করেন। ১৬৬৬ খৃঃ অব্দে আরাকান-রাজ্যের নৌশক্তিকে পরাভূত করিয়া শায়েস্তা খাঁ সন্দীপ ও চট্টগ্রাম অধিকার করেন। শায়েস্তা খাঁ বঙ্গদেশের নৌশক্তি বাড়াইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে বাঙ্গালী লস্করদের সাহস, নৈপুণ্য ও বুদ্ধিমত্তা অত্যন্ত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল এবং দলে দলে বাঙ্গালী নাবিক পর্ত্তুগীজ, ইংরাজ ও আরাকানী জাহাজে কাজ করিত। মুঘল সম্রাটদের নৌ-নীতির

দমন

চট্টগ্রাম অধিকার ১৬৬৬)

ঔরঙ্গজীব (সমসাময়িক চিত্র হইতে)।

অভাবেই ভারতীয় নাবিকগণ ও বণিকগণ বিদেশীদের সহিত আর পারিয়া উঠিল না। নাবিকগণ ক্রমশঃ ইংরাজ-চালিত জাহাজের খালাসীর পর্য্যায়ে নামিয়া আসিল আর বণিকগণ বহির্বাণিজ্য ত্যাগ করিয়া দেশে "বেনিয়া" সম্প্রদায় হইয়া বসিল। এই সময়ে আরাকানে কবি আলাওল জয়সীর "পদ্মাবতী" কাব্য বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশ করেন। দ্বিতীয়বার (১৬৮০) সুবাদার নিযুক্ত হইয়া শায়েস্তা খাঁ প্রায় ১৩ বৎসর কাল বাঙ্গালা শাসন করেন। শুনিতে পাওয়া যায়, শায়েস্তা খাঁর শাসনকালে বাঙ্গালায় টাকায় আট মণ করিয়া চাউল বিক্রয় হইত। ১৬৯৪ খৃঃ অব্দে আগ্রায় তাঁহার মৃত্যু হয়। শায়েস্তা খাঁর পর ঔরঙ্গজীবের পৌত্র আজিম উশ্‌শান বাঙ্গালার সুবাদার নিযুক্ত হইয়া আসেন। তাঁহার

মুর্শিদকুলী খাঁ

দেওয়ান ছিলেন মুর্শিদকুলী খাঁ। মুর্শিদকুলী খাঁ ঢাকা হইতে মুকশুদাবাদে প্রাদেশিক রাজস্ব বিভাগ তুলিয়া লইয়া গেলেন এবং একরূপ স্বাধীনভাবেই কাজকর্ম্ম করিতে লাগিলেন। তাঁহারই নামানুসারে মুকশুদাবাদের নাম হয় মুর্শিদাবাদ।

পশ্চিম সীমান্তে বিদ্রোহ

উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের উপদ্রবে ঔরঙ্গজীবকে বিব্রত হইতে হইয়াছিল। প্রথমে য়ুসুফ্‌জাই নামক এক আফগান উপজাতি বিদ্রোহী হইয়া পঞ্জাবে প্রবেশ করিল (১৬৬৭)। [সুফ্‌জাইদের দমন করার কিছু পরেই আফ্রিদিরা বিদ্রোহী হইল (১৬৭৩), এবং অন্যান্য উপজাতিরা আসিয়া বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগদান করিল। ঔরঙ্গজীব অবশেষে কূটনীতির বলে অর্থের দ্বারা কয়েকটি দলকে বশীভূত করিয়া তাহাদের পরস্পরের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিলেন। ফলে পরস্পর যুদ্ধবিগ্রহ করিতে করিতে উপজাতিরা দুর্ব্বল হইয়া

বিদ্রোহ দমন

পড়িল, বিদ্রোহও থামিয়া গেল।

ঔরঙ্গজীবের ধর্ম্মনীতি

ঔরঙ্গজীব ছিলেন অত্যন্ত নিষ্ঠাবান সুন্নি মুসলমান, উপরন্তু পরধর্ম্মদ্বেষী। তিনি দাক্ষিণাত্যের সিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত রাজ্যগুলি যথা বিজাপুর, গোলকুণ্ডা, প্রভৃতির উপরও কম অত্যাচার করেন নাই। এই সিয়া-সুন্নি শ্রেণীগত বিবাদের অবসরেই শিবাজীর শক্তি এত বৃদ্ধি পায়। ধর্ম্মপ্রচারের আকাঙ্খা সম্রাটের রাজ্য-বিস্তারের উৎসাহ অপেক্ষা কম ছিল না। প্রজাদিগকে ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণে উৎসাহিত করিবার জন্য তিনি পুরস্কার, উপাধি, প্রভৃতি

বিতরণের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন; আর যাহারা ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করে নাই তাহাদের উপর অতিরিক্ত কর-ভার চাপাইয়া দিলেন। হিন্দু বণিকদের উপর অত্যধিক বাণিজ্য শুল্ক ধার্য্য হইল। ১৬৭৯ খৃঃ অব্দে তাঁহারই আদেশে জিজিয়া কর পুনঃপ্রবর্ত্তিত হয়। রাজপুত ব্যতীত সমুদয় হিন্দুকে পাল্কী, হাতী বা ভাল ঘোড়ায় চড়িতে নিষেধ করিয়া তিনি এক আদেশ জারি করেন। হিন্দুদের উৎসব, মেলা, শোভাযাত্রা, প্রভৃতিও বন্ধ করিয়া দেওয়া হইতে লাগিল। বাদশাহ প্রত্যেক সুবাদারকে হিন্দু মন্দির ধ্বংসের আদেশ দেন। এইরূপে যে সকল মন্দির বিধ্বস্ত হইয়া গেল তাহাদের মধ্যে মথুরার কেশব মন্দির এবং কাশীর বিশ্বেশ্বর মন্দির সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। কাশীর বিশ্বেশ্বর মন্দিরের ভিত্তির উপর এক বিরাট মস্‌জিদ স্থাপন করা হইল, আর মথুরার নাম রাখা হইল 'ইস্‌লামাবাদ'। ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ না করিলে রাজকার্য্য হইতে হিন্দুদের বিতাড়িত করার ব্যবস্থাও হইতে লাগিল।

জিজিয়া কর (১৬৭৯) ও হিন্দুদের উপর নিষেধাজ্ঞা

এইভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রজাদের ধর্ম্মবিশ্বাসে আঘাত করিয়া ঔরঙ্গজীব স্বেচ্ছায় যেন সাম্রাজ্যের সর্ব্বনাশ ডাকিয়া আনিলেন। ১৬৬৯ খৃঃ অব্দে এবং পুনরায় ১৬৮৫ খৃষ্টাব্দে মথুরা অঞ্চলে হিন্দু জাঠগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করে। বহু সৈন্যক্ষয় করিয়া ঔরঙ্গজীব তাহাদিগকে প্রতিবার পরাজিত করিলেও সম্পূর্ণরূপে দমন করিতে পারেন নাই। বুন্দেলখণ্ডে রাজা চম্পৎরায় ঔরঙ্গজীবের রাজত্বের প্রথম দিকেই বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিলেন, কিন্তু পরাজিত হইয়া আত্মহত্যা করেন (১৬৬১)। চম্পৎরায়ের পুত্র ছত্রসাল দাক্ষিণাত্যে বাদশাহের কর্ম্মচারীরূপে কিছুকাল কাজ করেন এবং সেখানে শিবাজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠেন। ঔরঙ্গজীব যখন প্রকাশ্যভাবে হিন্দুদের উপর অত্যাচার সুরু করেন তখন ছত্রসাল নিজেকে হিন্দুধর্ম্মের রক্ষকরূপে ঘোষণা করিয়া বিদ্রোহী হইয়া উঠিলেন। ঔরঙ্গজীব তাঁহাকে কিছুতেই দমন করিতে পারিলেন না। ছত্রসাল বুন্দেলখণ্ডে এক স্বাধীন হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিলেন।

জাঠ বিদ্রোহ

বুন্দেলখণ্ডে বিদ্রোহ, চম্পৎরায়, ছত্রসাল

১৬৭২ খৃঃ অব্দে সৎনামী নামক এক অনুন্নত হিন্দুদের কৃষক সম্প্রদায় বিদ্রোহ ঘোষণা করে। বর্ত্তমান পাতিয়ালা রাজ্যের

সংনামী বিদ্রোহ (১৬৭২)

অন্তর্গত নরনৌল এবং আলোয়ার রাজ্য বা মেওয়াট্ ছিল তাহাদেব বাসভূমি। কিন্তু সুশিক্ষিত বাদশাহী ফৌজের সহিত সৎনামী কৃষকেরা পারিয়া উঠিল না। তাহাদের অধিকাংশই রণক্ষেত্রে প্রাণ হারাইল।

পাঞ্জাবে শিখ সম্প্রদায়

শিখদের মধ্যেও তখন নূতন প্রেরণা আসিয়াছিল এবং তাহারা ধীরে ধীরে শক্তিসঞ্চয় করিতেছিল। গুরু নানক (১৪৬৯—১৫৩৯) তাঁহার উদার ধর্ম্মপ্রচারে হিন্দু ও মুসলমানকে একসূত্রে গাঁথিতে চাহিয়াছিলেন; তাঁহার বা তাঁহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী শিখ-গুরুদের মধ্যেও সামরিক শক্তি বিকাশের কোনও উদ্দেশ্য ছিল না। মহামতি আকবর ১৫৭৭ খৃঃ অব্দে অমৃতসরে শিখসম্প্রদায়কে যে জমি দান করেন সেখানেই অমৃতসরের প্রসিদ্ধ 'স্বর্ণমন্দির' স্থাপিত হয়; তদবধি উহাই শিখদের প্রধান তীর্থ। পঞ্চম গুরু অর্জ্জুন জহাঙ্গীরের আদেশে নিহত হন (১৬০৬)। এই অর্জ্জুনই ছিলেন শিখদের 'আদিগ্রন্থ' নামক ধর্ম্মপুস্তকের সঙ্কলয়িতা। ষষ্ঠ গুরু হরগোবিন্দই (১৬০৬—৪৫) সর্ব্বপ্রথম শিখদিগকে সামরিক সম্প্রদায়ে পরিণত করেন।

শিখদিগকে সামরিক সম্প্রদায়ে পরিণত

জহাঙ্গীরের আদেশে তিনি দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর কারাদণ্ড ভোগ করিয়াছিলেন এবং পরে শাহ্‌জহানের সৈন্যদলের সহিত যুদ্ধ-বিগ্রহেই তাঁহাব জীবন অতিবাহিত হয়। নবম গুরু তেগ-বাহাদুরকে রাজদ্রোহের অপরাধে বন্দী করা হয়। ঔরঙ্গজীব তাঁহাকে ইস্‌লাম ধর্ম্ম অথবা মৃত্যু এই দু'য়ের একটি বাছিয়া লইতে বলিলে, তেগবাহাদুর প্রাণদণ্ড বরণ করিলেন (১৬৭৫)। গুরুর এই আত্মত্যাগে শিখদের মধ্যে এক অভিনব প্রেরণাব সঞ্চার হইল। দশম গুরু গোবিন্দ সিংহ তেগবাহাদুবের হত্যার প্রতিশোধ লইবাব জন্য শিখদিগকে একটি রণকুশল সামরিক জাতিতে পরিণত করিলেন। শিখজাতি প্রাণপণে মুঘলদের বিরোধিতা করিতে লাগিল।

তেগবাহাদুরের প্রাণদণ্ড (১৬৭৫)

গুরু গোবিন্দ ও শিখ রণশক্তি

এই সময়ে ছত্রপতি শিবাজীর নেতৃত্বে মারাঠা শক্তির অভ্যুদয় হয়। শাহ্‌জহানের রাজত্বকালেই শিবাজী দাক্ষিণাত্যে ধীরে ধীরে শক্তিসঞ্চয় করিতেছিলেন। দাক্ষিণাত্যের সুবাদার হিসাবে কাজ করিবার সময় গোলকুণ্ডা ও বিজাপুরের মুস্‌লিম শক্তি খর্ব্ব করিয়া ঔরঙ্গজীব আপনার অজ্ঞাতসারে হিন্দু শিবাজীর শক্তিবৃদ্ধির

মহারাষ্ট্রে শিবাজীর অভ্যুদয়

পথ প্রস্তুত করিয়া আসিয়াছিলেন। ১৬৬০ খৃঃ অব্দে ঔরঙ্গজীব মাতুল শায়েস্তা খাঁকে দাক্ষিণাত্যের সুবাদার নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু শিবাজীর হাতে পরাভূত হইয়া তাঁহাকে ফিরিয়া আসিতে হইল (১৬৬৩)। তারপর যুবরাজ মুয়াজ্জম দাক্ষিণাত্যে প্রেরিত হইলেন। তাহাতেও কিছুই হইল না; শিবাজী সুরৎ (সুরাট) ও আহ্‌মদনগর লুণ্ঠন করিয়া নিজবলে "রাজা" উপাধি গ্রহণ করিলেন (১৬৬৪)। তখন ঔরঙ্গজীব অম্বর-রাজ জয়সিংহ ও সেনাপতি দিলীর খাঁকে শিবাজীর বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। এবার শিবাজীর পরাজয় হইল (১৬৬৫); এবং পুরন্দরের সন্ধিতে উভয় পক্ষের বিরোধ কিছুকালের জন্য স্থগিত রহিল। জয়সিংহেব অনুরোধ রক্ষা করিয়া তিনি বাদশাহের সহিত সাক্ষাতের জন্য আগ্রায় গমন করিলেন (১৬৬৬)। ঔরঙ্গজীব হাতে পাইয়া তাঁহাকে আগ্রায় বন্দী করিয়া রাখিলেন। কিন্তু সুচতুর শিবাজী কৌশলে আগ্রা হইতে পলায়ন কবেন। ১৬৬৮ খৃঃ অব্দে ঔরঙ্গজীব শিবাজীর 'রাজা' উপাধি মানিয়া লইতে বাধ্য হন। কিন্তু তবুও উভয়ের মধ্যে মৈত্রী হইল না। ১৬৭০ খৃঃ অব্দে শিবাজী দ্বিতীয়বার সুরাট লুণ্ঠন ও খান্দেশ হইতে 'চৌথ' আদায় করিলেন এবং পুরন্দরের সন্ধির সর্ত্ত অনুযায়ী তিনি যে সকল দুর্গ ছাড়িয়া দিয়াছিলেন সেগুলির অধিকাংশই জয় করিয়া লইলেন। ১৬৭৪ খৃঃ অব্দে মহাসমারোহে তিনি 'ছত্রপতি' উপাধি গ্রহণ করিলেন। ঔরঙ্গজীব কিছুতেই এই মারাঠাবীরকে দমন করিতে পারিলেন না।

শিবাজী ও শায়েস্তা খাঁ

শিবাজী আগ্রায নজরবন্দী

পলায়ন

ঔরঙ্গজীব কর্ত্তৃক শিবাজীব রাজোপাধি স্বীকার

এদিকে সঙ্কীর্ণ রাজনীতি ও হিন্দুবিদ্বেষ দ্বারা ঔবঙ্গজীব ক্রমে ক্রমে বিশ্বস্ত রাজপুতগণকেও শত্রুতে পরিণত করিয়া তুলিলেন। হিন্দুগণের প্রতি ঔরঙ্গজীবের অত্যাচার এবং 'জিজিয়া' কর পুনঃ-প্রবর্ত্তন—এই দুইটি কারণে সমস্ত রাজপুত জাতি ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল।

রাজপুতগণের সহিত সংঘর্ষ

এই সময়ে মাড়বার-রাজ যশোবন্ত সিংহ সম্রাটের কার্য্যে আফগানিস্থানে ছিলেন। আফগান সীমান্তে জামরুদ নামক স্থানে অকস্মাৎ তাঁহার মৃত্যু হয় (১৬৭৮)। যশোবন্ত সিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার মহিষী শিশুপুত্র অজিতসিংহকে লইয়া স্বদেশের পথে

যশোবন্ত সিংহের মৃত্যু ও অজিত সিংহ

দিল্লীতে উপস্থিত হইলে, ঔরঙ্গজীব তাঁহাদের গতিরোধ করিয়া বলেন যে, অজিতসিংহ মুসলমান না হইলে মাড়বার রাজ্যের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবেন। রাঠোর রাজপুতগণ এ প্রস্তাব প্রত্যাখান করিলেন। সেনাপতি দুর্গাদাসের বিশ্বস্ততা, বীরত্ব ও বিচক্ষণতায় যশোবন্তসিংহের মহিষী ও পুত্রকে দিল্লী হইতে রাজপুতানায় লইয়া যাওয়া সম্ভব হইল। ঔরঙ্গজীব তখন মাড়বারের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়া সহজেই যোধপুর অধিকার করিলেন। দেখিতে দেখিতে অন্যান্য অনেক নগরও তিনি জয় করেন (১৬৭৯)। অজিতসিংহের মাতা মেবার-রাজ রাজসিংহের নিকট সহায়তা প্রার্থনা করিলে রাজসিংহ মাড়বারের রাঠোরগণের সহিত যোগদান করিলেন। কিন্তু তিনি ঔরঙ্গজীবের বিশাল বাহিনীর অগ্রগতি রোধ করিতে পারিলেন না। ঔরঙ্গজীবের আদেশে মেবার শ্মশানে পরিণত হইল। বীরশ্রেষ্ঠ রাজসিংহ রাজধানী ত্যাগ করিয়া দুর্গম পার্ব্বত্য প্রদেশে গিয়া দুর্ভেদ্য দুর্গে আশ্রয় লইলেন এবং স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া শত্রুর গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। রাজপুতগণ দলে দলে বিভক্ত হইয়া বাদশাহী সৈন্যদিগকে পৃথক আক্রমণে কি ভাবে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিযা-ছিল তাহা বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার "রাজসিংহ" উপন্যাসে দেখাইয়াছেন।

দুর্গাদাস

ঔরঙ্গজীবের মাড়বার জয় (১৬৭৯)

মেবার-রাজ রাজসিংহ

রাজপুত-সমর

অতঃপর ঔরঙ্গজীব তাঁহার পুত্র মুহম্মদ আকবরকে রাজপুতদেব বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। কিন্তু এই সঙ্কটকালে আকবর রাজপুতদের সহায়তায় সিংহাসন অধিকারের অভিপ্রায়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন (১৬৮১); এবং তাঁহার ভগিনী তাঁহাকে এসময়ে সাহায্য করেন শোনা যায়। এই বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ঔরঙ্গজীব কূটনীতির আশ্রয় লইলেন। তিনি এক চিঠিতে আকবরের সহি জাল করাইয়া এরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন যাহাতে সেখানি রাজপুতদের হাতে পড়ে। সরলপ্রকৃতি রাজপুতগণ চিঠিখানি দেখিয়াই আকবরের উপর সন্দিহান হইয়া আর তাঁহাকে সাহায্য করিলেন না। তখন আকবর উপায়ান্তর না দেখিয়া প্রাণভয়ে মারাঠা রাজ্যে গিয়া উপস্থিত হইলেন। শিবাজীর পুত্র শম্ভুজী তখন মারাঠা-অধিপতি। তিনি সাদরে তাঁহাকে আশ্রয় দিলেন। ইহার কয়েক বৎসর পরে আকবর তাঁহার পূর্ব্ব-

যুবরাজ আকবরের বিদ্রোহ (১৬৮১)

পুরুষ হুমায়ুনের মত পারস্য দেশে পলায়ন করেন এবং ১৭০৪ খৃঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

আকবরের পলায়ন ও মৃত্যু

বলপ্রয়োগে রাজপুত জাতিকে দমন করা অসম্ভব দেখিয়া ঔরঙ্গজীব রাণা রাজসিংহের পুত্র জয়সিংহের সহিত সন্ধি করিলেন (জুন ১৬৮১)। সন্ধির সর্ত্ত অনুসারে জয়সিংহ ঔরঙ্গজীবকে মেবারের কয়েকটি জেলা ছাড়িয়া দিলেন, ঔরঙ্গজীবও মেবারের উপর হইতে জিজিয়া কর তুলিয়া লইলেন। কিন্তু মাড়বারের সহিত তখনও যুদ্ধ চলিতে লাগিল। ঔরঙ্গজীব সেনাপতিদের উপর যুদ্ধের ভার দিয়া যুবরাজ আকবরের শাস্তিবিধানের জন্য দাক্ষিণাত্যে গমন করিলেন (১৬৮২)। রাঠোর বীর দুর্গাদাস অবিরত যুদ্ধ চালাইতে লাগিলেন। দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর ধরিয়া এই যুদ্ধ চলিয়াছিল। ঔরঙ্গজীবের মৃত্যুর পরও (১৭০৭) ইহা চলিতে থাকে। ঔরঙ্গজীবের পুত্র বাহাদুর শাহের রাজত্বকালে ইহার অবসান ঘটে (১৭০৯)।

মেবারের সহিত সন্ধি (১৬৮১)

মাড়বারের সহিত যুদ্ধ

মাড়বারের সহিত সন্ধি (১৭০৯)

ঔরঙ্গজীবের জীবনের শেষ ২৫ বৎসর দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধবিগ্রহে কাটিয়াছিল। ১৬৮২ খৃঃ অব্দে যখন তিনি দক্ষিণাপথের মুঘল রাজধানী ঔরঙ্গাবাদে পৌঁছেন তখন বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা রাজ্য-দুইটির অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। বারবার মারাঠাদের আক্রমণে এবং অন্তর্দ্বন্দ্বে রাজ্যদ্বয়ের পতন তখন আসন্ন। বহুকাল হইতেই এই রাজ্যদুইটির প্রতি ঔরঙ্গজীবের লোভ ছিল। ১৬৮৫ খৃঃ অব্দে তিনি বিজাপুর অবরোধ করিলেন এবং পর বৎসর বিজাপুরের সুলতান সিকন্দর শাহ আত্মসমর্পণ করিলে তাঁহাকে আজীবন বন্দী করিয়া রাখা হইল। এইভাবে বিজাপুরের আদিল-শাহী রাজবংশ বিলুপ্ত হইয়া গেল। পর বৎসর গোলকুণ্ডা রাজ্যও ঔরঙ্গজীবের অধিকারভুক্ত হইয়া পড়িল (১৬৮৭)। গোলকুণ্ডার সুলতান আবুল হাসানকে দৌলতাবাদে বন্দী করিয়া রাখা হয় সুতরাং গোলকুণ্ডার কুতব-শাহী রাজবংশও বিলুপ্ত হইয়া গেল। ইহার পর অনায়াসেই তাঞ্জোর ও ত্রিচিনোপল্লী অবধি বাদশাহের অধিকারভুক্ত হইয়া যায়।

বিজাপুর অধিকার (১৬৮৬)

গোলকুণ্ডা অধিকার (১৬৮৭)

বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা—এই মুস্‌লিম রাজ্যদুইটির ধ্বংসের ফলে প্রবল-প্রতাপ মারাঠাদের আর কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী দাক্ষিণাত্যে

শিবাজীর মৃত্যুর পর মারাঠাদের সহিত যুদ্ধ

রহিল না। ১৬৮২ খৃঃ অব্দে ঔরঙ্গজীব যখন দক্ষিণ-ভারতে আগমন করেন তখন শিবাজীর পুত্র শম্ভুজী সেখানে রাজত্ব করিতেছিলেন। মারাঠাদের উপর বাদশাহ মোটেই প্রসন্ন ছিলেন না। আকবরকে আশ্রয় দান করার অপরাধে তিনি শম্ভুজীর উপর অসন্তুষ্ট ছিলেন। শিবাজীর মৃত্যুও তাঁহার অন্তরে নূতন আশার সঞ্চার করিয়াছিল, সুতরাং শম্ভুজীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষিত হইল। কয়েক বৎসর যুদ্ধের পর শম্ভুজী পরাজিত ও বন্দী হইলেন। সম্রাটের আদেশে তাঁহার প্রাণদণ্ড হইল (১৬৮৯)। শম্ভুজীর পুত্র শাহু (২য় শিবাজী) তখন নিতান্ত শিশু। তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়া বাদশাহের অন্তঃপুরে পালন করা হইতে লাগিল। শম্ভুজীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাজারাম পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করেন। মারাঠাগণ তাঁহাকেই রাজা বলিয়া স্বীকার করিয়া লইল। ঔরঙ্গজীব জয়লাভ করিলেন বটে, কিন্তু যুদ্ধনিপুণ মারাঠারা কিছুতেই বশ্যতা স্বীকার করিল না, বরং তাহাদের বারবার অতর্কিত আক্রমণে বাদশাহের সৈন্যদল—এমন কি, বাদশাহ নিজেও অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিতে লাগিলেন। ১৭০০ খৃঃ অব্দে রাজারামের মৃত্যু হইলে তাঁহার পত্নী বুদ্ধিমতী তারাবাঈ নিজপুত্র ৩য় শিবাজীকে রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া স্বয়ং মারাঠা-জাতির নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। ক্রমশঃ মারাঠা সৈন্যেরা বেরার (১৭০৩), গুজরাট (১৭০৬), প্রভৃতি পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশ লুণ্ঠন করিতে লাগিল। ঔরঙ্গজীব বিশেষ চেষ্টা করিয়াও মারাঠা শক্তিকে দমন করিতে পারিলেন না। নিষ্ফল যুদ্ধের মধ্যে অবশেষে ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে ঔরঙ্গজীব আহ্‌মদনগরে পরলোক গমন করেন।

শম্ভুজীর প্রাণদণ্ড (১৬৮৯)

শাহু

রাজারাম

তারাবাঈ

মারাঠাদের সাফল্য

রাজপ্রাসাদের অপরিমেয় বিলাসিতার মধ্যে ঔরঙ্গজীব আজীবন যে কঠোর সংযমের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন তাহা যেমন প্রশংসার্হ তেমনই বিস্ময়কর। তিনি বাদশাহ হইয়াও স্বহস্তে টুপি তৈয়ারি করিয়া বিক্রয়লব্ধ যে সামান্য অর্থ রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহা দিয়াই তাঁহার কবরের খরচ নির্ব্বাহ করিতে আদেশ দেন। কোরাণ নকল করিয়া তিনি যে টাকা সঞ্চয় করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার আত্মার মঙ্গল কামনায় দরিদ্র ধার্ম্মিক মুসলমানদের মধ্যে বিতরণ করিবার আদেশ লিখিয়া রাখিয়া যান। জীবনের শেষ

ঔরঙ্গজীবের চরিত্র, ধর্ম্মনিষ্ঠা,

সরল জীবন যাত্রা,

দিন পর্য্যন্ত নিয়মিত উপাসনায় এবং শাস্ত্রীয় অনুশাসন ও অন্যান্য অনুষ্ঠান পালনে তাঁহার সামান্য শৈথিল্যও দেখিতে পাওয়া যায় নাই। মুস্‌লিম ধর্ম্মশাস্ত্রেও ছিল তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য, সমগ্র কোরাণ তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। তিনি কখনও মদ্য স্পর্শ করেন নাই। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তিনি আমিষ ভোজনও ত্যাগ করিয়াছিলেন। পুত্রকন্যাগণকে সদাচার ও ধর্ম্মশিক্ষাদানের জন্য তাঁহার চেষ্টার অবধি ছিল না। রাজকার্য্যে রাজকীয় আড়ম্বর নিখুঁতভাবে রক্ষা করিয়াও, নিজের বেশভূষায় তিনি অত্যন্ত অনাড়ম্বর ছিলেন। নিজে সঙ্গীতবিদ্যায় পারদর্শী হইয়াও শাস্ত্রীয় অনুশাসনের সম্মান রক্ষার জন্য গীতবাদ্য বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন, চিত্রকলাদিরও কোনরূপ পৃষ্ঠপোষকতা করেন নাই। অনেকে ঔরঙ্গজীবের প্রতি ভণ্ডামির দোষ আরোপ করিয়া থাকেন; কারণ তাঁহার ধর্ম্মনিষ্ঠা, সদাচার, প্রভৃতির সহিত ভ্রাতৃহত্যা, পিতাকে কাবাগারে নিক্ষেপ, রাজকার্য্যে শঠতার আশ্রয় গ্রহণ, প্রভৃতি ব্যাপারের সামঞ্জস্য বিধান করা কঠিন। কিন্তু সিংহাসনের জন্য পিতৃদ্রোহ বা ভ্রাতৃদ্রোহ তাঁহার বংশে নূতন নয়। প্রায় প্রত্যেক স্বৈরাচারী রাজার ন্যায়ই তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, রাজকার্য্যে নীতির কোনও স্থান নাই; তাই সেক্ষেত্রে মিথ্যাচার, বিশ্বাসভঙ্গ, প্রভৃতি কার্য্য তাঁহার কাছে বিবেক-বিরুদ্ধ বলিয়া মনে হইত না। কিন্তু যেখানে, তাঁহার মতে রাজ্যের স্থায়ী মঙ্গল ও ইস্‌লাম ধর্ম্মের মধ্যে কোনরূপ বিরোধ ঘটিয়াছে, সেখানে তিনি নিজ ধর্ম্মের জন্য সাম্রাজ্যের স্থায়ী স্বার্থ বিসর্জ্জন দিতে কুণ্ঠিত হন নাই; তাই রাজ্যের নিশ্চিত অমঙ্গল জানিয়াও তিনি অ-মুসলমানদের প্রতি যথেষ্ট অত্যাচার করিয়াছেন। মনে হয়, যেন শুধু ধর্ম্মান্ধতার জন্য তিনি সাম্রাজ্যের ভিত্তি শিথিল করিয়া দিয়াছিলেন।

পাণ্ডিত্য

শাস্ত্রীয় অনুশাসন পালন

ধর্ম্মমতের প্রতি এরূপ প্রগাঢ় আসক্তি হেতু তিনি রাজনীতিক হিসাবে সফলতা লাভ করিতে পারেন নাই। আকবর ধর্ম্মে উদারনীতি অনুসরণ করিয়া বিস্তীর্ণ মুঘল সাম্রাজ্য সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত করিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু ঔরঙ্গজীবের সঙ্কীর্ণ নীতি ও পরধর্ম্মদ্বেষের ফলে সেই সুদৃঢ় ও বিশাল মুঘল সাম্রাজ্য পতনের পথে দ্রুত অগ্রসর হইল। অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতবর্ষ ও ইউরোপ

ঔরঙ্গজীবের ব্যর্থতা

ভারতবর্ষ ১৭০০
কাবুল
পেশোয়ার
কান্দাহার
লাহোর
মুলতান
পানিপথ
দিল্লী
সিন্ধু
আগ্রা
গঙ্গা
যোধপুর
আজমীঢ়
গোয়ালিয়র
উদয়পুর
কলিঞ্জর
এলাহাবাদ
ঢাকা
চন্দননগর
শ্রীরামপুর
কলিকাতা
উজ্জয়িনী
নর্ম্মদা
তাপ্তি
বুরহানপুর
সুরাট
দিউ
দমন
বেসিন
সলসাত্তি
বোম্বে
চাউল
দৌলতাবাদ
আউরঙ্গাবাদ
আহম্মদনগর
গোদাবরী
মহানদী
সাতারা
গোলকুণ্ডা
বিমলিপত্তম
বিশাখপত্তন
বিজাপুর
কোলাপুর
কৃষ্ণা
মসলিপত্তন
গোয়া
চন্দ্রগিরি
মাদ্রাজ
পন্দিচেরী
কাবেরী
কালিকট
নাগপত্তম
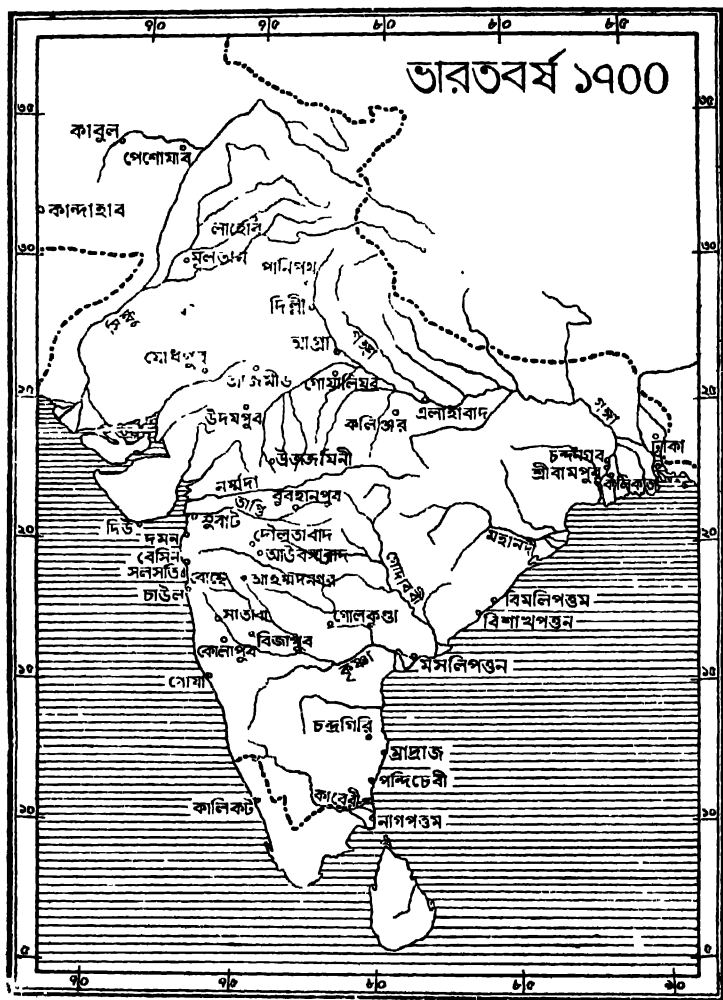
রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কত বিভিন্ন ! প্রতিদ্বন্দ্বী পাশ্চাত্য রাষ্ট্রশক্তির তুলনায় ভারতের মুস্‌লিম রাজশক্তি কতটা দুর্ব্বল ও ভবিষ্যৎ-দৃষ্টিশূন্য তাহা ঔরঙ্গজীবের মতন সম্রাটও বুঝেন নাই ; বুঝিলে অন্তর্বিবাদে ও হিন্দু-মুসলিম সংগ্রামে শক্তিক্ষয় না করিয়া পাশ্চাত্য শক্তির বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ হইবার চেষ্টা দেখা যাইত, অধিকন্তু ইংরাজরা যে ব্যবসায়ের নামে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ধীরে ধীরে বিস্তার করিতেছিল সেদিকে লক্ষ্য রাখিবার অবকাশও ঔরঙ্গজীবের ছিল না। যখন হুঁস্ হইল তখন ইংরাজের নৌশক্তি দেখিয়া ভীত হইয়া বরঞ্চ কোম্পানীর অধ্যক্ষ জব্ চার্ণকের সহিত এক চুক্তিতে অধিকতর স্ুবিধা ইংরাজদের হাতে তুলিয়া দিলেন। এই চুক্তিই মুঘলদের মরণকাঠি হইয়া দেখা দিল। ঔরঙ্গজীবের মুস্‌লিম সাম্রাজ্য বাসনা ও শিবাজীর হিন্দু সাম্রাজ্যসাধ স্বপ্নের ন্যায় মিলাইয়া গেল, সঙ্ঘবদ্ধ সুনিপুণ পাশ্চাত্য রাষ্ট্রশক্তির অমোঘ আঘাতে। আকবরের আদর্শ অনুসারে হিন্দু-মুস্‌লিম সহযোগ ও ঐক্য সার্থক হইলে পাশ্চাত্য আক্রমণ সত্ত্বেও ভারতের স্বাধীনতা হয়ত রক্ষা পাইত। ঔরঙ্গজীব অন্তিমকালে নিজ জীবনের বিরাট ব্যর্থতা যেন উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাঁহার শেষজীবনের চিঠি-গুলিতে তিনি নিরাশা-জনিত যে ক্ষোভ ও বেদনা প্রকাশ করিয়া-ছেন তাহা যেমন করুণ, তেমনই মর্ম্মস্পর্শী।

বংশ-পরিচয় ও বাল্যজীবন

শিবাজী।—পুনা জেলার অন্তর্গত জুন্নর-এর নিকটে শিবনের গিরিদুর্গে ১৬২৭ খৃঃ অব্দে (মতান্তরে ১৬৩০) শিবাজীর জন্ম হয়। তাঁহার পিতা শাহজী প্রথমে আহ্‌মদনগরেব নিজাম-শাহী রাজদরবারে একজন প্রভাবশালী কর্ম্মচারী ছিলেন। পুনা জেলায় তাঁহার বিস্তীর্ণ জায়গীর ছিল। শাহ্‌জহান আহ্‌মদনগর অধিকার করিলে শাহজী বিজাপুরের আদিল-শাহী দরবারের অধীনে কার্য্যভার গ্রহণ করেন এবং কর্ণাট অঞ্চলে আর একটি বিস্তীর্ণ জায়গীব পাইয়া তাঁহার দ্বিতীয় পত্নীকে লইয়া সেখানে বাস করিতে থাকেন, আর শিবাজীর মাতা বালক শিবাজীকে লইয়া দাদাজী-কোণ্ডদেব নামে জনৈক বিচক্ষণ ব্রাহ্মণ কর্ম্মচারীর তত্ত্বাবধানে পুনায় রহিয়া গেলেন। শিবাজীর মাতা ছিলেন দেবগিরির যাদব রাজবংশের কন্যা, আর পিতা মেবারের শিশোদীয় রাজবংশের

সন্তান বলিয়া আত্ম-পরিচয় দিতেন। বাল্যকাল হইতেই রামায়ণ-মহাভারতের উপাখ্যান, মাতৃ ও পিতৃকুলের বীরত্বকাহিনী, ইত্যাদি শুনিয়া শিবাজীর অন্তরে প্রাচীন হিন্দু-গৌরব ফিরাইয়া আনিবার কল্পনা জাগিয়া উঠে। বাল্যকালেই শিবাজী অস্ত্রবিদ্যায় নিপুণ

ছত্রপতি শিবাজী

হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং দুর্দ্ধর্ষ মাওলী জাতির মধ্য হইতে বিশ্বস্ত অনুচর সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

তোর্ণা অধিকার (১৬৪৬)

এই মাওলী অনুচরগণের সাহায্যে ১৬৪৬ খৃঃ অব্দে শিবাজী বিজাপুর রাজ্যের অধীন তোরণ বা তোর্ণা দুর্গ (পুনার প্রায় ২০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে) অধিকার করিলেন। অভিভাবক দাদাজী

কোণ্ডদেবের মৃত্যুর (১৬৪৭) পর অপূর্ব্ব ক্ষিপ্রতার সহিত শিবাজী ছলে-বলে-কৌশলে একটির পর একটি দুর্গ অধিকার করিয়া আপনার শক্তিবৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। সেজন্য বিজাপুরের সুলতান শাহজীকে বন্দী করিলে (১৬৪৮) শিবাজী সম্রাট শাহ্-জহানের পুত্র মুরাদ বক্সের সহায়তায় পিতাকে উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহাতে সফল হইলেন না। অগত্যা শিবাজীকে কিছুকাল নিরস্ত হইয়া থাকিতে হইল। এদিকে বিজাপুরের কয়েকজন প্রভাবশালী ব্যক্তির অনুরোধে শাহজীকে কারামুক্ত করা হইল (১৬৪৯) এবং শিবাজীও পুনরায় নিজমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। ১৬৫৫-৫৬ খৃঃ অব্দে শিবাজীর জনৈক অনুচর সাতারা জেলার অন্তর্গত জাউলী নামক স্থানের সামন্ত রাজাকে হত্যা করেন; কারণ জাউলীর রাজা মারাঠা হইয়াও শিবাজীর সহিত যোগদান করিতে অসম্মত হইয়াছিলেন। জাউলী অধিকারের পর শিবাজী আরও কয়েকটি দুর্গ হস্তগত করেন। বিজাপুরের সুলতান তখন এই মারাঠা বীরকে আর উপেক্ষা করা সঙ্গত নয় ভাবিয়া প্রবীণ সেনাপতি আফজল খাঁকে তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন (১৬৫৯)। বিজাপুরের সুশিক্ষিত বিরাট বাহিনীর সহিত মুষ্টিমেয় মারাঠা সৈন্যের সম্মুখসমরের ক্ষমতা ছিল না। শিবাজী প্রতাপগড়ের দুর্ভেদ্য দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। আফজল খাঁ শিবাজীকে সম্মুখসমরে অবতীর্ণ করিবার অভিপ্রায়ে দুইটি দেবমন্দির কলুষিত করিয়াও তাঁহাকে প্রতাপগড় হইতে বাহির করিতে পারিলেন না। তখন সন্ধির প্রস্তাব লইয়া আফজল খাঁর নিকট হইতে দূত গেল। স্থির হইল, আফজল ও শিবাজী একটি নির্দ্দিষ্ট স্থানে সাক্ষাৎ করিয়া, সন্ধির সর্ত্ত সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন। পূর্ব্ব-ব্যবস্থা অনুসারে, আফজল খাঁ ও শিবাজী প্রতাপগড়ের নিকটে একস্থানে সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। তখন সে যুগের শিষ্টাচারের নিয়মে উভয়ে আলিঙ্গনবদ্ধ হইলে, কথিত আছে, আফজল বামহস্তে শিবাজীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাঁহার শ্বাসরোধের চেষ্টা করিতে লাগিলেন এবং দক্ষিণ হস্তের ছুরিকা দিয়া তাঁহার পার্শ্বদেশে আঘাত করিলেন। কিন্তু সুচতুর শিবাজী পরিচ্ছদের নীচে লৌহবর্ম্ম এবং পাগড়ীর তলায় শিরস্ত্রাণ

জাউলী অধিকার

বিজাপুরের সহিত সংঘর্ষ

আফজল খাঁ

পরিয়া গিয়াছিলেন। আর তাঁহার বামহস্তের অঙ্গুলিতে ছিল 'বাঘনখ' নামে সুতীক্ষ্ণ লৌহনখর, এবং আস্তিনের মধ্যে লুকায়িত ছিল তীক্ষ্ণ ছুরিকা। শিবাজীর লৌহবর্মে আফজলের ছুরিকা প্রতিহত হইয়া গেল এবং তৎক্ষণাৎ বিদ্যুৎ গতিতে শিবাজী বাঘনখ দিয়া আফজলের উদর চিরিয়া ফেলিলেন ও ছুরিকাখানি আফজলের পার্শ্বদেশে আমূল বসাইয়া দিলেন এবং শিবাজীর এক অনুচর আসিয়া আফজলের মাথা কাটিয়া ফেলিল। তারপর বিপুল বিক্রমে মারাঠা সৈন্যদল বিজাপুর-বাহিনী ছিন্নভিন্ন করিয়া দিয়া শত্রুশিবির লুণ্ঠন করিল। (সুলতান এই পরাজয়ের সংবাদে রুস্তম খাঁ নামক তাঁহার আর একজন সুদক্ষ সেনাপতির নেতৃত্বে শিবাজীর বিরুদ্ধে এক সৈন্যদল প্রেরণ করিলেন। পরণালের নিকট এক যুদ্ধে রুস্তম খাঁ পরাভূত হইলেন। বিজাপুর রাজ্যের কিয়দংশ শিবাজীর অধিকারভুক্ত হইল।)

আফজল খাঁর মৃত্যু

ইহাতেও শিবাজীর বিপদ কাটিল না। ১৬৬০ খৃঃ অব্দে ঔরঙ্গজীব শায়েস্তা খাঁকে দাক্ষিণাত্যের সুবাদার নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। সহজেই পুনা নগরী সুবাদারের হস্তগত হইল এবং কল্যাণ জেলা হইতে মারাঠারা বিতাড়িত হইল। কিন্তু শায়েস্তা খাঁ মারাঠাদের বিরুদ্ধে বিশেষ সুবিধা করিতে পারিলেন না। ক্ষিপ্রগতি মারাঠা অশ্বারোহীরা অসময়ে অতর্কিত আক্রমণে বাদশাহী ফৌজকে বিব্রত করিয়া তুলিতে লাগিল। অবশেষে এক-রাত্রে শিবাজী স্বয়ং মুষ্টিমেয় বিশ্বস্ত অনুচর সঙ্গে লইয়া একেবারে শায়েস্তা খাঁর শয়নকক্ষে হানা দিলেন (১৬৬৩)। শায়েস্তা খাঁ প্রাণে বাঁচিলেন বটে, কিন্তু শত্রুর অস্ত্রাঘাতে তাঁহাকে একটি অঙ্গুলী হারাইতে হইল; তাঁহার পুত্রেরও প্রাণ গেল। শায়েস্তা খাঁর পরিবর্তে অতঃপর যুবরাজ মুয়াজ্জমকে দাক্ষিণাত্যে প্রেরণ করা হইল। কিন্তু শিবাজী সুরৎ (সুরাট) বন্দর ও আহ্‌মদনগর লুণ্ঠন করিয়া সগৌরবে 'রাজা' উপাধি গ্রহণ করিলেন (১৬৬৪)।

ঔরঙ্গজীবের সহিত সংঘর্ষ, শায়েস্তা খাঁ

সুরাট ও আহমদনগর লুণ্ঠন এবং 'রাজা' উপাধি গ্রহণ ১৬৬৪)

তখন ঔরঙ্গজীব অম্বরাধিপ জয়সিংহ এবং দিলীর খাঁকে শিবাজীর বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন (১৬৬৪)। জয়সিংহ বিজাপুর এবং অন্যান্য কয়েকটি ক্ষুদ্ররাজ্যের সহিত মিলিত হইয়া পুরন্দর দুর্গ অবরোধ করিলেন; শিবাজী পরাজয় মানিয়া সন্ধি প্রার্থনা করি-

জয়সিংহ ও দিলীর খাঁ

লেন। পুরন্দরের এই সন্ধির সর্ত্ত অনুযায়ী মাত্র দ্বাদশটি দুর্গ নিজে রাখিয়া শিবাজী অন্যান্য দুর্গগুলি বাদশাহকে সমর্পণ করিলেন। তাঁহাকে বাদশাহের বশ্যতাও স্বীকার করিতে হইল (১৬৬৫)।

পুরন্দরের সন্ধি (১৬৬৫)

ইহার পর জয়সিংহ বিজাপুর আক্রমণ করিলে শিবাজী তাঁহাদের সাহায্য করেন। শিবাজীর সহায়তা লাভে সন্তুষ্ট হইয়া ঔরঙ্গজীব তাঁহাকে খেলাৎ দিয়া দরবারে উপস্থিত হইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। জয়সিংহের অনুরোধে এবং অভয়দানে নির্ভর করিয়া শিবাজী বাদশাহের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবার জন্য আগ্রায় গমন করিলেন (১৬৬৬)। দরবারে তাঁহাকে পদমর্য্যাদা অনুযায়ী সম্মান প্রদর্শন না করায় অপমানে ক্ষিপ্ত হইয়া শিবাজী রূঢ় ভাষায় বাদশাহের কার্য্যের প্রতিবাদ করেন। কিন্তু প্রতিবাদ নিষ্ফল হইল, শিবাজী আগ্রায় বন্দী হইয়া রহিলেন। অতঃপর তিনি মুক্তিলাভের এক অভিনব উপায় উদ্ভাবন করিলেন। পীড়ার ভাণ করিয়া শিবাজী প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঝুড়িতে করিয়া সন্ন্যাসী, ফকির, আমীর, ওমরাহ, প্রভৃতির নিকট আরোগ্য-কামনার ছলে মিষ্টান্ন পাঠাইতে আরম্ভ করিয়া দিলেন। প্রথম প্রথম রক্ষীরা ঝুড়িগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিত; প্রত্যহই ঝুড়িগুলিতে রাশি রাশি মিষ্টান্ন দেখিয়া পরে আর তাহারা ঝুড়ি খুলিয়া দেখিত না। এই সুযোগে শিবাজী এবং তাঁহার পুত্র, দুইটি ঝুড়িতে লুকাইয়া পলায়ন করিলেন। সোজা দাক্ষিণাত্যের পথ ধরিলে বিপদের আশঙ্কা তাই চতুর শিবাজী মথুরা, বৃন্দাবন, কাশী, প্রভৃতি প্রসিদ্ধ তীর্থ ঘুরিতে ঘুরিতে উড়িষ্যার পথে মহারাষ্ট্রে আসিয়া উপনীত হইলেন (ডিসেম্বর, ১৬৬৬)।

বাদশাহের দরবারে শিবাজীর নিমন্ত্রণ

শবাজীর আগ্রায় গমন

শিবাজী বন্দী

শিবাজীর পলায়ন

স্বরাজ্যে ফিরিয়া শিবাজী দাক্ষিণাত্যের সুবাদারের সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া শাসন-সংস্কারে মনোনিবেশ করিলেন। ১৬৬৭ খৃঃ অব্দে জয়সিংহের মৃত্যু হইলে কুমার মুয়াজ্জমকে সহায়তা করিবার জন্য মাড়বারের অধিপতি যশোবন্ত সিংহকে দাক্ষিণাত্যে প্রেরণ করা হইল। যশোবন্ত সিংহ ও মুয়াজ্জম-এর মধ্যস্থতায় ঔরঙ্গজীব শিবাজীকে রাজা বলিয়া স্বীকার করিলেন। কিন্তু ১৬৬৯ খৃঃ অব্দে পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গেল। শিবাজী হৃত দুর্গগুলি উদ্ধার করিতে লাগিলেন এবং দ্বিতীয়বার সুরাট লুণ্ঠন করিলেন (১৬৭০)।

ঔরঙ্গজীবের শিবাজীকে রাজা বলিয়া স্বীকার,

সুরাট লুণ্ঠন (১৬৭০),

খান্দেশের

চৌথ আদায় (১৬৭০), সুরাটের চৌথ ১৬৭২), অভিষেক (১৬৭৪), গোলকুণ্ডার সহিত সন্ধি ও বিজাপুর আক্রমণ,

তারপর খান্দেশ হইতে 'চৌথ' আদায় করা হইল (১৬৭০) ১৬৭২ খৃঃ অব্দে তিনি সুরাটেরও চৌথ দাবি করিলেন। সর্ব্বত্র বাদশাহী ফৌজ তাঁহার নিকট পরাভূত হইতে লাগিল। ১৬৭৪ খৃঃ অব্দে রায়গড়ে মহাসমারোহে তাঁহার অভিষেক হইল, তিনি 'ছত্রপতি' এবং 'গো-ব্রাহ্মণ প্রতিপালক' উপাধি গ্রহণ করিলেন।*

তারপর ১৬৭৭ খৃঃ অব্দে 'ছত্রপতি' শিবাজী গোলকুণ্ডার সুলতানের সহিত সন্ধি করিয়া বিজাপুর-রাজ্যের কর্ণাট প্রদেশ আক্রমণ করিলেন। সহজেই কর্ণাটের অন্তর্গত জিঞ্জি তাঁহার হস্তগত হইল (১৬৭৭), তারপর তিনি ভেলোর অধিকার করিলেন (১৬৭৮)। বর্ত্তমান মহীশূরের কিয়দংশও তাঁহার অধিকারভুক্ত হইল। শিবাজীর প্রবল নৌশক্তি ছিল এবং মুঘল নৌবাহিনীর অধ্যক্ষ আফগান ফতে খাঁর সহিত তাঁহার সংঘর্ষ লাগিয়াই ছিল। ক্রমান্বয় পরাজয়ে বিক্ষুব্ধ হইয়া একবার ফতে খাঁ বোম্বাইয়ের দক্ষিণে জিঞ্জিরা বন্দরটি শিবাজীকে দিতে রাজী হওয়ায় অন্যান্য নৌকর্ম্ম-চারীগণ মুঘল সম্রাটের অনুমতি ক্রমে ইংরাজদের সাহায্য ভিক্ষা চাহিল। সম্মিলিত ইংরাজ ও মুঘল নৌবাহিনীর নিকট শিবাজীর পরাজয় ঘটে। শিবাজী পরবৎসর সুরাট বন্দরটি অধিকার করিয়া পূর্ব্ব আক্রোশ মিটান। ১৬৮০ খৃঃ অব্দে শিবাজী পরলোকে গমন করেন।

শিবাজীর মৃত্যু (১৬৮০)

শিবাজীর চরিত্র ও কৃতিত্ব

শিবাজীর চরিত্র ও কৃতিত্ব সম্বন্ধ ঐতিহাসিকগণ অতি উচ্চ ধারণা পোষণ করিয়া থাকেন। সামান্য একজন জায়গীদারের পুত্র হইয়া এবং কাহারও নিকট হইতে সামান্যতম সাহায্য না পাইয়াও তিনি কেবল নিজের প্রতিভাবলে ও কর্ম্মক্ষমতায় এক বিস্তীর্ণ স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিয়া যাইতে পারিয়াছিলেন। বিশেষতঃ একদিকে বিজাপুর রাজ্যের বিরোধিতা, আর একদিকে ঔরঙ্গজীবের বিপুল শক্তি তাঁহাকে পদে পদে বাধা দিয়াছে; তথাপি এই অদ্ভুতকর্ম্মা মারাঠা বীর এক স্বাধীন হিন্দুরাজ্য স্থাপন করিয়া আপনার সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিয়াছিলেন। মারাঠা জাতির গঠন কর্ত্তা বলিয়াই তিনি সমধিক প্রসিদ্ধ। তাঁহার তিরোভাবের পরে

জাতি-স্রষ্টা

* গো-ব্রাহ্মণ = বেদ ও ব্রাহ্মণ। বেদ হিন্দুধর্ম্মের প্রতীক এবং ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠবর্ণ বলিয়া বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের প্রতীক। 'গো-ব্রাহ্মণ' হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুসমাজের প্রতীক।

প্রায় এক শতাব্দি ধরিয়া মারাঠারা ভারতের সর্ব্বপ্রধান শক্তিরূপে পরিগণিত হইয়াছিল। ইহাই তাঁহার কৃতিত্বের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

শিবাজীর ব্যক্তিগত চরিত্র

শিবাজীব কৃতিত্বের কথা ছাড়িয়া দিয়া কেবল তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনের দোষগুণ আলোচনা করিলেও, তাঁহার চরিত্রের বিশেষত্ব সকলকে মুগ্ধ করে; কষ্টসহিষ্ণুতা, সাহস, বুদ্ধি, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, সমরকৌশল, প্রভৃতি বিবিধ সদ্‌গুণের সমাবেশে তাঁহার চরিত্র বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। কর্ম্মক্ষেত্রে সাফল্য লাভের জন্য অবশ্য তিনি ছল ও প্রতারণার আশ্রয় লইতে দ্বিধা করিতেন না। তখনকাব রাজনীতিতে তাহা একরকম অপরিহার্য্য ছিল। মুস্‌লিম ঐতিহাসিক খাঁফি খাঁ তাঁহাকে 'নরকের কুক্কুর', 'শয়তানের অবতার', প্রভৃতি বলিয়া গালি দিয়া গিয়াছেন; অথচ তিনিও শিবাজীর ন্যায়নিষ্ঠা ও উদারতা সম্বন্ধে ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। হিন্দুধর্ম্মে পরম নিষ্ঠাবান হইলেও অন্য ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার কোন বিদ্বেষ বা হিংসা ছিল না। তিনি তাঁহার অনুচরদিগকে অপরের ধর্ম্মস্থান বা ধর্ম্মগ্রন্থের কোন ক্ষতি করিতে বার বার নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন। নারীজাতির প্রতি তাঁহার অপরিসীম শ্রদ্ধা ছিল এবং জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে তাঁহাদের সম্মান রক্ষার জন্য তিনি সর্ব্বদা অবহিত থাকিতেন। মস্‌জিদের খরচ নির্ব্বাহের জন্যও তিনি নিষ্কর ভূমি দান করিয়াছেন; লুণ্ঠন-ব্যাপারে কোর্‌-আন্‌ তাঁহার হস্তগত হইলে মুসলমান অনুচরকে তাহা উপহার দিতেন। মুসলমান ফকীর দরবেশকেও সম্মানপ্রদর্শন করিতে তিনি ইতস্ততঃ করিতেন না। একই যুগে ঔরঙ্গজীবের অনুদার ধর্ম্মান্ধতা আর শিবাজীর উদার ধর্ম্মনীতি উভয়ের চরিত্রের বৈষম্য পরিস্ফুট করে। কিন্তু ঔরঙ্গজীবের ধর্ম্মনির্য্যাতনে হিন্দু ও মারাঠা জাতির রাষ্ট্রে যে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, তাহার ফলে নিখিল ভারতীয় ঐক্যসাধনের পথ সুগম হয় নাই। ধর্ম্মে বিভিন্ন হইয়াও পাশ্চাত্য রাষ্ট্রশক্তিসকল যেমন রাষ্ট্র ব্যাপারে এক হইয়া লড়িতে পারে তেমন রাজনৈতিক ঐক্যবোধ এযুগে ভারতের কোন হিন্দু বা মুস্‌লিম শাসকের মধ্যেই দেখা যায় নাই। ফলে উভয়েই ক্ষণিক বিজয়গর্ব্ব উপভোগ করিয়া অবশেষে সঙ্ঘবদ্ধ পাশ্চাত্য শক্তির পদতলে উভয়ের অমূল্য স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিতে বাধ্য হয়।

রাজতন্ত্র

শিবাজীর শাসন-ব্যবস্থা।—মধ্যযুগের রাজনীতির আদর্শে শিবাজীর শাসন-ব্যবস্থাতেও রাজাই ছিলেন রাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা। আটজন মন্ত্রী বা 'প্রধান' শাসনকার্য্যে তাঁহাকে সাহায্য করিতেন। প্রধানমন্ত্রী 'মুখ্য প্রধান' বা পেশবা নামে অভিহিত হইতেন। রাজ্য-শাসনের জন্য হিন্দুপ্রথার আদর্শে পৃথক পৃথক বিভাগ নির্দ্দিষ্ট ছিল। সর্ব্বশুদ্ধ ছিল প্রায় ত্রিশটি বিভাগ। মন্ত্রীরা এক একজন এইরূপ একাধিক বিভাগের অধ্যক্ষতা করিতেন। শাসন-সংক্রান্ত গুরুতর কার্য্যে রাজা মন্ত্রীসভার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। প্রাদেশিক শাসকগণ প্রত্যেকে আটজন কর্ম্মচারীর সহায়তায় নিজ নিজ প্রদেশ শাসন করিতেন।

অষ্ট প্রধান

প্রাদেশিক শাসন

সৈন্যদলের অধ্যক্ষেরা বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন। নিম্ন-তম অধ্যক্ষের উপাধি ছিল 'নায়ক', নায়কের পর 'হাবিলদার', তারপর 'জুম্‌লাদার'। সর্ব্বপ্রধান সৈন্যাধ্যক্ষের উপাধি ছিল 'সর্ণোবৎ' বা সেনাপতি। পদাতিক ও অশ্বারোহী দলের উপর এক একজন করিয়া মোট দুইজন 'সর্ণোবৎ' থাকিতেন। আবার সকলের উপর ছিলেন একজন প্রধান সেনাপতি, তিনি মন্ত্রীসভারও অন্যতম সদস্য ছিলেন। অশ্বারোহী সৈন্যদের অধিকাংশ ছিল 'বার্গীর' (বর্গী), আর কতক ছিল 'শিলাদার'। বার্গীরগণ সরকারী অশ্বারোহী; রাজসরকার হইতে তাহাদিগকে অস্ত্রশস্ত্র, পোষাক-পরিচ্ছদ, অশ্ব ও বেতন দেওয়া হইত। শিলাদারেরা গড়িয়া তুলিয়াছিল জাতীয় সৈন্যদল (national militia). তাহারা নিজেরাই অস্ত্রশস্ত্র, অশ্ব, পোষাক, প্রভৃতি লইয়া আসিত এবং সৈন্যদলে যোগ দিয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য কাজ করিত; সেজন্য সরকার তাহাদিগকে অর্থ সাহায্য করিতেন। শিবাজী সৈন্যদলে কঠোর নিয়মানুবর্ত্তিতা প্রচলন করিয়াছিলেন। সৈন্যদলে এবং সেনানিবাসগুলিতে স্ত্রীলোকের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। সৈন্য-দের সঙ্গে নিতান্ত অপরিহার্য্য দ্রব্যাদি ব্যতীত কোনরূপ উপকর-ণের বাহুল্যও থাকিতে পারিত না। ক্ষিপ্রতায় সে-যুগে মারাঠা সৈন্যদের সমকক্ষ ছিল না। তাহারা প্রায়ই সম্মুখ যুদ্ধ পরিহার করিয়া অতর্কিতে শত্রুদলের পার্শ্বদেশ বা পশ্চাদ্‌ভাগ আক্রমণ করিয়া তাহাদের ছিন্নভিন্ন করিয়া দিত, রসদ লুটিয়া লইয়া যাইত

সৈন্য-বিভাগ

সৈন্যাধ্যক্ষদের শ্রেণী বিভাগ

বার্গীর ও শিলাদার

শৃঙ্খলা

এবং তাহাদের বিড়ম্বনার চূড়ান্ত করিয়া ছাড়িত। কিন্তু লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি ছিল সরকারী সম্পত্তি। শিবাজীর শক্তিকেন্দ্র ছিল তাঁহার অসংখ্য পার্ব্বত্য দুর্গ; তিনি ছিলেন সর্ব্বসমেত দুইশত চল্লিশটি দুর্গের অধিকারী। যাহাতে দুর্গাধ্যক্ষরা বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া শত্রুপক্ষের হাতে দুর্গ সমর্পণ করিতে না পারে, সেজন্য প্রত্যেকটি দুর্গের কর্ত্তৃত্বভার তিনজন করিয়া অধ্যক্ষের উপর ন্যস্ত ছিল। শিবাজী সৈন্যাধ্যক্ষগণকে জায়গীরের পরিবর্ত্তে পদমর্য্যাদা অনুসারে বেতন দিতেন। কিন্তু উত্তরকালে (রাজারামের রাজত্বে) জায়গীব প্রথার পুনঃপ্রবর্ত্তন হইয়াছিল, এবং মারাঠা-শক্তিব অধঃ-পতনেব উহাই অন্যতম কাবণ। শিবাজীর দূবদৃষ্টির আর একটি নিদর্শন ছিল তাঁহার নৌ বহর গঠন। তাঁহার নৌ-বহর সে যুগেব ইউরোপীয় নৌ-বহর হইতে কোন ক্রমেই নিকৃষ্ট ছিল না; পর্ত্তুগীজ, ইংরেজ ও ডাচদের সহিত সংঘর্ষে তিনি কয়েকবার জয়লাভও করিয়াছিলেন। কিন্তু শিবাজীর এই দূবদর্শিতাব কোন প্রভাবই মুঘল সম্রাটদের উপর দেখা যায না, কারণ তাঁহারা স্থলসৈন্যেব উপরই চরম নির্ভর করিতেন; ভারতেব বিশাল উপকূল রহিয়াছে দেখিয়াও সে পথে বহিঃশত্রু আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য নৌ-বহর (Navy) গঠন করিতে মুঘলরা কোনও চেষ্টা করেন নাই এবং তার ফলভোগও করিয়াছেন। আক্রমণোদ্যত পাশ্চাত্য শক্তির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নির্ভর ছিল তাহাদের নৌ-বাহিনী এবং ঐখানেই ছিল ভারতীয় রাজগণের চরম দুর্ব্বলতা।

জায়গীর প্রথা লোপ

নৌ-বহর

রাজস্ব-বিভাগেও শিবাজী শৃঙ্খলা আনয়ন করিয়াছিলেন। সেজন্য সমগ্র রাজ্যটিকে কয়েকটি "প্রান্ত" বা প্রদেশে বিভক্ত করেন। প্রত্যেকটি প্রান্ত কয়েকটি "পরগণা"য়, প্রত্যেকটি "পরগণা" কতিপয় "তরফে," এবং প্রত্যেকটি "তরফ" কতকগুলি গ্রামে বিভক্ত ছিল। জমি জরিপ করিয়া তদনুযায়ী প্রত্যেক ভূমিখণ্ডেব উপর উৎপন্ন দ্রব্যের পাঁচ ভাগের দুইভাগ রাজকর ধার্য্য হইয়াছিল। কৃষকেরা সুবিধামত শস্য অথবা অর্থের দ্বারা রাজস্ব দিতে পারিত। শিবাজী জমি ইজারা দিবার প্রথা তুলিয়া দিয়াছিলেন। কৃষকদের নিকট হইতে যাহাতে রাজস্বের অতিরিক্ত আর কিছু আদায় না হয়, সেদিকেও তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতেন। কিন্তু পর্ব্বতসঙ্কুল

রাজস্বনীতি প্রান্ত, পবগণা, তরফ গ্রাম

রাজকর

চৌথ ও সরদেশমুখী

মহারাষ্ট্র দেশে পর্য্যাপ্ত রাজস্ব আদায় হইত না। তাই শিবাজী অন্যান্য রাজ্য হইতে "চৌথ" (রাজস্বের চতুর্থাংশ) ও "সরদেশমুখী" (রাজস্বের দশমাংশ) আদায় করিতেন। যে সকল রাজ্য এই কর দিতে অস্বীকৃত হইত মারাঠা সৈন্যগণ সেই সকল রাজ্য আক্রমণ করিয়া লুণ্ঠন করিত। মারাঠা সৈন্যের অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইবার জন্য পার্শ্ববর্ত্তী বহু রাজা এই কর দিতে স্বীকৃত হইয়াছিল। চৌথ ও সরদেশমুখী হইতে মারাঠা রাজ্যের প্রভূত অর্থাগম হইত। শিবাজীর পূর্ব্বেও এরূপ প্রথা বিদ্যমান ছিল। রামনগরের (বর্ত্তমান ধরমপুর) রাজা দমান বন্দরের পর্তুগীজদের নিকট হইতে "চৌথ" আদায় করিতেন; সম্ভবতঃ শিবাজী তাঁহারই অনুকরণে একার্য্যে প্রবৃত্ত হন। অধিকন্তু শিবাজী 'সরদেশমুখী" নামে রাজস্বের এক-দশমাংশও আদায় করিতেন। তিনি বলিতেন যে, তাঁহার পূর্ব্ব-পুরুষেরা ছিলেন সমগ্র মহারাষ্ট্রের "সরদেশমুখ",—অর্থাৎ দেশমুখ্য দের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান, অতএব সেই উত্তরাধিকার-সূত্রে পূর্ব্বপুরুষ-দের প্রাপ্য রাজস্বের দশমাংশে তাঁহারও ন্যায্য অধিকার ছিল।

চৌথের উৎপত্তি

সরদেশমুখীর উৎপত্তি

শিবাজীর উত্তরাধিকারিগণ।—শিবাজীর পর তাঁহার পুত্র সাম্ভাজী বা শম্ভুজী সিংহাসনে আরোহণ করিলেন (১৬৮০)। তিনি যুদ্ধবিদ্যায় অপটু ছিলেন না বটে, কিন্তু তাঁহার চরিত্র ছিল অত্যন্ত কলুষিত। তাঁহার রাজত্বকালে মারাঠা-রাজ্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। ঔরঙ্গজীবের বিদ্রোহী পুত্র আকবরকে তিনি আশ্রয় দিয়াছিলেন বলিয়া ঔরঙ্গজীব মারাঠা রাজ্য আক্রমণ করিয়া শম্ভুজীকে বন্দী করেন এবং অনুচরসহ তাঁহাকে হত্যা করেন (১৬৮৯)। শম্ভুজীর সাত বৎসর বয়সের শিশুপুত্র শাহু বা ২য় শিবাজীকে ঔরঙ্গজীব নিজ অন্তঃপুরে নজরবন্দী রাখিয়া পালন করিতে লাগিলেন।

শম্ভুজী (১৬৮০-৮৯)

শাহু

তখন শিবাজীর (১ম) দ্বিতীয় পুত্র রাজারামকে মারাঠাগণ রাজা বলিয়া স্বীকার করিয়া লইল। রাজারাম মহারাষ্ট্র হইতে পলায়ন করিয়া কর্ণাটের অন্তর্গত জিঞ্জিতে গিয়া আশ্রয় লইয়াছিলেন। কিন্তু মহারাষ্ট্রের ব্রাহ্মণমন্ত্রী রামচন্দ্র পন্ত অশেষ কৌশলে রাজ্যরক্ষা করিতে লাগিলেন, আর সৈন্যাধ্যক্ষ সান্তাজী ঘোড়পাড়ে ও ধনাজী যাদব ক্রমাগত বাদশাহী ফৌজকে বিব্রত ও শক্তিহীন

রাজারাম (১৬৮৯-১৭০০)

করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। একবার স্বয়ং ঔরঙ্গজীবের শিবির পর্য্যন্ত লুণ্ঠিত হইল। ক্রমাগত আট বৎসর (১৬৯০-৯৮) যুদ্ধের পর জিঞ্জি দুর্গের পতন হইল বটে, কিন্তু রাজারাম পূর্ব্বাহ্নেই সেস্থান ত্যাগ করিয়াছিলেন। এদিকে মারাঠারা মালব লুণ্ঠন করিল (১৬৯৯)। ১৭০০ খৃঃ অব্দে রাজারামের মৃত্যু হয়।

তারাবাঈ
তৃতীয় শিবাজী

তখন রাজারামের পত্নী বুদ্ধিমতী তারাবাঈ তাঁহার নাবালক পুত্র ৩য় শিবাজীর অভিভাবিকা হইয়া রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। তাঁহার রাজধানী ছিল সাতারা। ঔরঙ্গজীব মাত্র দু'একটি দুর্গ যুদ্ধের দ্বারা দখল করিলেন এবং অর্থের দ্বারা একে একে অনেকগুলি দুর্গ হস্তগত করিয়া লইলেন। কিন্তু তিনি বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন; এরূপ অবস্থায় দুর্দ্ধর্ষ মারাঠাদের অতর্কিত আক্রমণ প্রতিরোধ করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব ছিল না। দুর্দ্ধর্ষ মারাঠারা কেবল যে বাদশাহী ফৌজকেই বিব্রত করিয়া বেড়াইতে লাগিল তাহাই নয়, পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশগুলিও আক্রমণ করিয়া বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলিতে লাগিল। রাজারামের জীবদ্দশাতেই মালব আক্রান্ত হইয়াছিল; এবার বেরার (১৭০৩) এবং গুজরাটও (১৭০৬) বাদ পড়িল না। তারপর বরোদা লুণ্ঠিত হইল।

শাহুর মুক্তিলাভ ও মারাঠাদিগের গৃহবিবাদ

ঔরঙ্গজীবেরও অন্তিমকাল ঘনাইয়া আসিয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর অনতিকাল পরেই জিঞ্জি-দুর্গজয়ী জুলফিকর খাঁর পরামর্শে শাহুকে মুক্তিদান করা হয় (১৭০৭)। তখন শাহু, অর্থাৎ ২য় শিবাজী এবং রাজারাম ও তারাবাঈয়ের পুত্র ৩য় শিবাজী এই দুইজনের মধ্যে কে মারাঠা সিংহাসনের ন্যায্য উত্তরাধিকারী তাহা লইয়া গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গেল এবং এই কারণেই মারাঠাশক্তি ক্রমে ক্রমে পঙ্গু হইয়া পড়িল।

STUDIES AND QUESTIONS

1. Sketch the career of Shivaji. (C. U. '12,'25, '31, '33, '35, '36, '37, '38, '39).
2. Describe the various attempts made by Aurangzeb to crush Shivaji. (C. U. '20).
3. Briefly describe Shivaji's struggle with Aurangzeb. (C. U. '39,'45).
4. Describe Shivaji's military system. (C. U. '35).

5. Write a short account of Shivaji's civil and military administration. (C. U. '39,'45).

6. Wherein did the policy of Akbar differ from that of Aurangzeb with regard to the Hindus ? Show how this difference of treatment finally led to the fall of the Mughal Empire. (C. U. '13, '17).

7. Write what you know of Aurangzeb's policy towards the Marathas. What were the consequences of the policy. (C. U. '41)

8. Estimate the character of Aurangzeb as a man, and as a ruler (C. U. '18, '21).

9. Give an account of Aurangzeb's policy towards the Rajputs. (C U. '34).

10 Compare Akbar and Aurangzeb. (C.U.'25,'27, '32). How far Aurangzeb was responsible for the ruin of the Mughal Empire ? (C. U. '23).

11. What were Sivaji's relations with the Mughals ? How did Sivaji organise his government ? (C U. 1943).

সপ্তবিংশ অধ্যায়

মুঘল সাম্রাজ্যের অবসান

শাহ আলম বাহাদুর শাহ।—ঔরঙ্গজীবের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার পুত্রদের মধ্যেও অনিবার্য্য ভ্রাতৃবিরোধ আরম্ভ হইল। তাঁহার পুত্রদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ ও কর্ম্মকুশল মুয়াজ্জম কাবুলে শাসনকর্তা ছিলেন। মুয়াজ্জমের প্রধান সহায় ছিলেন মুনীম খাঁ নামে জনৈক সুদক্ষ সেনাপতি। আগ্রার অনতিদূরে জাজৌ নামক স্থানে মুয়াজ্জম তাঁহার এক ভ্রাতা আজমকে পরাজিত ও নিহত করিয়া (জুন, ১৭০৭) বাহাদুর শাহ উপাধি লইয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। মুয়াজ্জমের আর এক নাম ছিল শাহ আলম; এইজন্য ইনি ১ম বাহাদুর শাহ ও ১ম শাহ আলম উভয় নামেই খ্যাত। তারপর তিনি দাক্ষিণাত্যে গিয়া হায়দ্রাবাদের নিকটে এক যুদ্ধে অপর ভ্রাতা কামবক্সকে পরাজিত করিলেন; কামবক্স আহত হইয়াছিলেন, শীঘ্রই তাঁহার মৃত্যু হইল (জানুয়ারী, ১৭০৯)।

আজমের পরাজয় ও মৃত্যু এবং বাহাদুর শাহের সিংহাসন লাভ (১৭০৭)

কামবক্সের পরাজয় ও মৃত্যু (১৭০৯)

তখনও রাজপুতদের সহিত বাদশাহী ফৌজের যুদ্ধ চলিতেছিল।

১৬৭৯ খৃঃ অব্দে ঔরঙ্গজীব মাড়বারের রাঠোরদের সহিত যে সমরের সূচনা করিয়াছিলেন তাঁহাব মৃত্যুকালেও তাহার অবসান ঘটে নাই। কেবল ১৬৮১ খৃঃ অব্দে মাডবাবের মিত্র মেবারের রাণার (রাজসিংহের পুত্র জয়সিংহ) সহিত সন্ধি হইয়াছিল। ইতিমধ্যে আবার মেবার (উদয়পুর) ও অম্বর (জয়পুর) মাডবারের (যোধপুর) সহিত মিলিত হওয়ায় বাহাদুব শাহ বাজপুতদের সহিত সন্ধি করিয়া যশোবন্ত সিংহের পুত্র অজিত সিংহকে মাড়বারের বাজা বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেন (১৭১০)।

রাজপুতদের সহিত সন্ধি (১৭১০)

এই সময় শিখগণও শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছিল। শিখদের নবম গুরু তেগবাহাদুবকে ঔরঙ্গজীব প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিয়া ছিলেন (১৬৭৫)। দশম গুরু গোবিন্দসিংহ শিবাজীর আবির্ভাবেব সময়ে শিখদিগকে সম্পূর্ণরূপে একটি সামরিক ভ্রাতৃ-সঙ্ঘে পবিণত করিয়াছিলেন। তিনি বাহাদুর শাহকে সিংহাসন লাভে সাহায্য করিয়াছিলেন; কিন্তু ১৭০৮ খৃঃ অব্দে তিনি আততায়ীর হস্তে নিহত হইলে শিরহিন্দের মুঘল সেনাপতি তাঁহার শিশুপুত্রদিগকে বর্ব্বরোচিত নিষ্ঠুরতাব সহিত হত্যা কবে। তখন শিখ সম্প্রদায়ের নেতা হইলেন 'বান্দা' নামক জনৈক শিখবীর। গুরু গোবিন্দের পুত্রদিগকে হত্যার জন্য বান্দা প্রতিশোধ লইতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তাঁহার প্রচণ্ড আক্রমণে শিরহিন্দ ছারখার হইয়া গেল। বাহাদুর শাহ ও মুনীম খাঁ উভয়েই বান্দার বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। লৌহগড় দুর্গে বান্দাকে অবরোধ করা হইল, কিন্তু দুর্গ অধিকারের পূর্ব্বেই বান্দা পলায়ন করিলেন।

শিখদের সহিত সংঘর্ষ

গুরুগোবিন্দ

বান্দা

বান্দার পলায়ন

১৭১২ খৃঃ অব্দে বাহাদুর শাহের মৃত্যু হইল। ঔরঙ্গজীবের পুত্রদের মধ্যে ইনিই ছিলেন রাজপদের যোগ্যতম ব্যক্তি—বিদ্বান্, বিনম্র ও উদার।

জহান্দর শাহ।—বাহাদুর শাহের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ-পুত্র জহান্দর শাহ ভ্রাতৃদ্বন্দ্বে জয়লাভ করিয়া সিংহাসন অধিকার করেন। তাঁহার প্রধান সহায়ক ছিলেন জুল্‌ফিকর খাঁ। কিন্তু ভ্রাতাদের মধ্যে জহান্দর শাহ ছিলেন সর্ব্বাপেক্ষা অপদার্থ,—বিলাসী, মদ্যপ ও চরিত্রহীন। তিনি কেবল এগার মাস নামে মাত্র রাজত্ব করিয়াছিলেন। তারপর তাঁহার দ্বিতীয় ভ্রাতা আজিম্

ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব ও সিংহাসন লাভ

উশ্‌শানের পুত্র ফর্‌রুখ্‌সিয়র জহান্দর শাহকে হত্যা করিয়া সিংহাসন অধিকার করিলেন (১৭১৩)। জুল্‌ফিকর খাঁকেও হত্যা করা হইল।

সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়

ফর্‌রুখ্‌সিয়র।—ফর্‌রুখ্‌সিয়রের সহায় ছিলেন সৈয়দ আবদুল্লাহ ও সৈয়দ হুসেন আলী নামে দুই ভ্রাতা। তাঁহারাই এখন রাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া উঠিলেন, যদিও রাজ্যশাসনের দুরূহ কর্ত্তব্য রতনচাঁদ নামক এক হিন্দুই নিষ্পন্ন করিতেন। জহান্দর শাহের মত ফর্‌রুখ্‌সিয়রেরও কোন যোগ্যতাই ছিল না; তিনিও ছিলেন চরিত্রহীন। বাদশাহের দরবার চক্রান্তভূমি হইয়া উঠিল। ওম্‌রাহেরা তিনদলে বিভক্ত ছিল—হিন্দুস্থানী, ইরাণী (পারস্য ও খোরাসান হইতে আগত) এবং তুরাণী (মধ্য এশিয়া হইতে আগত)। বিভিন্নদলের পরস্পব ষড়যন্ত্র ও বিবাদের ফলে সাম্রাজ্যের শক্তি ক্রমশঃই ক্ষীণ হইতে লাগিল।

দরবারে দলাদলি

মাড়বার-রাজ অজিত সিংহের পরাজয়

এই সকল গোলযোগের মধ্যে মাড়বাররাজ অজিতসিংহ বাদশাহী রাজ্য আক্রমণ করিলেন। কিন্তু সৈয়দ হুসেন আলী তাঁহাব বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলে, বিনা যুদ্ধেই বশ্যতা স্বীকার করিয়া অজিত সিংহ বিবাহের নামে নিজের কন্যাকে বাদশাহের হস্তে সমর্পণ করিয়া নিষ্কৃতি লাভ করিলেন ১৭১৫ ।

শিখনেতা বান্দার পরাজয় ও মৃত্যু

বাহাদুর শাহ শিখনেতা বান্দাকে ধরিতে পারেন নাই। এই বিশৃঙ্খলার সুযোগে বান্দা ফিরিয়া আবার শিখদের সুগঠিত করিয়া তুলিতেছিলেন। তাঁহাকে গুরুদাসপুর গড়ে আবার অবরোধ করা হইলে তিনি আত্মসমর্পণ করিলেন। অনুচরগণসহ নিষ্ঠুরভাবে তাঁহার প্রাণবধ করা হইল। কিন্তু শিখদেব সামরিক প্রগতি রুদ্ধ হইল না।

জাঠ-বিদ্রোহ

এদিকে ভরতপুরে জাঠনায়ক চূরামন বিদ্রোহ করিয়াছিলেন (১৭১৩)। বিস্তর যুদ্ধবিগ্রহেব পর সৈয়দ আবদুল্লাহ্‌ খাঁর চেষ্টায় তিনি বশ্যতা স্বীকার করিলেন (১৭১৮)।

এই সময় মারাঠাগণ মুঘলরাজ্যে উপদ্রব আরম্ভ করায় সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় পেশবার সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন। সন্ধির সর্ত্ত অনুসারে মারাঠাগণ দাক্ষিণাত্যেব মুঘল সুবা হইতেও চৌথ· আদায়ের অধিকার পাইল। বারবার শত্রুদের আক্রমণে পতনোন্মুখ মুঘল সাম্রাজ্য আরও হীনবল হইয়া পড়িল।

সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রভুত্বে অতিষ্ঠ হইয়া বাদশাহ গোপনে তাঁহাদের প্রাণনাশের চেষ্টা করায় তাঁহারা অকর্ম্মণ্য সম্রাটকে হত্যা করিলেন (১৭১৯)। তারপর রফিউদ্দরজাৎ নামে বাহাদুর শাহের এক পৌত্রকে সিংহাসনে বসান হইল, আর ওদিকে নেকু-সিয়র নামে ঔরঙ্গজীবের এক পৌত্র (কুমার আকবরের পুত্র) নিজেকে সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিলেন। নেকুসিয়রকে সহজেই পরাভূত করা হইল। ইতিমধ্যে রফিউদ্দরজাৎ-এর মৃত্যু হইলে তাঁহার অগ্রজ রফিউদ্দৌলা (২য় শাহ্‌জহান) সিংহাসন লাভ করিলেন। কিন্তু তিনিও কয়েক মাসের মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন; তখন সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় রোসান আখতার নামে বাহাদুর শাহের আর এক পৌত্রকে রাজপদ দান করিলেন। রোসান আখতার 'মুহম্মদ শাহ' উপাধি গ্রহণ করিলেন (১৭১৯)।

ফররুখ সিয়রের প্রাণনাশ (১৭১৯)

রফিউদ্দরজাৎ

নেকুসিয়র ও রফিউদ্দৌলা

মুহম্মদ শাহ

মুহম্মদ শাহ।—কিন্তু সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের কাল পূর্ণ হইয়া আসিয়াছিল। তাঁহাদের বিরুদ্ধে মহম্মদ শাহ নিজাম-উল-মুল্কের সহিত চক্রান্ত করিতে লাগিলেন। সৈয়দ হুসেন আলী খাঁকে গোপনে হত্যা করা হইল (১৭২০)। তখন সৈয়দ আবদুল্লাহ্ খাঁ বিদ্রোহ করিয়া মুহম্মদ ইব্রাহিম (রফিউদ্দৌলার অগ্রজ) নামে বাহাদুর শাহের আর এক পৌত্রকে বাদশাহ বলিয়া ঘোষণা করিলেন। কিন্তু যুদ্ধে আবদুল্লাহ্‌কে বন্দী করা হইল (১৭২০)। তারপর কারাগারে বিষপ্রয়োগে তাঁহার প্রাণনাশ করা হয় (১৭২২)।

সৈয়দ ভ্রাতৃ-দ্বয়ের পতন

মুহম্মদ ইব্রাহিম

সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের পতন হইল বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বাদশাহী সাম্রাজ্যও ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। মুহম্মদ শাহ নির্ব্বোধ না হইলেও বিলাসী ও ইন্দ্রিয়াসক্ত ছিলেন। রাজকার্য্যে তাঁহার বিশেষ কোন যোগ্যতা ছিল না। ১৭২২ খৃঃ অব্দে নিজাম-উল্-মুল্ককে প্রধান-মন্ত্রী নিয়োগ করা হইয়াছিল। তাঁহার প্রকৃত নাম ছিল মীর কমরউদ্দীন। তাঁহার পিতা গাজিউদ্দীন খাঁ সমরকন্দ হইতে এদেশে আসিয়া ঔরঙ্গজীবের অধীনে কার্য্য গ্রহণ করেন। কমরউদ্দিনও ঔরঙ্গজীবের সময় হইতেই নানা দায়িত্বপূর্ণ পদে কার্য্য করিয়া, অশেষ যোগ্যতার পরিচয় দিয়া, বিভিন্ন সময়ে 'আসফ জাহ', 'চীন কিলিচ খাঁ', 'খান খানান,' 'নিজাম-উল্-মুল্ক বাহাদুর ফতেজঙ্গ', প্রভৃতি উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। নিজাম-উল্-মুল্ক

সাম্রাজ্য ছিন্নভিন্ন

নিজাম-উল্-মুল্ক

দিল্লীতে মন্ত্রীর কার্য্যে বিরক্ত হইয়া স্বেচ্ছায় দাক্ষিণাত্যের শাসন-ভার লইলেন এবং সেখানে গিয়া স্বাধীনভাবেই রাজত্ব করিতে লাগিলেন (১৭২৪)। তাঁহার নাম হইতে এইরূপে বর্ত্তমান হায়দরাবাদের নিজাম রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হইল। এই বৎসরই আবার সাদৎ খাঁর উপর অযোধ্যার শাসনভার অর্পিত হয়। সাদৎ খাঁ ছিলেন পারস্যের অধিবাসী। তিনিও স্বাধীনভাবে অযোধ্যা শাসন করিতে লাগিলেন (১৭২৪)। তারপর বাঙ্গালার সুবাদার আলীবর্দ্দী খাঁ (১৭৪০—৫৬) বাদশাহকে করদান বন্ধ করিয়া স্বাধীনভাবে বঙ্গদেশ শাসন করিতে লাগিলেন। গঙ্গার উত্তরে রোহিলা আফগানরাও, আফগান প্রতিপালিত আলি মুহম্মদ খাঁ নামক এক ধর্ম্মত্যাগী হিন্দু নেতার অধীনে, স্বাধীন রোহিলখণ্ডের পত্তন করিল। পঞ্জাবে শিখ ও ভরতপুরে জাঠদেরও ক্ষমতা বাড়িতে লাগিল; রাজপুত রাজারাও স্বাধীন হইয়া গেলেন; আর মারাঠারা মালব ও গুজরাটে প্রাধান্য স্থাপন কবিয়া পেশবা ১ম বাজীরাওয়ের নেতৃত্বে দিল্লী পর্য্যন্ত অগ্রসব হইল (১৭৩৭)। সম্রাট ঔরঙ্গজীবের মৃত্যুর (১৭০৭) পর ত্রিশ বৎসর অতীত হইতে না হইতেই বিশাল সাম্রাজ্যের প্রদেশগুলি মুঘলদিগের হস্তচ্যুত হইয়া গেল এবং তথা-কথিত দিল্লী নগরী ও তাহার চারিপাশের সামান্য ভূ-খণ্ডে উহা সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িল।

নিজাম-রাজ্য স্থাপন (১৭২৪)

অযোধ্যাব স্বাধীনতা (১৭২৪)

স্বাধীন বঙ্গদেশ

রোহিলখণ্ড

শিখ, জাঠ, রাজপুত ও মারাঠাগণের শক্তিবৃদ্ধি

নাদির শাহের আক্রমণ।—বাদশাহী সাম্রাজ্যের এই দুরবস্থার মধ্যে পারস্যরাজ নাদির শাহ, দিল্লীর দরবারে তাঁহার দূতেরা যথাযোগ্য মর্য্যাদা পান নাই এই অজুহাতে, ভারতবর্ষ আক্রমণ করিলেন (১৭৩৯)। পরে তিনি স্পষ্ট স্বীকার করিয়াছেন যে, বাদশাহের কর্ম্মচারীদের প্ররোচনায় এবং বিশ্বাসঘাতকতার সুযোগে তিনি দিল্লী আক্রমণ করেন। বিনা বাধায় গজনী, কাবুল ও লাহোর জয় করিয়া দিল্লীর দিকে অগ্রসর হইলে, মুহম্মদ শাহ তাঁহাকে বাধা দিবার প্রয়াসে সমস্ত প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাদের এবং প্রধান রাজপুত নায়কদের সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে যোগদান করিতে আহ্বান করিলেন। কেহই সে আদেশে কর্ণপাত করিল না। পাণিপথের অনতিদূরে কর্ণাল নামক স্থানে বাদশাহী ফৌজ পারসিকদের হাতে বিধ্বস্ত হইল। মুহম্মদ শাহ বশ্যতা স্বীকার

কর্ণালের যুদ্ধ

করিয়া বিজয়ী নাদির শাহের সহিত একসঙ্গে দিল্লী প্রবেশ করিলেন। কয়েকদিন শান্তিতে কাটিল। তারপর একদিন গুজব রটিল যে, অকস্মাৎ নাদির শাহের মৃত্যু হইয়াছে; তৎক্ষণাৎ দিল্লীর অধিবাসীরা কয়েকশত পারসিক সৈন্যের প্রাণনাশ করিল। নাদির শাহ উত্তেজিত হইয়া নির্ম্মমভাবে প্রতিশোধ গ্রহণ করিলেন। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই প্রায় দেড় লক্ষ লোকের প্রাণ গেল। অবশেষে মুহম্মদ শাহ আসিয়া তাঁহাকে বিস্তর অনুনয় করিয়া এই জঘন্য হত্যাকাণ্ড প্রশমিত করিলেন। নাদির হত্যাকাণ্ড বন্ধ করিলেন বটে, কিন্তু অর্থের জন্য প্রজাদের উপর অকথ্য উৎপীড়নে ক্ষান্ত হইলেন না। এইরূপে প্রায় পনের কোটি নগদ টাকা এবং পঞ্চাশ কোটি টাকার মণিমাণিক্য নাদিরের হস্তগত হইল। শাহ্-জহানের ভুবনবিখ্যাত ময়ূরাসন এবং কোহিনুরখানিও তিনি পারস্যে লইয়া গেলেন। এতদ্ভিন্ন সিন্ধুর পশ্চিম তীরের সমুদয় ভূমিভাগও নাদির শাহের অধিকারে চলিয়া গেল। মুহম্মদ শাহ বাদশাহ রহিলেন বটে, কিন্তু মুঘল-তৈমুর বংশের গৌরব আর ফিরিল না।

মুহম্মদ শাহের বশ্যতা স্বীকার

নাদিরের প্রতিশোধ

নাদিরের দিল্লী লুণ্ঠন ও পারস্যে প্রত্যাগমন

এদিকে ১৭৪৭ খৃঃ অব্দে নাদির শাহের মৃত্যু হইলে তাঁহার সাম্রাজ্য ছিন্নভিন্ন হইয়া যায়। আহ্‌মদ শাহ নামে তাঁহার জনৈক আফগান সেনানায়ক পারস্য সাম্রাজ্যের পূর্ব্বভাগে আধিপত্য স্থাপন করেন। তিনি ছিলেন, আফগানের 'আবদালী' বংশোদ্ভব এবং আফগানীস্থান রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি নিজে 'দুর-ই-দুরবান' (যুগরত্ন) উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং উহা হইতেই তাঁহার বংশ 'দুর্‌রাণী' বংশ বলিয়া পরিচিত হইতে থাকে। ১৭৪৮ খৃঃ অব্দে মুহম্মদ শাহের মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্বে তিনি মারাঠা উৎপীড়িত মুসলমানগণ কর্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া পঞ্জাব আক্রমণ করেন; কিন্তু যুবরাজ আহ্‌মদ শাহ (মুহম্মদ শাহের পুত্র) ও উজীর কমাল্-উদ্দীনের হাতে তাঁহার পরাজয় হয়।

আহ্‌মদ শাহ আবদালীর প্রথম আক্রমণ ও পরাজয় (১৭৪৮)

আহ্‌মদ শাহ ও ২য় আলমগীর।—১৭৪৮ খৃঃ অব্দে মুহম্মদ শাহের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র আহ্‌মদ শাহ নির্ব্বিঘ্নেই সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার সময় আহমদ শাহ দুর্‌-রাণীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় অভিযানে (১৭৪৯, ১৭৫১—৫২) দিল্লীর

দ্বিতীয় ও তৃতীয় আক্রমণ, আহ্‌মদ শাহের সিংহাসনচ্যুতি, দুর্‌রাণীর চতুর্থ আক্রমণ

সাম্রাজ্য আরও সঙ্কুচিত হয়। দুর্‌রাণীর প্রভুত্ব মুলতান পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। নিজাম-উল্‌-মুল্কের পৌত্র গাজীউদ্দীন ১৭৫৪ খৃঃ অব্দে আহ্‌মদ শাহকে সিংহাসনচ্যুত ও অন্ধ করিয়া জহান্দর শাহের পুত্র আজিজউদ্দিনকে বাদশাহ পদে অভিষিক্ত করিলেন। আজিজউদ্দিনের নাম হইল ২য় আলমগীর। ১৭৫৬ খৃঃ অব্দে আহ্‌মদ শাহ দুর্‌রাণী চতুর্থবার ভারত আক্রমণ করিলেন।

দিল্লী ও মথুরা লুণ্ঠন (১৭৫৬—৫৭)

পুনরায় দিল্লীর রাজপথ নরনারীর রক্তে রঞ্জিত হইয়া উঠিল। তারপর মথুরা লুণ্ঠন করিয়া দুর্‌রাণী স্বদেশে ফিরিয়া গেলেন (১৭৫৭)। এই বৎসরই বাঙ্গালায় পলাশীর যুদ্ধ ও ইংরাজ শক্তির অটল প্রতিষ্ঠা হয়।

২য় শাহ্ আলম

পরবর্ত্তী বাদশাহগণ।—২য় আলমগীর আততায়ীর হস্তে প্রাণ হারাইলেন (১৭৫৯) এবং তাঁহার পুত্র ২য় শাহ আলম সিংহাসন লাভ করিলেন। এই শাহ আলমকে ধরিয়াই ১৭৬৫ খৃঃ অব্দে ইংরেজ ক্লাইভ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর তরফে বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করেন। ১৭৭১ খৃঃ অব্দে মারাঠাদের আশ্রয়ে শাহ্ আলম দিল্লীতে প্রথম প্রবেশ করিয়া সেখানে বাস করিতে থাকেন। ১৮০৩ খৃঃ অব্দে লর্ড ওয়েলেস্‌লীর আমলে দ্বিতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের সময় সেনাপতি লেক দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করেন। তখন হইতে বাদশাহ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বৃত্তিজীবি হইয়া দাঁড়াইলেন।

২য় আকবর
২য় বাহাদুর শাহ

শাহ আলমের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র ২য় আকবর (১৮০৬—১৮৩৭) ও পৌত্র ২য় বাহাদুর শাহ (১৮৩৭—১৮৫৮) দিল্লীর নাম-সর্ব্বস্ব বাদশাহরূপে কোম্পানীর বৃত্তিভোগ করিতে থাকেন এবং বাদশাহের ন্যায্য টাকা আদায়ের জন্য রাজা রামমোহন রায়কে বিলাতে পাঠান (১৮৩০—৩৩)। সিপাহী বিদ্রোহের সময় (১৮৫৭—৫৮) দিল্লীর বিদ্রোহীরা বাহাদুর শাহকে হিন্দুস্থানের সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিল। বিদ্রোহ দমিত হইলে বাহাদুর শাহ

বাদশাহ পদের অবসান

রেঙ্গুনে নির্ব্বাসিত হইলেন। এইরূপে মুঘল বাদশাহীর অবসান হইল। ১৮৬২ খৃঃ অব্দে রাজ্যহীন, গৃহহীন, হতমান শেষ মুঘল বাদশাহ ২য় বাহাদুর শাহ রেঙ্গুনের কারাগারে অন্ধ শোকাতুর অবস্থায় পরলোক গমন করেন।

মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের কারণ।—প্রকৃতপক্ষে মুঘল-

বাদশাহী আধিপত্য ভারতবর্ষে দুই শতাব্দী কালও স্থায়ী হয় নাই। সুলতানী আধিপত্যের ন্যায় মুঘল সাম্রাজ্যের মূলও তেমন সুদৃঢ় ছিল না। একমাত্র সামরিক শক্তিই ছিল সে বিশাল সাম্রাজ্যের ভিত্তিস্বরূপ, রাষ্ট্র-জীবনের অন্যান্য দিকগুলি এরূপ অবস্থায় বিকাশ লাভ করিতে পারে নাই। বস্তুতঃ সুলতানী আমলে যেরূপ, বাদশাহী আমলেও তদ্রূপ বিজেতা রাষ্ট্রশক্তির সহিত বিজিত জনসাধারণের বিশেষ কোন যোগ ছিল না। সাম্রাজ্যের মধ্যে ঐক্য-চেতনা কিম্বা জাতীয়তাবোধ জাগ্রত হয় নাই। অথচ বাদশাহী সাম্রাজ্য এতদূর বিস্তার লাভ করিয়াছিল যে, জাতীয় ঐক্য-চেতনার বিকাশ ব্যতীত তাহা রক্ষা করা সম্ভব ছিল না। শাসিতের পূর্ণ সহযোগিতা ব্যতীত বিশাল সাম্রাজ্য রক্ষা সম্ভবপর নয়। আকবর হিন্দু-মুসলমানকে যেভাবে একসূত্রে বাঁধিয়া জাতীয়তাবোধে অনুপ্রাণিত করিতে চাহিয়াছিলেন তাহা সাময়িকভাবে ফলপ্রদ হইলেও তাঁহার পরবর্ত্তী সম্রাটগণের অনুদার নীতি ও হিন্দু-বিদ্বেষের ফলে আকবরের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা, বিশেষ স্থায়ী ফল না আনিয়া, দেশব্যাপী বিদ্রোহ ও ব্যর্থতায় পরিণত হয়।

সামরিক শক্তির উপর একান্ত নির্ভরতা

রাষ্ট্রীয় জীবনের অন্তঃসারশূন্যতা

মুঘল সাম্রাজ্যের অত্যধিক বিস্তারও ইহার পতনের আর একটি কারণ। প্রায় সমগ্র ভারতব্যাপী বিশাল সাম্রাজ্যের শাসন এক সম্রাটের পক্ষে একটি মাত্র কেন্দ্র হইতে পরিচালনা করা অসম্ভব ছিল। তাই প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তৃগণ সম্রাটের দুর্ব্বলতার সুযোগ পাইলেই বিদ্রোহী হইতেন। সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থল হইতে দূরবর্ত্তী প্রদেশের বিদ্রোহ দমন সকল সময় সহজ বা সম্ভবপর হইত না। তাই মুঘল শক্তির অবসানের যুগে হিন্দু ও মুসলিম সংগ্রামের ফলে ভারত বহুধা-বিভক্ত ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল।

সাম্রাজ্যের বিশালতা ও সম্রাটের দুর্ব্বলতা

প্রাদেশিক বিদ্রোহ ও

এই সময়ে হিন্দুর জাতীয় জাগরণের ফলেও মুস্লিম সাম্রাজ্য দ্রুত অবনতির পথে অগ্রসর হইল। ঔরঙ্গজীবের অনুদার নীতির জন্য রাজপুত, মারাঠা, শিখ, জাঠ, প্রভৃতি শক্তির অভ্যুদয় ঘটে এবং ইহাদের ঘাত-প্রতিঘাত ও সংঘর্ষের ফলে সাম্রাজ্যের ভিত্তি-মূল শিথিল হইয়া পড়ে। নাদির শাহ ও দুর্‌রাণীর আক্রমণও মুঘল সাম্রাজ্যের আশু পতনের অন্যতম কারণ। ইহা ব্যতীত ঔরঙ্গ-জীবের উত্তরাধিকারিগণ প্রায় সকলেই ছিলেন রাজনৈতিক জ্ঞানে

হিন্দুর নব-জাগ্রত শক্তি

দুর্ব্বল, বিলাসপরায়ণ ও অকর্ম্মণ্য। তাঁহাদের দুর্ব্বলতার সুযোগে প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তৃগণ দিল্লীর অধীনতাপাশ ছিন্ন করিয়া স্ব স্ব প্রধান হইলেন। প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তৃগণের বিদ্রোহ এবং নবজাগ্রত হিন্দুশক্তির আঘাতে দিল্লীর বিশ্ববিশ্রুত সাম্রাজ্য চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গেল। এবং সেই সুযোগে পাশ্চাত্য শক্তি স্থায়ী প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া ভারতবর্ষকে অধীন করিল।

বহিঃশত্রুর আক্রমণ

STUDIES AND QUESTIONS

1. Attempt a rapid survey of the Mughal Empire from the death of Aurangzeb to the invasion of Nadir Shah. (C. U. '18).

2. Enumerate the causes of downfall of the Mughal Empire. (C. U. '10, '25, '27).

3 Compare the invasion of Timur with that of Nadir Shah indicating the results in each case. (C. U '26).

অষ্টবিংশ অধ্যায়

মারাঠা শক্তির বিস্তার

শাহু ও শিবাজীর বংশধরগণ।—শিবাজীর পৌত্র শাহু ১৬৮৯ খৃঃ অব্দ হইতে বাদশাহী দরবারে বন্দী ছিলেন। ঔরঙ্গজীবের মৃত্যুর পর জুল্‌ফিকর খাঁর উপদেশে আজম শাহ্ তাঁহাকে মুক্তিদান করেন (১৭০৭)। শাহু স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে মারাঠা রাজ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব সুরু হইল। রাজারামের মৃত্যুর (১৭০০) পর তাঁহার পুত্র ৩য় শিবাজী মাতা তারাবাঈয়ের অভিভাবকত্বে তখন রাজত্ব করিতেছিলেন। তারাবাঈ শাহুর দাবী অস্বীকার করিলে মারাঠাদের মধ্যে দুই দল হইয়া গেল। অবশেষে বালাজী বিশ্বনাথ নামে এক ব্রাহ্মণের সহায়তায় শম্ভুজীর পুত্র শাহু, ২য় শিবাজী নামে সাতারার রাজা হইয়া বসিলেন (১৭০৮)। রাজারাম ও তারাবাঈয়ের পুত্র ৩য় শিবাজী কোলাপুরে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। ১৭১২ খৃঃ অব্দে ৩য় শিবাজীকে সিংহাসনচ্যুত করা হয়। তাঁহার পুত্র রামরাজা শাহুর দত্তকপুত্ররূপে নামে রাজা হইলেও

মারাঠা রাজ্যে গৃহবিবাদ

শাহুর রাজপদ লাভ (১৭০৮)

৩য় শিবাজী রামরাজা

(১৭৪৯-৭৭) আমৃত্যু সাতারার দুর্গে পেশবাদের হস্তে বন্দীভাবে কাটাইয়া যান। রাজারামের আর এক পত্নীর গর্ভজাত পুত্র ২য় শম্ভুজী ১৭১৪ হইতে ১৭৬০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত কোলাপুরে রাজত্ব করেন। এখনও তাঁহার বংশধরগণ তথায় রাজত্ব করিতেছেন।

২য় শম্ভুজী

বালাজী বিশ্বনাথ (১৭১৪—২০)।—১৭১৪ খৃঃ অব্দে শাহু বালাজী বিশ্বনাথকে পেশবা বা প্রধানমন্ত্রীর পদে নিয়োগ করিলেন। তিনি স্বীয় প্রতিভা ও কর্ম্মদক্ষতাব বলে শীঘ্রই রাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া উঠিলেন।

পেশবা পদ প্রাপ্তি

বাদশাহ ফর্‌রুখসিয়রেব নিকট হইতে বালাজী বিশ্বনাথ শাহুর নামে এক সনন্দ বা ফর্‌মান্‌ আদায় করেন (১৭১৯)। এই সনন্দে সম্রাট মারাঠারাজকে দাক্ষিণাত্যের ছয়টি সুবা (খান্দেশ, বেরার, বিদর, ঔরঙ্গাবাদ, হায়দরাবাদ ও বিজাপুব) হইতে চৌথ ও সরদেশমুখী আদায়ের অধিকার দান করেন। বিনিময়ে শাহু বাদশাহকে বার্ষিক দশ লক্ষ টাকা কব এবং যুদ্ধকালে ১৫ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য দিয়া সাহায্য করিতে স্বীকৃত হন। ইহাতে আদর্শচ্যুতি ঘটিলেও, কার্য্যতঃ দাক্ষিণাত্যের আধিপত্য বাদশাহের হস্ত হইতে মারাঠাদের হাতে চলিয়া যায়।

চৌথ আদায়ের সনন্দ লাভ (১৭১৯)

শিবাজীর পরই মারাঠা রাজ্যে জায়গীর প্রথার পুনঃপ্রবর্ত্তন করা হইয়াছিল, এবং সে সুযোগে জায়গীরদাবেরা নিজ নিজ ক্ষমতা বৃদ্ধি করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। বালাজী প্রত্যেক জায়গীর-দারকে নিয়মিতভাবে চৌথ আদায়ের জন্য বিশিষ্ট কর্ম্মক্ষেত্র নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন এবং তাঁহারাও সানন্দে চারিদিকে লুণ্ঠন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

জায়গীর প্রথা

১৭২০ খৃঃ অব্দে বালাজী বিশ্বনাথের মৃত্যু হইল। তাঁহার সময় হইতেই শিবাজীর বংশধরগণ ক্রমে নিশ্চল জড় পুত্তলিকায় পরিণত হইয়া পড়িলেন এবং পেশবাগণই রাজ্যের প্রকৃত নিয়ামক হইয়া উঠিতে আরম্ভ করিলেন।

মৃত্যু

১ম বাজীরাও (১৭২০—৪০)।—বালাজী বিশ্বনাথের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র বাজীরাও পেশবা পদ লাভ করিলেন। তিনি পিতা অপেক্ষাও কর্ম্মকুশল ছিলেন। বাদশাহী প্রভুত্ব ধ্বংস করিয়া তিনি সমগ্র ভারতে হিন্দুপ্রাধান্য স্থাপনের সঙ্কল্প করিলেন

হিন্দু-পদ-পাদশাহী' আদর্শ

এবং এই উদ্দেশ্যে ভারতময় 'হিন্দু-পদ-পাদ্শাহী' আদর্শ প্রচার করিতে লাগিলেন।

বাজীরাওয়েব 'হিন্দু-পদ-পাদ্শাহী' আদর্শ সহজেই হিন্দুদের চিত্ত আকর্ষণ করিল এবং অনায়াসে মালব ও গুজরাটে মারাঠা প্রভুত্ব স্থাপিত হইল। বুন্দেলখণ্ডের রাজা ছত্রসালকে মুস্লিমদের বিরুদ্ধে সাহায্যদানের বিনিময়ে তাঁহার রাজ্যেব একাংশ মারাঠাদের অধিকারভুক্ত হইয়া গেল। এদিকে দাক্ষিণাত্যেও বাদশাহের সেনাপতি মারাঠাদের নিকট পরাভূত হইলেন। অবশেষে ১৭৩৭ খৃঃ অব্দে মারাঠা সৈন্যদল দিল্লীর উপকণ্ঠে উপনীত হইলে বাদশাহ (মুহম্মদ শাহ) প্রমাদ গণিয়া নিজাম-উল্-মুল্ককে (কমরউদ্দীন) বাজীরাওয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা কবিতে আদেশ দিলেন। নিজামও মারাঠাদের প্রভাব বিস্তারে আপনাকে নিরাপদ মনে করিতে পারিতেছিলেন না। কিন্তু যুদ্ধে নিজামই পরাজিত হইলেন (১৭৩৮)। তারপর মারাঠারা সাল্‌সেটি ও বেসিন হইতে পর্ত্তুগীজদিগকে তাড়াইয়া দিল (১৭৩৯)। নাদির শাহের ভারত আক্রমণে বাজীরাও তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার আয়োজন করিতেছিলেন; এমন সময় মাত্র ৪২ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হইল (১৭৪০)। ১ম বাজীরাও কর্ম্মক্ষমতায় পেশবাদের মধ্যে ছিলেন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

বুন্দেলখণ্ড
দাক্ষিণাত্য
মারাঠাদের দিল্লী প্রবেশ (১৭৩৭)
নিজামের পরাজয় (১৭৩৮)
সাল্‌সেটি ও বেসিন অধিকার (১৭৩৯)

মারাঠা রাজ্যপঞ্চক।—জায়গীর প্রথার পুনঃ প্রবর্ত্তনে বিস্তৃত মারাঠা সাম্রাজ্যের এক এক কেন্দ্রে ক্রমশঃ এক একজন সেনাপতি আপন আপন প্রাধান্য স্থাপন করেন। মালবদেশে রণোজী সিন্ধিয়া এবং মল্‌হর রাও হোলকার বিস্তীর্ণ জায়গীর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের বংশধরগণ আজিও সামন্ত নরপতিরূপে যথাক্রমে গোয়ালিয়র এবং ইন্দোর রাজ্য শাসন কবিতেছেন। এই মালব দেশেই পবাব বংশ একটি ক্ষুদ্র জায়গীর প্রাপ্ত হন; তাঁহাদের রাজধানী ছিল চিরপ্রসিদ্ধ ধারা নগরী। বেরার প্রদেশে রঘুজী ভোঁসলা পেশবাদের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বেই জায়গীর লাভ করিয়াছিলেন। এইভাবে বেরারে ভোঁসলা বংশের প্রতিপত্তি স্থাপিত হয়। পিলাজী গায়কবাড় গুজরাটে প্রতিষ্ঠিত হইলে বরোদার গায়কবাড় রাজ্যের উদ্ভব হয়। এই পাঁচটি রাজ্য ব্যতীত স্বয়ং পেশবার অধীনে রহিল পুনা রাজ্য। বিভিন্ন মারাঠা রাজ্যগুলি পেশবার কর্ত্তৃত্বাধীনে এক

সিন্ধিয়া ও হোলকার
ভোঁসলা, গায়কবাড়, পেশবা

সূত্রে গ্রথিত হইলেও, রাজ্যগুলি এক রকম স্বাধীনই ছিল। এই রাষ্ট্রীয় বিচ্ছিন্নতাই হইল মারাঠা-শক্তির পতনের কারণ।

পেশবা-পদ বংশানুক্রমিক

বালাজী বাজীরাও (১৭৪০—৬১)।—১ম বাজীরাওয়ের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বালাজী বাজীরাও পেশবা নিযুক্ত হইলে পেশবা-পদ বালাজী বিশ্বনাথের উত্তরাধিকারীগণের বংশগত হইয়া পড়ে। ছত্রপতি শাহুও মৃত্যুর পূর্ব্বে পেশবাকে রাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব দান করিয়া যান (১৭৪৯)। বালাজী বাজীরাও পুণায় রাজধানী স্থাপন করিয়া অপ্রতিহত প্রতাপে মারাঠা সাম্রাজ্য শাসন করিতে থাকেন। এই সময়ে তারাবাঈয়ের সহিত পেশবার সংঘর্ষ হয়; পরিশেষে তারাবাঈকে যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করিতে হইল এবং তারাবাঈয়ের পৌত্র রামরাজা আজীবন (১৭৪৯-৭৭) সাতারা দুর্গে পেশবার বন্দী হইয়া থাকেন।

পেশবার সর্ব্বময় কর্তৃত্ব লাভ

তারাবাঈয়ের পরাজয়

১ম বাজীরাও মারাঠা সাম্রাজ্যের আয়তন বাড়াইয়া গেলেও, অবিরত যুদ্ধবিগ্রহের ফলে সরকারী তহবিল প্রায় শূন্য হইয়া আসিয়াছিল। বালাজী পিতার 'হিন্দু-পদ-পাদ্‌শাহী' আদর্শ ত্যাগ করিয়া অর্থসংগ্রহের জন্য মারাঠাদের সনাতন প্রথানুসারে ব্যাপক লুণ্ঠন আরম্ভ করিলেন। তাঁহার পীড়নে হিন্দু-মুসলমান নির্ব্বিশেষে দেশের সকলেই মারাঠাদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠিতে লাগিল; ভারতবর্ষে হিন্দু সাম্রাজ্য স্থাপনের আদর্শ কলুষিত ও বিলুপ্ত হইয়া গেল।

অর্থের জন্য উৎপীড়ন

এদিকে ইব্রাহিম খাঁ ও Bussy প্রভৃতি বিদেশী সৈন্যাধ্যক্ষ নিয়োগ, পাশ্চাত্য রণনীতিতে শিক্ষাদান ও বিদেশী সৈন্য আমদানী করিয়া বালাজী দেশীয় সৈন্য বিভাগ হইতে জাতীয় ভাব ও ঐক্যবোধ লোপ করিয়াছিলেন।

তবুও এই সময়ই মারাঠা সাম্রাজ্য উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিল। বালাজীর ভ্রাতা রঘুনাথ রাও বা রাঘোবা ১৭৫৮ খৃঃ অব্দে অনায়াসে পঞ্জাব অবধি অধিকার করিয়া ফেলিলেন। এদিকে ১ম বাজীরাওয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র সদাশিব রাও নিজাম-উল্‌-মুল্কের পুত্র নিজাম আলীকে পরাজিত করিয়া অসীরগড় ও অন্যান্য কয়েকটি দুর্গ অধিকার করিলেন (১৭৬০)। সামগ্রিক ভাবে সমগ্র ভারতে মারাঠা শক্তি অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিল।

মারাঠা শক্তির চরম বিকাশ

কিন্তু এ সৌভাগ্য স্থায়ী হইল না। রঘুনাথ রাও পঞ্জাব জয় করিযা ফিরিয়া গেলে, আহ্‌মদশাহ দুর্‌রাণী পঞ্চম বার ভারত আক্রমণ করিয়া অনায়াসে পঞ্জাব অধিকার করিয়া ফেলিলেন (১৭৫৯)। তখন পেশবা তাঁহার সপ্তদশ বর্ষীয় পুত্র বিশ্বাস রাওকে সেনাপতি করিয়া এক বিপুল বাহিনী প্রেরণ করেন। সেনাপতির পরামর্শদাতা সদাশিব রাও ছিলেন এই বাহিনীর প্রকৃত পরিচালক।

পানিপথের যুদ্ধের কারণ

পানিপথে উভয় দলের সাক্ষাৎ হইল। উত্তর ভারতের অধিকাংশ মুসলিম রাষ্ট্রনায়কগণ মারাঠাদের অভ্যুদয়ে শঙ্কিত হইয়া একে-একে দুর্‌রাণীর সহিত যোগদান করিলেন। কিন্তু পেশবা-পক্ষ প্রধান প্রধান হিন্দু রাজার সহায়তা হইতে বঞ্চিত হইলেন। কারণ মারাঠাদের অত্যাচারে সকলেই বিরূপ হইয়া উঠিয়াছিলেন। এমন কি রঘুজী ভোঁসলাও সদাশিবের সহিত যোগদান করিলেন না। বিপুল পরাক্রমের সহিত যুদ্ধ করিয়াও অবশেষে মারাঠা সৈন্য সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হইল। বিশ্বাস রাও, সদাশিব রাও এবং প্রায় দুই লক্ষ মারাঠা সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ হারাইলেন। দুঃখে, শোকে, হতাশা ও মর্ম্মবেদনায় বালাজী বাজীরাও অল্পকাল পরেই পুনায় মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন।

পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের ফলাফল

পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে মারাঠা শক্তি একেবারে লোপ না পাইলেও বহুল পরিমাণে খর্ব্ব হইয়া পড়ায় ভারতব্যাপী হিন্দু-সাম্রাজ্য স্থাপনের আশাও নির্ম্মূল হইয়া গেল। এদিকে বহুকষ্টে জয়লাভ করিলেও এই যুদ্ধের ফলে আহ্‌মদ শাহ দুর্‌রাণীর বিশেষ কোন লাভ হয় নাই। সৈন্যদলে বিদ্রোহ উপস্থিত হওয়ায় তাঁহাকে হিন্দুস্থানের বাদশাহীর আশা বিসর্জ্জন দিয়া কাবুলে ফিরিয়া যাইতে হইল। আবার শিখদের অভ্যুদয়ের ফলে পঞ্জাবেও তিনি তাঁহার অধিকার রক্ষা করিতে পারেন নাই। তাঁহার সাহায্যকারী অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা, রোহিলা আফগান, প্রভৃতি মুসলমান রাষ্ট্রনায়কদেরও এই যুদ্ধের ফলে বিশেষ কিছু লাভ হয় নাই। পরবর্ত্তী পেশবা মাধব রাও পুনরায় মারাঠা প্রভুত্ব বিস্তারের চেষ্টা করেন। বাদশাহ আলম মারাঠাদের সাহায্যে ও তাহাদের ক্রীড়াপুত্তলিরূপেই দিল্লী প্রবেশ করিয়াছিলেন। তবুও একথা কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না যে,

পানিপথের পরাজয়ের পর মারাঠা-শক্তি যথেষ্ট দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল এবং সেজন্যই ইংরাজগণ দাক্ষিণাত্য ও বাঙ্গালা দেশে নিজেদের প্রাধান্য বিস্তার করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। পানিপথে দুর্‌রাণীর আকস্মিক জয়লাভ ইতিহাসের একটি সাধারণ ঘটনা, কিন্তু মারাঠাদের পরাজয়ে আমাদের ইতিহাসে এক নবীন ইঙ্গ-ভারতীয় অধ্যায়ের সূচনা হইয়াছে।

STUDIES AND QUESTIONS

1. Sketch the history of the Marhattas from the death of Raja Shahu to the Third Battle of Panipat. (C. U. '15).

2. Sketch the progress of the Marhatta power under the first three Peshwas and indicate the policy adopted by them in overthrowing the Mughal Empire. What led to the eventful fall of the Marhatta power. (C. U. '17, '27, '30).

3. "The year 1761 is a turning-point in the history of India".—Explain. (C. U. '23, '26).

ঊনত্রিংশ অধ্যায়

বাদশাহী যুগের অবস্থা

স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র, সামরিক শাসন

শাসন-প্রণালী।—সুলতানী আমলের শাসন-ব্যবস্থার সঙ্গে বাদশাহী শাসনের পার্থক্য বিশেষ কিছুই ছিল না,—দুই ছিল 'স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র', আর সামরিক শক্তি ছিল উভয়েরই ভিত্তি। সুতরাং সুলতানী আমলে সম্রাটের সঙ্গে তাঁহার মন্ত্রী, কর্ম্মচারী ও প্রজাদের যেরূপ সম্বন্ধ ছিল, বাদশাহী আমলেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। দুই একটি সুলতানের ন্যায় কোন কোন বাদশাহ যদিও এরূপ মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন যে, রাজ-কোষের অর্থ প্রজাদেরই গচ্ছিত সম্পত্তি তথাপি উভয় ক্ষেত্রেই

শাসনকার্য্যের সহিত জনসাধারণের বিশেষ সংযোগ ছিল না। তবুও এক বিষয়ে সুলতানী আমল হইতে বাদশাহী আমলে আমরা আদর্শের পার্থক্য দেখিতে পাই। সুলতানী আমল ছিল এদেশে তুর্কী-শাসনের প্রথম পর্ব্ব, তাই সুলতানী আমলের প্রথমে দুইটি স্বতন্ত্র জাতি পরস্পরের সম্মুখীন হওয়াতে বিরোধের ভাবই প্রবল আকার ধারণ করে। তারপর বহু যুগের দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইবার পর যখন একদেশবাসী উভয় সম্প্রদায়ের অজ্ঞাতসারেই মিলনগ্রন্থি রচিত হইয়া আসে, তখন আমরা দেখি বাদশাহী আধিপত্যের বিস্তার। সাহিত্যে, সামাজিক আচার-ব্যবহারে, এমন কি ধর্ম্মানুষ্ঠানেও হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে তখন অনেক সমন্বয় ও সামঞ্জস্য আসিয়া গিয়াছে। মহানুভব আকবর সেই মিলনের সূত্রেই ভারতবর্ষের বিভিন্ন জাতিকে বাঁধিতে চাহিয়াছিলেন। এই দিক দিয়া দেখিলে বাদশাহী শাসনে আমরা জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় আদর্শের প্রগতি দেখিতে পাই। সুলতানী শাসনের সহিত বাদশাহী শাসনের এই খানেই প্রকৃত পার্থক্য ছিল। আর প্রধানতঃ এই জন্যই শাহ্‌জহান এবং ঔরঙ্গজীবের সাময়িক হিন্দুবিদ্বেষ সত্ত্বেও বাদশাহী আধিপত্য এদেশে প্রায় শত বৎসর টিকিতে পারিয়াছিল। ঔরঙ্গজীব যদি আকবরের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতেন তাহা হইলে সম্ভবতঃ উহা আরও কিছু কাল স্থায়ী হইত। বাদশাহী যুগে শাসনকর্ত্তাগণ মাঝে মাঝে প্রজাদের উপর অত্যাচার করিলেও, মোটের উপর শান্তি-

বাদশাহী আমলে শাসনাদর্শের অগ্রগতি
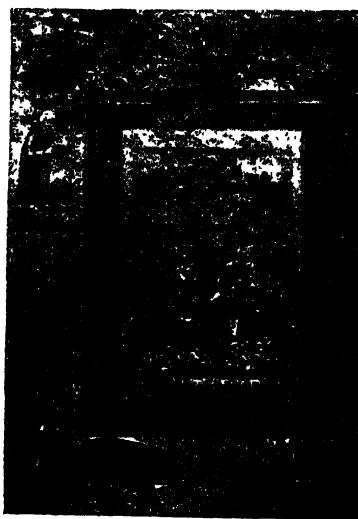
বাদশাহী যুগের চিত্রশিল্প

রক্ষার ফলে ও দ্রব্যাদির মূল্য অত্যন্ত সস্তা হওয়ায়, এবং জীবন-যাত্রার মানদণ্ড (Standard of living) অপেক্ষাকৃত নিম্ন থাকায়, জনসাধারণ সুখে-স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করিত।

বাজপক্ষী [জনৈক মুসলিম চিত্রকর কর্তৃক অঙ্কিত]

ইন্দো-পারসিক কলাপদ্ধতি

শিল্পোন্নতি।—মুঘল বাদশাহের পৃষ্ঠপোষকতায় ভারতবর্ষে সঙ্গীত, স্থাপত্য ও চিত্রকলার প্রভূত উন্নতি হইয়াছিল। বিশেষজ্ঞগণ এ-যুগের কলাপদ্ধতির নাম দিয়াছেন, 'ইন্দোপারসিক' শিল্প। হুমায়ূনের সমাধি, ফতেপুর সিক্রীর সুরম্য প্রাসাদসমূহ, ইতিমাদ্-উদ্দৌলার কবর, শাহ্‌জহানের দেওয়ান-ই-খাস, দেওয়ান-ই-আম্, জাম-ই-মস্‌জিদ্, মোতি মস্‌জিদ, তাজমহল, প্রভৃতি উহার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এ যুগের চিত্রশিল্পীদের মধ্যে উস্তাদ মুনসুর, আব্দুস সামাদ, মীর সৈয়দ আলী, আবুল হসন, বিষণ দাস, কেশব, মাধব, প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সঙ্গীতে তানসেন অমর হইয়া আছেন।

বাবুর, জহাঙ্গীর গুলবদন বেগম

সাহিত্য।—তৈমুর বংশের একটি প্রধান বিশেষত্ব সাহিত্যিক প্রতিভা। বাদশাহদের মধ্যে বাবুর এবং জহাঙ্গীর আত্মজীবনী রচনা করিয়া গিয়াছেন। হুমায়ুনের এক ভগ্নী গুলবদন বেগম, ভ্রাতার রাজত্বকালের এক ইতিহাস রচনা করিয়াছিলেন। দারা শিকোও ধর্ম্ম ও দর্শন সম্বন্ধীয় কয়েকখানি পুস্তক রচনা করেন এবং উপনিষদের পারসিক অনুবাদ প্রকাশ করেন। ঔরঙ্গজীবের বিদুষী কন্যা জেবউন্নিসা ফার্সীভাষায় চমৎকার কবিতা রচনা করিয়া

দারা শিকো

জেবউন্নিসা

যশস্বিনী হইয়া গিয়াছেন। কন্যার মনীষায় মুগ্ধ হইয়া ঔরঙ্গজীব চার লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া এক অপূর্ব্ব গ্রন্থাগার নির্ম্মাণ করাইয়া কন্যাকে উপহার দেন। আকবরের সমসাময়িক লেখকদের মধ্যে ফৈজী, আবুল ফজল, প্রভৃতির কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। ঐতিহাসিক ফিরিস্তাও সেই সময়েরই লোক। ঔরঙ্গজীবের রাজত্বকালে প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক খাঁফি খাঁ আবির্ভূত হন। তাঁহার প্রকৃত নাম ছিল মুহম্মদ হাসিম। ঔরঙ্গজীব ইতিহাস রচনা নিষেধ করিয়া দেওয়ায় তিনি 'খাঁফি খাঁ' এই ছদ্মনামে ইতিহাস লিখিতে থাকেন।

ফৈজি আবুল ফজল ফিরিস্তা খাঁফি খাঁ

এ-যুগে অনেক হিন্দু লেখকও পারসিক ভাষায় কয়েকখানি চমৎকার পুস্তক রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে রায় ভারমল, ভীমসেন, সুজনরাব ক্ষত্রি, ঈশ্বরদাস নাগর, প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ভারমল ভীমসেন, সুজন ঈশ্বরদাস

লৌকিক ভাষারও এই সময় যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। হিন্দি সাহিত্যে রাম-চরিত-মানস-রচয়িতা তুলসীদাস ও সুরসাগরের লেখক সুরদাসের নাম পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। কেশবদাস, ভূষণ, প্রভৃতি সাহিত্যিকগণ হিন্দি সাহিত্যে অমর। হিন্দি পদ্মাবতী-রচয়িতা মালিক মুহম্মদ জয়সী ও পদাবলী-রচয়িতা "রসখান", এবং দোহা-রচয়িতা খান্‌খানা বা আবদার রহিম হিন্দি সাহিত্যে যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এই সময়েই আবার বঙ্গসাহিত্যে রামায়ণ-রচয়িতা কৃত্তিবাস, মহাভারত-রচয়িতা কাশীরাম দাস, কবি-কঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী, কবিচন্দ্র শঙ্কর চক্রবর্ত্তী, ঘনরাম, এবং বাঙ্গালা পদ্মাবতী-রচয়িতা আলোয়াল, প্রভৃতি বহু মুসলমান কবির আবির্ভাব হয়। রামদাস, তুকারাম, বামন, মহীপতি, ময়ুর পণ্ডিত, সেখ মুহম্মদ, প্রভৃতির কল্যাণে মারাঠি সাহিত্যও এই সময় যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছিল। মারাঠি ভাষায় অনেকগুলি ইতিহাসও এই সময় রচিত হইয়াছিল।

হিন্দি সাহিত্য বাঙ্গালা সাহিত্য মারাঠি সাহিত্য

বিদেশী পর্য্যটকগণের বিবরণ।—বাদশাহী আমলে কয়েক জন বিচক্ষণ ইউরোপীয় পর্য্যটক ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের ভ্রমণ বৃত্তান্তে এদেশ সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান্ তথ্য পাওয়া যায়।

রাল্‌ফ ফিচ

রাল্‌ফ্ ফিচ ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিকে এদেশে আসেন

তিনি বলেন, আগ্রা ও ফতেপুর সিক্রী দুইটি শহরই তখন লণ্ডন হইতে বৃহৎ ছিল। ১৫৮৩ খৃঃ অব্দে বাখরগঞ্জ জেলার বাকলা নামক ক্ষুদ্র শহরটির বিশাল সুরম্য অট্টালিকা এবং প্রশস্ত রাজপথ দেখিয়া তিনি বিশেষ মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

হাতীর লড়াই (বাদশাহীযুগের চিত্রশিল্প)

উইলিয়ম হকিন্স

জহাঙ্গীরের রাজত্বকালে উইলিয়ম হকিন্স এদেশে আসেন। বাদশাহের অপরিমিত সম্পদের পরিচয় পাইয়া তিনি বিস্মিত হইয়াছিলেন। তিনি অনুমানে লিখিয়া গিয়াছেন যে, সম্রাটের বার্ষিক রাজস্ব ছিল অন্যূন ৫০ কোটি টাকা।

স্যার টমাস রো

জহাঙ্গীরের রাজত্বকালে স্যার টমাস রো (Sir Thomas Roe) ইংলণ্ডের রাজা ১ম জেম্‌সের দূতরূপে বাদশাহের দরবারে আগমন করেন। তিনি ১৬১৫ খৃঃ অব্দ হইতে ১৬১৯ খৃঃ অবধি এখানে ছিলেন। রো জহাঙ্গীরের ব্যক্তিগত জীবন হইতে আরম্ভ করিয়া বহু বিষয়েই অনেক কিছু লিখিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহার বর্ণনায় অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য জানিতে পারা যায়। রো লিখিয়াছেন, জহাঙ্গীর দিনে তিনবার করিয়া দরবার করিতেন; দ্বিপ্রহরে হস্তী এবং অন্যান্য পশুর

জহাঙ্গীর সম্বন্ধে রো

খেলা দেখিতেন ; অপরাহ্ন বেলা চারিটা হইতে সন্ধ্যা পাঁচটা-ছয়টা পর্য্যন্ত প্রার্থীদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করিতেন। রাত্রি নয়টা হইতে দ্বিতীয় প্রহর অবধি তিনি রাজ্যের শ্রেষ্ঠ লোকদের সহিত আলাপ-আলোচনা করিয়া কাটাইয়া দিতেন। সপ্তাহে একদিন করিয়া বাদশাহ বিচার করিতে বসিতেন এবং ধৈর্য্যের সহিত সকল পক্ষের কথা শুনিয়া নিজের বিবেচনা অনুসারে অপরাধীদের শাস্তি দিতেন। বাদশাহের হুকুমেই শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ হইত। প্রাদেশিক শাসকগণ প্রায়ই উৎপীড়ক ছিলেন। বিশেষ করিয়া বন্দরগুলিতে স্বেচ্ছাচারের মাত্রা ছিল অত্যধিক। পাশ্চাত্য জাতির শক্তি-সামর্থ্যের বিষয় কিছু না জানিয়া সে যুগের উদ্ধত মুসলিম শাসকগণ ইংরেজ ও অন্য ইউরোপীয় বণিকদের নিকট হইতে অত্যধিক কর অযথা আদায় করিতেন ; মৃত ব্যক্তিদের বিষয়-সম্পত্তি রাজকীয় সম্পদরূপে পরিগণিত হইত। রাজস্ব, উপঢৌকন এবং মৃত ব্যক্তিদের সম্পত্তি হইতে বাদশাহের অত্যধিক আয় হইত কিন্তু সাধারণ প্রজাদের দুঃখ লাঘব হইত না।

ফ্রান্সিস্কো পেলসেট

ফ্রান্সিস্কো পেলসের্ট (Francisco Pelsaert) নামে জনৈক ডাচ্ বণিক জহাঙ্গীরের রাজত্বের শেষ দিকে এদেশে আসিয়াছিলেন। তাঁহার বর্ণনা হইতে জনসাধারণের অবস্থা সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে পারা যায়। প্রাদেশিক শাসকগণের অত্যাচারে এবং রাজস্ব-আদায়কারী কর্ম্মচারীদের উৎপীড়নে প্রজা ও কৃষকগণ নিতান্ত দুরবস্থায় দিন কাটাইত। শ্রমিক ও মজুরদের উপরও উৎপীড়ন কম হইত না। তাহাদিগকে জোরজবরদস্তি করিয়া সারাদিন খাটাইয়া যৎসামান্য মজুরী দেওয়া হইত। রাজ্যের সম্ভ্রান্ত কর্ম্মচারী ও অভিজাত ব্যক্তিরা প্রায়ই অর্দ্ধমূল্যে জিনিষপত্র খরিদ করিতেন বলিয়া দোকানদারদের অবস্থাও বিশেষ উন্নত ছিল না ; বাঙ্গালা দেশ তখন তুলা ও রেশম চাষের জন্য বিখ্যাত ছিল। আকবরের ন্যায় সম্রাট জহাঙ্গীরও জৈন ও হিন্দুদের মনোরঞ্জনের অভিপ্রায়ে সাম্রাজ্যে গো-হত্যা ও পর্ব্ব-দিবসে প্রাণীবধ নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন।

জনসাধারণের দুরবস্থা

জহাঙ্গীরের গোহত্যা নিষেধ

তাভার্ণিয়ে (Tavernier) নামে জনৈক ফরাসী জহরত-ব্যবসায়ী সম্রাট শাহ্‌জহানের রাজত্বকালে ভারতবর্ষে আগমন

তাভার্ণিয়ে

করেন। তাঁহার বিবরণে বাদশাহের ঐশ্বর্য্যের কথা সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। শাহ্‌জহানের ময়ূরাসনের এক বিস্তৃত বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছেন যে, আসনখানির মূল্য দশ লক্ষ টাকারও অনেক বেশী; ঔরঙ্গজীবের মণিমুক্তা দেখিবার সৌভাগ্যও তাঁহার হইয়াছিল। তিনি লিখিয়াছেন, মুঘল বাদশাহের সাতখানি মণি-রত্নখচিত সিংহাসন আছে; সেগুলির মধ্যে একখানি আগাগোড়া হীরক-শোভিত। বাঙ্গালার রেশম-শিল্পের কথাও তিনি উল্লেখ করিয়াছেন।

বাদশাহের অতুল ঐশ্বর্য্য

ফরাসী নাট্যকার (Moliere) এর সহপাঠি বের্ণিয়ে (Bernier) নামে একজন ফরাসী চিকিৎসক এদেশে বার বৎসর (১৬৫৬—৬৮) কাটাইয়া যান। বাদশাহী সাম্রাজ্যের বিপুল বৈভব দর্শনে তিনিও বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছিলেন। তিনিও প্রাদেশিক শাসকদের অত্যাচার ও কৃষকদের দুরবস্থার কথা লিখিয়া গিয়াছেন। ঔরঙ্গজীবের মনীষা ও কর্ম্মশক্তি সম্বন্ধে তাঁহার অত্যন্ত উচ্চ ধারণা ছিল। তিনি ঔরঙ্গজীবকে "অসাধারণ প্রতিভাশালী ক্ষণজন্মা পুরুষ" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনাতেও বাঙ্গালাদেশের তুলা ও রেশমশিল্পের অনেক কথা জানিতে পারা যায়। বাঙ্গালার চাউল ও চিনি তখন নানা দেশের অভাব মিটাইত। তবে বাঙ্গালা দেশে তখন পর্ত্তুগীজ জলদস্যুরা অত্যন্ত উৎপাত করিত।

বের্ণিয়ে
বাদশাহী ঐশ্বর্য্য
ঔরঙ্গজীবের প্রতিভা,
বাঙ্গালা দেশ

মানুচ্চি (Manucci) নামে একজন ইতালীয় পর্য্যটকও ঔরঙ্গজীবের রাজত্বকালে ভারতবর্ষে আগমন করেন। তিনি ছিলেন সম্পূর্ণরূপে ভাগ্যান্বেষী; এদেশে নানা স্থানে তিনি চিকিৎসক এবং গোলন্দাজের কাজ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনা হইতেও আমরা প্রাদেশিক শাসকদের অত্যাচার এবং জনগণের দুরবস্থার কথা জানিতে পারি।

মানুচ্চির বিবরণ

এই সকল ইউরোপীয় পর্য্যটকদের বিবরণ একত্র করিলে দেখা যায়, বাদশাহী আমলে অভিজাত শ্রেণী অপরিমেয় বিলাসে কাল কাটাইতেন, আর দেশের জনসাধারণের প্রচুর দুরবস্থা ছিল। অথচ দেশে বাণিজ্যশ্রী ও শস্যসম্পদের অভাব ছিল না। তবে জনসাধারণের জীবনযাপনের মানদণ্ড ছিল নিম্ন এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিও ছিল অত্যন্ত সুলভ। সুতরাং তাহারা যে অত্যন্ত

বাদশাহী আমলে দেশের অবস্থা

দুঃখ-দুর্দ্দশায় দিন কাটাইত ইহাও মনে করিবার কোনও সঙ্গত কারণ নাই। বরং পাশ্চাত্য বণিকদের শাসন ও শোষণের যুগে (১৭০০-১৮০০) সাধারণ মানুষের অভাব ও অবনতি যেন চরমে পৌঁছিয়াছিল। দেশীয় শিল্প-সম্পদ ধ্বংস করিয়া পাশ্চাত্য বাণিজ্যের প্রসার সাধনই এই অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কূট বুদ্ধির মূল স্বরূপ।

STUDIES AND QUESTIONS

1. When did Sir Thomas Roe and Bernier visit India? What accounts of India have been given by them? (C. U. '10, '13, '15, '22).

2. Briefly describe the condition of the Mughal Empire from what you gather from the accounts left by European travellers in the 17th century. (C. U. '19, '28).

3. Give an account of the art, architecture and literature of the Mughal period.

বর্ত্তমান যুগের সূচনা

ত্রিংশ অধ্যায়

ইউরোপীয় বণিকদিগের আগমন

পর্ত্তুগীজদের আগমন।—ভারতে সুনির্দ্দিষ্ট ইতিহাসের সূচনা হয় আর্য্যদের উত্তর-পশ্চিম গিরিপথ দিয়া ভারত প্রবেশে এবং ক্রমশঃ আর্য্য অধিকার ও সভ্যতা বিস্তারে। আর্য্যদের সামাজিক রীতি ও দর্শন-বিজ্ঞান-চর্চ্চার ফলে গড়িয়া উঠে হিন্দু সংস্কৃতি ও শাস্ত্র এবং সহস্রাধিক বৎসর কাল ভারতে আর্য্য-অনার্য্য সংমিশ্রণে উদ্ভব হয় বিচিত্র হিন্দু জাতি। হিন্দুর জন্মভূমি বলিয়াই ভারতের অন্য এক নাম হিন্দুস্থান। তারপর অষ্টম শতকে এ উত্তর পশ্চিম প্রদেশ দিয়া আবার ভারতে প্রবেশ করে পশ্চিম এসিয়ার নব দীক্ষিত মুসলমানগণ, তাহাদের ছিল স্বতন্ত্র ধর্ম্ম, ভাষা ও আচার-অনুষ্ঠান। ফলে সংঘর্ষ অনিবার্য্য হইয়া ওঠে এবং হিন্দুদের দমন করিয়া মুসলমানগণ ভারতবর্ষে পাশাপাশি অথচ পৃথকভাবে বাস আরম্ভ করে। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষে ভারতকে আবার বিক্ষুব্ধ করে ইউরোপীয় জাতির আবির্ভাব। তাহারা আসিয়াছিল ব্যবসায় ব্যপদেশে সমুদ্র বাহিয়া দক্ষিণ পথ দিয়া। মুসলমানদের মত তাহাদের সহিতও হিন্দুদের সংস্কৃতিগত বা ধর্ম্মগত কোন যোগ ছিল না। তথাপি বিজ্ঞানের উৎকর্ষে এবং প্রবল মনন ও কর্ম্মশক্তির প্রভাবে উদ্যমহীন ধর্ম্মজড় ভারতীয় মনকে ইউরোপীয়েরা, বিশেষ করিয়া ইংরাজরা সবলে ধাক্কা দিয়া যেন আমূল পরিবর্ত্তনের সূচনা করিয়াছে। প্রবীণ ভারতের বুকে নবীন ইউরোপীয় জাতিগণের অধিষ্ঠান আধুনিক ইতিহাসের এক বিস্ময়কর অধ্যায়। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে ইউরোপীয় বণিকগণ আরবগণের মধ্যস্থতা উপেক্ষা করিয়া ভারতবর্ষের সহিত প্রত্যক্ষ বাণিজ্য-সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য উৎসুক হইয়া উঠিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের পথ আবিষ্কার করিবার

বার্থোলোমিউ ডিয়াজ

জন্য পর্তুগালের রাজসরকার নাবিকদিগকে যথেষ্ট সাহায্য করিতে লাগিলেন। ১৪৮৮ খৃঃ অব্দে বার্থোলোমিউ ডিয়াজ নামে জনৈক পর্তুগীজ নাবিক আফ্রিকার উপকূল বাহিয়া অবশেষে 'উত্তমাশা' অন্তরীপে পৌছান। ইতালীয় কলোম্বাস্ স্পেনরাজ্যের আনুকূল্যে ভারতের বাণিজ্যপথ আবিষ্কার করিতে বারবার প্রয়াস পান এবং ঘটনাক্রমে আমেরিকা আবিষ্কার (১৪৯২) করিয়া তাহার নাম দেন ইণ্ডিস্। আসল ভারতবর্ষকে পর্তুগীজ ভাস্কো-ডা-গামা জানাইয়া দিলে আমেরিকার নূতন নাম হইল ওয়েষ্ট ইণ্ডিস্ (West Indies) এবং এশিয়ার ভূখণ্ডকে ইষ্ট ইণ্ডিস্ লেখা সুরু হয়। ডিয়াজের পথ অনুসরণ করিয়া ১৪৯৮ খৃঃ অব্দে বিশ্ববিশ্রুত পর্তুগীজ নাবিক ভাস্কো-ডা-গামা ভারতের উপকূলে আসিয়া উপনীত হন এবং কালিকটে অবতরণ করেন। ১৫০০ খৃষ্টাব্দে কাব্রাল (Cabral) নামে আর একজন প্রসিদ্ধ পর্তুগীজ নাবিক কালিকটে এক বাণিজ্য-কুঠি স্থাপন করিলেন। আরবেরা পর্তুগীজদের বিরোধিতা করায় কালিকটের হিন্দুরাজা সামদ্রিণ 'জামোরিণ' ও তাহাদের প্রতি বিরূপ হইয়া উঠিলেন।

ভাস্কো-ডা-গামা (১৪৯৮)

১৫০৯ খৃঃ অব্দে অল্‌বুকার্ক এদেশে পর্তুগীজদের গবর্ণর নিযুক্ত হন। তিনিই ছিলেন ভারতবর্ষে পর্তুগীজ শক্তির প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। ১৫১০ খৃঃ অব্দে তিনি গোয়া বন্দরটি অধিকার করিয়া লইলেন। ভারতবর্ষে তাহাই হইল ইউরোপীয় অধিকারের প্রথম সূত্রপাত। দাক্ষিণাত্যের সিয়াদের সহিত উত্তরের সুন্নীদের এবং সাধারণভাবে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে ক্রমান্বয় সংঘর্ষের ফলে ক্রমশঃ পর্তুগীজদের আধিপত্য বাড়িতে লাগিল। সালসেট্টি, বেসিন, দমান, দিউ, চৌল, বোম্বাই, সান্‌থোম (মাদ্রাজের নিকটে), ও সিংহলের বহু স্থানে এবং বাঙ্গালায় হুগলী, চট্টগ্রাম প্রভৃতি বন্দরে তাহারা বাণিজ্য-কুঠি এবং উপনিবেশ স্থাপন করিল। এজন্য বাঙ্গালা ভাষায় অনেক পর্তুগীজ শব্দ মিশিয়া গিয়াছে। পর্তুগীজ রমণীদের ভারতে আসিবার নিয়ম ছিল না কাজেই ভারতীয় রমণীদেরই তাহারা সঙ্গিনী বা স্ত্রীরূপে গ্রহণ করিত— ফলে বহু পর্তুগীজ ভারতবাসীদের সহিত একেবারে মিশিয়া গিয়াছে। ইঙ্গ-ভারতীয়দের মত স্বতন্ত্র গণ্ডী সৃষ্টি করে নাই। কিন্তু

অল্‌বুকার্ক গোয়া অধিকার (১৫১০)

পর্তুগীজদের উপনিবেশ বিস্তার

পর্ত্তুগীজদের পরধর্ম্ম-বিদ্বেষ, দুর্নীতি ও অকথ্য অত্যাচারের ফলে ভারতীয় রাজা ও প্রজারা অতিষ্ঠ হইয়া ওঠে। এই দোষেই এশিয়ায় বিরাট পর্ত্তুগীজ সাম্রাজ্য শীঘ্র নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়। অথচ পারস্য উপসাগর হইতে সুদূর চীন ও জাপান পর্য্যন্ত তাহারা অধিকার বিস্তার করে। এদিকে পর্ত্তুগীজরা অন্যান্য ইউরোপীয় জাতিকেও ভারতবর্ষে আসিয়া ব্যবসাবাণিজ্য করিতে দিতে চাহিত না। তখন একদিকে অন্যান্য ইউরোপীয় জাতির জলপথে প্রতিকূলতা এবং স্থলপথে ভারতীয় রাজাদের সহিত সংঘর্ষের ফলে অধিকাংশ বন্দর হইতে পর্ত্তুগীজদিগকে বিদায় লইতে হইল। অথচ পর্ত্তুগাল সরকারের কোন সাহায্য পাইল না। এখন কেবল গোয়া, দমান ও দিউ পর্ত্তুগীজদের অধিকারে রহিয়াছে। কিন্তু এক সময়ে পর্ত্তুগীজরা সমুদ্রবিজয়ী জাতি বলিয়া সত্যই গর্ব্ব করিতে পারিত। অতলান্তিক জয় করিয়া প্রশান্ত মহাসাগর জয়েও তাহারাই ছিল পথিকৃৎ। ১৫১৩ খৃঃ অব্দে স্পেনের **Balboa** পানামার কাছে আসিয়া প্রথম প্রশান্ত মহাসাগর আবিষ্কার করেন এবং পর্ত্তুগীজ **Magellan** দক্ষিণ আমেরিকার উপকূল প্রদক্ষিণ করিয়া (১৫২০) প্রশান্ত মহাসাগর প্রায় উত্তীর্ণ হন ও ফিলিপীন দ্বীপে প্রাণত্যাগ করেন (১৫২১)।

উভয় সঙ্কট

ভারতে পর্ত্তুগীজ অধিকারের অবসান

অন্যান্য ইউরোপীয় জাতি।—পর্ত্তুগীজদের দেখাদেখি অন্যান্য ইউরোপীয় জাতিও ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিবার জন্য উদ্যোগ করিতে লাগিল। ১৬০০ খৃঃ অব্দের ৩১শে ডিসেম্বর ইংরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী রাণী এলিজাবেথের নিকট হইতে 'পূর্ব্ব-সমুদ্রে' বাণিজ্যের একাধিকার লাভ করেন। ইহার কিছু পূর্ব্বে উক্ত রাণীর রাজত্বকালে ইংরেজ নাবিকগণ স্পেন রাজ্যের নৌবহর (**Armada**) ধ্বংস করিয়া স্পেনীয় সাম্রাজ্যের ভিত্তি কাঁপাইয়া দেন এবং **Drake** প্রমুখ ইংরাজ নৌ-বীরগণ পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে বিশ্বব্যাপী করিয়া তুলিতে প্রয়াস পান। ১৬০২ খৃঃ অব্দে ওলন্দাজ ডাচ্‌গণ ইউনাইটেড ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী গঠন করেন। ১৬১৬ খৃঃ অব্দে দিনেমার বা ডেনগণ ভারতবর্ষে বাণিজ্যার্থ আর একটি কোম্পানী গঠন করেন। ১৬৬৪ খৃঃ অব্দে ফ্রেঞ্চ ইণ্ডিয়া কোম্পানী গঠিত হয়।

ইংরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী (১৬৬০)

ডাচ্ ইউনাইটেড ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী (১৬০২)

ডেনিস কোম্পানী (১৬১৬)

ফ্রেঞ্চ কোম্পানী (১৬৬৪)
ফ্লাণ্ডার্সের অষ্টেণ্ড কোম্পানী (১৭২২)
সুইডেনের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী (১৭৩১)

তারপর ১৭২২ খৃঃ অব্দে বেলজিয়ামের ফ্লেমিশ বণিক্‌গণ অষ্টেণ্ড কোম্পানী নাম দিয়া নিজেদের এক বণিক-সঙ্ঘ গঠন করেন এবং সর্ব্বশেষে ১৭৩১ খৃঃ অব্দে সুইডেনের বণিকরা আর একটি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী গঠন করেন। এই সকল বণিক-সঙ্ঘের মধ্যে ফ্লাণ্ডার্সের অষ্টেণ্ড কোম্পানী ব্যবসায়ে কখনই বিশেষ সুবিধা করিয়া উঠিতে পারে নাই, আর সুইডেনের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্য চলিত প্রধানতঃ চীন দেশের সঙ্গে। অন্যান্য কোম্পানী-গুলি ভারতবর্ষেই আপনাদের কর্ম্মক্ষেত্র প্রসার করিতে চেষ্টা সুরু করিল।

ডাচ্‌দের অধিকার

ক্যাথলিক ফরাসী ও পর্ত্তুগীজদের প্রতিদ্বন্দ্বী হইল প্রটেষ্টাণ্ট ডাচ্ (ওলন্দাজ) ও ইংরেজগণ। ডাচ্‌রা মান্দ্রাজের উত্তরে পলিকট নামক স্থানে তাহাদের প্রথম বাণিজ্যকুঠি নির্ম্মাণ করে (১৬০৯)। পরে মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির নাগপত্তন (Negapatam) নামক স্থানে তাহাদের প্রধান কেন্দ্র স্থাপিত হয় (১৬৬০)। এই সময়ে ডাচ পণ্ডিত Abraham Roger হিন্দুধর্ম্ম ও ভর্ত্তৃহরির কাব্য নিদর্শন অবলম্বনে একটি গ্রন্থ মাদ্রাজ (Paliacatta) প্রচার-কেন্দ্র হইতে রচনা করেন (১৬৩০-৬৩)। পঞ্চতন্ত্রের পর ইহাই ইউরোপে প্রথম সংস্কৃত "শতক" কাব্যের নমুনা হিসাবে প্রসিদ্ধ। ইহার প্রায় এক শতাব্দী পরে ফরাসী পণ্ডিত DuPerron "আবেস্তা" ও "উপনিষৎ" গ্রন্থ এবং ইংরাজ Wilkins "ভগবদ্ গীতা" প্রকাশ করিলেন এবং ক্রমশঃ ভারতের ধর্ম্ম ও সাহিত্য সম্বন্ধে পাশ্চাত্যগণ সজাগ হইয়া উঠিলেন। কিন্তু ভারতবর্ষে ডাচ্‌দের ক্ষমতা খুব বেশী ছিল না; তাহাদের প্রধান কর্ম্মক্ষেত্র ছিল সুমাত্রা, জাভা, বোর্ণিও, সেলিবিস, প্রভৃতি দ্বীপময় ভারত (Insul India) অথবা প্রাচ্য দ্বীপপুঞ্জ (East Indies); ১৬১৯ খৃঃ অব্দে তাহারা জাভার অন্তর্গত বাতাভিয়ায় (Batavia) কুঠি স্থাপন করে। একালে উহাই ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিজের রাজধানী। এইখানে ডাচ্ পণ্ডিতরা এসিয়ার সর্ব্বপ্রথম ঐতিহাসিক গবেষক সমিতি Batavia Society (১৭৭৮) প্রতিষ্ঠিত করেন।

১৬৭৬ খৃঃ অব্দে কলিকাতার নিকটে শ্রীরামপুরে দিনেমারদের প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র স্থাপিত হয়। কিন্তু ব্যবসায়ে সুবিধা না

হওয়ায় ১৮৪৫ খৃঃ অব্দে তাহারা বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের কাছে তাহাদের কুঠিগুলি বিক্রয় করিয়া চলিয়া যায়। Rev. Carey, Dr. Marshman, প্রভৃতি ব্যাপটিষ্ট মিশনারীদের বিখ্যাত শ্রীরামপুর কলেজটি ১৯ শতাব্দীর গোড়ায় শ্রীরামপুরে স্থাপিত হয় এবং ইহার দলিলে ডেনরাজের দানপত্র উদ্ধৃত আছে।

পর্ত্তুগীজদের পর ডাচ, ইংরেজ ও ফরাসী এই তিনটি জাতিই 'পূর্ব্ব-সমুদ্রে' আধিপত্য করিতে লাগিল। একই কর্ম্মক্ষেত্রে বিভিন্ন জাতির বণিকগণ বাণিজ্য করিতে থাকায় তাহাদের মধ্যে কলহ ও বিরোধ অবশ্যম্ভাবী। ডাচগণ সিংহল ও বিশাল প্রাচ্য-দ্বীপপুঞ্জ লইয়া বিশেষ ব্যস্ত থাকায়, ভারতবর্ষে ইংরেজ ও ফরাসীরা পরস্পরের বিরোধিতা করিতে লাগিল। সমুদ্রে পর্ত্তুগীজ ও অন্যান্য ইউরোপীয়দের গতি প্রতিহত করার চেষ্টা একমাত্র ভারতীয় বিভিন্ন নাবিক ও বণিক-সঙ্ঘই করিয়াছিলেন। তবে সমবেত-ভাবে কোন প্রচেষ্টা হয় নাই। সে সময়ে গুজরাটি, মালাবারি, মারাঠা এবং বাঙ্গালার রণপোত এবং বাণিজ্য জাহাজের কর্ম্ম-তৎপরতা ও দৌরাত্ম্যে ইউরোপীয় বণিক-রাষ্ট্র সদাই সন্ত্রস্ত থাকিত। কিন্তু কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রনীতির অভাবে এবং স্থানীয় রাজাদের উদাসীনতার জন্য ভারতীয় নাবিক-সঙ্ঘ ঐক্যবদ্ধ হইয়া যুদ্ধ করিবার সুযোগ পায় নাই। ভারতীয় নাবিকদের এত শৌর্য্য, সাহস ও রণদক্ষতা মুঘল রাজারা কোন কাজেই লাগাইতে পারিলেন না। ফলে দলে দলে ভারতীয় নাবিকগণ ইউরোপীয় জাহাজে কর্ম্ম গ্রহণ করিয়া তাহাদেরই শক্তি বৃদ্ধি করিল। ভারত স্বাধীনতা হারাইল।

সুরাটে কুঠি স্থাপন। ১৬১২)

ইংরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী।—১৬১২ খৃঃ অব্দে ইংরেজগণ গুজরাটের মুঘল শাসনকর্ত্তার নিকট হইতে সুরাট, কাম্বে ও অন্যান্য দুইটি স্থানে বাণিজ্যের অনুমতি লাভ করেন। ঐ বৎসরই এক জলযুদ্ধে পর্ত্তুগীজদিগকে পরাজিত করিয়া ইংরেজ বণিকগণ সুরাটে এক কুঠি স্থাপন করেন। তারপর ১৬১৫ খৃঃ অব্দে আর একটি জলযুদ্ধে ইংরেজদের হাতে পর্ত্তুগীজদিগকে আবার পরাজয় স্বীকার করিতে হয় এবং ১৬২২ খৃঃ অব্দে ইংরেজ-গণ পর্ত্তুগীজগণের নিকট হইতে পারস্য উপসাগরে ওরমুজ বন্দর

পর্ত্তুগীজদের পতন

অধিকার করেন। এই পরাজয়ের পর "পূর্ব্ব সমুদ্রে" পর্ত্তুগীজদের প্রভুত্ব চিরদিনের মত বিনষ্ট হইয়া যায়।

মাদ্রাজ (১৬৩৯)

১৬৩৯ খৃঃ অব্দে ফ্রান্সিস ডে নামে জনৈক ইংরেজ স্থানীয় নায়কের নিকট হইতে করমণ্ডল উপকূলে কিছু জমির ইজারা লাভ করেন। সেখানে একটি বাণিজ্য-কুঠি এবং সেণ্ট জর্জ্জ নামে এক দুর্গ স্থাপিত হয়। কালক্রমে এখানেই মাদ্রাজ সহরটি গড়িয়া উঠে। ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্লস পর্ত্তুগাল রাজকুমারী ক্যাথারিনকে বিবাহ করিয়া যৌতুকস্বরূপ বোম্বাই দ্বীপ লাভ করেন (১৬৬১)। চার্লস বাৎসরিক মাত্র দশ পাউণ্ড খাজনায় উহা

বোম্বাই (১৬৬৮)

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে ইজারা দিয়া দিলেন (১৬৬৮)। ধীরে ধীরে পশ্চিম উপকূলে বোম্বাই ইংরাজদের প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র

কলিকাতা (১৬৯০)

হইয়া উঠিল। ১৬৯০ খৃঃ অব্দে জব চার্ণক নামে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একজন কর্ম্মচারী ভাগীরথী নদীর তীরে সুতানুটী, গোবিন্দপুর, কালীঘাট, প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রাম লইয়া কলিকাতা নগরী স্থাপন করিলেন। এখানে একটি দুর্গ স্থাপন করিয়া ইংলণ্ডের রাজা ৩য় উইলিয়মের নামানুসারে তাহার নাম রাখা হইল ফোর্ট উইলিয়ম।

ভারতের রাজনীতি-ক্ষেত্রে যে দুর্যোগ ঘনাইয়া আসিতেছে তাহা কোম্পানীর সুচতুর, কর্ম্মপটু ও দূরদর্শী ডিরেক্টর স্যার যোশিয়া চাইল্ড বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তখন নাদির শাহের আক্রমণে মুঘলশক্তি বিধ্বস্ত, শিবাজীর মৃত্যুতে মারাঠাজাতি বিচ্ছিন্ন ও লুণ্ঠনপরায়ণ এবং অন্যান্য রাজন্যবর্গ দুর্ব্বল ও পরস্পর বিবদমান। এই অপূর্ব্ব সুযোগে ভারতে ইংরাজরাজ প্রভুত্ব ও অধিকার বিস্তারিত হইল। ভারতে ইউরোপীয় রাজত্ব পত্তনের কথা প্রথম পর্ত্তুগীজ গবর্ণর অলবুকার্ক, পরে ডাচ গবর্ণর সোয়েন এবং ফরাসী গবর্ণর ডুপ্লে ভাবিয়াছিলেন। অবশেষে কিন্তু ইংরাজ স্বপ্নই সত্যে পরিণত হইল।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ভারত-বাণিজ্যে কল্পনাতীত লাভ দেখিয়া ১৬৯৮ খৃঃ অব্দে আর একটি ইংরেজ কোম্পানী রাজার নিকট হইতে বাণিজ্যের সনন্দ লইয়া ভারতবর্ষে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। একই দেশের দুইটি কোম্পানীর মধ্যে প্রতিযোগিতা

আরম্ভ হওয়ায় উভয় কোম্পানী একত্র সংযুক্ত (১৭০২) হইয়া 'ইউনাইটেড কোম্পানী' নামে ব্যবসা চালাইতে লাগিলেন।

ইংরেজ ইউনাইটেড কোম্পানী

ফরাসীদের ইণ্ডিয়া কোম্পানী।—ফরাসীরা ইংরেজদের অনেক পরে 'পূর্ব্ব-সমুদ্রের' ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ করেন। ১৬৬৮ খৃঃ অব্দে তাঁহারা প্রথম সুরাটে একটি কুঠি স্থাপন করেন; পর বৎসর (১৬৬৯) মসুলিপত্তনে আর একটি কুঠি স্থাপিত হয়। তারপর মান্দ্রাজের অনতিদক্ষিণে কিছু জমি ইজারা লইয়া মার্টিন ও লেস্‌পিনে নামে দুইজন বণিক আর একটি বাণিজ্য-কেন্দ্র স্থাপন করেন। এখানেই পণ্ডিচেরী শহর গড়িয়া উঠে (১৬৭৩-৭৪)। ১৬৭৪ খৃঃ অব্দে বাঙ্গালার নবাব ফরাসীদিগকে চন্দননগর দান করেন এবং তাঁহারা সেখানে কুঠি নির্ম্মাণ করিয়া বাণিজ্য করিতে থাকেন। কিন্তু ফরাসীরা ব্যবসায়ে কখনও ইংরেজদের সমকক্ষ হইয়া উঠিতে পারেন নাই। তদুপরি ফরাসী গবর্ণমেণ্টের অনভিজ্ঞতা ও অযথা হস্তক্ষেপের ফলে তাহাদের বাণিজ্যের অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। শেষে ১৭২০ খৃঃ অব্দে নূতন করিয়া কোম্পানীর গঠন করিতে হয়। পর বৎসর (১৭২১) ভারত মহা-সাগরের মরিশাস্ দ্বীপ ফরাসীদের অধিকারে আসে। ইহার পর তাঁহারা মালাবার উপকূলের মাহে (১৭২৫) এবং করমণ্ডল উপকূলের কারিকল (১৭৩৯) অধিকার করেন। বর্ত্তমানে মাহে, কারিকল, পণ্ডিচেরী, ইয়ানন (গোদাবরীর মোহনায়) এবং চন্দননগর এখন ফরাসী গণতন্ত্রের অধীন।

সুরাট
মসুলিপত্তন
পণ্ডিচেরী
চন্দননগর
ফরাসী কোম্পানীর পুনর্গঠন
মরিশাস
মাহে

STUDIES AND QUESTIONS

1. Briefly review the trade relations between India and the West from the earliest times down to the 18th century.

2. When and how were the following towns founded : Madras, Bombay, Calcutta ?

একত্রিংশ অধ্যায়

ইঙ্গ-ফরাসী সংঘর্ষ ও বৃটিশ শক্তির অভ্যুদয়

ডুপ্লে।—ফরাসীরা যে ভারতের রাজনীতি-ক্ষেত্রে বিশেষ প্রভাব-প্রতিপত্তি স্থাপন করিয়াছিল ইহার মূলে ছিলেন ডুপ্লে। প্রথমে তিনি ছিলেন চন্দননগরের গবর্ণর এবং সেখানকার Dupleix College আজও তাঁহার স্মৃতিস্বরূপ রহিয়াছে। ১৭৪২ খৃঃ অব্দে তাঁহাকে পণ্ডিচেরীর গবর্ণর নিযুক্ত করা হয়। ডুপ্লে ভারতীয় রাজন্যবর্গের আভ্যন্তরীণ দুর্ব্বলতার কথা জানিতেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, একদল ভারতীয় সৈন্যকে ইউরোপীয় পদ্ধতিতে শিক্ষিত করিয়া লইলে অনায়াসে ভারতবর্ষে ফরাসী সাম্রাজ্য স্থাপন করা যাইতে পারে। সুতরাং তিনি তদনুযায়ী কার্য্য করিতে লাগিলেন কিন্তু ইহা সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই ইউরোপে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়া গেল (১৭৪২)। এই যুদ্ধ 'অষ্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার সংক্রান্ত যুদ্ধ' (War of the Austrian Succession) নামে পরিচিত। সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষেও ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে বিবাদ বাধিয়া গেল।

ডুপ্লের উচ্চাকাঙ্খা

ইউরোপে ইঙ্গ-ফরাসী যুদ্ধ

প্রথম কর্ণাট যুদ্ধ (প্রথম ইঙ্গ-ফরাসী সংঘর্ষ)।—ইউরোপে ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে যুদ্ধ বাধিলে, ভারতবর্ষে ইংরেজগণ পণ্ডিচেরী আক্রমণের উদ্যোগ করে (১৭৪৫)। বর্ত্তমান মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত কর্ণাটের নবাব আনোয়ারউদ্দীনকে কূট-নীতিক ডুপ্লে হাত করিয়াছিলেন; আনোয়ারউদ্দীন তাঁহার রাজ্যের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ করিতে ইংরেজগণকে নিষেধ করিয়া পাঠাইলেন। এদিকে ফরাসী নৌ-সেনাপতি ও মরিশাসের শাসনকর্ত্তা মাহে-দ্য-লা বুরদনে (Mahe-de-la-Bourdonnais) সমুদ্র হইতে অত-র্কিতে গোলাবর্ষণ করিয়া মাদ্রাজ অধিকার করিলেন (১৭৪৬)। তিনি ইংরেজদের নিকট হইতে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ চারি লক্ষ পাউণ্ড পাইলে মাদ্রাজ ছাড়িয়া দিতে স্বীকৃত হন। কিন্তু ডুপ্লে তাহাতে সম্মত হইলেন না। নবাবকে মাদ্রাজ সমর্পণ করিবার কোনও অভিপ্রায় কূটনীতিক ডুপ্লের নাই দেখিয়া আনোয়ারউদ্দীন

ইংরেজদের পণ্ডিচেরী আক্রমণের উদ্যোগ, আনোয়ার-উদ্দীন, লা-বুরদনে কর্ত্তৃক মাদ্রাজ অধিকার (১৭৪৬), ডুপ্লের বিরুদ্ধে আনোয়ার উদ্দীন,

ফরাসীদেব বিরুদ্ধে দশ হাজার সৈন্য প্রেরণ করিলেন; কিন্তু ডুপ্লে মাত্র পাঁচশত সৈন্যের সহায়তায় মান্দ্রাজের নিকটে মৈলাপুর নামক স্থানে কর্ণাট বাহিনীকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিলেন। তারপর ডুপ্লে ইংরেজদের সেণ্ট ডেভিড দুর্গ (মান্দ্রাজেব একশত মাইল দক্ষিণে) অধিকার করিতে গিয়া ব্যর্থকাম হন। কিন্তু ১৭৪৮ খৃঃ অব্দে ইংরাজরাও পণ্ডিচেরী আক্রমণ করিতে গিয়া পরাভূত হইয়া ফিবিয়া আসিলেন। এই বৎসরই ইউরোপের আয়-লা-শাপেল (Aix-la-Chapelle) নামক স্থানে ফরাসী ও ইংরেজদের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হইলে ইংবেজগণ মান্দ্রাজ ফিরিষা পাইলেন।

আনোয়ার উদ্দীনের পরাজয়
ডুপ্লের সেণ্ট ডেভিড দুর্গ জয়েব ব্যর্থ প্রয়াস,
ইংরেজদেব পণ্ডিচেরী জযের ব্যর্থ প্রয়াস,
সন্ধি

২য় কর্ণাট যুদ্ধ।—প্রথম কর্ণাট-যুদ্ধে শেষ অবধি কোন লাভ না হইলেও, ফরাসীদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বাড়িয়াছিল। মহোৎসাহে ডুপ্লে এবার তাঁহার অভীষ্টসিদ্ধির জন্য দাক্ষিণাত্যের রাজন্যবর্গের গৃহবিবাদে হস্তক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

কর্ণাটের নবাব আনোয়ারউদ্দীন নিজাম কর্ত্তৃক সেখানকার নাবালক নবাবের অভিভাবক নিযুক্ত হইয়া আসিয়াছিলেন (১৭৪৪)। কিছুদিন পরে তিনি নাবালক নবাবকে হত্যা করিয়া নিজেই কর্ণাটের নবাব হইয়া বসিলেন। কিন্তু কর্ণাটের পূর্ব্বতন এক নবাবের জামাতা হুসেন দোস্ত খাঁ বা চাঁদা সাহেব নবাবী দাবী করিলেন। এদিকে ১৭৪৮ খৃঃ অব্দে নিজামের মৃত্যু হইলে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র নাজির জঙ্গ এবং দৌহিত্র মুজফ্‌ফর জঙ্গ সিংহাসন লইয়া বিবাদ বাধাইয়া দিলেন।

ইংরেজ ও ফরাসীদের সম্মুখে এক চমৎকার সুযোগ আসিয়া উপস্থিত হইল। ডুপ্লে মুজফ্‌ফর জঙ্গ ও চাঁদা সাহেবের পক্ষ অবলম্বন করিলেন, ইংরেজগণ নাজির জঙ্গ এবং আনোয়ার-উদ্দীনের পক্ষ সমর্থন করিতে লাগিলেন। ফরাসীদের সহায়তায় মুজফ্‌ফর জঙ্গ ও চাঁদা সাহেব আনোয়ারউদ্দিনকে পরাজিত ও নিহত করিলে, আনোয়ারউদ্দীনের পুত্র মুহম্মদ আলী ত্রিচিনো-পল্লীতে পলায়ন করিলেন। ইংরেজগণ মুহম্মদ আলীকে কর্ণাটের নবাব বলিয়া মানিয়া লইলেন। নাজির জঙ্গ এক যুদ্ধে মুজফ্‌ফরকে

কর্ণাটের নবাবী লইয়া চক্রান্ত,
চাঁদা সাহেব,
নিজামী লইয়া কলহ,
নাজির জঙ্গ ও মুজফ্‌ফর জঙ্গ,
ডুপ্লে কর্তৃক মুজফ্‌ফর জঙ্গ ও চাঁদা সাহেবকে সমর্থন,
আনোয়ারউদ্দীনের পরাজয় ও মৃত্যু,
মুহম্মদ আলী,

নাজির জঙ্গের মৃত্যু, মুজফ্‌ফর জঙ্গের সিংহাসন লাভ,

বন্দী করিয়াছিলেন ; কিন্তু শীঘ্রই আততায়ীর হস্তে তাঁহার প্রাণ গেল। মুজফ্‌ফর জঙ্গ হায়দরাবাদের সিংহাসনে বসিলেন (১৭৫০)। দাক্ষিণাত্যে ফরাসী প্রতিপত্তি সাময়িকভাবে স্থাপিত হইল। মুজফ্‌ফর দুপ্লেকে দক্ষিণে সমুদয় ভূভাগের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত
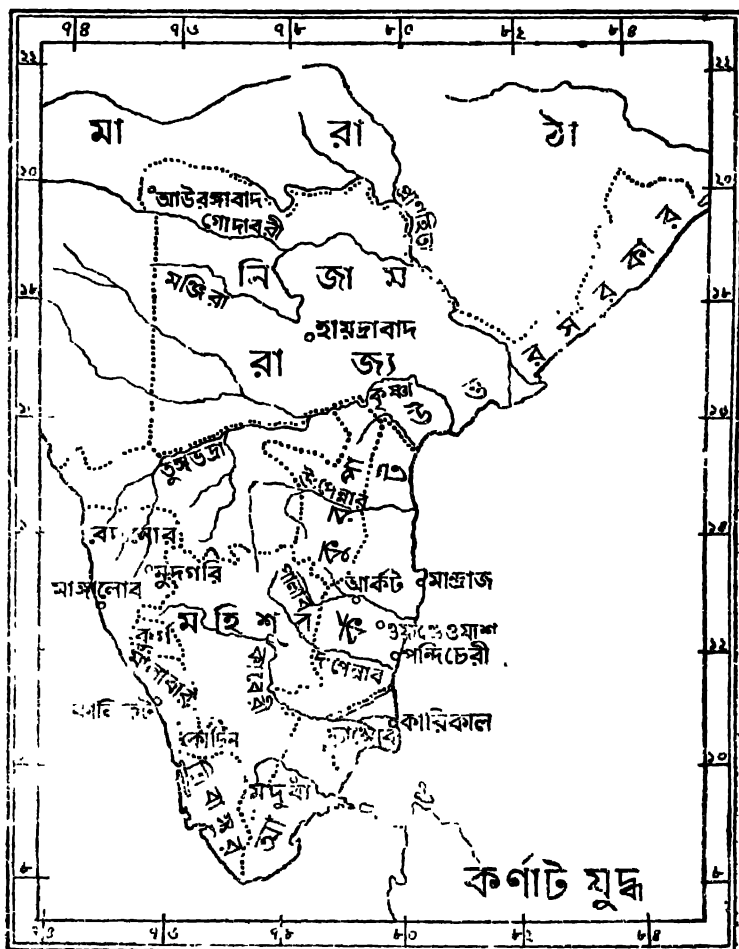
করিলেন এবং মসুলিপত্তন অঞ্চল ফরাসীদিগকে দান করিলেন। অধিকন্তু ডুপ্লের ভাগ্যে একটি জায়গীর এবং নগদ দুই লক্ষ পাউণ্ড পুরস্কারও জুটিল। অল্পকাল পরে মুজফ্‌ফর জঙ্গ বিদ্রোহীদের হস্তে প্রাণ হারাইলে ফরাসী সেনাপতি ব্যুসী (Bussy) নিজাম-উল্-মুল্কের তৃতীয় পুত্র সলাবৎ জঙ্গকে সিংহাসনে বসাইলেন(১৭৫১) এবং সসৈন্যে হায়দরাবাদে বাস করিতে লাগিলেন। ফরাসী সৈন্যদলের ব্যয়-নির্ব্বাহের জন্য 'উত্তর সরকার' নামক ভূমিভাগের রাজস্ব নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইল। আনোয়ারউদ্দীনের মৃত্যুর পর চাঁদা সাহেবকে কর্ণাটের নবাবী দেওয়া হইয়াছিল। তিনি ত্রিচিনোপল্লীতে মুহম্মদ আলীকে অবরোধ করিয়া ফেলিলেন। দাক্ষিণাত্যে ফরাসীদের প্রতিপত্তি বিস্তার যখন প্রায় সম্পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে তখন একজন বিচক্ষণ ইংরেজ সেনাপতির অভ্যুদয়ে তাহা বিনষ্ট হইয়া গেল।

ডুপ্লেকে পুরস্কার, চাঁদা সাহেবের নবাবী লাভ, মুজফ্‌ফর জঙ্গ নিহত, সলাবৎ জঙ্গের রাজ্যলাভ, সেনাপতি ব্যুসী ত্রিচিনোপল্লীতে, মুহম্মদ আলী অবরুদ্ধ

রবার্ট ক্লাইভ।—১৭৪২ খৃঃ অব্দে রবার্ট ক্লাইভ নামে অষ্টাদশ বর্ষীয় এক ইংরেজ যুবক ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে নিম্নতন কেরাণীর একটি পদ লইয়া ভারতবর্ষে আগমন করেন। লা-বুরদনে যখন মাদ্রাজ অধিকার করেন তখন ক্লাইভ কিছু সামরিক অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। পরে যখন চাঁদা সাহেব ত্রিচিনোপল্লীতে মুহম্মদ আলীকে অবরোধ করিলেন, তখন ক্লাইভ ইংরেজ কর্ত্তৃপক্ষের অনুমতি লইয়া মাত্র তিনশত ভারতীয় সিপাহী আর দুইশত ইংরেজ সৈন্যসহ চাঁদা সাহেবের রাজধানী আর্কট আক্রমণ করিয়া অনায়াসে আর্কট দখল করিলেন। চাঁদা সাহেবের পুত্র রাজা সাহেব আর্কট উদ্ধার করিতে আসিয়া ক্লাইভের প্রতাপে যখন ফিরিয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, তখন অতর্কিত আক্রমণে ক্লাইভ তাঁহার সৈন্যদল ছিন্নভিন্ন করিয়া দিলেন এবং ত্রিচিনোপল্লীর দিকে অগ্রসর হইলেন। চাঁদা সাহেব এবং ফরাসীদের মিলিত বাহিনী তাঁহার হস্তে পরাভব স্বীকার করিল। মুহম্মদ আলী আর্কটের নবাব হইলেন (১৭৫২)। কর্ণাটে ইংরেজ-প্রাধান্য স্থাপিত হইল।

পূর্ব্ব পরিচয়

আর্কট আক্রমণ

রাজা সাহেবের ব্যর্থতা, মুহম্মদ আলীর নবাবী লাভ ও কর্ণাটে ইংরেজ প্রাধান্য

ডুপ্লের শেষজীবন।—ডুপ্লে তখনও যুদ্ধ চালাইতে লাগিলেন। ফ্রান্সের কর্ত্তৃপক্ষ ডুপ্লের কার্য্যাবলীতে শঙ্কিত হইয়া তাঁহাকে স্বদেশে

ডুপ্লেকে প্রত্যাবর্ত্তনের নির্দ্দেশ, ডুপ্লের কৃতিত্ব,

আহ্বান করিয়া পাঠাইলে হতাশ অন্তঃকরণে তিনি দেশে ফিরিয়া গেলেন (১৭৫৪)। ডুপ্লে এদেশে ফরাসী-সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন কিন্তু জীবদ্দশায় তিনি স্বদেশবাসীর কৃতজ্ঞতা বা প্রশংসা অর্জ্জন করিতে পারেন নাই। অথচ কার্য্যক্ষেত্রে তিনি যথেষ্ট কৃতিত্বের ও প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। ফরাসী

ডুপ্লের অকৃতকার্য্যতার কারণ

গবর্ণমেণ্টের অজ্ঞতা, অদূরদর্শিতা এবং সমরোপকরণ ও অর্থের অভাবই ছিল তাঁহার ব্যর্থতার মূল কারণ। ক্লাইভের ন্যায় তিনি যদি অবস্থানুযায়ী সমস্ত সুযোগ-সুবিধা ও সাহায্য পাইতেন, বলা যায় না পরবর্ত্তী ইতিহাস কি ভাবে লিখিত হইত।

[illegible]পের সপ্ত[illegible] মহাসমর

৩য় কর্ণাট যুদ্ধ—ইঙ্গ-ফরাসী সংঘর্ষের দ্বিতীয় অধ্যায়।—১৭৫৬ খৃঃ অব্দে ইউরোপে 'সপ্তবর্ষের সমর' (Seven Years' War) আরম্ভ হইয়া গেল। ভারতবর্ষেও ফরাসী এবং ইংরেজগণ যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। কাউণ্ট লালী (Count Lally)

কাউণ্ট লালী

নামে জনৈক অভিজাত ব্যক্তিকে ফরাসী গবর্ণমেণ্ট গবর্ণর নিযুক্ত করিয়া ভারতবর্ষে প্রেরণ করিলেন (১৭৫৮)। ইতিমধ্যে ইংরেজরা পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া (১৭৫৭) কার্য্যতঃ বাঙ্গালায় নিজেদের সর্ব্বময় কর্তৃত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন। ইউরোপের ইঙ্গ-ফরাসী সংঘর্ষের সংবাদ এদেশে পৌঁছিবামাত্রই ইংরেজরা চন্দননগর আক্রমণ

ইংরেজদের সুযোগ-সুবিধা আর ফরাসী-দের অসুবিধা

করেন। লালী এদেশে আসিয়াই সেণ্ট ডেভিড দুর্গ অধিকার করিয়া ফেলিলেন (১৭৫৮)। কিন্তু তাঁহাকে নানারূপ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে কার্য্য করিতে হইয়াছিল। সমুদ্রপথে ইংরেজরা ছিল অপ্রতিদ্বন্দ্বী; অথচ ডুপ্লের ন্যায় লালীও স্বদেশ হইতে কোনরূপ সাহায্য পাইতেছিলেন না। তবুও সেণ্ট ডেভিড দুর্গের পতনের পর লালী বিপুল বিক্রমে তাঞ্জোর আক্রমণ করিলেন। তাঞ্জোরের পতনও প্রায় নিশ্চিতই ছিল, কিন্তু যথাসময়ে ইংরেজ নৌ-বহর আসিয়া পড়ায় লালীর চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া গেল। নিরুপায় হইয়া

ব্যুসীর নিজাম রাজ্য ত্যাগ

লালী নিজাম রাজ্য হইতে ব্যুসীকে আহ্বান করিলেন। ব্যুসী হায়দরাবাদ ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে সেখান হইতে ফরাসীদের প্রভাব চিরদিনের মত অন্তর্হিত হইয়া গেল। ক্লাইভ বাঙ্গালা দেশ

মসুলিপত্তনের পতন (১৭৫৯)

হইতে কর্ণেল ফোর্ডকে মসুলিপত্তন আক্রমণ করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন (১৭৫৯)। মসুলিপত্তন ইংরেজদের অধিকারে আসিল

নিজাম রাজ্যে ইংরেজ প্রাধান্য স্থাপন, বন্দিবাসের যুদ্ধে আয়ার কূটের হাতে লালীর পরাজয় (১৭৬০), পণ্ডিচেরীর পতন, প্যারীর সন্ধি (১৭৬৩), ফরাসী প্রাধান্যের অবসান

আর সঙ্গে সঙ্গে নিজাম ইংরেজদের সহিত সন্ধি করিয়া, যে সকল স্থান পূর্ব্বে ফরাসীদের উপহার দিয়াছিলেন, সেগুলি এবার ইংরেজদের দিলেন। তারপর ক্লাইভ কর্ণাট প্রদেশে স্যার আয়ার কূটকে সেনাপতি নিয়োগ করিয়া পাঠাইলেন। বন্দিবাসের যুদ্ধে আয়ার কূট সম্পূর্ণরূপে লালীকে পরাভূত করিলেন (১৭৬০)। বঙ্গদেশে পলাশীর যুদ্ধের ন্যায় দাক্ষিণাত্যে বন্দিবাসের যুদ্ধ একটি বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ঘটনা। তারপর এক একটি করিয়া ফরাসী উপনিবেশগুলি ইংরেজদের হস্তগত হইতে লাগিল। দীর্ঘ নয় মাস অবরোধের পর ১৭৬১ খৃঃ অব্দে পণ্ডিচেরী নগরীরও পতন হয়। ১৭৬৩ খৃঃ অব্দে ইউরোপে 'প্যারীর সন্ধি' (Treaty of Paris) অনুসারে সপ্তবর্ষের সমর নিবৃত্ত হইল। ফরাসীরা তাহাদের উপনিবেশগুলি ফিরিয়া পাইল, কিন্তু ভারতবর্ষে ফরাসীদের প্রভুত্ব চিরদিনের মত বিনষ্ট হইয়া গেল।

ফরাসী গবর্ণমেণ্টের উদাসীনতা ও প্রতিকূলতা

ফরাসীদের ব্যর্থতার কারণ।—ভারতবর্ষে ফরাসীদের ব্যর্থতার প্রধান কারণ, ইউরোপে ফরাসী কর্ত্তৃপক্ষের ভারতবর্ষের ব্যাপারে উদাসীনতা ও অজ্ঞতা এবং ইংরেজদের প্রবলতর নৌ-শক্তি। এদেশে ইংরেজগণ স্বদেশ হইতে যেরূপ সাহায্য পাইতেন, ফরাসীরা সেরূপ তো পাইতই না, বরং অনেক সময় কর্ত্তৃপক্ষ তাহাদের বিরুদ্ধতা করিতেও ছাড়িতেন না। পক্ষান্তরে ইংলণ্ডের গবর্ণমেণ্ট ভারতীয় ইংরেজ কর্ত্তৃপক্ষকে স্বাধীনভাবে কার্য্য করিবার সুযোগ দিতেন। এজন্য তাঁহারা অবস্থানুযায়ী নীতি অবলম্বন করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অসামান্য সফলতালাভে সক্ষম হইয়াছেন। উপনিবেশগুলির উপর ফরাসী গভর্ণমেণ্টের সর্ব্ববিষয়ে হস্তক্ষেপের ফলে ফরাসী সাম্রাজ্য-বিস্তারের প্রচেষ্টা বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছিল; অধিকন্তু বাণিজ্যেরও প্রভূত ক্ষতি সাধিত হইয়াছিল। জলপথে ইংরেজদের নৌ-বহর উৎকৃষ্টতর ছিল আর ইউরোপ হইতে সুদূর ভারতে আধিপত্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে জলপথে প্রাধান্য স্থাপন ছিল সর্ব্বপ্রথম প্রয়োজন। ইংরেজশক্তি প্রয়োজনানুসারে ইংলণ্ড হইতে ভারতে সৈন্য ও রণসম্ভার পাঠাইয়া ভারতীয় ইংরেজদিগকে সাহায্য করিয়াছে; কিন্তু ইংরেজ নৌ-বহরের প্রতিকূলতায় ফরাসীগণ স্বদেশ হইতে আবশ্যক মত সাহায্য পান নাই। এদিকে ৩য় কর্ণাট

ইংরেজদের নৌ-শক্তির উৎকৃষ্টতা

ফরাসীদের অর্থাভাব

যুদ্ধের পূর্ব্বেই ইংরেজরা সমস্ত বাঙ্গালাদেশে আধিপত্য স্থাপন করেন; তাই যুদ্ধের সময় তাঁহাদের কখনও অর্থাভাব হয় নাই। অথচ লালী কখনও প্রয়োজনানুরূপ অর্থসংগ্রহ করিতে পারেন নাই। তাই, কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে, ইংরেজদের পলাশী যুদ্ধে জয়লাভের জন্যই বন্দিবাসের যুদ্ধে ফরাসীদের পরাভব ঘটিয়াছিল। আর ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ধনসম্পদপূর্ণ বাঙ্গালাদেশ হইতেই ইংরেজদের প্রভুত্ব সমগ্র ভারতে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে।

STUDIES AND QUESTIONS

1. Sketch the career and policy of Dupleix in founding a French Empire in India. (C.U. '17,'21,'35).
2. Briefly describe the struggle between the English and the French for supremacy in Southern India. (C. U. '18, '33, '35).

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়

বৃটিশ শক্তির অভ্যুদয়

(প্রথম পর্ব্ব)

বঙ্গদেশে বৃটিশ প্রভুত্ব—মহীশূরে হায়দর আলীর অভ্যুত্থান

মুর্শিদকুলী খাঁ

মুর্শিদকুলী খাঁ ও বাঙ্গালার নবাবগণ।—ঔরঙ্গজীবের রাজত্বকালে মুর্শিদকুলী খাঁ বাঙ্গালার দেওয়ান হইয়াছিলেন। ১৭০৩-৪ খৃঃ অব্দে তিনি এখানকার সুবাদার হন। তাঁহার রাজধানী ছিল মুর্শিদাবাদ। ১৭২৫ কিম্বা ১৭২৭ খৃঃ অব্দে মুর্শিদকুলী খাঁর মৃত্যু হইলে বাদশাহী ফরমানের বলে তাঁহার জামাতা সুজাউদ্দীন বাঙ্গালার নবাব হন। সুজাউদ্দীন ন্যায়পরায়ণতার জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। ১৭৩৯ খৃঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র সরফরাজ খাঁ নবাব হইলেন। কিন্তু পিতার ন্যায় তাঁহার

সুজাউদ্দীন

সরফরাজ খাঁ

যোগ্যতা ছিল না। কয়েক মাসের মধ্যেই বিহারের শাসনকর্ত্তা আলীবর্দ্দী খাঁ তাঁহাকে পরাজিত ও নিহত করিয়া বাঙ্গালা অধিকার করিলেন এবং বাদশাহ মুহম্মদ শাহকে প্রচুর উপঢৌকন দিয়া তাঁহার নিকট হইতে এক ফরমান আদায় করিয়া লইলেন। তাঁহার কর্ম্মকুশলতার অভাব ছিল না; স্বাধীনভাবেই তিনি শাসনকার্য্য চালাইতে লাগিলেন। তখন ছিল মারাঠাদের অভ্যুত্থানের যুগ। মারাঠা বর্গীর অত্যাচারে আলীবর্দ্দী অত্যন্ত বিব্রত হইয়া উঠিলেন। বহু যুদ্ধ-বিগ্রহের পর তাহাদের হাতে উড়িষ্যার একাংশ ছাড়িয়া দিয়া এবং বার্ষিক ১২ লক্ষ টাকা চৌথ দিবার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া তিনি মারাঠাদের সহিত সন্ধি করিলেন (১৭৫১)। বাঙ্গালা দেশ বর্গীর অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইল।

আলীবর্দ্দী খাঁ

সিরাজউদ্দৌলা।—১৭৫৬ খৃঃ অব্দে আলীবর্দ্দী খাঁর মৃত্যুর পর তাঁহার দৌহিত্র মির্জ্জা মুহম্মদ বা সিরাজউদ্দৌলা ২৪ বৎসর বয়সে বাঙ্গালার নবাব হন। মসনদে আরোহণের অল্পকাল পরেই তাঁহার সহিত ইংরেজের বিবাদ বাধিয়া গেল। সিরাজউদ্দৌলা হয়ত কর্ম্মদক্ষ বা সাহসী ছিলেন না কিন্তু বুদ্ধিমান্ ছিলেন। ইংরাজ শক্তি ও প্রভুত্ব যে তাঁহার রাজ্য-গ্রাসে অগ্রসর হইতেছে তাহা তিনি স্পষ্ট বুঝিয়াছিলেন। বাঙ্গালা দেশে তখন ইংরেজদের কুঠি ছিল কলিকাতায়, ফরাসীদের কুঠি চন্দননগরে, আর ডাচদের চুঁচুড়ায়। ইউরোপীয় বণিকরা তখন শুধু বাণিজ্যই করিতেন না, দেশের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহেও লিপ্ত হইতেন। আলিবর্দ্দী তাঁহাদিগকে দুর্গাদি নির্ম্মাণ ও যুদ্ধবিগ্রহ করিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন। তাই কর্ণাটে যুদ্ধবিগ্রহ চলিলেও বাঙ্গালায় অশান্তি দেখা দেয় নাই। কিন্তু আলীবর্দ্দীর মৃত্যু হইলে ইংরেজ ও ফরাসীরা নিজেদের নিজেদের কুঠিতে দুর্গ নির্ম্মাণ আরম্ভ করিয়া দিলেন। সিরাজউদ্দৌলা নিষেধ করিয়া পাঠাইলে ফরাসীরা তাঁহার কথা শুনিলেন কিন্তু ইংরেজরা গ্রাহ্যও করিলেন না। এদিকে ১৭১৭ খৃঃ অব্দের এক ফরমানে ইংরেজদিগকে এদেশে বাণিজ্যের জন্য যে সকল বিশেষ সুবিধা মঞ্জুর করা হইয়াছিল, কোম্পানীর ছোট বড় প্রায় সকল কর্ম্মচারীই তাহার যথেচ্ছ অপব্যবহার আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল। তারপর রাজা রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণদাস নবাবের

ইংরাজদের সহিত বিরোধের কারণ

ইংরেজদের দুর্গ নির্ম্মাণ

কৃষ্ণদাসের কলিকাতায় পলায়ন, সানুচর ড্রেকের পলায়ন ও কলিকাতার পতন

বিরাগভাজন হইয়া কলিকাতায় পলায়ন করিলে, ইংরেজরা তাঁহাকে সাদরে আশ্রয় দিলেন। এই সমস্ত কারণে সিরাজউদ্দৌলা ইংরেজদের কাশিমবাজারের কুঠি অধিকার করিয়া কলিকাতা আক্রমণ করিলেন। ড্রেক ও তাঁহার অনুচরেরা প্রায় সকলেই কলিকাতার দক্ষিণে ফল্‌তা নামক স্থানে পলায়ন করিলেন। যে মুষ্টিমেয় ইংরেজ কলিকাতায় রহিল তাহারা কিছুকাল যুদ্ধের পর আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইল (২০শে জুন, ১৭৫৬)।

ইংরেজদের কলিকাতা পুনরুদ্ধার

কলিকাতা পতনের সংবাদ মান্দ্রাজে পৌঁছিলে ক্লাইভ একদল সৈন্য লইয়া বাঙ্গালায় আসিলেন; ওয়াটসন নামক নৌ-বলাধ্যক্ষের অধীনে একটি নৌ-বহরও আসিয়া উপস্থিত হইল। তাঁহারা অনায়াসেই কলিকাতা উদ্ধার করিলেন (জানুয়ারী, ১৭৫৭)। সিরাজ-উদ্দৌলা ইংরেজদের সহিত সন্ধি করিলেন। সন্ধির সর্ত্ত অনুসারে নবাব ইংরেজদিগকে দুর্গসমেত তাঁহাদের সমুদয় পূর্ব্বাধিকার ফিরাইয়া দিলেন। তাঁহারা দুর্গ নির্ম্মাণ এবং মুদ্রা প্রস্তুতের অধিকারও পাইলেন। যুদ্ধের ক্ষতিপূরণস্বরূপ নবাব প্রচুর অর্থও দিলেন।

সন্ধি

ক্লাইভ

ইউরোপে 'সপ্ত বর্ষের সমর' ও ইংরেজদের চন্দননগর অধিকার

পলাশীর যুদ্ধ।—ইতিপূর্ব্বেই (১৭৫৬) ইউরোপে 'সপ্তবর্ষের মহাসমর' আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল। সে সংবাদ ভারতবর্ষে পৌঁছিলেই ক্লাইভ ও ওয়াটসন একযোগে চন্দননগর আক্রমণ করিয়া তাহা অধিকার করিয়া বসিলেন (১৭৫৭)। নবাবের নিষেধ তাঁহারা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনিলেন না। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া নবাব আবার যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। নবাবের গূঢ় অভিসন্ধি উপলব্ধি করিয়া এবং নবাবী সেনার মন্থর গতি ও

সিরাজের চক্রান্ত

নবাবের ইতস্তত মনোভাবের সুযোগ লইয়া ক্লাইভ হঠাৎ আক্রমণাত্মক যুদ্ধ করাই স্থির করিলেন। বাবর যেমন কামানের জোরে লোদী সেনার তীরন্দাজদের অক্লেশে পরাজিত করেন তেমনি ইংরাজের আগ্নেয়াস্ত্রের সম্মুখে মামুলী নবাবী সেনা বিলুপ্ত হইয়া গেল। যুদ্ধবিদ্যায় ভারতীয়েরা এত পিছাইয়াছিল যে, স্বাধীনতা রক্ষা করা প্রায় এস্থলে অসম্ভব। এদিকে নবাবের কয়েকজন কর্ম্মচারী গোপনে তাঁহার বিরুদ্ধে ইংরেজদের সহিত ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল। তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল সিরাজউদ্দৌলাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া আলীবর্দ্দীর ভগ্নীপতি মীরজাফরকে সিংহাসনে স্থাপন করা। মীরজাফর বাঙ্গালার মসনদের বিনিময়ে ইংরেজ সহযোগীদিগকে পৌণে দুই কোটি টাকা পুরস্কার দিতে স্বীকৃত হইলেন। উমিচাঁদ বা আমিনচাঁদ নামে একজন শিখ বণিক এই চক্রান্তের কথা জানিত। ক্লাইভ তাহার মুখ বন্ধ করিবার জন্য তাহাকে প্রচুর অর্থদানের লোভ দেখাইয়া এক মিথ্যা চুক্তিপত্র সম্পাদন করিলেন। ওয়াটসন তাহাতে স্বাক্ষর দিতে অস্বীকৃত হইলে ক্লাইভ তাহাতে ওয়াটসনের নাম জাল করেন। তারপর সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে সন্ধিভঙ্গের মিথ্যা অভিযোগ আরোপ করিয়া ক্লাইভ তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। মুর্শিদাবাদের ২০ মাইল দক্ষিণে ভাগীরথীতীরে পলাশী গ্রামের বিশাল আম্রকাননে উভয় পক্ষের যুদ্ধ বা তাহার নামান্তর হইল (২৩শে জুন, ১৭৫৭)। প্রধান সেনাপতি মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতায় ক্লাইভের জয় হইল এবং নবাব বিনাযুদ্ধে পলায়ন করিলেন। কিন্তু কিছুদিন পরেই তিনি ধরা পড়িলেন। তখন মীরজাফরের পুত্র মীরণের আদেশে অমানুষিক নিষ্ঠুরতার সহিত হতভাগ্য নবাবের প্রাণবধ করা হয়। মীরজাফরকে বাঙ্গালার নবাব বলিয়া ঘোষণা করা হইল। কার্যতঃ ক্লাইভই বাঙ্গালার প্রভু হইয়া বসিলেন। ক্লাইভ ও অন্যান্য চক্রান্তকারীরা প্রচুর ধনরত্ন পুরস্কার পাইলেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী চব্বিশ পরগণার জমিদারী লাভ করিলেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসে পলাশীর যুদ্ধ, তরাইন ও পানিপথের যুদ্ধের ন্যায়ই স্মরণীয় ঘটনা। বাঙ্গালার অতুল ধনসম্পদ ইংরেজদের আয়ত্তে আসায় সমগ্র

মীরজাফর

উমিচাঁদ

পলাশীর যুদ্ধ (২৩শে জুন, ১৭৫৭)

সিরাজউদ্দৌলার প্রাণনাশ

পলাশীর যুদ্ধের গুরুত্ব

ভারতে ইংরেজ আধিপত্য বিস্তারের পথ উন্মুক্ত হইয়া গিয়াছিল।

মীরজাফরের অসুবিধা

মীরজাফর।—মীরজাফর শুধু বিশ্বাসঘাতক ছিলেন না, অত্যন্ত অপদার্থও ছিলেন। তাঁহাকে মসনদে বসাইবামাত্র তাঁহার সহযোগীরা প্রতিশ্রুত অর্থের জন্য তাঁহার উপর চাপ দিতে লাগিলে কিস্তিতে কিস্তিতে টাকা দিবার ব্যবস্থা হইল। কিন্তু তাহাদের দাবী ক্রমেই মীরজাফরের কাছে অসহ্য বোধ হইতে লাগিল। তিনি চুঁচুড়ার ডাচদের সঙ্গে ইংরেজদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিতে লাগিলেন ; ইংরেজ ও ডাচদের মধ্যে যুদ্ধ বাধিল। জলপথে ডাচদের জাহাজ আটক করা হইল, আর স্থলপথে ক্লাইভ তাহাদিগকে পরাজিত করিলেন (১৭৫৯)। বাঙ্গালায় ইংরেজ-প্রাধান্য সুদৃঢ় হইয়া উঠিল। ক্লাইভ বিজয়ী বীরের মত স্বদেশে ফিরিয়া গেলেন (ফেব্রুয়ারী ১৭৬০)। গুণমুগ্ধ স্বদেশবাসিগণ তাঁহাকে 'লর্ড' উপাধিতে ভূষিত করিলেন।

ডাচদের পরাভব, ক্লাইভের ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন

কোম্পানীর কর্ম্মচারীদের যথেচ্ছাচার

মীরকাশিম।—ক্লাইভের স্বদেশ গমনের পরেও নবাব ও প্রজাদের উপর কোম্পানীর কর্ম্মচারীদের উৎপীড়ন কমিল না। তাহারা ক্রমাগত অর্থের জন্য নবাবের উপর চাপ দিতে লাগিল। মীরজাফর আর অর্থ যোগাইতে পারিতেছিলেন না। কলিকাতায় ইংরেজদের নূতন গবর্ণরের নাম ছিল ভ্যান্সিটার্ট। তিনি ও তাঁহার কাউন্সিলের মেম্বারগণ তখন মীরজাফরের জামাতা মীরকাশিমকে বাঙ্গালার মসনদে বসাইলেন, এবং বিনিময়ে কোম্পানী মেদিনীপুর, বর্দ্ধমান ও চট্টগ্রামের জমিদারী লাভ করিলেন ; আর সপরিষদ গবর্ণর পাইলেন নগদ দুই লক্ষ পাউণ্ড।

কোম্পানী ও ইংরাজদের লাভ

মীরকাশিমের প্রকৃত ক্ষমতা লাভের প্রয়াস,

কিন্তু মীরকাশিম শ্বশুরের ন্যায় অপদার্থ ছিলেন না। ইংরেজদের প্রভাব এড়াইবার জন্য তিনি মুর্শিদাবাদ হইতে মুঙ্গেরে রাজধানী তুলিয়া লইয়া গেলেন। সেখানে গিয়া তিনি শাসনকার্য্যে মিতব্যয়িতা প্রবর্ত্তন করিয়া শূন্য রাজকোষ পূর্ণ করিয়া তুলিতে লাগিলেন। একদল সৈন্যকে দুইজন আর্ম্মানী সেনাধ্যক্ষের অধীনে পাশ্চাত্য প্রথায় শিক্ষা দেওয়া হইতে লাগিল। কিন্তু আরব্ধ কার্য্য সম্পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই ইংরেজদের সহিত তাঁহার বিরোধ বাধিয়া উঠিল। ইংরেজ শক্তি বিনষ্ট করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল।

ইংরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে বাঙ্গালাদেশে বাণিজ্যের জন্য কোনরূপ শুল্ক দিতে হইত না। কোম্পানীর কর্ম্মচারীরা ব্যক্তিগতভাবেও সেই সুবিধার সুযোগ লইতে লাগিল। এমন কি, কোম্পানীর ভারতীয় কর্ম্মচারীদের মধ্যে যাহারা ইংরেজদের প্রিয়পাত্র ছিল তাহারাও বিনা শুল্কে বাণিজ্য করিতে লাগিল। ইহাতে ভারতীয় বণিকদের অত্যন্ত ক্ষতি হইতে লাগিল। মীরকাশিম ইংরেজগণকে এরূপভাবে সুবিধার অপব্যবহার করিতে নিষেধ করিয়া দিলেন। তাঁহার আদেশে কেহই কর্ণপাত না করায় তিনি বাণিজ্যের উপর হইতে সমস্ত শুল্ক তুলিয়া লইলেন। দেশীয় বণিকেরাও ইংরেজদের মতই বিনা শুল্কে বাণিজ্যের অধিকার পাওয়ায় ইংরেজদের তাহা সহ্য হইল না।

ইংরেজদের বাণিজ্য-ব্যাপারে সুবিধার অপব্যবহার

মীরকাশিমের নিষ্ফল প্রতিবাদ ও বাণিজ্য-শুল্ক লোপ

পাটনার ইংরেজ-কুঠির অধ্যক্ষ এলিস অকস্মাৎ পাটনা অধিকার করিয়া বসিলেন; নবাবের ধৈর্য্যের সীমা অতিক্রম করিল। সানুচর এলিস্‌কে তিনি বন্দী করিলেন। কোম্পানীর কলিকাতার কর্ত্তারা তখন নবাবের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। কাটোয়া ও ঘেরিয়া নামক স্থানে দুইবার নবাবকে পরাস্ত হইতে হইল। তখন দারুণ আক্রোশে ক্ষিপ্ত হইয়া তিনি প্রায় দুইশত ইংরেজ বন্দীর প্রাণনাশ করিলেন (১৭৬৩)। তারপর উদয়নালা নামক স্থানে আর একবার তাঁহার পরাজয় হইল। মীরকাশিম অযোধ্যায় পলায়ন করিয়া সেখানকার নবাব সুজাউদ্দৌলার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন এবং বাদ্‌শাহ শাহ্‌ আলমের নিকটও সাহায্য ভিক্ষা করিয়া পাঠাইলেন। সুজাউদ্দৌলা ইংরেজদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। বক্সারে উভয় পক্ষের সাক্ষাৎ হইল। ইংরেজ সেনাপতি মেজর মন্‌রো সেখানে জয়লাভ করিলেন (১৭৬৪)। বক্সারের যুদ্ধে জয়লাভের পর এলাহাবাদ অবধি সমগ্র ভূ-ভাগে ইংরেজদের আধিপত্য বিস্তৃত হইল। মীরকাশিমের সকল আশাভরসা নির্ম্মূল হইয়া গেল। ইংরাজদের নবীন উদ্যম, সাহস, রণকৌশল ও বৈজ্ঞানিক অস্ত্র প্রয়োগ নবাব সৈন্যের পরাজয়ের কারণ।

এলিস্ কর্ত্তৃক পাটনা অধিকার, যুদ্ধ ঘোষণা, কাটোয়া ও ঘেরিয়ায় মীরকাশিমের পরাজয় ও ইংরেজ বন্দিগণকে হত্যা, উদয়নালায় ও বক্সারে ইংরেজদের জয়

বাঙ্গালার নবাবী।--বাঙ্গালার নবাবী লইয়া বহুদিন হইতেই ইংরেজদের চক্রান্ত এবং ব্যবসায় দুই-ই চলিতেছিল।

মীরজাফর

মীরকাশিমের সহিত যুদ্ধ বাধিলে তাঁহারা আবার মীরজাফরকেই নবাব বলিয়া ঘোষণা করিয়া দিলেন। ১৭৬৫ খৃঃ অব্দে মীরজাফর মৃত্যুমুখে পতিত হইলে ইংরেজরা নজমউদ্দৌলা নামে মীরজাফরের এক অপদার্থ পুত্রকে নবাবী দিয়া পুরস্কারস্বরূপ কয়েক লক্ষ টাকা আদায় করিয়া লইলেন। কোম্পানীর সকল কর্ম্মচারীই অবাধে উৎকোচ গ্রহণ করিতে লাগিল। এইরূপ বিশৃঙ্খল অবস্থায় কোম্পানীর কাজেরও অনেক ক্ষতি হইতে থাকে।

নজমউদ্দৌলা

ক্লাইভের প্রত্যাবর্ত্তন ও বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ।—এইসব বিশৃঙ্খলা দূর করিবার জন্য কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ ক্লাইভকে পুনরায় বাঙ্গালা দেশে পাঠাইলেন (১৭৬৫)। কোম্পানীর কর্ম্মচারীরা উৎকোচ, উপঢৌকন লইয়া ব্যস্ত থাকায় তখনও অযোধ্যার নবাবের সহিত বিরোধের অবসান হয় নাই। ক্লাইভ আসিয়া তাঁহার সহিত এক সন্ধি করিলেন। সুজাউদ্দৌলার নিকট হইতে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ আদায় করা হইল; এলাহাবাদ ও কোরা জেলা দুইটিও তিনি কোম্পানীর হাতে ছাড়িয়া দিলেন। অযোধ্যার নবাবের নিকট হইতে সদ্যপ্রাপ্ত জেলা দুইটি বাদশাহ শাহ্ আলমকে দান করা হইল, আর বার্ষিক ছাব্বিশ লক্ষ টাকা বৃত্তির বিনিময়ে ক্লাইভ কোম্পানীর হইয়া বাদশাহের নিকট হইতে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী প্রাপ্ত হইলেন (১৭৬৫)। উড়িষ্যা বলিতে তখন কেবল মেদিনীপুর, হাওড়া ও হুগলী জেলার একাংশ বুঝাইত। 'উত্তর সরকার' প্রদেশটি ইতিপূর্ব্বেই ইংরেজদের অধিকারে আসিয়াছিল; বাঙ্গালা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানীর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা বাদশাহের নিকট হইতে উহারও ফরমান্ লইলেন। ক্লাইভ বাঙ্গালার নবাবের জন্যও ৫০ লক্ষ টাকার বার্ষিক বৃত্তি বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন; আর দেশরক্ষার জন্য বাৎসরিক ৫৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ের বন্দোবস্ত করিলেন।

অযোধ্যার নবাবের সহিত সন্ধি

বাদশাহ শাহ্ আলমের সহিত ব্যবস্থা, বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী

বাঙ্গালার নবাবের বৃত্তি, দেশরক্ষার ব্যয়

দ্বৈত-শাসন প্রণালী।—ক্লাইভের প্রবর্ত্তিত শাসন-ব্যবস্থার ফলে দেশের শাসন-ব্যবস্থা দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া গেল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাতে আসিল দেওয়ানী,—অর্থাৎ রাজস্ব আদায়ের ভার। পূর্ব্বপ্রথায় দেওয়ান দেশরক্ষার জন্য দায়ী

দ্বৈত-শাসনের স্বরূপ, কোম্পানীর

থাকিতেন না,—সে কাজ ছিল সুবাদার বা নবাবের। দেওয়ানীর সঙ্গে সঙ্গে কোম্পানী দেশরক্ষার ভারও স্বহস্তে লইলেন। এইরূপে কোম্পানী যুগপৎ রাজস্ববিভাগ ও সমব-বিভাগের কর্ত্তা হইয়া দাঁড়াইলেন। বিচার ও শাসনের ভাব রহিল নবাবের উপরে। এই ব্যবস্থার ফলে প্রকৃতপক্ষে নবাব কোম্পানীর বৃত্তিভোগী হইলেন। অথচ আইনের দিক দিয়া নবাবই রহিলেন দেশের শৃঙ্খলা-বিধানের জন্য দায়ী। আবাব বাঙ্গালা ও বিহাব প্রদেশ দুইটির শাসনের জন্য যে দুইজন নায়েব-নাজিম (ডেপুটি নবাব) নিযুক্ত করা হইত তাহাও ছিল কোম্পানীর অনুমোদন-সাপেক্ষ। নবাবেব বহিল দায়িত্ব, কিন্তু ক্ষমতা থাকিল না; আর কোম্পানীর বহিল ক্ষমতা কিন্তু দায়িত্ব নয়। মিঃ ব্রুক আডাম্ নামীয় এক ইংরাজ স্বীকার করিয়াছেন, পলাশী যুদ্ধের পর বঙ্গদেশের লুণ্ঠিত ধনদৌলত এমন প্রবল বন্যাব মত লণ্ডনে আসিয়া পৌঁছিতে লাগিল যে বিলাতে "Industrial Revolution" ঘটিল। যে Macaulay সাহেব ভারতীয়দের গালাগালি দিবার জন্য স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন তিনিই ইংরাজদেব সম্বন্ধে ক্ষোভে রোষে বলিয়াছিলেন, "যে কোম্পানীর কার্য্যকবী সভার সদস্যরা শুধু ষড়যন্ত্র, নীচতা ও হীনতার বলে নির্ব্বাচিত হয়, তাহাদের কাছে ভাল কী আশা করা যাইতে পারে।" বিলাতের কবি কাউপার (Cowper) ভারত লুণ্ঠনে অতীব ক্ষুণ্ণ হইয়া একদা লিখিয়াছিলেন,

"দেশে যে করে চুরি তার হয় ফাঁসি"
ভারত লুণ্ঠনে হইয়া প্রবৃত্ত
হঠাৎ পুঁজিপতি সাজে যে দুর্ব্বৃত্ত
খালাস পায় সে সব নিয়ম নাশি।"

রাজস্ব আদায় ও বণ্টনের অধিকার

কোম্পানী সমর বিভাগের কর্ত্তা

নবাবের কর্ত্তৃত্ব ও দায়িত্ব অনির্দ্দিষ্ট, নায়েব-নাজিম

অনাচার নিয়ন্ত্রণ।—ক্লাইভকে পুনরায় এদেশে পাঠাইবার উদ্দেশ্য ছিল কোম্পানীর কর্ম্মচারীদের মধ্যে অনাচার ও বিশৃঙ্খলা দূব করা। এজন্য তিনি কোম্পানীর কর্ম্মচাবীদের ব্যক্তিগত ব্যবসায়ের অধিকার লোপ করিয়া দিলেন। অধিকন্তু তাহারা কাহারও নিকট হইতে উপহারের নামেও যাহাতে উৎকোচ গ্রহণ করিতে না পারে সেজন্য তিনি তাহাদের নিকট হইতে লিখিত প্রতিশ্রুতি আদায় করিলেন। এই সকল ক্ষতির জন্য ক্লাইভ

কোম্পানীর কর্ম্মচারীদেব ব্যক্তিগত ব্যবসায় এবং উপহার গ্রহণ নিষিদ্ধ

প্রস্তাব করিলেন যে, কোম্পানী এদেশে লবণের যে একচেটিয়া ব্যবসায় করিতেছিল তাহার লভ্যাংশ কর্ম্মচারীদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হউক। কিন্তু ডিরেক্টররা তাহার পরিবর্ত্তে কর্ম্মচারীদের বেতন বাড়াইয়া দিলেন। পলাশীর যুদ্ধের পর হইতে সৈন্যদিগকে শান্তির সময়ও 'ডবল ভাতা' দেওয়া হইত। ক্লাইভ তাহা তুলিয়া দিলেন। সৈন্যেরা ভয়ানক অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিল। কিন্তু ক্লাইভের অনমনীয় দৃঢ়তায় তাহারা কোন অশান্তি বা বিদ্রোহ সৃষ্টি করিতে পারে নাই। ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে ক্লাইভ স্বদেশে ফিরিয়া গেলেন। অতঃপর তাঁহার শত্রুরা তাঁহার বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ আনেন কিন্তু পার্লামেণ্টের বিচারে তাঁহাকে নির্দ্দোষ সাব্যস্ত করা হয় (১৭৭৩); কিন্তু ইংলণ্ডের জনমত তাঁহার ত্রুটি ক্ষমা করে নাই। শেষে লোকনিন্দা সহিতে না পারিয়া ক্লাইভ আত্মহত্যা করেন (১৭৭৫)।

সৈন্যদের দ্বিগুণ ভাতা লোপ

ক্লাইবের জীবন

ক্লাইভ ছিলেন এদেশে ইংরেজ-শাসনের প্রতিষ্ঠাতা। অথচ তাঁহার চরিত্রে অনেক অমার্জ্জনীয় দোষ-ত্রুটিও ছিল। কেহ কেহ তাঁহাকে অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন বলিয়া মনে করিলেও বাস্তবিক তিনি সেরূপ ছিলেন না। সামরিক ব্যাপারে বা শাসনকার্য্যে কোথাও তিনি অসাধারণ প্রতিভা দেখাইতে পারেন নাই, অথচ অদৃষ্টবলে তিনিই এদেশে বৃটিশ-শক্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া যান। প্রতিভা, বুদ্ধিমত্তা, কর্ম্মকৌশল, প্রভৃতিতে ডুপ্লের তুলনায় ক্লাইভ হীন ছিলেন, কিন্তু পারিপার্শিক অবস্থা ছিল ডুপ্লের প্রতিকূল, আর ক্লাইভের অনুকূল। তখন বাঙ্গালা দেশে নবাবের যে নিদারুণ অধঃপতন হইয়াছিল, তাহার ফলেই ক্লাইভ অপ্রত্যাশিত সফলতা লাভ করেন। ব্যক্তিগত জীবনেও ক্লাইভ ছিলেন নিতান্ত সাধারণ মানুষ। অনেকে তাঁহার সাহস ও ধৈর্য্যের প্রশংসা করিতেন। কিন্তু ঠিক বীরের মত সাহস ক্লাইভের ছিল না,—তিনি ছিলেন দুঃসাহসী। আর ক্লাইভের নীতিজ্ঞান বলিয়া কিছুই বোধ হয় ছিল না,—কার্য্যসিদ্ধির জন্য কোনও অন্যায়কেই তিনি অন্যায় মনে করিতেন না। তাঁহার যে অপরিমেয় ধনলিপ্সা ছিল সেকথা বলাই বাহুল্য। বাঙ্গালার রাজনীতিতে তাঁহার হস্তক্ষেপ কতটা স্বদেশের জন্য, আর কতটা নিজের এবং অনুচরদের স্বার্থসিদ্ধির

ক্লাইভের কৃতিত্ব

ডুপ্লে ও ক্লাইভ

চরিত্র

জন্য, তাহা সঠিক বিচার করা এখন কঠিন। সে যাহাই হউক, তিনিই যে ভারতে ইংরাজ-শক্তি প্রতিষ্ঠাতার গৌরব লাভের অধিকারী এ-বিষয়ে কোনই সংশয় নাই এবং এইজন্যই তিনি ইংলণ্ডের ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছেন, এবং
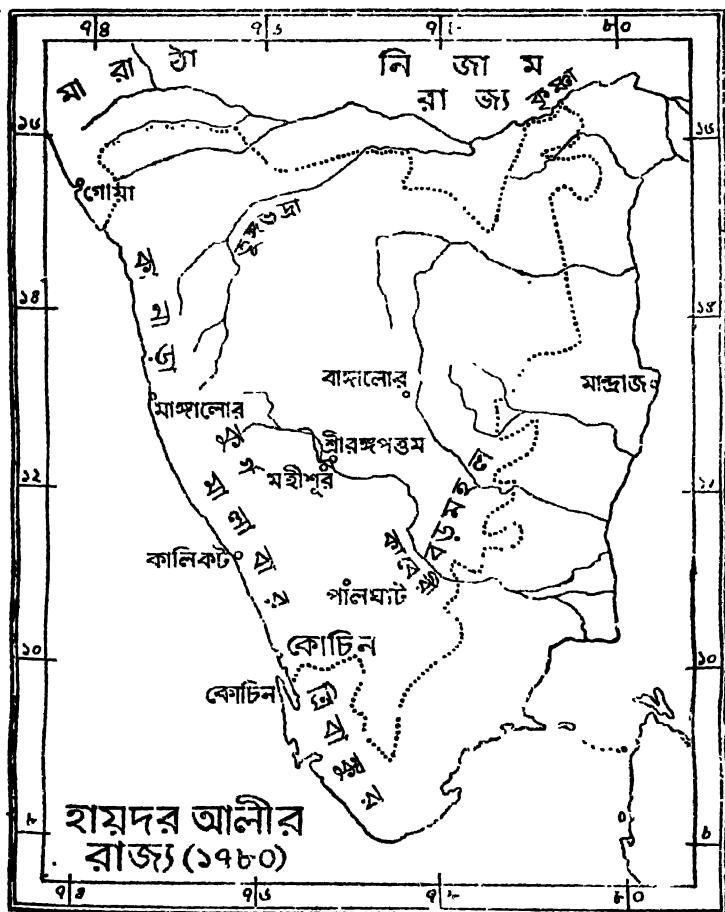
সমষ্টিগত ভাবে ইংরাজ জাতির স্থিরবুদ্ধি, একাগ্র লক্ষ্য, নিয়মানুবর্ত্তিতা ও উচ্চাভিলাষের উদ্দীপনা ক্লাইভের সফলতাকে সহায়তা করিয়াছে।

বাঙ্গালায় শাসন-বিভ্রাট ও ছিয়াত্তরের মন্বন্তর।—ক্লাইভের পর ভেরেলষ্ট (১৭৬৭—৬৯) এবং কার্টিয়ার (১৭৭০—৭২) পর পর কোম্পানীর গবর্ণর নিযুক্ত হন। কোম্পানীর লোকদের লোভ ও অত্যাচারের সীমা ছিল না, তাহার উপর আবার বাঙ্গালার নায়েব-নাজিম মুহম্মদ রেজা খাঁ, আর বিহারের নায়েব-নাজিম রাজা সীতাব রায় রাজস্ব আদায়ের নামে প্রজাদের উপর যথেচ্ছ অত্যাচার করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন ; এই সময় আবার (বাঙ্গালা ১১৭৬ সন, ১৭৬৯—৭০ খৃঃ অব্দ) বাঙ্গালা দেশে এক নিদারুণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। আজও সে দুর্ভিক্ষ 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' নামে স্মরণীয় হইয়া আছে। অনাহারে এবং মহামারীর আক্রমণে বাঙ্গালার এক তৃতীয়াংশ লোক প্রাণ হারাইল। কিন্তু এই দুর্দ্দিনেও কোম্পানীর রাজস্ব আদায় সমানভাবেই চলিতে লাগিল। এইরূপে দ্বৈতশাসন ব্যবস্থার দোষ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিলে, সকল বিশৃঙ্খলা নিবারণের জন্য বিলাতের কর্তৃপক্ষ ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্ নামে একজন সুদক্ষ কর্ম্মচারীকে বাঙ্গালার গবর্ণর নিযুক্ত করিলেন (১৭৭২)। তিনি নিজে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে, ১৭৭১ খৃঃ অব্দে ১৭৬৮ খৃঃ অব্দ অপেক্ষা অধিক রাজস্ব আদায় হইয়াছিল।

শাসন-বিভ্রাট

'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর'

মহীশূরে হায়দর আলীর অভ্যুত্থান।—যে সময় ইংরেজরা বাঙ্গালা দেশে প্রভুত্ব বিস্তার করিতেছিলেন সেই সময় দক্ষিণ-ভারতের মহীশূর রাজ্যে হায়দর আলী নামে এক পরাক্রমশালী বীরের অভ্যুত্থান হয়। তিনি ছিলেন একজন সামান্য সৈনিকের পুত্র। ১৭৪৯ খৃঃ অব্দে ২৭ বৎসর বয়সে তিনি মহীশূরের হিন্দু রাজার অধীনে অশ্বারোহী সৈন্যদলে যোগদান করেন। বাল্যে লেখাপড়া শিখিবার সুযোগ না হইলেও তাঁহার বুদ্ধি বা অভিজ্ঞতা কম ছিল না। সুতরাং ক্রমশঃই তাঁহার উন্নতি হইতে লাগিল এবং শীঘ্রই তিনি দিণ্ডিগল নামক স্থানের শাসনকর্ত্তার পদ লাভ করিলেন (১৭৫৫)। ইহার কিছুকাল পরে বাঙ্গালোর

হায়দর

সৈন্যবিভাগে প্রবেশ ও পদোন্নতি

অঞ্চলে একটি জায়গীরও তিনি পাইলেন। তখন মহীশূরে ছিল 'দলবই' (দলপতি) আখ্যাধারী মন্ত্রীদের একাধিপত্য। এই সময় নন্দরাজ নামে এক ব্যক্তি মহীশূরের দলবই বা প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। হায়দর নন্দরাজেরই অনুগ্রহে উচ্চপদ লাভ করিয়াছিলেন; কিন্তু নন্দরাজের প্রভুত্ব বিনষ্ট করিবার চক্রান্তে যোগ দিতে তিনি কুণ্ঠিত হন নাই। নন্দরাজের পতনের পর হায়দর নিজেই দলবই-এর স্থান গ্রহণ করিয়া রাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া উঠিলেন। খণ্ডেরাও নামক এক ব্রাহ্মণ কর্ম্মচারীর সহায়তায় মহীশূরের রাজা তাঁহাকে দমনের চেষ্টা করিলে খণ্ডেরাও বন্দী হইলেন। অবশেষে ১৭৬৬ খৃঃ অব্দে রাজাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া হায়দর নিজেই মহীশূরের সিংহাসন অধিকার করিলেন। ইহার পূর্ব্ব হইতেই হায়দর রাজ্যবিস্তারে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। ১৭৬৩ খৃঃ অব্দে তিনি বেদনুর অধিকার করেন। মারাঠা এবং নিজাম রাজ্যের কিয়দংশও তাঁহার হস্তগত হয়। ক্ষুদ্র মহীশূর রাজ্যের আয়তন অনেক বাড়িয়া গেল। উত্তরে কৃষ্ণা নদী পর্য্যন্ত তাঁহার আধিপত্য বিস্তৃত হইয়াছিল।

মহীশূর রাজ্যের আভ্যন্তরীণ গোলযোগ

হায়দরের রাজ্যলাভ

রাজ্যবিস্তার

প্রথম মহীশূর-মারাঠা সংঘর্ষ।—পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের পর মারাঠা রাজ্যে বিশৃঙ্খলা আসিয়াছিল। নূতন পেশবা মাধবরাও (বালাজী বাজীরাওয়ের ২য় পুত্র) মারাঠাদের মধ্যে আবার উদ্দীপনা সঞ্চার করিলেন এবং সমগ্র ভারতে মারাঠা প্রাধান্য বিস্তারে মনোনিবেশ করিলেন। পেশবার নেতৃত্বে এক মারাঠা বাহিনী হায়দারকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিল (১৭৬৪-৬৫)। ক্ষতিপূরণ এবং রাজ্যের একাংশ ছাড়িয়া দিয়া হায়দর সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন। মারাঠারা উত্তর ভারতে ব্যস্ত থাকার সুযোগে হায়দর মালাবার অধিকার করিলেন।

৪র্থ পেশবা মাধব রাও

হায়দরের পরাভব

মালাবার অধিকার

প্রথম ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ।—কর্ণাটের নবাব মুহম্মদ আলী ছিলেন ইংরেজদের আশ্রিত। তাঁহার সহিত হায়দরের শত্রুতা ছিল। তাই ইংরেজদের বিরুদ্ধে সহায়তা লাভের জন্য হায়দর নিজামের সহিত মৈত্রী স্থাপন করিলেন। ১৭৬৭ খৃঃ অব্দে ইংরেজের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ হইল। প্রথমে হায়দরেরই পরাজয় হয়; কিন্তু পরে এক বৃহত্তর সৈন্যদল লইয়া তিনি অতর্কিতে

যুদ্ধের কারণ

যুদ্ধ

একেবারে মান্দ্রাজের উপকণ্ঠে আসিয়া উপনীত হইলেন (১৭৬৯); নিরুপায় হইয়া ইংরেজ কর্ম্মকর্ত্তারা হায়দরের নির্দ্দেশ অনুযায়ী সন্ধিসর্ত্ত রচনা করিলেন। ইতিপূর্ব্বে কোনও দেশীয় রণনায়কের হাতে ইংরেজদের এরূপ দুর্দ্দশা হয় নাই। সন্ধির সর্ত্ত অনুসারে হায়দর বিজিত স্থানগুলি ফিরাইয়া দিলেন, এবং ইংরেজগণও পূর্ব্বে হায়দরের নিকট হইতে যে সকল স্থান কাড়িয়া লইয়াছিলেন সেগুলি প্রত্যর্পণ করিলেন। উভয় পক্ষের মধ্যে বন্দী-বিনিময়ও হইল। আরও স্থির হইল যে, তৃতীয় পক্ষের আক্রমণ হইতে হায়দর ও ইংরেজগণ পরস্পরকে রক্ষা করিবেন। সন্ধির এই সর্ত্তটি হায়দরের কাছে ছিল সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান; কারণ মারাঠাদের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য তাঁহার পক্ষে এক প্রবল-মিত্রশক্তির সাহায্যের প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল।

মান্দ্রাজের সন্ধি (১৭৬৯)

হায়দরের মারাঠা-ভীতি

দ্বিতীয় মহীশূর-মারাঠা সংঘর্ষ।—কিন্তু কিছুকাল পরেই হায়দরের সহিত মারাঠাদের আবার বিরোধ বাধিয়া উঠিলে হায়দর ইংরেজদের নিকট সন্ধির সর্ত্তানুযায়ী কোন সাহায্য পাইলেন না। বাধ্য হইয়া তখন তাঁহাকে অপমানজনক সর্ত্তে মারাঠাদের সহিত সন্ধি করিতে হইল।

হায়দরের পরাজয় ও সন্ধি

STUDIES AND QUESTIONS

1. Sketch the career of Clive in India. (C. U. '14, '20).

2 Write a note on the 'Double Goverment' established by Clive. (C. U. '27). Compare it with the system of Dyarchy introduced in the Goverment of India Act of 1919.

3. Trace the growth of British power in India under Clive. (C. U. '28). and of Mysore under Hyder Ali.

ত্রয়োস্ত্রিংশ অধ্যায়

ব্রিটিশ শক্তির অভ্যুদয়

দ্বিতীয় পর্ব্ব

ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্ (১৭৭২-৮৫) ও লর্ড কর্ণওয়ালিস্ (১৭৮৬-৯৩)

হেষ্টিংসের শাসন সংস্কার।—ক্লাইভের ন্যায় ওয়ারেন হেষ্টিংও তরুণ বয়সে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সামান্য চাকুরী লইয়া এদেশে আসিয়াছিলেন। কাজেই এখানকার কাজকর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহার বিলক্ষণ অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছিল। ক্লাইভের পর ভেরেলষ্ট ও কার্টিয়ারের আমলে কোম্পানীর কাজে নানারূপ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছিল। বাঙ্গালার গভর্ণর হইয়া হেষ্টিংস্ দেখিলেন দ্বৈতশাসনই যত অনিষ্টের মূল। সুতরাং প্রথমেই তিনি উহার উচ্ছেদ সাধনে বদ্ধপরিকর হইলেন। মুহম্মদ রেজা খাঁ ও সীতাব রায়কে পদচ্যুত করা হইল। কলিকাতায় 'রেভিনিউ বোর্ড' স্থাপন করিয়া হেষ্টিংস্ 'কালেক্টর' নামক বৃটিশ কর্ম্মচারীদের উপর রাজস্ব আদায়ের ভার দিলেন। রাজকোষও মুর্শিদাবাদ হইতে কলিকাতায় স্থানান্তরিত করা হইল। ভূমি-রাজস্ব নিলামে (Revenue Sale) চড়াইয়া যাহারা সর্ব্বোচ্চ
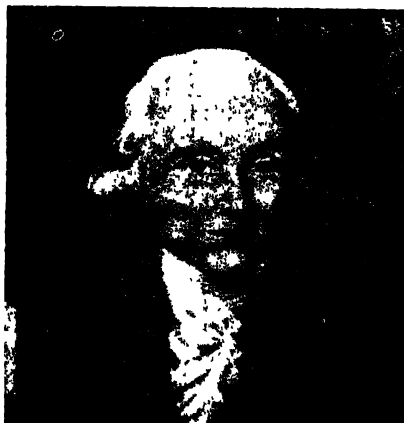
ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্

দ্বৈতশাসন ব্যবস্থা লোপ

নায়েব-নাজিমদ্বয়ের পদচ্যুতি, রেভিনিউ বোর্ড গঠন, কালেক্টর নিযুক্ত, কলিকাতায় রাজকোষ স্থানান্তর,

ভূমি রাজস্বের পঞ্চবার্ষিকী বন্দোবস্ত, বিচার-ব্যবস্থা, জেলা আদালত, দেশীয় আইনের অনুবাদ, ব্যয়সঙ্কোচ, নবাবের বৃত্তি হ্রাস, একক-শাসন

রাজস্ব দিতে স্বীকার করিল তাহাদের সহিত পাঁচ বৎসরের জন্ত জমির বন্দোবস্ত করা হইল। কালেক্টর ও একজন করিয়া দেশী বিচারক যথাক্রমে স্থানীয় দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার বিচারের ভার পাইলেন। কলিকাতায় 'সদর দেওয়ানী আদালত' ও 'সদর নিজামৎ আদালত' নাম দিয়া দুইটি উচ্চতম বিচারালয় স্থাপন করা হইল। সদর দেওয়ানী আদালতের অধ্যক্ষ হইলেন স্বয়ং গবর্ণর, আর নিজামৎ আদালতে একজন মুসলমান অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলেন। হিন্দু ও মুসলমানদের আইন-সমূহ বিধিবদ্ধ করিবার জন্ত হেষ্টিংস্ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ও ফার্সীনবীশ-দের সাহায্যে তৎসংক্রান্ত সংস্কৃত ও পারসিক পুস্তকগুলি অনুবাদের ব্যবস্থা করিলেন। নায়েব-নাজিম বা ডেপুটি নবাবদ্বয়কে বরখাস্ত করায় কিছু ব্যয়সঙ্কোচ হইয়াছিল। হেষ্টিংস্ বাঙ্গালার নবাবের বৃত্তি কমাইয়া অর্দ্ধেক করিয়া দিতে দ্বিধা করিলেন না। দ্বৈত-শাসনের স্থলে এবার দেশে কোম্পানীর সম্পূর্ণ একক-শাসন প্রতিষ্ঠিত হইল।

বাদশাহ শাহ্ আলম ও অযোধ্যার নবাব।—বাদশাহ শাহ্ আলম কোম্পানীর নামে দেওয়ানী সনন্দ দিবার বিনিময়ে বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকা বৃত্তি বা কর এবং এলাহাবাদ ও কারা জেলা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু বাদশাহ-নামের মহিমা অক্ষুণ্ণ থাকিলেও শাহ্ আলম অযোধ্যার নবাব উজীর সুজাউদ্দৌলার আশ্রয়েই বাস করিতেছিলেন। পিতৃপুরুষদের সাধের রাজধানী দিল্লী নগরীতে তিনি প্রবেশ করিতেও পারেন নাই। পানিপথের পরাজয়ের পর পেশবা ১ম মাধব রাওয়ের নেতৃত্বে মারাঠারা আবার প্রবল হইয়া উঠিতেছিল। মারাঠা সেনানায়ক মহাদাজী সিন্ধিয়া সসৈন্তে উত্তর ভারতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তাঁহার সহায়তায় শাহ্ আলম দিল্লীতে প্রথম প্রবেশ করিলেন (১৭৭১)। হেষ্টিংস্ এ সুবর্ণ-সুযোগ হেলায় হারাইলেন না। বাদশাহ ইংরেজদের আশ্রয় ত্যাগ করিয়াছেন, এই অজুহাতে হেষ্টিংস্ তাঁহার বৃত্তি বন্ধ করিয়া দিলেন; অযোধ্যার নবাবের নিকট ৫০ লক্ষ টাকা লইয়া এলাহাবাদ ও কারা জেলা তাঁহাকে ফিরাইয়া দিলেন। উপরন্তু নবাবকে প্রয়োজনের সময় সৈন্ত-সাহায্য করিতে হেষ্টিংস্ প্রতিশ্রুতি দিলেন এবং নবাবও

মারাঠাদের পুনরভ্যুদয়, সিন্ধিয়ার সহায়তায় শাহ্ আলমের দিল্লী প্রবেশ, বাদশাহের বৃত্তি লোপ, অযোধ্যার নবাবকে এলাহাবাদ ও কারা দান

বৃটিশ সৈন্যের ব্যয়-নির্ব্বাহের জন্য হেষ্টিংস্‌কে প্রচুর অর্থ দিতে সম্মত হইলেন।

রোহিলা যুদ্ধ।—তবুও হেষ্টিংসের অর্থাভাব ঘুচিল না। তখন তিনি অর্থসংগ্রহের জন্য অত্যন্ত অবৈধ উপায় অবলম্বন করিলেন। এক সময় অযোধ্যার নবাব রোহিলখণ্ড জয় করিবার উদ্দেশ্যে হেষ্টিংসের কাছে একদল ইংরেজ সৈন্য প্রার্থনা করিলেন। সৈন্যদলের যাবতীয় ব্যয়ভার ছাড়া তিনি ইংরেজদিগকে নগদ ৪০ লক্ষ টাকা দিতেও সম্মত হইলেন। ইংরেজ সৈন্যদলের সহায়তায় রোহিলখণ্ড বিজিত হইল। হেষ্টিংস্‌ প্রচুর অর্থলাভ করিলেন এবং দুই বৎসরের মধ্যেই কোম্পানীর সমুদয় ঋণ শোধ হইয়া তহবিলে কিছু অর্থ উদ্বৃত্ত হইল। বঙ্গ-বিহারের ইংরেজ রাজ্য এবং মারাঠা রাজ্যের মধ্যে ছিল অযোধ্যার অবস্থান। সেই মিত্ররাজ্যের শক্তি-বৃদ্ধির চেষ্টা রাজনীতিক দিক দিয়া দোষের নাও হইতে পারে; কিন্তু একথা মনে রাখিতে হইবে যে, হেষ্টিংস্‌ প্রধানতঃ অর্থের জন্য ন্যায়ের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করিতে দ্বিধা করেন নাই।

যুদ্ধের কারণ

রোহিলখণ্ড অধিকার

কোম্পানীর ঋণশোধ

লর্ড নর্থের রেগুলেটিং অ্যাক্ট (১৭৭৩)।—এই সময় কোম্পানীর রাজ্য বহুবিস্তৃত হইয়া পড়ায় এবং শাসনকার্য্যে নানা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হওয়ায় পার্লামেণ্টের কর্ত্তৃপক্ষ ভারতে বৃটিশ শাসনের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা আবশ্যক মনে করিলেন। তদনুযায়ী তখনকার প্রধান মন্ত্রী লর্ড নর্থ 'রেগুলেটিং অ্যাক্ট' নামে পার্লামেণ্টে এক 'ভারত-শাসন আইন' বিধিবদ্ধ করাইয়া লইলেন (১৭৭৩)। এই আইনের বিধান অনুযায়ী বাঙ্গালার গবর্ণরই ইংরেজ-অধিকৃত ভারতবর্ষের গবর্ণর-জেনারেল বা বড়লাট নিযুক্ত হইলেন। গবর্ণর-জেনারেল ব্যতীত আরও চারিজন সদস্য লইয়া তাঁহার শাসনপরিষদ বা কাউন্সিল গঠিত হইল। গবর্ণর জেনারেল হইলেন সেই পরিষদের সভাপতি। সপরিষদ গবর্ণর জেনারেল হইলেন সমগ্র 'বৃটিশ ভারতের' সর্ব্বময় কর্ত্তা। সপরিষদ গবর্ণর-জেনারেল মান্দ্রাজ ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অর্থ-নৈতিক ও পর-রাষ্ট্রীয় ব্যাপার নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা লাভ করিলেন। তিনি ও তাঁহার পারিষদবর্গ শাসনকার্য্যের জন্য বৃটিশ পার্লামেণ্টের কাছে দায়ী হইলেন। সুতরাং বৃটিশ-ভারতের শাসন-সংক্রান্ত রিপোর্ট পার্লা-

রেগুলেটিং অ্যাক্টের বিধান সমূহ

গবর্ণর জেনারেল ও কাউন্সিল

সপরিষদ গবর্ণর জেনারেলের ক্ষমতা ও পার্লামেণ্টে নিকট দায়িত্ব

মেণ্টের ক্যাবিনেট বা মন্ত্রিসভার নিকট পাঠাইবার দায়ীত্বও তাঁহাদের রহিল। এই আইনের বলে ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্ 'বৃটিশ ভারতের গবর্ণর-জেনারেল' নিযুক্ত হইলেন, আর ফ্রান্সিস্, মন্‌সর, ক্লেভারিং ও বরওয়েল হইলেন তাঁহার প্রথম শাসন-পরিষদের সদস্য। এতদ্ব্যতীত, রেগুলেটিং অ্যাক্ট অনুযায়ী একজন প্রধান বিচারপতি ও তিনজন অধস্তন বিচারককে লইয়া কলিকাতায় একটি 'সুপ্রীম কোর্ট' বা উচ্চতম আদালতও স্থাপিত হইল। স্যার ইলাইজা ইম্পে উহার প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হইলেন। তিনি ছিলেন হেষ্টিংসের এক বাল্যবন্ধু। পরে (Sir William Jones) স্যার উইলিয়ম জোন্স জজ হইয়া কলিকাতায় আসেন (১৭৮৩) এবং Asiatic Society of Bengal প্রতিষ্ঠা করিয়া (১৭৮৪) এবং শকুন্তলা ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া প্রসিদ্ধ হন।

প্রথম গবর্ণর-জেনারেল ও পারিষদবর্গের নাম

সুপ্রীমকোর্ট

'রেগুলেটিং অ্যাক্ট'টিকে বৃটিশ পার্লামেণ্টের প্রথম 'ভারত-শাসন আইন' বলিয়া বর্ণনা করা চলে। এই আইনের অনেক ত্রুটি ছিল। সর্ব্বপ্রধান দোষ এই ছিল যে, ইহাতে সপরিষদ গবর্ণর-জেনারেলের সহিত মান্দ্রাজ ও বোম্বের গবর্ণরদ্বয় ও তাঁহাদের কাউন্সিল দু'টির এবং সুপ্রীম কোর্টের সহিত গবর্ণর-লেনারেল ও তাঁহার কাউন্সিলের সম্বন্ধ কি তাহা স্পষ্টভাবে নির্দ্ধারিত কবিয়া দেওয়া হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ, কাউন্সিলের অধিকাংশ সভ্যের অমতে অচল অবস্থা হইত কারণ সে ক্ষেত্রে গবর্ণর-জেনারেলেরও কোন কার্য্য করিবার ক্ষমতা ছিল না। ইহাতে শাসনকার্য্যে খুবই বিশৃঙ্খলা ঘটিত। এদিকে সুপ্রীম কোর্টের ক্ষমতা ও সপরিষদ গবর্ণর জেনারেলের সহিত তাহার সম্বন্ধ সুনির্দ্দিষ্ট না হওয়ার ফলে উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও গোলযোগ উপস্থিত হইল। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য পার্লামেণ্ট পরে সুপ্রীম কোর্টের ক্ষমতা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন।

রেগুলেটিং অ্যাক্টের দোষগুণ

সপরিষদ গবর্ণর-জেনারেলের সহিত অন্যান্য গবর্ণর ও সুপ্রীম কোর্টের সম্বন্ধ

রেগুলেটিং অ্যাক্ট অনুযায়ী শাসনের ফলাফল।— ১৭৭৪ খৃঃ অব্দ হইতে 'রেগুলেটিং অ্যাক্ট' অনুযায়ী শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইল। হেষ্টিংসের কাউন্সিলারদের মধ্যে এক বারওয়েলেরই ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সামান্য কিছু অভিজ্ঞতা ছিল, অপর তিনজন সদস্য সদ্য বিলাত হইতে আসিয়াছিলেন। এই তিনজন

সদস্য কাউন্সিলে হেষ্টিংসের প্রত্যেক প্রস্তাবেরই বিরোধিতা করিতে থাকিলে গবর্ণর-জেনারেলের পক্ষে কাজ করা প্রায় অসম্ভব হইয়া উঠিল। অবশেষে ১৭৭৬ খৃঃ অব্দে মন্‌সনের ও ১৭৭৭ খৃঃ অব্দে ক্লেভারিং-এর মৃত্যু হইলে হেষ্টিংসের অনেক সুবিধা হইল এবং তিনি কতকটা ইচ্ছামত শাসনকার্য্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন।

কাউন্সিলারদের বিরুদ্ধতা ও অচল অবস্থা

নন্দকুমারের ফাঁসী।—কাউন্সিলারদের সঙ্গে গবর্ণর-জেনারেলের বিরোধের কথা গোপন রহিল না; বরং তাঁহারাই আবার গোপনে হেষ্টিংসের শত্রুদিগকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। তখন একে একে তাঁহার বিরুদ্ধে ঘুষ লইবার ও তহবিল তছরূপ করিবার অভিযোগ আসিতে লাগিল। মহারাজ নন্দকুমার নামে জনৈক উচ্চপদস্থ ব্রাহ্মণ, কাউন্সিলে হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে মীরজাফরের অন্যতমা পত্নী মণিবেগমের নিকট হইতে উৎকোচ গ্রহণের অভিযোগ আনয়ন করিলেন। অভিযোগ প্রমাণের জন্য নন্দকুমার দলিলপত্র দাখিল করিতেও ছাড়িলেন না। হেষ্টিংস সভাপতি হিসাবে শাসন-পরিষদে সেই গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন করিতে দিলেন না, উপরন্তু প্রতিহিংসাবশে নন্দকুমারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের পাল্টা অভিযোগ আনিলেন কিন্তু তাহা কাউন্সিলে প্রমাণ করিতে অস্বীকৃত হইলেন। ইতিমধ্যে মোহন-প্রসাদ নামে এক ব্যক্তি হঠাৎ সুপ্রীম কোর্টে নন্দকুমারের নাম জালিয়াতির মামলা আনিল এবং অতি সংক্ষিপ্ত বিচারে নন্দকুমারের ফাঁসি হইয়া গেল (১৭৭৫)। অনেকের বিশ্বাস এই যে, মোহনপ্রসাদ ছিল হেষ্টিংসেরই অনুগৃহীত, আর ইম্পে বাল্যবন্ধু হেষ্টিংসের প্রতি পক্ষপাত-বশতঃ নন্দকুমারের প্রতি সুবিচার করেন নাই, বিশেষতঃ অভিযুক্ত গবর্ণর-জেনারেলের বিচার তখনও মুলতুবি ছিল এবং তাঁহার বিরুদ্ধ পক্ষের প্রধান সাক্ষী ছিলেন নন্দকুমার। হিন্দু অথবা মুস্‌লিম কোন আইন-কানুনেই নন্দকুমারকে ফাঁসি দেওয়া যায় না দেখিয়া ইম্পে জালিয়াতি সম্বন্ধে বৃটিশ আইন প্রয়োগ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই।

নন্দকুমার কর্ত্তৃক হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে অভিযোগ, হেষ্টিংসের পাল্টা অভিযোগ, জালিয়াতি অভিযোগ নন্দকুমারের ফাঁসি

সুপ্রীম কোর্টের সহিত বিবাদ।—সুপ্রীম কোর্ট ও গবর্ণমেণ্টের পরস্পর সম্পর্ক সুস্পষ্টরূপে অ্যাক্টে লিখিত না থাকায় সুপ্রীম কোর্টের সহিত হেষ্টিংসের বিবাদ বাধিয়া গেল। ইম্পে মনে করিতেন যে, সর্ব্বোচ্চ আদালত হিসাবে কলিকাতার সুপ্রীম কোর্ট

শাসনতান্ত্রিক সঙ্কট

কোম্পানীর প্রত্যেক কর্ম্মচারীর উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে পারেন; আর হেষ্টিংস ভাবিতেন যে, সপরিষদ গবর্ণর-জেনারেলই কোম্পানীর সর্ব্বময় কর্তা। এই শাসনতান্ত্রিক সঙ্কট দূর করিবার জন্য হেষ্টিংস ইম্পেকে সদর দেওয়ানী আদালতের প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত করিয়া দিলেন। কিন্তু কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ উহা সমর্থন করিলেন না।

পানিপথের পরাজয়ের পর পেশবা ১ম মাধব রাও কর্ত্তৃক মারাঠা প্রাধান্য পুনরুদ্ধার, ১ম মাধব রাওয়ের মৃত্যু

'প্রথম মারাঠা যুদ্ধ'—ইঙ্গ-মারাঠা সংঘর্ষ।—পানিপথের পরাজয়ের পর পেশবা ১ম মাধব রাওয়ের নেতৃত্বে মারাঠারা তাহাদের হৃতগৌরব পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করিতে থাকে। পেশবার সৈন্যদল ও মহাদাজী সিন্ধিয়া প্রমুখ রণকুশল সেনানায়কদের সহায়তায় দক্ষিণাপথে এবং উত্তরাপথে মারাঠাশক্তি আবার প্রবল হইয়া উঠিল। কিন্তু অকস্মাৎ পেশবা মাধব রাও মাত্র ৩৯ বৎসর বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন (১৮ই নবেম্বর, ১৭৭২)। খুল্লতাত রঘুনাথ বা রাঘোবার চক্রান্তে মারাঠা রাজ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব বাধিয়া উঠিলে মারাঠা শক্তি আবার হীনবল হইয়া পড়িল। পানিপথের পরাজয়েও মারাঠাদের যে ক্ষতি হয় নাই, পেশবা ১ম মাধব রাওয়ের মৃত্যুতে তাহাই হইল এবং এ-ক্ষতি আর কেহ পূরণ করিতে পারেন নাই।

পেশবা নারায়ণ রাও

মাধব রাওয়ের মৃত্যুতে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নারায়ণ রাও তখন পেশবা হইলেন (ডিসেম্বর, ১৭৭২)। তাঁহাদের খুল্লতাত রঘুনাথ বহুদিন হইতেই নিজে পেশবা হইবার জন্য চক্রান্ত করিয়া বেড়াইতেছিলেন। কিছুদিনের মধ্যেই রঘুনাথের চক্রান্তে নারায়ণ রাও নিহত হইলেন এবং (আগষ্ট, ১৭৭৩) রঘুনাথ রাও নিজেকে পেশবা বলিয়া ঘোষণা করিলেন। নারায়ণ রাওয়ের মৃত্যুর সময় তাঁহার পত্নী ছিলেন সন্তান-সম্ভবা; ইহা জানিয়া অনেক মারাঠা-নায়ক স্থির করিলেন যে, নারায়ণ রাওয়ের যদি পুত্র হয় তবে সেই শিশুকেই পেশবা পদে অভিষিক্ত করা হইবে। সৌভাগ্যক্রমে নারায়ণ রাওয়ের এক পুত্র হইল। তখন সেই শিশুকে মাধব রাও নারায়ণ বা দ্বিতীয় মাধব রাও (১৭৭৪-৯৬) নামে পেশবা বলিয়া ঘোষণা করা হইল। মারাঠা-নায়কদের মধ্যে যাঁহারা নবজাত শিশুর উত্তরাধিকার সমর্থন করিতে লাগিলেন তাঁহাদের নায়ক ছিলেন বালাজী

পেশবা রঘুনাথ রাও

পেশবা ২য় মাধব রাও

জনার্দ্দন নামে কূটনীতিক ব্রাহ্মণ। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ ফড়্‌নবীশ' অর্থাৎ হিসাব-বিভাগে অধ্যক্ষের কাজ করিতেন ; তাই তিনি প্রকৃত নামের পরিবর্ত্তে 'নানা ফড়্‌নবীশ' নামেই প্রসিদ্ধ হইয়া গিয়াছেন।

নানা ফড়্‌নবিশ

অতঃপর রঘুনাথ বোম্বায়ের ইংরেজদের নিকট আসিয়া তাঁহাদের সাহায্য ভিক্ষা করিলেন। স্থির হইল, রঘুনাথ ইংরেজের সাহায্যের বিনিময়ে কোম্পানীকে সাল্‌সেটি ও বেসিন দান করিবেন এবং যুদ্ধের সমুদয় ব্যয়ও বহন করিবেন (মার্চ্চ, ১৭৭৫)। ইহারই নাম 'সুরাটের সন্ধি'। ইংরেজদের সঙ্গে মারাঠাদের শত্রুতা ছিল না; তবুও কেবল অন্যায় রাজ্যলাভে, বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট সুরাটের সন্ধি অনুযায়ী কর্ণেল কিটিংকে মারাঠাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন এবং কিটিং সসৈন্যে গুজরাটে প্রবেশ করিলেন! জন মুয়ারও কানহোজি আঙ্গে প্রভৃতি নৌবীরগণের গঠিত মারাঠা নৌবাহিনী ধ্বংস করিয়া দিলেন। কিন্তু এই সময় কলিকাতার গবর্ণমেণ্ট, হেষ্টিংসের অনিচ্ছাসত্ত্বেও সুরাটের সন্ধি বাতিল করিয়া শিশু পেশবার অভিভাবকগণের সহিত এক নূতন সন্ধি করিলেন। এই সন্ধি 'পুরন্দরের সন্ধি' নামে প্রসিদ্ধ (১৭৭৬)। এই সন্ধির সর্ত্ত অনুসারে নানা ফড়্‌নবীশ ইংরেজগণকে সাল্‌সেটি দান করিলেন, ইংরেজগণও রাঘোবার পক্ষ ত্যাগ করিলেন। সপরিষদ বোম্বায়ের গবর্ণর বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের কার্য্যকলাপে অসন্তুষ্ট হইয়া পুরন্দরের সন্ধি উপেক্ষা করিয়া রাঘোবাকেই আশ্রয় দিলেন। এই সময় বিলাতের ডিরেক্টরগণও আবার পুরন্দরের সন্ধি বাতিল করিয়া দিয়া সুরাটের সন্ধিই সমর্থন করিলেন। ইতিমধ্যে কলিকাতার শাসন-পরিষদের দুইজন সদস্যের মৃত্যু হওয়াতে ওয়ারেন্ হেষ্টিংস স্বাধীনভাবে কার্য্য পরিচালনার সুযোগ পাইয়াছিলেন। সুতরাং পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হইল (ডিসেম্বর, ১৭৭৮)। কিন্তু চারিদিক হইতে পরিবেষ্টিত হইয়া ইংরেজ সৈন্যদল পরাজিত হইল এবং ওয়াড়গাঁও নামক স্থানে মারাঠাদের সহিত এক অসম্মানজনক সন্ধিতে ইংরেজদের আবদ্ধ হইতে হইল (১৭৭৯)। স্থির হইল, বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট রাঘোবাকে মারাঠাদের নিকট সমর্পণ করিবেন, এবং এযাবৎ মারাঠাদের নিকট হইতে ইংরেজেরা যাহা কিছু লইয়াছেন সবই প্রত্যর্পণ করিবেন। কিন্তু আশু বিপদের সম্ভাবনা

ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের কারণ

সুরাটের সন্ধি (১৭৭৫)

পুরন্দরের সন্ধি (১৭৭৬)

যুদ্ধ

ইংরেজদের পরাজয়

ওয়াড়গাঁওয়ের সন্ধি (১৭৭৯

ইংরেজগণ কর্তৃক সন্ধি অস্বীকার

এড়াইয়া ইংরেজ সৈন্যগণ নির্ব্বিঘ্নে বোম্বাই পৌঁছিবার পরই ইংরেজগণ সন্ধিসর্ত্ত অস্বীকার করিয়া নূতন করিয়া যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন। গডার্ড নামক এক সেনাপতি মারাঠাদের বিরুদ্ধে প্রেরিত হইলেন। সুরাটে পৌঁছিয়া গডার্ড গায়কবাড়ের সহিত সন্ধি করিলেন (জানুযারী, ১৭৮০)। সিন্ধিয়া এবং হোল্‌কার ওয়াড়গাঁওয়ের সন্ধির পর ইংরেজদের সহিত পুনরায় যুদ্ধেব জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। গডার্ড তাঁহাদিগকে পরাজিত করিয়া আহ্‌মদাবাদ ও বেসিন অধিকার করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু পথে তাঁহার পুনরায় নিদারুণ পরাজয় হইল। এদিকে হেষ্টিংস পপহ্যাম নামক সেনাপতিকে সিন্ধিয়ার বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। পপহ্যাম গোয়ালিয়র দুর্গ অধিকার করিয়া ফেলিলে (১৭৮০) সিন্ধিয়াকে পৃথকভাবে ইংরেজদের সঙ্গে এক সন্ধি করিতে হইল। পেশবার সৈন্যদলের সঙ্গে ইংরেজদেব তখনও সংঘর্ষ চলিতেছিল। মহাদাজী সিন্ধিয়ার মধ্যস্থতার সন্ধি স্থাপিত হইল। তাঁহারই রাজ্যেব অন্তর্ভূত সল্‌বই নামক স্থানে সম্পাদিত হওয়ায় ইহা 'সল্‌বইযের সন্ধি' (১৭৮২) নামে প্রসিদ্ধ। তাহাতে স্থির হইল যে, পুবন্দবের সন্ধির পর ইংরেজ সৈন্যেরা যে সকল স্থান অধিকাব করিয়াছিল তাহা সবই ফিরাইয়া দিতে হইবে, পুবন্দরের সন্ধি অনুযায়ী কোম্পানী কেবল সাল্‌সেটি লাভ করিবেন। অধিকন্তু মাধব রাও নারায়ণকেই কোম্পানী পেশবা বলিয়া মানিয়া লইতে বাধ্য হইলেন, তবে রাঘোবার জন্য বার্ষিক তিনলক্ষ টাকা বৃত্তির ব্যবস্থা কবা হইল।

পুনরায যুদ্ধ

জয-পরাজয

সল্‌বইযের সন্ধি (১৭৮২)

২য় মহীশূর যুদ্ধ—ইঙ্গ-মহীশূর সংঘর্ষ—মারাঠা যুদ্ধ শেয হইবার পূর্ব্বেই ইংরেজদিগকে হায়দর আলীর সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইতে হইল। মারাঠাদের সহিত মহীশূরেব দ্বিতীয় সংঘর্ষে ইংরেজদের বিশ্বাস-ভঙ্গের জন্য হায়দর আলি বরাবরই কুপিত ছিলেন। নিজামও মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্টের উদ্ধত আচরণে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। মারাঠাদের ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ চলিতে চলিতেই ১৭৭৮ খৃঃ অব্দে ইউরোপে আবার ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে বিরোধ বাধিয়া গেল। তখন নিজাম হায়দর আলী ও মারাঠা-নায়ক ভোঁসলার সহিত মিলিত হইয়া ইংরেজদের বিরুদ্ধে এক বিরাট শক্তি-সঙ্ঘ গড়িয়া তুলিলেন (১৭৭৯)। ইউরোপে ইঙ্গ-ফরাসীর সংঘর্ষ

যুদ্ধেব কারণ

উপস্থিত হইবার পর ভারতবর্ষে ইংরেজগণ ফরাসী উপনিবেশগুলি দখল করিতে লাগিলেন ; ফরাসীদের মাহে বন্দরটি ছিল মহীশূর রাজ্যের অন্তর্গত। হায়দরের প্রতিবাদে কর্ণপাত না করিয়া ইংরেজরা মাহে অধিকার করিলেন (১৭৭৯)। তখন হায়দর
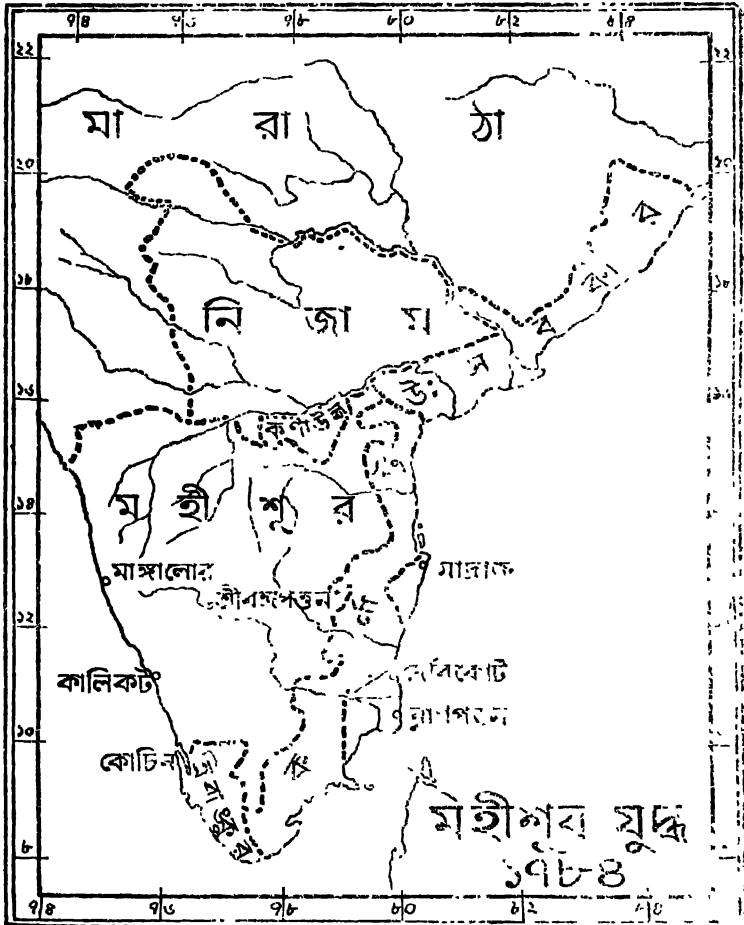
নিজামের সহিত যোগ দিয়া ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। কিন্তু যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পরেই ইংরেজ কর্ত্তৃপক্ষ নিজাম ও ভোঁসলার সহিত সন্ধি স্থাপন করিলেন। হায়দর সসৈন্যে মাদ্রাজের উপকণ্ঠে আসিয়া পৌছিলেন। ইতিমধ্যে বেইলী নামে একজন সেনাপতির অধীনে একদল ইংরেজ সৈন্য উত্তরদিক হইতে মাদ্রাজের অভিমুখে অগ্রসর হইল। হায়দর অপূর্ব্ব ক্ষিপ্রতার সহিত বেইলীর সৈন্যদলকে একেবারে বিধ্বস্ত করিয়া দিলেন (১৭৮০)। ইংরেজ সেনাপতি স্তর আয়ার কূট পোর্তো নোভো নামক স্থানে হায়দরকে পরাজিত করিলেন (১৭৮১); কিন্তু হায়দরের পুত্র টিপু তাঞ্জোরে কর্ণেল ব্রেথওয়েট নামক ইংরেজ সেনাপতির সৈন্যদলকে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিলেন (১৭৮২)। কিছুকাল পরে হায়দরের মৃত্যুতে (১৭৮২) যুদ্ধের বেগ সামান্য মন্দীভূত হইলেও নিবৃত্ত হইল না। পর বৎসর টিপু সুলতান ম্যাথুস নামক ইংরাজ সেনাপতিকে একেবারে সসৈন্যে বন্দী করিলেন (১৭৮৩)। এই বৎসরই ইউরোপে শান্তি স্থাপিত হয়। তখন উভয়পক্ষে বন্দী-বিনিময় ও বিজিত স্থান প্রত্যর্পণের সর্ত্তে মাঙ্গালোর নামক স্থানে ইংরেজদের সঙ্গে টিপু সুলতানের সন্ধি হয় (১৭৮৪)। শুধু যে সব ইংরাজ বন্দীদের জোর করিয়া ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করা হইয়াছিল তাহাদের মুক্তি দেওয়া হয় নাই।

জয়-পরাজয়

হায়দরের মৃত্যু (১৭৮২)

টিপু সুলতান

মাঙ্গালোরের সন্ধি (১৭৮৪)

বাদশাহী সাম্রাজ্যের পতনের পর এদেশে যে কয়জন অসাধারণ শক্তিশালী পুরুষের আবির্ভাব হইয়াছিল হায়দর আলী তাঁহাদের অন্যতম। তাঁহার পুঁথিপড়া শিক্ষাদীক্ষা কিছুই ছিল না। তবুও তিনি দূরদর্শী ও শাসনপটু ছিলেন। রাজকার্য্যের প্রত্যেকটি ব্যাপার তিনি স্বয়ং পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। তাঁহার সরল ও অকপট স্বভাবে এবং প্রতিজ্ঞাপালনের দৃঢ়তায় তিনি সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় পরিশ্রমী রাজা এবং উৎসাহী ও রণকুশল সেনানায়ক সর্ব্বদেশেই বিরল। নগণ্য মহীশূর রাজ্যটিকে তিনিই ভারতবর্ষের মধ্যে একটি প্রথম শ্রেণীর শক্তিতে পরিণত করিয়া তুলিয়াছিলেন। শৃঙ্খলা ও ন্যায়ানুবর্ত্তিতার প্রতি তাঁহার ছিল সহজ অনুরাগ, এবং সেজন্য তাঁহার সময় মহীশূরে প্রকৃষ্ট শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হওয়ায় রাজ্যটি দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হয়।

হায়দর আলীর চরিত্র ও কৃতিত্ব

হেষ্টিংসের অর্থাভাব ও তাহার প্রতিকার।—প্রায় প্রথমাবধিই হেষ্টিংস্ শাসনকার্য্যের জন্য অর্থাভাব বোধ করিতে-ছিলেন। তাই শাসনভার হাতে লইয়াই তিনি অর্থ-সংগ্রহের চেষ্টা করেন। মারাঠা ও মহীশূর যুদ্ধের ফলে কোম্পানীর কোষাগার শূন্য হইয়া আসিল। আবার তিনি অর্থ-সংগ্রহের জন্য অবৈধ উপায় অবলম্বন করিতে লাগিলেন।

(১) অযোধ্যার নবাবের সঙ্গে বন্দোবস্ত।—অর্থাভাবে হেষ্টিংস্ অযোধ্যার নবাব আসফ্উদ্দৌলার সহিত এক নূতন বন্দোবস্ত করিলেন। বন্দোবস্ত অনুসারে নবাবের সৈন্যদলকে ইংরেজ কর্ম্মচারী দ্বারা পাশ্চাত্য প্রথায় শিক্ষা দিবার মূল্য স্বরূপ নবাব কয়েকটি জেলার রাজস্ব ইংরেজ গবর্ণমেণ্টকে দান করিবেন স্থির হইল। এইরূপে ইংরেজ সামরিক কর্ম্মচারিগণকে ভাড়া খাটাইয়া হেষ্টিংস্ কোম্পানীর কোষাগার পূর্ণ করিতে লাগিলেন।

(২) চৈৎসিংহের উপর অত্যাচার।—বারাণসী ছিল অযোধ্যার নবাবের অধীন একটি সামন্ত রাজ্য। ১৭৭৫ খৃঃ অব্দে এই রাজ্যটি কোম্পানীর অধিকারে আসে। তখন এরূপ এক চুক্তি হইয়াছিল যে, বারাণসীর রাজা চৈৎসিংহ যতদিন পর্য্যন্ত কোম্পানীকে বার্ষিক সাড়ে বাইস লক্ষ টাকা কর দিবেন ততদিন কোম্পানী তাঁহার রাজ্যের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিবেন না, বা রাজ্যের কোনও ক্ষতি হইতে দিবেন না। তদবধি চৈৎসিংহ নিয়মিতভাবে কোম্পানীকে রাজস্ব দিতেন। এমন কি হেষ্টিংসের অন্যায় অতিরিক্ত দাবীও বারবার মিটাইয়া আসিতেছিলেন। ১৭৮১ খৃঃ অব্দে হেষ্টিংস্ চৈৎসিংহকে কোম্পানীর জন্য এক হাজার অশ্বারোহী সৈন্য প্রেরণ করিবার আদেশ দিলেন। আদেশমত একটি ক্ষুদ্র সৈন্যদল গঠন করাও হইল। কিন্তু হেষ্টিংস্ আদেশ-পালনে শৈথিল্যের অজুহাতে চৈৎসিংহকে ৫০ লক্ষ টাকা জরিমানা করিলেন, এবং জরিমানা আদায়ের অছিলায় সসৈন্যে বারাণসীধামে গিয়া উপস্থিত হইলেন। চৈৎসিংহকে তাঁহার প্রাসাদেই বন্দী করা হইল। তখন প্রজারা রাজার এই অপমানে ক্রুদ্ধ হইয়া ইংরেজ সৈন্যদিগকে হত্যা করিল। হেষ্টিংস্ কোনক্রমে প্রাণ লইয়া চুনারে পলায়ন করিলেন। অতঃপর সৈন্য সংগ্রহ

চৈৎসিংহের সহিত কোম্পানীর চুক্তি

চৈৎসিংহের উপর অন্যায় দাবি

জুলুম

চৈৎসিংহকে গ্রেপ্তার ও বিদ্রোহ.

বিদ্রোহ দমন ও চৈৎসিংহের পলায়ন

নয়া ব্যবস্থায় আয়বৃদ্ধি

করিয়া তিনি বারাণসী অধিকার করেন। নিরুপায় চৈৎসিংহ তখন গোয়ালিয়রে পলায়ন করিলেন। তাঁহার এক আত্মীয়কে আনিয়া বাৎসরিক চল্লিশ লক্ষ টাকা করদানের চুক্তিতে বারাণসীর গদীতে বসান হইল (১৭৮১)।

নবাবের নিকট প্রাপ্য অর্থ দাবি

নবাবের উত্তর

শাসন-পরিষদের ব্যবস্থা

বেগমদের ধন-লুণ্ঠন

(৩) **অযোধ্যার বেগমদের উপর জুলুম।**—তবুও কোম্পানীর অর্থাভাব ঘুচিল না। অযোধ্যার নবাবের নিকট হইতে ইংরেজ সৈন্যের ব্যয় বাবদ কোম্পানী যে অর্থ পাইতেন, নবাব তাহা সম্পূর্ণভাবে শোধ করিতে পারিতেছিলেন না। হেষ্টিংস্ তাঁহাকে টাকার জন্য অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেলন। নবাব তখন বলিয়া পাঠাইলেন যে, তাঁহার পিতার সম্পত্তির অধিকাংশ তাঁহার মাতা ও পিতামহীর হস্তগত হওয়ায় তাঁহার পক্ষে এত অর্থ প্রদান করা একেবারেই অসম্ভব। নবাব সুজাউদ্দৌলার মৃত্যুর পর কলিকাতার শাসন-পরিষদের অনুমোদনেই সুজাউদ্দৌলার পত্নী এবং মাতা তাঁহার সঞ্চিত ধনরত্ন এবং সম্পত্তির কিয়দংশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। হেষ্টিংস্ নবাবকে তাঁহার মাতা ও পিতামহীর ধনসম্পত্তি বলপূর্ব্ব অধিকার করিতে পরামর্শ দিয়া একদল ইংরেজ সৈন্যও প্রেরণ করিলেন। সৈন্যদের অত্যাচারে বেগমরা নিতান্ত বিপন্ন হইয়া উঠিলেন, তাঁহাদের বিশ্বস্ত খোজা রক্ষীদের উপর অকথ্য অত্যাচার করা হইতে লাগিল। এই হীন উপায়ে অসহায় অন্তঃপুরিকা বেগমদের নিকট হইতে জুলুম করিয়া ৭৬ লক্ষ টাকা আদায় করা হয় (১৭৮২)।

হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে আন্দোলন, পিটের ভারত শাসন আইন (১৭৮৪), হেষ্টিংসের পদত্যাগ (১৭৮৫)

হেষ্টিংসের স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন।—এ সকল ঘৃণ্য সংবাদ ইংলণ্ডে পৌঁছিলে সেখানকার সকলেই শঙ্কিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। হেষ্টিংসের বিরোধী পক্ষের সকলে সেখানে প্রবল আন্দোলন উপস্থিত করিলেন। বৃটিশ মন্ত্রী ফক্স (Fox) ভারত শাসনের ভার কোম্পানীর নিকট হইতে হস্তান্তরিত করিয়া একজন বৃটিশ মন্ত্রীর উপর ন্যস্ত করিবার জন্য পার্লামেণ্টে এক 'বিল' আনয়ন করিলেন (১৭৮৩)। কিন্তু উহা বাতিল হইয়া গেল। পর বৎসর (১৭৮৪) প্রধান মন্ত্রী পিট (Pitt) 'ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট' নামে পার্লামেণ্টে এক আইন পাশ করাইয়া লইলে হেষ্টিংস্ পদত্যাগ করিয়া স্বদেশে চলিয়া গেলেন (১৭৮৫)।

হেষ্টিংসের বিচার (১৭৮৮-৯৫)

ক্লাইভের বেলায় যেমন হইয়াছিল এবারও পার্লামেণ্টের কমন্স সভা হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে রোহিলাদের স্বাধীনতা হরণ, চৈৎসিংহ ও অযোধ্যার বেগমদের প্রতি অত্যাচার, প্রভৃতির জন্য লর্ডস্ সভার নিকট প্রবল অভিযোগ (Impeachment) আনয়ন করেন। সেকালের প্রসিদ্ধ রাজনীতিজ্ঞ ও বাগ্মী বার্ক, শেরিডন্, প্রভৃতি তাঁহাকে অভিযুক্ত করিলেন। দীর্ঘ সাত বৎসর ধরিয়া হেষ্টিংসের বিচার চলিল। বহুকষ্টে তিনি নির্দ্দোষ বলিয়া মুক্তিলাভ করেন (১৭৯৫)। ১৮১৮ খৃঃ অব্দে ৮৫ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়।

মুক্তিলাভ

হেষ্টিংসের চরিত্র ও কৃতিত্ব।—মানবতা ও ন্যায়নীতির দিক হইতে হেষ্টিংসকে প্রশংসা করা প্রায় অসম্ভব। কিন্তু বাস্তব রাজনীতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাঁহার কার্য্যাবলী বিচার করিতে গেলে তাঁহাকে কিছু প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। মীরজাফরের পত্নী মণিবেগমের নিকট হইতে দেড় লক্ষ টাকা সেলামী লইলেও, ক্লাইভ, ভ্যান্সিটার্ট, প্রভৃতি সে যুগের কর্ম্মচারীদের তুলনায় হেষ্টিংস সম্ভবতঃ ততটা লুব্ধ ছিলেন না। তাঁহাকে এক নিরতিশয় কলুষিত আবহাওয়ার মধ্যে বহু ত্রুটিপূর্ণ শাসনতন্ত্র লইয়া কাজ চালাইতে হইয়াছিল। কিন্তু রোহিলাদের স্বাধীনতা হরণ, চৈৎসিংহের ও অযোধ্যার বেগমদের উপর জঘন্য অত্যাচার কিছুতেই সমর্থন করা যায় না; অবশ্য স্বদেশ ও স্বজাতির ক্ষমতা-বৃদ্ধির জন্য তিনি এদেশের উপর অন্যায় করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাই বলিয়া ন্যায় নীতির দিক দিয়া ক্লাইভ বা হেষ্টিংস্‌কে সমর্থন করা চলে না। সুতরাং হেষ্টিংসের সর্ব্বপ্রধান এবং বোধ হয় একমাত্র সাফল্য দাঁড়াইল ভারতে বৃটিশ-প্রভুত্ব রক্ষা। হায়দর আলী ও মারাঠাদের সহিত সংঘর্ষ সত্ত্বেও তিনি এদেশে ইংরেজদের প্রাধান্য যে কেবল অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন তাহাই নয়, উহা দৃঢ়তর করিয়াও তুলিয়াছিলেন। এখানেই হেষ্টিংসের কৃতিত্ব; সংগঠন-মূলক নীতিতেও তিনি তাঁহার বুদ্ধিমত্তা, রাজনীতি-জ্ঞান, সাহস, কর্ম্মক্ষমতা, প্রভৃতির কিছু পরিচয় দিয়া গিয়াছেন; আর এজন্যই অনেকে হেষ্টিংসকে ভারতবর্ষের একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গবর্ণর-জেনারেল বলিয়া গণ্য করেন। শাসনকার্য্যেও তিনি তাঁহার দায়িত্বজ্ঞান এবং দক্ষতা দেখাইয়া গিয়াছেন। তবে হেষ্টিংসের শাসনসংস্কার ক্লাইভ-

দোষত্রুটি ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা

কৃতিত্ব

প্রবর্ত্তিত দ্বৈত-শাসনেরই পরিণতি বলিয়াও মনে করা যাইতে পারে। তিনি দ্বৈতশাসনের সফলতার দ্বারা এদেশে কেবল বৃটিশ প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, শাসনদায়িত্ব পূর্ণভাবে গ্রহণ করিয়া দ্বৈত-শাসনের অন্তর্নিহিত অচল অবস্থারও অবসান করিয়াছিলেন।

এশিয়াটিক সোসাইটি, কলিকাতা মাদ্রাসা ও কাশীর সংস্কৃত কলেজ

শিক্ষার প্রসার।—হেষ্টিংসের উৎসাহে নানাদিকে বিদ্যাচর্চ্চা ও শিক্ষার প্রসার ঘটে। এই সময় পণ্ডিতপ্রবর স্যর উইলিয়ম জোন্স ভারতীয় এবং প্রাচ্যদেশীয় ইতিহাস, সাহিত্য, বিজ্ঞান, প্রভৃতি আলোচনার জন্য 'এশিয়াটিক সোসাইটি' প্রতিষ্ঠা করেন (১৭৮৪)। আরবী ও পারসিক শিক্ষার জন্য 'কলিকাতা মাদ্রাসা' (১৭৮২), ও হিন্দু বিদ্যা প্রসারের জন্য কাশীতে 'সংস্কৃত কলেজ' স্থাপিত হয়। তাঁহার নির্দ্দেশক্রমে হ্যালহেড্ সাহেব প্রথম বাঙ্গালা ব্যাকরণ এবং হিন্দু ও মুসলমানদের ব্যবস্থা-শাস্ত্রের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেন, এবং মেজর রেনেল গঙ্গাবিধৌত দেশগুলির বৈজ্ঞানিক মানচিত্র প্রস্তুত করেন। তাঁহার অর্থসাহায্যে উইল্‌কিন্‌স্‌-কৃত ভগবৎগীতার প্রথম ইংরেজী অনুবাদ ছাপা হয়; পরে জোন্‌স্ শকুন্তলার ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করিয়া সারা ইউরোপে সংস্কৃত সাহিত্যের গৌরব প্রকাশ করেন। এই সময়ে উইল্‌কিন্‌স্ প্রথম টাইপ কাটিয়া বাঙ্গালায় ছাপাখানার পত্তন করেন। ১৭৮১ খৃঃ অব্দে 'হিকিস্ গেজেট' নামক প্রথম ইংরেজি সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়।

বোর্ড-অব-কণ্ট্রোল

পিটের ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট।—১৭৮৪ খৃঃ অব্দে ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী উইলিয়ম পিট 'ইণ্ডিয়া এ্যাক্ট' নামে নূতন 'ভারত-শাসন-আইন' পার্লামেণ্টে পাশ করাইয়া লন। সেই আইনের বলে, মন্ত্রীদের পরামর্শ অনুযায়ী ইংলণ্ডের রাজা, ছয়জন সদস্য লইয়া 'বোর্ড অব-কণ্ট্রোল' নামে একটি পরিষদ গঠন করেন। একজন মন্ত্রী ইহার সভাপতি নিযুক্ত হইলেন। কোম্পানীর ডিরেক্টর সভার পরিবর্ত্তে ভারত-শাসনের কর্ত্তৃত্বভার এই বোর্ডের উপর ন্যস্ত হয়। বড়লাট তিনজন সদস্য লইয়া বোর্ড-অব-কণ্ট্রোলের অধীনে ভারত-বর্ষের শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন, স্থির হইল।

স-পরিষদ বড়লাটের ক্ষমতা

স-পরিষদ গবর্ণর-জেনারেল যুদ্ধবিগ্রহ, সন্ধি, অর্থ ও বৈদেশিক ব্যাপারে স-পরিষদ মাদ্রাজ ও বোম্বের গবর্ণরের উপর সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব লাভ করিলেন। নিতান্ত প্রয়োজন হইলে পরিষদের মতামত অগ্রাহ্য করিয়া গবর্ণর-

জেনারেল নিজ দায়িত্বে কার্য্য নির্ব্বাহের ক্ষমতা লাভ করিলেন। সুপ্রীম কোর্টের ক্ষমতাও এই আইনে স্পষ্টতরভাবে নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া হয়। লর্ড নর্থের রেগুলেটিং অ্যাক্টের কয়েকটি মূল ত্রুটি এইভাবে সংশোধিত হইল।

বড়লাটের নিজ দায়িত্বে কার্য্যের ক্ষমতা, সুপ্রীম কোর্টের ক্ষমতা

ম্যাক্‌ফারসন্।—হেষ্টিংস্ চলিয়া গেলে শাসন-পরিষদের প্রবীণ সদস্য ম্যাক্‌ফারসন অস্থায়িভাবে কয়েক মাস (১৭৮৫—৮৬) গবর্ণর-জেনারেলের কার্য্য করেন।

লর্ড কর্ণওয়ালিস্।—লর্ড কর্ণওয়ালিস্ ১৭৮৬ খৃঃ অব্দে ভারতবর্ষে আসিয়া স্যর জন ম্যাক্‌ফারসনের নিকট হইতে গবর্ণর-জেনারেলের কার্য্যভার গ্রহণ করেন। তিনি বিশেষ সম্ভ্রান্ত বংশের লোক ছিলেন। সততা ও ন্যায়নিষ্ঠার জন্য তাঁহার খ্যাতিও ছিল যথেষ্ট। ভারতবর্ষে ইংরেজ কর্ম্মচারীদের দুর্নীতি দূর করিবার জন্যই কর্ণওয়ালিসকে গবর্ণর-জেনারেল করিয়া পাঠান হয়। আবশ্যক হইলে শাসন-পরিষদের মতামত অগ্রাহ্য করিয়া কার্য্য করিবার অধিকার গবর্ণর-জেনারেলকে দেওয়াতে, কর্ণওয়ালিসের পক্ষে কার্য্য পরিচালনা অনেক সহজ হইয়াছিল। অধিকন্তু তাঁহাকে প্রধান সেনাপতির ক্ষমতাও দেওয়া হয়। আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামে কর্ণওয়ালিস বৃটিশ সেনাপতিরূপে যুদ্ধ করেন সুতরাং যুদ্ধ-বিগ্রহে তিনি বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন।

কর্ণওয়ালিসের নিয়োগ ও সুযোগ-সুবিধা

তৃতীয় মহীশূর যুদ্ধ।—পিট তাঁহার ইণ্ডিয়া অ্যাক্টে এরূপ নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন যে, ইংরেজগণ ভারতে রাজ্য বিস্তার করিতে পারিবেন না, দেশীয় রাজাদের সহিত তাঁহাদিগকে সদ্ভাব রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে। এজন্য কর্ণওয়ালিস কার্য্যভার গ্রহণ করার পর শান্তিরক্ষা করিয়াই চলিতেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাঁহাকেও যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে হইল। ১৭৮৯ খৃঃ অব্দে টিপু ত্রিবাঙ্কুর রাজ্য আক্রমণ করেন। ত্রিবাঙ্কুর ছিল ইংরেজদের মিত্র-রাজ্য। কর্ণওয়ালিস তৎক্ষণাৎ নিজাম ও মারাঠাদের সহিত টিপুর রাজ্য আক্রমণ করিলেন। নিজাম, মারাঠা ও ইংরেজদের সমবেত শক্তির সহিত টিপু একাই বীরবিক্রমে লড়িতে লাগিলেন। বহুদিন যুদ্ধের পর কর্ণওয়ালিস টিপুর রাজধানী শ্রীরঙ্গপত্তম অবরোধ করিয়া ফেলিলে (১৭৯২) নিরুপায় হইয়া টিপুকে সন্ধি করিতে হইল। সন্ধির

যুদ্ধের কারণ ইংরেজদের নিজাম ও মারাঠাদের সহিত সন্ধি, টিপুর পরাজয় ও শ্রীরঙ্গপত্তমের সন্ধি (১৭৯২)

সর্ত্ত অনুসারে তিনি মহীশূর রাজ্যের অর্দ্ধেক ছাড়িয়া দিলেন এবং যুদ্ধের ক্ষতিপূরণস্বরূপ ৩ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা দিতে সম্মত হইলেন। টিপুর রাজ্যের এই অর্দ্ধাংশ ইংরেজ, নিজাম ও মারাঠারা ভাগাভাগি করিয়া লইল। ক্ষতি-পূরণের টাকার জামিন হিসাবে কর্ণওয়ালিস টিপুর দুই পুত্রকে কলিকাতায় আনিয়া রাখিলেন।

টিপু সুলতান

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত।—লর্ড কর্ণওয়ালিস এদেশে নানারূপ শাসন-সংস্কারের জন্যই বিখ্যাত। এদেশে কোম্পানীর রাজত্ব আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ভূমি-রাজস্ব লইয়া নানারূপ বিশৃঙ্খলা চলিতেছিল। হেষ্টিংসের শাসনকালে ভূমিকর নিলামে চড়াইয়া দিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। যিনি সর্ব্বোচ্চ মূল্য দিতে চাহিতেন পাঁচ বৎসরের জন্য জমি তাঁহাকেই দেওয়া হইত। যখন যিনি যে জমি নিলামে ডাকিয়া লইতেন, তখন লাভের অভিপ্রায়ে তিনি জোরজুলুম করিয়া কৃষকদের নিকট হইতে যত বেশী অর্থ আদায় করা সম্ভব তাহা আদায় করিতে ছাড়িতেন না। কৃষকেরা উৎপীড়নে উৎসন্ন হইতে বসিল, অনেকে চাষবাস ছাড়িয়া পলাইল। জমির দরও কমিয়া গেল। এদিকে আবার অনেক সঙ্গতিপন্ন লোক অধিক লাভের আশায় অত্যধিক মূল্যে নিলামে জমি ডাকিয়া লইতে লাগিলেন, কিন্তু শেষ অবধি প্রতিশ্রুত অর্থ গবর্ণমেণ্টকে দিতে পারিতেন না। ইহাতে গবর্ণমেণ্টের তহবিলে কোন্ বৎসর কত টাকা জমিবে বা ঘাটতি হইবে তাহার কোনই স্থিরতা না থাকায় শাসনকার্য্যে বিশৃঙ্খলা ঘটিতে লাগিল। কর্ণওয়ালিস্ তখন, বিলাতের জমিদারী প্রথার অনুকরণে, এদেশের জমিদারদের সঙ্গে ভূমি-রাজস্বের পরিমাণ চিরদিনের মত নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন।

ভূমি-রাজস্ব সংক্রান্ত বিশৃঙ্খলা

জমিদারগণকে জমির স্থায়ী মালিক বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া হইল; তাঁহারা নিজ নিজ জমির জন্য বৎসরে গবর্ণমেণ্টকে কত টাকা করিয়া রাজস্ব দিবেন তাহাও চিরকালের মত স্থির করিয়া দেওয়া হইল। ইহাই 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' (Permanent Settlement) নামে খ্যাত। বিলাতের কর্তৃপক্ষ কর্ণওয়ালিসের ব্যবস্থা সমর্থন করিলেন। ১৭৯৩ খৃঃ অব্দে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্ত্তিত হইল। ১৭৯৫ খৃঃ অব্দে বারাণসীতেও উহা প্রবর্ত্তিত হয়।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলাফল।—চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দ্বারা কর্ণওয়ালিস বাঙ্গালাদেশে একদল অভিজাত ভূস্বামী-সম্প্রদায় ও প্রভাবশালী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সৃষ্টি করিলেন। কিন্তু এই ব্যবস্থায় কৃষকগণ ক্ষতিগ্রস্ত হইল এবং তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে জমিদারের কৃপার উপর নির্ভর করিতে হইল। জমিদার ইচ্ছামত প্রজাদের খাজনা বৃদ্ধি অথবা তাহাদের একেবারে উচ্ছেদ করিতেও পারিতেন। পরবর্ত্তীকালে কয়েকটি প্রজাস্বত্ব আইন বিধিবদ্ধ হওয়ার ফলে জমির উপর প্রজার অধিকার কিছু পরিমাণে স্বীকৃত হইয়াছে। এই ব্যবস্থার জন্যই জমিদার সম্প্রদায় কৃষকদের শ্রমলব্ধ অর্থের উপর অন্যায়ভাবে ভাগ বসাইতেছেন, ইহা অস্বীকার করা যায় না। তবুও এই চিরস্থায়ী ব্যবস্থায় প্রথমে জমিদারগণ লাভবান হইতে পারেন নাই। নির্দ্দিষ্ট দিনে রাজস্ব দিতে না পারায় কঠোর 'সূর্য্যাস্ত আইন' অনুসারে অনেক জমিদারের সম্পত্তি হস্তচ্যুত হইত। অপরদিকে এই ব্যবস্থায় রাজস্ব চিরদিনের জন্য নির্দ্দিষ্ট হওয়ায় গবর্ণমেণ্টের শাসন-কার্য্যে কতকটা সুবিধা হইয়াছে সত্য, কিন্তু এই বন্দোবস্তের জন্য গবর্ণমেণ্টের ক্ষতিও হয় যথেষ্ট। কারণ পরে জমির মূল্য অনেক পরিমাণে বাড়িয়া গেলেও গবর্ণমেণ্টের পক্ষে রাজস্ব বৃদ্ধির কোনও উপায় নাই। তাই রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য গবর্ণমেণ্টকে অন্যভাবে নানারূপ কর বসাইতে হইয়াছে। সে সকল কর ছাড়া স্বার্থপর জমিদারগণের শোষণেও, প্রজারা প্রায় ধ্বংসের পথে চলিল। এই নিয়ম প্রবর্ত্তনের ৮০ বৎসর পরে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় "বাঙ্গালাদেশের কৃষক" প্রবন্ধে তাহাদের দুর্দ্দশার প্রকৃত ছবিটি আঁকেন। কর্ণওয়ালিস

অভিজাত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী

পরবর্ত্তী সংস্কার

'সূর্য্যাস্ত আইন'

গবর্ণমেণ্টের ক্ষতি

ভারতের অবস্থা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন তাই তিনি বিলাতী রীতিতে "চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত" স্থির করেন। রাজস্ব আদায়রূপ উচ্চপদ প্রভৃতিতে তিনি কোন ভারতীয়কে নিয়োগ করা যুক্তি-সঙ্গত মনে করিলেন না। আর এইসব ইংরেজ কেবলমাত্র রাজস্ব আদায় করিয়াই খালাস। প্রজাদের অভাব-অভিযোগে কর্ণপাত করা তাঁহাদের কর্ত্তব্যের মধ্যে নয়। যে প্রজা নির্দ্দিষ্টদিনে তাহার খাজনা দিতে অসমর্থ হইবে তাহাকে জেলা জজের নিকট সমর্পণ করিয়া দিয়াই কালেক্টর নিশ্চিন্ত। তারপর প্রজা শাস্তি ভোগ করুক। কর্ণওয়ালিসের সময় জেলা জজ শুধু বিচার এবং দণ্ডবিধান করিয়া ক্ষান্ত ছিলেন না, তাঁহাকে পুলিশের পূর্ণ ক্ষমতাও জাহির করিতে হইত। জজও আবার ইংরেজ, প্রজার ভাষা তাঁহার বোধগম্য হয় না, তদুপরি আইন-কানুনও বিজাতীয় ভাষায় লেখা। আরো মুস্কিল দরিদ্র প্রজাকে উকিল নিযুক্ত করিয়া তাহার কেস্ বুঝা-ইতে হইত, তাহাও প্রচুর খরচ সাপেক্ষ। গ্রামের শান্তির জন্য নিয়োজিত হইল দারোগা, তাহার প্রতাপে সব গ্রামবাসী এবং জমিদারও কম্পিত। ইংরেজ কালেক্টর ও জজ এবং ভারতীয় দারোগা সবাই হইল ক্ষমতাবান, শুধু নিষ্পেষিত হইতে লাগিল দীন নিরীহ প্রজা।

দুর্নীতির প্রতিকার

অন্যান্য সংস্কার।—কোম্পানীর কর্ম্মচারীদের দুর্নীতি দূর করিবার জন্যই কর্ণওয়ালিসকে এদেশে প্রেরণ করা হইয়াছিল। তাই কর্ম্মচারীরা যাহাতে উৎকোচাদি গ্রহণ না করে সেজন্য তিনি তাহাদের বেতন বাড়াইয়া দিবার ব্যবস্থা করিলেন।

জেলা গঠন

জেলা আদালত

বিচারক নিয়োগ

শাসনকার্য্যের সুবিধার জন্য কর্ণওয়ালিস এক একটি প্রদেশকে কয়েকটি করিয়া জেলায় ভাগ করিলেন। প্রত্যেক জেলায় একটি করিয়া দেওয়ানী আদালত স্থাপন করা হইল। এক একটি জেলা-আদালতে একজন করিয়া বৃটিশ বিচারক (জজ) থাকিতেন। একজন হিন্দু পণ্ডিত এবং একজন মুসলমান কাজি দেশের আইন সম্বন্ধে তাঁহাকে পরামর্শ দিতেন। ইংরাজী ভাষাজ্ঞানহীন পণ্ডিত অথবা কাজির পক্ষে ইংরেজ জজকে পরামর্শ দিবার বিড়ম্বনা সহজেই অনুমেয়। জেলা আদালত হইতে কলিকাতার সদর দেওয়ানী আদালতে 'আপীল' করিবার ব্যবস্থা অব্যাহত রহিল।

জেলা আদালত এবং সদর দেওয়ানী আদালতের মধ্যবর্ত্তী চারিটি প্রাদেশিক আদালতও স্থাপিত হইল। প্রত্যেক প্রাদেশিক আদালতের ভার দেওয়া হইল তিনজন করিয়া বৃটিশ বিচারকের উপর; কয়েকজন হিন্দু ও মুস্লিম আইনজ্ঞ তাঁহাদের সাহায্য করিতেন। প্রাদেশিক আদালতের বিচারকরা জেলায় জেলায় ঘুরিয়া ফৌজদারী মামলার বিচার করিতেন। এইভাবে দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার কাজ পৃথক করিয়া দেওয়া হইল। কলিকাতার সদর নিজামৎ আদালতে আপীলের ব্যবস্থা রহিল। এখন হইতে কালেক্টরের উপর শুধু রাজস্ব আদায়ের ভার ন্যস্ত হইল। এইভাবে বিচার ও রাজস্ব বিভাগ পৃথক করিয়া দেওয়াতে শাসনকার্য্যে সুবিধা হইল। কিন্তু আইন যেমন হইল ঘোরালো তেমনই হইল ব্যয়বহুল। গরীব প্রজার দুর্দ্দশার সীমা রহিল না। তদুপরি জজদের সংখ্যালঘুতার জন্য একজনের জীবদ্দশায় একটা কেস্ শেষ হইত না। তাহার উপর শপথের শব্দগুলি হিন্দুদের কাছে পাপ বলিয়া মনে হইত। তাই স্যার জন শোরের পুত্র যিনি বহুদিন ভারতের বিচার বিভাগে কাজ করিয়া অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন তিনিও বলিয়াছেন, "ইংরেজ বিচারালয়ে কোন হিন্দুর আগমনের অর্থই হইতেছে তাহার জাতিকুলমর্য্যাদায় সন্দেহ।"

সদর দেওয়ানী আদালত

প্রাদেশিক আদালত

ফৌজদারি মামলার ব্যবস্থা, সদর নিজামৎ আদালত

প্রত্যেকটি জেলা কয়েকটি থানায় ভাগ করা হইল। এক একজন দারোগা এক একটি থানার প্রধান কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইলেন। জেলা আদালতের বিচারকগণই ছিলেন জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট,—অর্থাৎ পুলিশ বিভাগের কর্ত্তা। বিচার এবং শাসন-বিভাগ আলাদা না হওয়ায় লোকদের উৎপীড়ন বাড়িয়াই চলিল।

জজের উপর ম্যাজিষ্ট্রেটের দায়িত্ব অর্পণ

কোম্পানীর নূতন সনন্দ।—কর্ণওয়ালিসের শাসনকালের শেষ ভাগে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ২০ বৎসরের জন্য এক নূতন সনন্দ লাভ করেন (১৭৯৩—১৮১৩)। ইহার বলে কোম্পানী এদেশে আরও বিশ বৎসরের জন্য একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার লাভ করিলেন। এই বৎসরই কর্ণওয়ালিস স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

ভারতে ইংরাজ শাসন প্রতিষ্ঠার পর কর্ণওয়ালিসের ন্যায় ন্যায়নিষ্ঠ লোকের প্রয়োজন ছিল। তাঁহার নির্ম্মল চরিত্রের

কর্ণওয়ালিসের চরিত্র ও কৃতিত্ব

উদাহরণে এবং শাসন-সংস্কারের চেষ্টায় কোম্পানীর কর্ম্মচারীদের মধ্যে অনাচার বহুলাংশে দূরীভূত হইয়াছিল; বৃটিশ শাসনও এদেশে দৃঢ়তর হইয়া উঠিবার সুযোগ পাইয়াছিল।

স্যার জন শোর।—কর্ণওয়ালিসের পর স্যার জন শোর গবর্ণর-জেনারেল নিযুক্ত হন (১৭৯৩)। তিনি ছিলেন কোম্পানীর একজন প্রবীণ ও অভিজ্ঞ কর্ম্মচারী; কর্ণওয়ালিসের শাসনে প্রবর্ত্তিত হইলেও "চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত" আসলে স্যার জন শোরেরই পরিকল্পনা। সততা ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠার জন্যও তাঁহার সুনাম ছিল। তিনি একান্ত শান্তিপ্রিয় লোক ছিলেন। পিটের ইণ্ডিয়া অ্যাক্টের নির্দেশ অনুযায়ী তিনি দেশীয় রাজ্যগুলির ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন নাই। তাঁহার এই নীতির নাম দেওয়া হইয়াছে 'ঔদাসীন্য-নীতি' (Policy of Non-intervention)। তবুও তিনি যে দেশীয় রাজ্যের ব্যাপারে কখনও হস্তক্ষেপ করেন নাই তাহা নয়। ১৭৯৭ খৃঃ অব্দে অযোধ্যার নবাব আসফউদ্দৌলার মৃত্যু হইলে শোর মৃত নবাবের মনোনীত উজির আলীর পরিবর্ত্তে আসফউদ্দৌলার ভ্রাতা সাদৎ আলীকে নবাবী দান করেন। বিনিময়ে সাদৎ আলী এলাহাবাদ জেলাটি ইংরেজ গবর্ণমেণ্টকে দান করিলেন।

ঔদাসীন্য নীতি

অযোধ্যার উত্তরাধিকারে হস্তক্ষেপ

সাদৎ আলী কর্ত্তৃক এলাহাবাদ দান

মারাঠা-রাজ্য সমূহ।—সলবইয়ের সন্ধির পর মহাদাজী সিন্ধিয়া উত্তর-ভারতে অসাধারণ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ভারতীয় সৈন্যদলকে পাশ্চাত্য প্রথায় শিক্ষিত করিয়া তুলিবার জন্য তিনি কয়েকজন ইউরোপীয় সামরিক কর্ম্মচারী নিয়োগ করিয়াছিলেন। এই সকল ইউরোপীয় কর্ম্মচারীদের মধ্যে ডি বয়েন (De Boigne) ছিলেন সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। বাদশাহ শাহ্ আলমকে হস্তগত করিয়া মহাদাজী উত্তর-ভারতে আপনার প্রভাব সমূহ বর্দ্ধিত করেন। তাঁহার সুশিক্ষিত সৈন্যদলের সহায়তায় মহাদাজী জাঠ ও রাজপুতগণের উপর নিজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। এই সময় পুনায় নানা ফড়্নবীশই পেশবার নামে রাজ্য পরিচালনা করিতেছিলেন। নানা ফড়নবীশের কর্ত্তৃত্ব খর্ব্ব করিয়া মারাঠা সাম্রাজ্যে একাধিপত্য স্থাপন করিবার ইচ্ছা মহাদাজীর ছিল; এজন্য মহাদাজী সসৈন্যে পুনার দিকে অগ্রসর হইলে হোলকারের সহিত তাঁহার কর্ম্মচারীদের বিবাদ বাধিয়া গেল, যুদ্ধও হইল; তাহাতে

মহাদাজী সিন্ধিয়া

ডি বয়েন

হোলকার পরাভূত হইলেন। এদিকে অকস্মাৎ মহাদাজীর মৃত্যু হইলে (১৭৯৪) তাঁহার পোষ্যপুত্র (ভ্রাতুষ্পুত্র) দৌলৎরাও সিন্ধিয়া পদ লাভ করিলেন। এ-সময় তিনি ত্রয়োদশ বর্ষীয় বালক মাত্র।

মহাদাজীর মৃত্যু (১৭৯৪), দৌলত রাও সিন্ধিয়া, অহল্যাবাঈয়ের মৃত্যু (১৭৯৫

পর বৎসর মলহর রাও হোলকারের পুত্রবধূ সুপ্রসিদ্ধা অহল্যা-বাঈ পরলোক গমন করেন (১৭৯৫)। যে সকল মহীয়সী মহিলার শাসন দক্ষতায় ভারতবর্ষের ইতিহাস উজ্জ্বল হইয়া আছে অহল্যা-বাঈ তাঁহাদের অন্যতমা। তিনি প্রায় ত্রিশ বৎসর কাল অপূর্ব্ব যোগ্যতার সহিত ইন্দোর রাজ্য শাসন করিয়া গিয়াছেন। অহল্যা-বাঈয়ের পর তুকোজী হোলকার ইন্দোরের শাসনকর্ত্তার পদ প্রাপ্ত হইলেন। তুকোজী রণদক্ষ ছিলেন, কিন্তু রাজনীতিতে তাঁহার কোনরূপ জ্ঞান ছিল না।

তুকোজী হোলকার

মারাঠা রাজ্যের কেন্দ্রভাগে ছিলেন নানা ফড়্‌নবীশ। বালক পেশবা মাধব রাও নারায়ণের নামে প্রকৃতপক্ষে তিনিই পুনা শাসন করিতেছিলেন। কর্ণওয়ালিসের সহিত টিপুর বিরুদ্ধে যোগদানের ফলে মারাঠা রাজ্যের সীমা তখন দক্ষিণে তুঙ্গভদ্রা নদী অবধি বিস্তার লাভ করিয়াছিল।

নানা ফড়্‌নবীশ

নিজামের সহিত মারাঠাদের যুদ্ধ।—মহাদাজী সিন্ধিয়ার মৃত্যুতে নানা ফড়্‌নবীশই মারাঠা সাম্রাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া উঠিলেন ; তখন নিজামের সহিত মারাঠাদের যুদ্ধ বাধিল। নিজাম বার বার স্যার জন শোরের নিকট সাহায্যের জন্য প্রার্থনা জানাইতে লাগিলেন, কিন্তু কোন সাহায্যই আসিল না। ১৭৯৫ খৃঃ অব্দে খর্দ্দা নামক স্থানে নিজামের শোচনীয় পরাজয় ঘটিল। তিনি তাঁহার রাজ্যের প্রায় অর্দ্ধাংশ ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইলেন।

নিজামের পরাজয়

মারাঠা সাম্রাজ্যে গোলযোগ।—নানা ফড়্‌নবীশের কঠোর শাসন তরুণ পেশবাকে তিলে তিলে বধ করিতেছিল ; শেষে মাত্র ২১ বৎসর বয়সে পেশবা মাধব রাও নারায়ণ আত্মহত্যা করিলেন (১৭৯৫)। রাঘোবার পুত্র বাজীরাও হইলেন পেশবা পদের উত্তরাধিকারী। রাজ্যে দলাদলি দেখা দিল। ফড়্‌নবীশ কারারুদ্ধ হইলেন। এই গোলযোগের সুযোগে নিজাম তাঁহার হৃতরাজ্যের কিয়দংশ পুনরুদ্ধার করিয়া লইলেন। এই আভ্যন্তরিণ দলাদলিই অবশেষে মারাঠা শক্তির পতনের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিল।

পেশবা মাধব রাও নারায়ণের আত্মহত্যা (১৭৯৫)

দলাদলি

STUDIES AND QUESTIONS

1. Describe the revenue, judicial and financial reforms of Warren Hastings. (C. U. '12, '40).

2. Give your own estimate of the character and achievements of Warren Hastings. (C. U. '23, '29)

3. "Warren Hastings will always occupy an honoured place among the Anglo-Indian statesmen"—Why ? (C. U. '34).

4. Describe the extent of the British possessions in India at the end of the administration of Warren Hastings. (C. U. '11, '14).

5 Describe British relations with Mysore under Warren Hastings. (C. U. '13).

6. Show how the Government of East India Company in India was modified and improved by (1) The Regulating Act of 1773 and (2) Pitt's India Act of 1784. (C U. '16, '19).

7. Mention the principal difficulties of internal and foreign administration that Warren Hastings had to face and show how he overcame them. (C. U. '33, '41).

8. Describe British relations with Mysore under Cornwallis. (C. U '11, '17, '20).

9 State what you know of the Permanent Settlement. (C. U. '16).

10. Describe the measures of land-revenue of Lord Cornwallis and point out its principal merits and demerits. (C U. '32, '45).

11. What dangers faced the British power in India in the time of Warren Hastings and how did he meet them ? (C. U. '43).

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়

বৃটিশ শক্তির প্রসার

লর্ড ওয়েলেসলী।—(১৭৯৮—১৮০৫)। স্যার জন শোরের পর লর্ড ওয়েলেসলী, আর্ল অব মর্ণিংটন, গবর্ণর-জেনারেল হইয়া আসিলেন। তিনি স্যার জনের 'ঔদাসীন্য-নীতি' ত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষে একছত্র বৃটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারে মনোনিবেশ করিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি এক নূতন নীতি প্রবর্ত্তন করিলেন। তাঁহার নূতন নীতির নাম হইতেছে 'সামন্ত-তান্ত্রিক সন্ধি'

লর্ড ওয়েলেসলী

সামন্ততান্ত্রিক সন্ধি

(Subsidiary Alliance). এই নীতি অনুসারে দেশীয় মিত্র রাজ্যসমূহের রক্ষার ভার ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট বহন করিবেন। তদুদ্দেশ্যে তাঁহাদিগকে নিজ নিজ রাজ্যে একদল করিয়া বৃটিশ সৈন্য রাখিতে হইবে এবং সৈন্যদলের খরচ যোগাইবার জন্য প্রত্যেকে তাঁহার রাজ্যের এক এক অংশ বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে দিতে বাধ্য থাকিবেন। এরূপ সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ ভারতীয় রাজগণ ইংরেজ প্রাধান্য স্বীকার করিবেন এবং ইংরেজের বিনানুমতিতে অন্য কোনও রাজার সহিত রাজনৈতিক সম্বন্ধ রাখিতে পারিবেন না। প্রকৃতপক্ষে ওয়েলেসলীর উদ্দেশ্য ছিল দেশীয় রাজদরবারে ফরাসী প্রাধান্য লোপ করা এবং স্বাধীন রাজগণকে ব্রিটিশ সামন্ত শ্রেণীতে পরিণত করা।

নিজামের বৃটিশ সামন্তে পরিণতি।—বড় বড় দেশীয় নৃপতিদের মধ্যে তখন নিজামই বোধ হয় ছিলেন সবচেয়ে দুর্ব্বল।

দুর্দ্দান্ত মারাঠাদের বিক্রমে তাঁহাকে সব সময় শঙ্কিত থাকিতে হইত। তাই নিজাম সর্ব্বপ্রথম সামন্ততান্ত্রিক সন্ধির চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়া বৃটিশ-শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ১৮০০ খৃঃ অব্দে তিনি রাজ্যের একাংশ বৃটিশ সৈন্যের ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য ছাড়িয়া দিলেন।

নিজাম ও ইংরেজগণ

চতুর্থ মহীশূর যুদ্ধ—ইঙ্গ-মহীশূর সংঘর্ষ ও মহীশূরের পতন।—টিপু সুলতান তখন মরিশাসের ফরাসী গবর্ণর-জেনারেলের সঙ্গে পত্রালাপ করিতেছিলেন। নেপোলিয়ান বোনাপার্টকেও তিনি ভারতবর্ষে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন; এবং নেপোলিয়ান ফরাসী ভাষায় লিখিত চিঠিতে "Citizen Tippo"কে যে জবাব দেন তাহাও রক্ষিত হইয়াছে। ওয়েলেস্‌লী টিপুকে সামন্ততান্ত্রিক সন্ধি স্বীকার করিতে আহ্বান করিলেন। টিপু ঘৃণাভরে সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন। ১৭৯৯ খৃঃ অব্দে তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষিত হইল। রাজধানী শ্রীরঙ্গপত্তম রক্ষার জন্য টিপু বীরের ন্যায় যুদ্ধ করিতে করিতে প্রাণদান করিলেন (৪ঠা মে, ১৭৯৯)। টিপুর মৃত্যুতে মহীশূরেরও পতন হইল। ওয়েলেস্‌লী মহীশূর রাজ্যের একাংশ নিজামকে দান করিলেন, একাংশ বৃটিশ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইলেন, আর মধ্যভাগ দেওয়া হইল সেখানকার পুরাতন হিন্দু রাজবংশের এক বালককে; মহীশূরের নূতন রাজা নাবালক বলিয়া কিছুকাল উহা ওয়েলেস্‌লীরই শাসনাধীনে রহিল। যে অংশ নিজামকে দেওয়া হইয়াছিল তাহাও নিজাম রাজ্যের বৃটিশ সৈন্যদের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য বৃটিশদের হাতে আসিয়া পড়িল (১৮০০)।

টিপু ও ফরাসীগণ

টিপুর পরাজয় ও মৃত্যু (১৭৯৯)

মহীশূর বিভাগ

বিদেশী ঐতিহাসিকদের অনেকে টিপু সুলতানের চরিত্রে অযথা কলঙ্ক লেপন করিয়াছেন; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে টিপুর অনেক সদগুণ ছিল, তিনি সুশাসকও ছিলেন। তাঁহার ন্যায় সাহসী, পরিশ্রমী, রণকুশল, সদাশয়, জনপ্রিয় এবং বিদ্বান্ নরপতি যে কোন দেশেই দুর্লভ। তাঁহার নৈতিক চরিত্রও ছিল নিষ্কলঙ্ক। পিতার ন্যায় তিনি সহজ, সরল অথচ দৃঢ়-প্রকৃতির লোক ছিলেন। সমসাময়িক ভারতীয় রাজাদের তুলনায় তিনি অনেক বিষয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। বৈদেশিক রাজনীতি সম্বন্ধে তাঁহার কৌতূহল এবং বিশেষ জ্ঞান দুই-ই ছিল। আফগানিস্থান, তুরস্ক, ফ্রান্স, প্রভৃতি

টিপুর চরিত্র

দেশের সহিত তাঁহার রাজনৈতিক সম্পর্ক ছিল। তাঁহার মত উদার মুস্‌লিম নেতার সহিত হিন্দু রাজগণ এক হইলে ভারতীয় স্বাধীনতার ইতিহাস হয়ত অন্যভাবে রচিত হইত। কর্ণেল মুন্রার টিপুর রাজত্ব সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন।

অন্যান্য রাজ্য অধিকার।—নিজামের বশ্যতা স্বীকার ও টিপু সুলতানের পতনে ওয়েলেস্‌লীর সম্মুখ হইতে দুইটি বড় বাধা দূর হইল। ১৭৯৯ খৃঃ অব্দে তিনি আবার তাঞ্জোরের রাজা এবং সুরাটের নবাবকে বৃত্তিদান করিয়া গদি হইতে অপসারিত করিলেন; তাঁহাদের রাজ্য বৃটিশের হস্তগত হইয়া গেল। তারপর ওয়েলেস্‌লী কর্ণাটের নবাবের বিরুদ্ধে টিপুর সহিত চক্রান্তের অভিযোগ আনিয়া তাঁহার রাজ্যটিও গ্রাস করিলেন (১৮০১)। এদিকে অযোধ্যার নবাব সাদৎ আলীর বিরুদ্ধে কু-শাসনের অভিযোগে ওয়েলেস্‌লী তাঁহার নিকট হইতে গঙ্গা-যমুনার অন্তর্ব্বর্ত্তী দোয়াব, রোহিলখণ্ড এবং গোরক্ষপুর কাড়িয়া লইলেন। অপরদিকে ওয়েলেস্‌লী ভারতবর্ষে পর্ত্তুগীজ, ডাচ ও ফরাসীদের অনেকগুলি উপনিবেশও করায়ত্ত করিলেন।

তাঞ্জোর ও সুরাট

কর্ণাট

অযোধ্যার কিয়দংশ ও ভারতের ইউরোপীয় উপনিবেশ গ্রাস

মারাঠা সাম্রাজ্যের দুরবস্থা।—মারাঠাদের তখন বড়ই দুর্দ্দিন পড়িয়াছিল। অথচ এই মারাঠা সাম্রাজ্যের সম্বন্ধে স্যার জন ম্যাল্‌কলম্ ১৮৩২ খৃঃ বলিয়াছিলেন, "আমি এযাবৎ মারাঠা-শাসিত দেশের মত এমন কৃষি ও বাণিজ্যের সুন্দর সমাবেশে সমৃদ্ধ দেশ আর দেখি নাই।" মহাদাজী সিন্ধিয়া ও অহল্যাবাঈ ইতিপূর্ব্বেই পরলোক গমন করিয়াছিলেন। মাধব-রাও নারায়ণের আত্মহত্যার পর যে গোলযোগ আরম্ভ হইয়াছিল তাহারও নিবৃত্তি হয় নাই। নূতন পেশবা ২য় বাজীরাও যেমন অকর্ম্মণ্য তেমনি নীচাশয় ছিলেন; এরূপ অবস্থায় ১৮০০ খৃঃ অব্দে নানা ফড়্‌নবীশের মৃত্যু হইল; সঙ্গে সঙ্গে মারাঠা রাষ্ট্রসমূহে ঐক্য ও শৃঙ্খলার অবসান হইল। এদিকে তুকোজী হোলকারের পুত্র যশোবন্ত রাও হোলকারের সহিত দৌলৎরাও সিন্ধিয়ার ভীষণ সংঘর্ষ বাধিয়া উঠিল। পেশবা ২য় বাজীরাও নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য মারাঠা নায়কগণকে পরস্পরের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। পেশবা ও সিন্ধিয়ার সম্মিলিত বাহিনী যশোবন্ত

নানা ফড়্‌নবিশের মৃত্যু (১৮০০

হোলকারের হাতে পরাজয়ে পেশবার বৃটিশ আশ্রয় গ্রহণ, বেসিনের সন্ধি (১৮০২)

রাও-এর হস্তে বিধ্বস্ত হইলে (১৮০২) বাজীরাও পুণা হইতে পলায়ন করিয়া ব্রিটিশের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন; বেসিনের সন্ধিতে (৩১শে ডিসেম্বর, ১৮০২) ওয়েলেস্‌লীর সামন্ততান্ত্রিক সন্ধি গ্রহণ করিয়া, একদল ইংরেজ সৈন্যের সঙ্গে, বাজীরাও পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া, পেশবার গদিতে বসিলেন।

মারাঠা-রণনায়কগণের বিচ্ছিন্ন ঐক্য

দ্বিতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ।—পেশবা স্বাধীনতা বিকাইয়া দিলেও মারাঠা-রণনায়কগণ তাহা স্বীকার করিলেন না; সিন্ধিয়া ও ভোঁসলা ইংরেজদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। পেশবাও নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া গোপনে তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষকতা করিতে লাগিলেন। কিন্তু প্রতিভাবান নায়কের অভাবে মারাঠাদের ঐক্য নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। ওয়েলেস্‌লী বুদ্ধিবলে ভারতীয় চরিত্র বুঝিয়া ফেলিয়াছিলেন। মারাঠারা যত বড় দুর্দ্ধর্ষই হউক না কেন, তাহারা যে যুদ্ধক্ষেত্রে এক সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে একত্র হইয়া এক নায়কের কর্তৃত্বে দাঁড়াইতে পারিবে না, তাহা বুঝিয়া তিনি এক একটি মারাঠা শক্তির সঙ্গে খণ্ড যুদ্ধ করাই স্থির করিলেন এবং এই নীতিতেই তিনি মারাঠা শক্তি চিরদিনের মত পঙ্গু করিয়া দিলেন। সিন্ধিয়া ও ভোঁসলার সহিত যোগ না দিয়া হোলকার নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিলেন, আর তাঁহারা দু'জনেও কোনও সুনির্দ্দিষ্ট কর্ম্মনীতি স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না। গবর্ণর-জেনারেলের ভ্রাতা স্যর আর্থার ওয়েলেস্‌লি (পরে নেপোলিয়ন-বিজয়ী ডিউক অব ওয়েলিংটন) সিন্ধিয়া ও ভোঁসলার মিলিত বাহিনীকে ঔরঙ্গাবাদের নিকটে আসাই নামক স্থানে পরাজিত করিলেন (সেপ্টেম্বর, ১৮০৩)। তারপর বেরারের অন্তর্গত আরগাঁও নামক স্থানে ভোঁসলা পুনরায় পরাভূত হইলেন (নবেম্বর, ১৮০৩)। আরগাঁওয়ের যুদ্ধে পরাজিত হইয়া ভোঁস্‌লার পক্ষে সন্ধি করা ব্যতীত গত্যন্তর রহিল না। দেওগাঁও নামক স্থানে সন্ধি হইল,—ভোঁসলা সামন্ততান্ত্রিক সন্ধি গ্রহণ করিলেন এবং সন্ধির সর্ত্ত অনুযায়ী, উড়িষ্যার কটক অঞ্চল বৃটিশের হাতে অর্পণ করেন। এদিকে সেনাপতি লেক উত্তর দিক হইতে সিন্ধিয়াকে আক্রমণ করিলেন। দিল্লী ইংরেজদের অধিকারে আসিল। তারপর আলোয়ারের অন্তর্গত লাসোয়ারী নামক স্থানে সিন্ধিয়া লেক-এর

আসাইয়ের যুদ্ধ

আরগাঁওয়ের যুদ্ধ, দেওগাঁয়ের সন্ধিতে ভোঁসলার সামন্ততান্ত্রিক নীতিগ্রহণ

হাতে পরাজিত হইলেন (১৮০৩)। তখন সুরজী অর্জ্জুনগাঁও নামক স্থানে সিন্ধিয়া সন্ধি করিলেন,—তাঁহাকেও সামন্ততান্ত্রিক সন্ধি স্বীকার করিতে হইল; সন্ধির সর্ত্ত অনুসারে তিনি গঙ্গাযমুনার দোয়াব বৃটিশদের হস্তে সমর্পণ করিলেন।

সুরজী অর্জ্জুন-গাঁওয়ের সন্ধিতে সিন্ধিয়ার সামন্ততান্ত্রিক নীতি গ্রহণ,

হোলকার এতদিন যুদ্ধের গতি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। এবার তিনি রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহার হস্তে কর্ণেল মনসনের বাহিনী সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইল (১৮০৪)। কিন্তু ইহার অনতিকাল পরেই দীগের যুদ্ধে তাঁহার পরাভব হয়। হোলকার গিয়া ভরতপুর দুর্গে আশ্রয় লইলেন,—এই দুর্ভেদ্য দুর্গটি তখন ছিল জাঠদের অধীন। সেনাপতি লেক বহু চেষ্টা করিয়াও দুর্গটি অধিকার করিতে পারিলেন না (১৮০৫)। হোলকারও সে যাত্রা রক্ষা পাইলেন।

হোলকারের সহিত যুদ্ধ

ভরতপুর দুর্গ অবরোধ ও ইংরাজদের ব্যর্থতা

ওয়েলেস্‌লীর প্রত্যাবর্ত্তন।—এই সকল যুদ্ধবিগ্রহের ফলে দিন দিন কোম্পানীর তহবিলে টান পড়িতে লাগিল। ওয়েলেস্‌লীর কার্য্যাবলীও বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষের মনঃপূত হইতেছিল না। তারপর হোলকারের হস্তে কর্ণেল মনসনের পরাভব এবং ভরতপুরে লেক্‌এর ব্যর্থতার সংবাদ ইংলণ্ডে পৌঁছিলে কর্ত্তৃপক্ষ শঙ্কিত হইয়া ওয়েলেস্‌লীকে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের নির্দ্দেশ দিয়া পাঠাইলেন।

ওয়েলেস্‌লীকে স্বদেশে আহ্বান (১৮০৫)

ওয়েলেস্‌লীর চেষ্টায় মহীশূরের শক্তি চিরদিনের মত লুপ্ত হইয়া যায়, মারাঠা শক্তিকেও তিনিই সম্পূর্ণরূপে পঙ্গু করিয়া দেন; নিজামকে তিনিই বৃটিশ কর্ত্তৃত্বের আশ্রয় দান করেন। এইভাবে তাঁহার চেষ্টায় ভারতবর্ষে বৃটিশের তিনটি প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তির পতন হয়। যেমন নৌবল-গঠনে মনযোগ না দিবার অপরাধে ভারতীয় রাজন্যগণ পাশ্চাত্য বণিক-সঙ্ঘের আক্রমণ রোধ করিতে পারেন নাই, তেমনি কামান, বন্দুক ও বারুদের যুদ্ধ-পদ্ধতি আয়ত্ত না করায় ভারতীয় রাজশক্তি ও যুদ্ধজীবী জাতিরা শুধু প্রাচীন যুদ্ধাস্ত্র লইয়া লড়িতে নামায় সম্পূর্ণ পরাস্ত হয় ও পাশ্চাত্য রাষ্ট্রের নিকট স্বাধীনতা হারায়। লর্ড ওয়েলেস্‌লী ১৮০০ খৃঃ অব্দে বিলাতে এক রিপোর্ট পাঠান "এক কলিকাতা বন্দরেই ১০,০০০ হাজার টনের জাহাজ, বিলাতে চালান দিবার জন্য প্রতি বৎসর নির্ম্মিত হয়।" কোম্পানী ধীরে ধীরে ভারতে জাহাজ নির্ম্মাণ নিষিদ্ধ

ওয়েলেস্‌লীর কৃতিত্ব

নিজামের মৈত্রী

মহীশূরের বিনাশ ও মারাঠা শক্তি খর্ব্ব,

করিয়া দেয়। ক্লাইভ এদেশে বৃটিশ রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন, হেষ্টিংস তাহাকে আসন্ন বিনাশের কবল হইতে উদ্ধার করিয়া যান, ওয়েলেস্‌লীর চেষ্টায় ভারতবর্ষে বৃটিশ অধিকার দ্রুত বিস্তারের পথে অগ্রসর হইতে থাকে। ক্লাইভ ও হেষ্টিংসকে যথার্থ সাম্রাজ্যবাদী বলা যায় না,—ওয়েলেস্‌লীই ছিলেন এদেশে প্রথম স্পষ্ট সাম্রাজ্যবাদী গবর্ণর-জেনারেল। ফরাসী-বিপ্লবের যুগে ভারতে এবং ভারতের বাহিরেও ফরাসী শক্তি প্রতিরোধ ছিল তাঁহার সাম্রাজ্যবাদেরই একটি বিশেষ অংশ এবং তাঁহার অসাধারণ রাজনীতিজ্ঞানের পরিচয়। আভ্যন্তরীণ শাসনে তিনি শৃঙ্খলা সুপ্রতিষ্ঠিত করেন এবং বৃটিশ সিভিলিয়ানদের দেশীয় ভাষাদি শিক্ষার জন্য কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপন করেন (১৮০০)। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ বাঙ্গালা, হিন্দী, উর্দ্দু, প্রভৃতি ভাষায় গদ্য-সাহিত্য রচনার আদিকেন্দ্র ছিল। এই কলেজ উন্মোচনের উদ্দেশ্য ছিল অল্পশিক্ষিত বণিক্ ইংরাজ সম্প্রদায়কে শাসকরূপে সাম্রাজ্য রাজনীতিতে শিক্ষিত করা।

সাম্রাজ্যবাদ, বৈদেশিক নীতি

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠা

লর্ড কর্ণওয়ালিস।—(১৮০৫)।—ওয়েলেস্‌লী যুদ্ধবিগ্রহের দ্বারা এদেশে যে অশান্তির সৃষ্টি করিয়া গিয়াছিলেন তাহা দূর করিবার জন্য কর্ত্তৃপক্ষ লর্ড কর্ণওয়ালিসকে পুনরায় এদেশে গবর্ণর-জেনারেল নিযুক্ত করিয়া প্রেরণ করিলেন (১৮০৫)। কিন্তু তখন বার্দ্ধক্যে তিনি ভগ্ন-স্বাস্থ্য হইয়া পড়িয়াছিলেন। এদেশে আসিয়া তিন মাসের মধ্যেই তিনি গাজীপুরে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

স্যার জর্জ্জ বার্লো।—(১৮০৫—৭)—তখন শাসন-পরিষদের প্রবীণ সদস্য স্যার জর্জ্জ বার্লোকে অস্থায়ীভাবে গবর্ণর-জেনারেল নিযুক্ত করা হয় (১৮০৫—৭)। বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষের নির্দ্দেশ অনুযায়ী হোলকারকে হৃতরাজ্য ফিরাইয়া দেওয়া এবং রাজপুতানার উপর হোলকারের আধিপত্য স্বীকার করিয়া লওয়া হইল। এই সময়েই প্রথম সিপাহীদের (বৃটিশের অধীনে দেশীয় সৈনিক) মধ্যে বিদ্রোহ হয়; ১৮০৬ খৃঃ অব্দে ভেলোরে তাহারা বিদ্রোহ করে। কিন্তু সহজেই উহা দমন করা হয়।

হোলকারের সহিত সন্ধি

সিপাহীদের বিদ্রোহ

প্রথম লর্ড মিণ্টো (১৮০৭—১৮১৩)।—১৮০৭ খৃঃ অব্দে লর্ড মিণ্টো গবর্ণর-জেনারেল নিযুক্ত হইয়া এদেশে আসেন। ইতি-

পূর্ব্বে তিনি ছিলেন বোর্ড-অব্-কণ্ট্রোলের সভাপতি। নেপোলিয়ানের সহিত ইংলণ্ডের সংঘর্ষের জন্য ফরাসী প্রভাব প্রতিরোধ করাই ছিল বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রধান বৈদেশিক নীতি। এরূপ অবস্থায় বৃটিশ কর্তৃপক্ষ ভারতবর্ষে নূতন গোলযোগ বাধাইবার একান্ত বিরোধী ছিলেন। এজন্য মিণ্টোও এখানে আসিয়া দেশীয় রাজাদের সহিত সদ্ভাব রক্ষা করিয়া চলিতে লাগিলেন, এবং প্রতিবেশী রাজ্যগুলিতে ফরাসী প্রভাব বিস্তারের প্রতিরোধে যত্নশীল হইলেন। শেষোক্ত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ১৮০৮ খৃঃ অব্দে তিনি কাবুল ও পারস্যে দূত প্রেরণ করেন। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই তাঁহার দৌত্য ব্যর্থ হইয়া যায়। বিখ্যাত ঐতিহাসিক এল্‌ফিনষ্টোনকে পারস্যের দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। তখন মিণ্টো লাহোরে পাঞ্জাবকেশরী রাজা রণজিৎ সিংহের নিকট দূত প্রেরণ করেন; রণজিৎ সিংহ সাগ্রহে বৃটিশের সহিত মৈত্রী স্থাপনে সম্মত হন।

বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের বৈদেশিক নীতি

কাবুল ও পারস্যে দূত প্রেরণ এবং ব্যর্থতা

রণজিৎ সিংহের সহিত মৈত্রী স্থাপন

রণজিৎ সিংহ—শিখশক্তির অভ্যুত্থান।—গুরু গোবিন্দের পর হইতেই শিখদের মধ্যে সামরিক শক্তি দ্রুত বিকাশ হইতেছিল। কিন্তু তাহাদের মধ্যে গুরুপদ লুপ্ত হওয়ায় শিখগণ অনেকগুলি 'মিস্‌ল' বা দলে বিভক্ত হইয়া পড়ে। রণজিৎসিংহেব পিতা ছিলেন এইরূপ একটি 'মিসল'-এর নায়ক। ১৭৯২ খৃঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে দ্বাদশ বর্ষীয় বালক রণজিৎ সিংহ (জন্ম ১৭৮০) উত্তরাধিকারসূত্রে পিতার আসন লাভ করেন। আহ্‌মদ শাহ দুর্‌রাণীর মৃত্যুর কিছুকাল পরে তাঁহার পৌত্র জমান শাহ্ কাবুল ও পঞ্জাবের অংশবিশেষ লাভ করিলেন। পঞ্জাব আক্রমণকালে রণজিৎসিংহ তাঁহাকে বিশেষ সাহায্য করেন। প্রতিদানে জমান শাহ্ তাঁহাকে লাহোরেব শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন এবং 'রাজা' উপাধিতে ভূষিত করেন। ক্রমে রণজিৎ সিংহ শিখ মিস্‌লগুলিকে স্বীয় অধীনে আনিয়া উত্তর ভারতে একটি শক্তিশালী স্বাধীন রাজ্য স্থাপনের উদ্যোগ করিলেন। তিনি আফগান প্রভুত্ব অস্বীকার করিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং ধীরে ধীরে পঞ্জাব ও কাশ্মীরে নিজের নিজের প্রভুত্ব স্থাপন করিলেন। লুধিয়ানাও তাঁহার হস্তগত হইল। তারপর রণজিৎ শতদ্রু ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী

শিখদেব সামরিক শক্তির বিকাশ

রণজিতের বাল্যজীবন

জমান শাহ্

রণজিতেব রাজা উপাধি লাভ

পঞ্জাব, কাশ্মীর ও লুধিয়ানা জয়

শিখরাজ্যগুলি অধিকার করিবার জন্য অগ্রসর হন ; সেখানকার শিখেরা বৃটিশের সহায়তা প্রার্থনা করিলে লর্ড মিণ্টো রণজিৎ-এর নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। বৃটিশের সহিত

অমৃতসরের সন্ধি (১৮০৯)

রণজিৎসিংহ

রণজিৎ সিংহের অমৃতসরে এক সন্ধি হইল (১৮০৯)। রণজিৎ শতদ্রু অতিক্রম করিয়া আর রাজ্য বিস্তার করিবেন না বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিলেন এবং ইংরেজরাও তাঁহার রাজ্যে হস্তক্ষেপ করিবেন না এইরূপ অঙ্গীকার করিলেন। রণজিৎ আজীবন এই সন্ধির মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। লুধিয়ানায় একটি বৃটিশ সৈন্যাবাস স্থাপিত হইল। বৃটিশ প্রভুত্ব পশ্চিমে শতদ্রু পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইল। অতঃপর রণজিৎ সিংহ উত্তর ও পশ্চিমে আরও কয়েকটি রাজ্য জয় করিয়া শিখরাজ্যকে একটি অতি শক্তিশালী রাজ্যে পরিণত করিলেন। উত্তরে কাশ্মীর হইতে দক্ষিণে মূলতান পর্য্যন্ত এবং পূর্ব্বে শতদ্রু হইতে পশ্চিমে পেশোয়ার পর্য্যন্ত তাঁহার রাজ্য বিস্তৃত ছিল। ১৮৩৯ সালে রণজিৎ সিংহের মৃত্যু হয় এবং ১৯৩৯ সালে সমগ্র পঞ্জাববাসী ও শিখসম্প্রদায় এই বীর কেশরীর শতবার্ষিকী উৎসব করেন।

মরিশাস, বুর্বোঁ, মলক্কা ও যবদ্বীপ অধিকার

মিণ্টোর সামুদ্রিক অভিযান।—কর্ণওয়ালিসের শাসনকালে মলাক্কা উপসাগরের পিনাং দ্বীপটি এবং শোরের সময় সিংহল এবং উত্তমাশা দ্বীপ দুইটি অধিকৃত হয়। ভারত মহাসাগরে ফরাসী প্রভুত্ব বিনষ্ট করিবার জন্য মিণ্টো ১৮১০ খৃঃ অব্দে ফরাসী অধিকৃত মরিশাস্ ও বুর্বোঁদ্বীপ অধিকার করিলেন।

যবদ্বীপ ও মলাক্কা ছিল ডাচ্‌দের অধিকারে। কিন্তু পাছে ফরাসীরা তাহাদের সহিত মৈত্রী স্থাপন করিয়া এই দ্বীপগুলিতে কর্তৃত্ব স্থাপন করে, এজন্য তিনি প্রথমে মলাক্কা (১৮১০) এবং তারপর যবদ্বীপ (১৮১১) অধিকার করিলেন। পরে ১৮১৫ খৃঃ অব্দে সন্ধি স্থাপিত হইলে এক মরিশাস ব্যতীত অপর দ্বীপগুলি ফিরাইয়া দেওয়া হয়। কিন্তু ১৮১৯ খৃঃ অব্দে ষ্ট্যাম্‌ফোর্ড র‍্যাফেলস্ সিঙ্গাপুর জয় করিয়া সুদূর প্রাচ্যে ইংরাজশক্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া এই ক্ষতি পূরণ করেন। ১৮২৪ খৃঃ অব্দে সুমাত্রায় ইংরাজদের কুঠির পরিবর্ত্তে ভারতে ডাচ্‌দের কুঠির বিনিময় হয়। ১৮৪৫ সালে দীনেমাররা তাহাদের শ্রীরামপুর ও ট্রান্‌কুইবারের কুঠি ইংরেজদের কাছে বিক্রয় করিয়া দেয়। এরূপে ভারতে ইংরেজ প্রভুত্ব অপ্রতিহত হয় এবং নৌশক্তিতে ইংরেজ সারা বিশ্বে অজেয় হইয়া উঠে।

বিদ্রোহ দমন।—লর্ড মিণ্টোর শাসনকালে ত্রিবাঙ্কুরে এবং মান্দ্রাজে সামান্য বিদ্রোহ হয়। সহজেই এই বিদ্রোহ প্রশমিত হইয়াছিল। তাঁহারই সময় বুন্দেলখণ্ডে এক গোল-যোগের সুযোগে কালঞ্জর ও অজয়গড়ের দুর্গ দুইটি বৃটিশ অধিকারে আসে।

কোম্পানীর নূতন সনন্দ।—১৮১৩ খৃঃ অব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে এক নূতন সনন্দ দেওয়া হইল। ইহার ফলে কোম্পানী ভারতবর্ষে ব্যবসায়ের অনুমতি পাইলেন বটে, কিন্তু ব্যবসায়ে তাঁহাদের একচেটিয়া অধিকার রহিত হইল। তবে চীনদেশের সহিত কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার অক্ষুণ্ণ রহিল। এই বৎসরই লর্ড মিণ্টো স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

ভারতে কোম্পানীর একচেটিয়া ব্যবসায়ের অধিকার লোপ

লর্ড হেষ্টিংস্ বা লর্ড ময়রা (১৮১৩—২৩)।—মিণ্টোর পর আর্ল অব্ ময়রা বৃটিশ ভারতের গবর্ণর জেনারেল এবং প্রধান সেনাপতির ক্ষমতা লইয়া আসেন (১৮১৩)। ইনি মার্কুইস্ অব্ হেষ্টিংস্ নামেই অধিক পরিচিত। ভারতীয় রাজনীতিতে তিনি ওয়েলেস্‌লীকে অনুসরণ করিয়াছিলেন। ওয়েলেস্‌লীর আরব্ধ কার্য্য লর্ড হেষ্টিংস্‌ই সম্পূর্ণ করেন।

গুর্খাদের সহিত যুদ্ধ।—পৃথ্বীনারায়ণ নামক এক রাজপুত নেতাব অধীনে গুর্খারা ১৭৬৮ খৃঃ অব্দে নেওয়ারী জাতির নেপাল রাজ্য অধিকার করে। ক্রমে তাহাদের রাজ্য বৃটিশ ভারতের সীমান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইলে দুর্দ্ধর্ষ গুর্খারা প্রায়ই ভারতের প্রত্যন্তভাগে নানারূপ দৌরাত্ম্য করিতে লাগিল। উভয় রাজ্যের সীমান্তও সুনির্দ্দিষ্ট ছিল না। পূর্ব্ববর্ত্তী গবর্ণর-জেনারেল লর্ড মিণ্টো এবং লর্ড হেষ্টিংস্ নেপাল সরকারের নিকট প্রতিবাদ করিয়া কোনও ফল পাইলেন না। ফলে গুর্খাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষিত হইল। গবর্ণব-জেনারেল নিজেই সৈন্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। গুর্খাদের পাশ্চাত্য রণনীতি কিছুই জানা ছিল না, কিন্তু তাহাদের বীরত্ব ও রণকুশলতার জন্য অনেক দিন যুদ্ধ চলিল। ইংরেজ সেনাপতি জেনারেল জিলেস্পাই কলঙ্গা নামক স্থানে পরাজিত ও নিহত হইলেন। গুর্খারা পর্ব্বতের আশ্রয়ে নির্ব্বিঘ্ন থাকিয়া ইংরেজ সৈন্যদের ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিত। তখন হেষ্টিংস্ কামান দাগিয়া পর্ব্বত গুঁড়াইয়া দিবার উপায় অবলম্বন করেন। তাহাতে গুর্খারা বিপন্ন হইয়া পড়িল এবং আধুনিক যুদ্ধাস্ত্রের সাহায্যে জেনারেল অক্টার্লোনি গুর্খাসেনাপতি অমবসিং থাপাকে পরাজিত করিয়া মলবাও দুর্গ অধিকার করিলেন (১৮১৬)। পর বৎসর অক্টার্লোনি গুর্খা রাজধানী কাঠমাণ্ডুর দিকে অগ্রসর হইলেন। তখন সগৌলি নামক স্থানে উভয় পক্ষে সন্ধি হইল। গুর্খারা কুমায়ুন, গাড়োয়াল এবং তরাই অঞ্চল বৃটিশের হাতে সমর্পণ করে। সিকিমের অধিকারও

কারণ

যুদ্ধ

লর্ড হেষ্টিংস্

সগৌলির সন্ধি (১৮১০)

গুর্খারা ত্যাগ করিল। নেপালের রাজধানী কাঠমাণ্ডুতে একজন বৃটিশ রেসিডেন্ট নিযুক্ত হইলেন।

পিণ্ডারী যুদ্ধ।—এই সময় পিণ্ডারী দস্যুদের উৎপীড়নে উত্তর-ভারত ছারখার হইয়া যাইতেছিল। পিণ্ডারীরা প্রথমে ছিল সিন্ধিয়া ও হোলকারের আশ্রিত রণোপজীবী। এই দলে হিন্দু এবং মুসলমান দুইই ছিল। তাঁহাদের পতনের পর তাহারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া দস্যুবৃত্তি করিতে লাগিল এবং সর্ব্বত্র ভীষণ আতঙ্কের সৃষ্টি করিল। লর্ড হেষ্টিংস্ এই বিরাট দস্যুদল দমনে বদ্ধপরিকর হইলেন। পিণ্ডারীদের বাসভূমি ছিল মালব দেশ। চারিদিক হইতে তাহাদিগকে ঘিরিয়া ফেলা হইল। পিণ্ডারী সর্দ্দার আফগান আমীর খাঁ ও করিম খাঁ আত্মসমর্পণ করিল। অন্যতম সর্দ্দার চিতু পলায়ন করিয়া বাঘের হাতে প্রাণ দিল। আমীর খাঁকে টঙ্কের নবাবী এবং করিম খাঁকে যুক্তপ্রদেশে এক জমিদারী দিয়া নিরস্ত করা হইল। প্রায় এক বৎসরের (১৮১৭-১৮) চেষ্টায় পিণ্ডারীরা ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল।

পরিচয়

আমীর খাঁ, করিম খাঁ, চিতু

৩য় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ।—বেসিনের সন্ধি অনুযায়ী পেশবা ২য় বাজীরাও বৃটিশের বশ্যতা স্বীকার করিলেও, গোপনে ইংরেজদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন। এই সকল ষড়যন্ত্রে তাঁহার কিছুই লাভ হইল না, বরং একে একে কোঙ্কন প্রদেশ, কয়েকটি দুর্গ এবং অবশেষে মারাঠাদের নেতৃত্বও তিনি হারাইলেন। পেশবার ন্যায় অনেক মারাঠা-নায়কও বৃটিশ প্রভুত্ব সহ্য করিতে পারিতেছিলেন না। ১৮১৭ খৃঃ অব্দে পেশবা, ভোঁসলা এবং হোলকার ইংরেজদের আক্রমণ করিলেন, কিন্তু একযোগে নয় আলাদা আলাদা ভাবে। পুনার অনতিদূরে কির্কি নামক স্থানে পেশবা পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন (নভেম্বর, ১৮১৭)। তারপর নাগপুরের নিকটে সীতাবল্‌দী নামক স্থানে ভোঁস্‌লা (আপ্পা সাহেব) পরাভূত হন। উজ্জয়িনীর কাছে মাহিদ্‌পুর নামক স্থানে হোলকারও পরাভব স্বীকার করেন (জানুয়ারী, ১৮১৭) এবং মাহিদ্‌পুরে এক সন্ধি করিয়া ইন্দোর রাজ্য রক্ষা করেন। পলায়িত পেশবা আবার পর পর কোরেগাঁও এবং আষ্টি নামক দুইটি স্থানেই পরাজিত হইয়া আত্মসমর্পণ করিলেন (১৮১৮)। ভোঁসলা প্রথমে

কারণ

কির্কির যুদ্ধ

সীতাবলদীর যুদ্ধ

মাহিদ্‌পুরের যুদ্ধ

কোরেগাঁও এবং আষ্টির যুদ্ধ

পঞ্জাবে পলায়ন করেন, সেখানে স্থান না পাইয়া তিনি রাজপুতানায় গমন করিলেন এবং সেইখানেই তাঁহার মৃত্যু হইল।

মারাঠা শক্তির পতন
পেশবাপদ লোপ, সাতারায় প্রতাপসিংহ, ভোঁসলার রাজ্য

প্রকৃতপক্ষে এইবার মারাঠা শক্তির পতন হইল। পেশবাকে পদচ্যুত করিয়া হেষ্টিংস্ তাঁহাকে বার্ষিক ৮ লক্ষ টাকা বৃত্তি দিয়া কানপুরের নিকটবর্ত্তী বিঠুর নামক স্থানে বাস করিবার অনুমতি দিলেন। পেশবার রাজ্যের একাংশ বৃটিশ অধিকারে আসিল। আর একটি ক্ষুদ্র অংশে প্রতাপসিংহ নামে শিবাজীর এক বংশধরকে সামন্ত নবপতিরূপে অভিষিক্ত করা হইল। তাঁহার রাজধানী হইল সাতারা। ভোঁসলার রাজ্যের অধিকাংশই কাড়িয়া লওয়া হয়; উহার এক নগণ্য অংশ রঘুজী ভোঁসলার (২য়) এক শিশু-পৌত্রকে দান করা হইল। এই সময়ে এক ইংরাজ সৈনিক অজন্তা গুহা ও তাহার অপূর্ব্ব চিত্রাদি আবিষ্কার করে।* ভারতীয় চিত্র-কলার উৎকর্ষ ও গৌরব এখন যে সর্ব্বত্র স্বীকৃত হইয়াছে তাহা অজন্তা আবিষ্কারেরই ফল।

অজন্তা গুহা আবিষ্কার

রাজপুতদের বশ্যতা স্বীকার।—মারাঠাদের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই রাজপুতদের পতন আরম্ভ হইয়াছিল। এরূপ অবস্থায় উদয়পুর (মেবার), যোধপুর (মাড়বার), জয়পুর (অম্বর), প্রভৃতি প্রধান প্রধান রাজপুত রাজ্যের রাজারা স্বাধীনতার আশা বিসর্জ্জন দিয়া বৃটিশ গবর্ণমেন্টের সহিত সামন্ততান্ত্রিক সন্ধির চুক্তিতে আবদ্ধ হইলেন। অন্যান্য রাজ্যগুলিও সে দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিল। কর্ণেল জেম্‌স্ টড্ নামে জনৈক কর্ম্মচারীকে লর্ড হেষ্টিংস্ রাজপুতানায় বৃটিশ প্রতিনিধি নিযুক্ত করিলেন। পণ্ডিতপ্রবর টড সাহেবই বিশেষ পরিশ্রম সহকারে রাজপুতদের জাতীয় ইতিহাস কাহিনী প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া Annals and Antiquities of Rajasthan নামক বিরাট গ্রন্থ রচনা করিয়া অক্ষয় যশের অধিকারী হইয়াছেন। লর্ড হেষ্টিংসের সময় ব্রিটিশ কর্ত্তৃক সিঙ্গাপুর বন্দর অধিকৃত হয় এবং তথায় তাহাদের অধিকার বিস্তৃত হয়।

রাজপুতদের দুর্দ্দশা ও অধঃপতন
কর্ণেল টড

এইরূপে সিন্ধুদেশ এবং আসাম, নেপালে গুর্খাদের রাজ্য এবং পঞ্জাবে রণজিৎ সিংহের রাজ্য ব্যতীত সমগ্র ভারতে বৃটিশের একাধিপত্য বিস্তৃত হইল। এই দুই রাজ্য ছাড়া অপর সকলগুলিই বৃটিশ গবর্ণমেন্টের অধীন সামন্ত রাজ্য হইয়া দাঁড়াইল। অবশ্য

বৃটিশ অধিকার

আইনের চক্ষে কোন কোন দেশীয় রাজ্য ছিল বৃটিশের আপাত সমকক্ষ মিত্রশক্তি, কিন্তু কার্য্যতঃ কাহারও আর কোনরূপ স্বাধীনতা রহিল না। ১৮২৩ খৃঃ অব্দে লর্ড হেষ্টিংস্ পদত্যাগ করিলেন।

শিক্ষা-বিস্তার।—লর্ড হেষ্টিংসের শাসনকালে ১৮১৭ খৃঃ অব্দে ডেভিড হেয়ার, রামমোহন রায়, প্রভৃতি মহাপুরুষগণের চেষ্টায় পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারের জন্য কলিকাতায় প্রসিদ্ধ 'হিন্দু কলেজ' স্থাপিত হয়। এই সময়েই বাঙ্গালীর প্রতিষ্ঠিত প্রথম সংবাদ পত্র "বাঙ্গালা গেজেট" এবং শ্রীরামপুরের খৃষ্টান মিশনারীগণ কর্তৃক বাঙ্গালা ভাষায় দ্বিতীয় পত্রিকা 'সমাচার দর্পণ' মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয় (১৮১৮)। বিদেশী পাদ্রীদের বিরুদ্ধে দেশীয় নেতা রামমোহন রায় এই সময়ে প্রচারকার্য্য সুরু করেন।

STUDIES AND QUESTIONS

1 Describe British relation with Mysore under Cornwallis and Wellesley. (C. U. '11, '17, '20).

2. Explain Wellesley's policy of Subsidiary Alliance and Shore's policy of Non-Intervention, and show how Wellesley was able to establish the British as paramount in India. (C. U '18,'31,'33,'36,'38,'40).

3 Briefly narrate the principal events of Wellesley's Governor-Generalship. (C. U. '25).

4. Indicate the character and consequences of Wellesley's policy towards the Indian States. (C. U. '42, '44).

5 Give an account of the fourth Mysore War and the second Anglo-Marhatta War. (C. U. '31).

6 Sketch the administration of the Earl of Minto. To what extent did he deviate from the policy of Non-Intervention ? (C. U. '16).

7. Trace the growth of British power in India under Lord Hastings, and give a narrative of the Nepal War (C. U. '21, '28).

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়

বৃটিশ শক্তির পূর্ণতর বিকাশ ও সিপাহী বিদ্রোহ

লর্ড আমহার্ষ্ট—(১৮২৩—১৮২৮)।—১৮২৩ খৃঃ অব্দের আগষ্ট মাসে লর্ড আমহার্ষ্ট গবর্ণর-জেনারেলরূপে ভারতবর্ষে আগমন করেন। তাঁহার সময় হইতে ভারতে বৃটিশ-শক্তি পূর্ণতর অভিব্যক্তির পথে অগ্রসর হয়।

১ম ব্রহ্মযুদ্ধ।—ব্রহ্ম দেশের ভিতর দিয়া ভারতবাসী একদিকে চীন ও অন্যদিকে শ্যাম ও মালয় দেশের সঙ্গে যোগ রাখিয়া আসিয়াছে। যখন বাঙ্গালা দেশে বৃটিশ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইতেছিল, প্রায় সেই সময়েই ব্রহ্মদেশে আলোম্প্রা নামক জনৈক রাজা একটি শক্তিশালী রাজ্যের পত্তন করেন। তাঁহার উত্তরাধিকারীগণের রাজত্বকালে ক্রমে ব্রহ্মদেশের বাহিরেও উহা প্রসারিত হইতে থাকে ; একে একে আরাকান (১৭৮৪), মণিপুর (১৮১৩) এবং আসামও (১৮১১—১২) ব্রহ্মরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে। আসাম ও আরাকানের অনেক অধিবাসী তখন বৃটিশ রাজ্যে আশ্রয় লইয়া ব্রহ্মদেশ আক্রমণের উদ্যোগ করিতেছিল। সেই সংবাদ পাইয়া ব্রহ্মের সুপ্রসিদ্ধ সেনাপতি মহাবন্দুল বঙ্গদেশ আক্রমণেব উদ্যোগ করেন (১৮২৪) ; ইহাতেই বৃটিশের সহিত ব্রহ্ম রাজ্যের যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া যায়। আসাম হইতে ব্রহ্মদেশীয় সৈন্যগণ বিতাড়িত হইল। কিন্তু বৃটিশ সৈন্যদল আরাকান আক্রমণ কবিলে রমু নামক স্থানে পরাজিত হয়। আর একদল বৃটিশ সৈন্য কিছুকাল পরে রেঙ্গুন অধিকার করিল। সেনাপতি মহাবন্দুল ডোনবিউ নামক স্থানে গুলির আঘাতে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। এই সুযোগে বৃটিশবাহিনী মান্দালয়ের দিকে অগ্রসর হইল। ব্রহ্মরাজ তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। ইয়ান্দাবো নামক স্থানে সন্ধি হইল (১৮২৬)। তদনুযায়ী ব্রহ্মরাজকে আসাম, আরাকান, টেনেসেরিম উপকূল এবং মার্ত্তাবানের কিয়দংশ বৃটিশের হস্তে সমর্পণ করিতে হইল। অধিকন্তু তিনি যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ এক কোটি টাকাও দিলেন। ব্রহ্মের

ব্রহ্মদেশে নূতন রাজশক্তির প্রসার

ইঙ্গ-ব্রহ্ম সংঘর্ষের কারণ

যুদ্ধ

ইয়ান্দাবোর সন্ধি (১৮২৬)

রাজধানী আভা নগরীতে একজন বৃটিশ রেসিডেণ্ট রাখিবার ব্যবস্থাও হইল।

ব্যারাকপুরে সিপাহীদের বিদ্রোহ।—ব্রহ্মযুদ্ধের প্রারম্ভে দেশীয় সিপাহীদের সাগর-পথে ব্রহ্মদেশে যাইবার আদেশ দেওয়া হয়। কালাপানি (সমুদ্র) পার হইলে জাতি যাইবে, এই কুসংস্কারের প্রভাবে ক্ষিপ্ত হইয়া তাহারা ব্যারাকপুরে (কলিকাতার অনতিদূরে) বিদ্রোহী হইয়া উঠিল (১৮২৪)। তৎপরতার সহিত কঠোর হস্তে বিদ্রোহীদিগকে দমন করা হইল।

প্রথম সিপাহী বিদ্রোহের কারণ

বিদ্রোহ দমন

ভরতপুরের পতন।—ব্রহ্মযুদ্ধের প্রথম দিকে বৃটিশদের পরাজয়ে অনেক সামন্তরাজার মন ভারতে বৃটিশ-প্রাধান্য অবসানের আশায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। এই সময়ে ভরতপুরের রাজার মৃত্যু হইলে, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র দুর্জ্জনশাল নাবালক রাজাকে রাজ্যচ্যুত করিলেন, এবং বৃটিশ আধিপত্য অস্বীকার করিয়া ভরতপুরের দুর্গে আশ্রয় লইলেন। লর্ড কম্বারমিয়ার নামক সেনাপতির অধীনে দুর্জ্জনশালের বিরুদ্ধে একদল সৈন্য প্রেরিত হইল। কম্বারমিয়ার ভরতপুর দখল করিলেন (১৮২৬)। দুর্জ্জনশালকে নির্ব্বাসিত করিয়া, সিংহাসনের প্রকৃত উত্তরাধিকারীকে ভরতপুরের রাজপদ দান করা হইল।

দুর্জ্জনশাল

ভরতপুর অধিকার

১৮২৮ খৃঃ অব্দে লর্ড আমহার্ষ্ট ব্যক্তিগত ও পারিবারিক কারণে গবর্ণর-জেনারেলের পদ ত্যাগ করিয়া দেশে চলিয়া যান। শাসন-পরিষদের প্রবীণতম সদস্য বাটারওয়ার্থ বেইলী অস্থায়ীভাবে বড়লাটের কাজ করিতে থাকেন। কলিকাতার সংস্কৃত কলেজ এই সময় স্থাপিত হয়। আমহার্ষ্টকে পত্র লিখিয়া রামমোহন ভারতীয়দের বিজ্ঞান শিক্ষার দাবী করেন।

লর্ড আমহার্ষ্টের প্রত্যাবর্ত্তন (১৮২৮)

লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক (১৮২৮—৩৫)।—লর্ড আমহার্ষ্টের পরে লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক গবর্ণর-জেনারেল হইয়া আসেন (১৮২৮)। বৃটিশ-ভারতের গবর্ণর-জেনারেলদের মধ্যে তিনিই সমাজ-সংস্কার ও আভ্যন্তরীণ শাসন শৃঙ্খলার জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ।

অর্থনৈতিক সংস্কার।—ব্রহ্ম-যুদ্ধের জন্য কোম্পানীর প্রায় এক কোটি টাকা ঋণ হইয়াছিল। বেণ্টিঙ্ক নানা দিক হইতে ব্যয়সঙ্কোচ ও আয়বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। সামরিক ও শাসন-বিভাগের কর্ম্মচারীদের বেতন ও ভাতা কমাইয়া

কোম্পানীর ঋণ

বেতন হ্রাস

ভূমি-রাজস্ব বঙ্গদেশ

দিলেন। কর্ণওয়ালিসের সময় বাঙ্গালায় 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে'র প্রবর্ত্তন হইলেও কয়েকটি মহলের কর ধার্য্য করা হয় নাই। এই সকল 'নিষ্কর' জমির উপর কর বসাইয়া কিছু আয় বৃদ্ধি করা হইল।

লর্ড বেণ্টিঙ্ক

মান্দ্রাজ রায়ৎওয়ারী বন্দোবস্ত
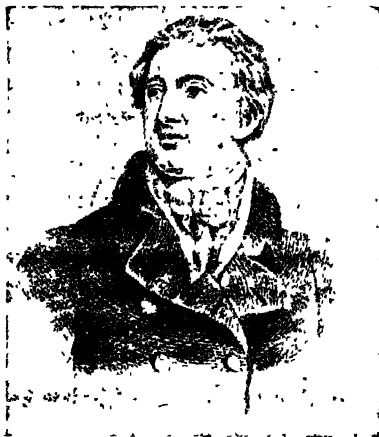
স্যার টমাস মনরো যখন মান্দ্রাজে জমির বন্দোবস্ত করেন (১৮২০ — '২৭) তখন সেখানে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরিবর্ত্তে 'রায়ৎওয়ারী বন্দোবস্ত' করা হয়; এই ব্যবস্থায় সোজাসুজি রায়ৎদের সঙ্গেই গবর্ণমেণ্ট নির্দ্দিষ্টকালের জন্য ভূমিরাজস্ব- সংক্রান্ত চুক্তি করিলেন।

আগ্রা

আগ্রা অঞ্চলে আবার গ্রামের নিম্নতম মালিক বা তাহাদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাধারণতঃ ত্রিশ বৎসরের মেয়াদে ভূমিরাজস্বের বন্দোবস্ত করা হয়। এরূপ বন্দোবস্তে কোম্পানীর তহবিলে প্রচুর অর্থাগম হইতে থাকে। বেণ্টিঙ্কের সময়ে মালব প্রদেশে উৎপন্ন আফিমের উপর শুল্ক ধার্য্য করা হয় এবং সেই আফিম চীন দেশে বিক্রয় করিয়া বহু অর্থ ইংরেজরা সঞ্চয় করেন। চীন হইতে চা গাছের চারা বেণ্টিঙ্কের আমলে এদেশের জমিতে রোপণ করা সুরু হয় এবং অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যেই চায়ের ব্যবসায়ে কোটি কোটি টাকা লাভ হইতে লাগিল। তারপর সিন্ধু প্রদেশের আমীরদের সহিত সন্ধি স্থাপন এবং পঞ্জাবে রণজিৎ সিংহের সহিত সন্ধির নূতন ব্যবস্থার ফলে সেই সকল স্থানেও বৃটিশ বাণিজ্যের প্রসার ঘটে। তাহাতেও গবর্ণমেণ্টের আয় বৃদ্ধি হইতে থাকে। ফলে কোম্পানীর সমস্ত ঋণ পরিশোধ হইয়াও তহবিলে এক কোটি টাকার উপর উদ্বৃত্ত হয়।

বাণিজ্য

শাসন-সংস্কার।—পূর্ব্ববর্ত্তী শাসন-সংস্কারে যে সকল ত্রুটি ছিল, বেণ্টিক সেগুলি দূর করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। প্রাদেশিক আদালতগুলি তুলিয়া দিয়া কালেক্টরগণের উপর ফৌজদারী বিচারের ভার অর্পণ করা হয়। কয়েকটি জেলা একত্র করিয়া একটি বিভাগ গঠিত হইল। প্রতি বিভাগে একজন করিয়া কমিশনার ও প্রতি জেলায় একজন সেসন জজ নিযুক্ত হয়। এই সময় প্রথম ডেপুটি কালেক্টর এবং জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ সৃষ্ট হয়। আদালতে ফার্সি ভাষার পরিবর্ত্তে বেণ্টিঙ্ক বাঙ্গালা প্রভৃতি দেশীয় ভাষার প্রচলন করেন। এই সময়েই প্রথম উচ্চ রাজকীয় কার্য্যে ভারতবাসী নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়। ১৮৩৩ খৃঃ অব্দে কোম্পানী যে নূতন সনন্দ লাভ করেন তাহাতে ইহা স্পষ্টভাবেই ব্যক্ত করা হইয়াছিল যে, ভারতবাসীরা উপযুক্ত যোগ্যতা অর্জ্জন করিলে যে কোনও বিভাগে রাজকীয় কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইতে পারিবে।

জেলাজজ পদের সৃষ্টি. কালেক্টরদিগকে বিচার-ভার অর্পণ

ডেপুটি কালেক্টর ও জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট

ভারতবাসী নিয়োগ

শাসন-সংস্কার যতই সংশোধিত হউক না কেন, পুরাকালের সহজ-সরল ব্যয় ও সময়-সংক্ষিপ্ত পঞ্চায়েতী প্রথার সুবিধা-সুবিচার আর পাওয়া গেল না। মেগাস্থিনিসের আমল হইতে যে নিয়ম ভারতের মজ্জায় মজ্জায় বসিয়া গিয়াছিল, তাহা কোম্পানীর নির্ম্মম বিধানে উঠিয়া গেল। ঐতিহাসিক এলিফিনষ্টোন এবং স্যর মনরো এই প্রথার অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহারা বলিয়াছেন, "পঞ্চায়েতী পদ্ধতির দরুণ গ্রামের পথ-ঘাট, কৃষি, জলনিকাশের ব্যবস্থা, পানীয় জল, বিচার-প্রণালী বিলাতের চেয়ে বহু অংশে শ্রেষ্ঠ ছিল। গ্রামের সকলেই লিখিতে পড়িতে ও অঙ্ক কষিতে জানিত।" মিঃ আডাম্ নামীয় এক ইংরেজ এক তদন্তে বলিয়াছিলেন যে, কোম্পানীর রাজত্বের পূর্ব্বে প্রত্যেক ৪০০ জন লোক পিছু একটি করিয়া স্কুল ভারতে ছিল।

সমাজ-সংস্কার।—কিন্তু শাসন-সংস্কার অপেক্ষা সমাজ-সংস্কারের জন্যই বেণ্টিঙ্ক সমধিক প্রসিদ্ধ। বহুকাল হইতেই হিন্দুসমাজে বিধবাদের সহমরণ ও অনুমরণের অতি নিষ্ঠুর প্রথা চলিয়া আসিতেছিল। সহমরণ বলিতে বুঝাইত—স্বামীর মৃত্যুর পর তাঁহার শবদেহের সহিত এক চিতায় পুড়িয়া মরা; আর যদি

সহমরণ ও অনুমরণ

দূবদেশে কোনও নারীর স্বামীর মৃত্যু হইত তাহা হইলে তাহাব বিধবা পত্নীকে একাকী চিতায় পুড়িয়া মবিতে হইত, সে ব্যবস্থাকে বলা হইত অনুমরণ। সহমবণ ও অনুমবণের এক কথায় নাম ছিল 'সতীদাহ'। কোন কোন বিধবা স্বেচ্ছায় এভাবে মৃত্যু বরণ করিতেন, কিন্তু শেষের দিকে ইহা অমানুষিক জোরজবরদস্তিতে পরিণত হইয়াছিল। এই নিষ্ঠুর প্রথা রহিত করিবার উদ্দেশ্যে ১৮২৯ খৃঃ অব্দে বেণ্টিঙ্ক আইনের দ্বারা উহা দণ্ডনীয় বলিয়া ঘোষণা করিলেন। ভারতবাসীদের মধ্যে রাজা রামমোহন রায় ও দ্বারকানাথ ঠাকুর এ-বিষয়ে বেণ্টিঙ্কেব প্রধান সহায় ছিলেন। তাঁহারাই বিড়ম্বিত নারীর জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা ও সমবেদনায় উদ্বুদ্ধ হইয়া তাঁহাদেব সম্বন্ধে পূর্ব্ব হইতেই দেশব্যাপী আন্দোলন চালাইতে থাকেন; এবং ক্রমশ গবর্ণমেণ্ট এই নির্ম্মম প্রথা উঠাইয়া দিতে অগ্রসর হন।

সতীদাহ, সতীদাহ প্রথা নিবাবণ (১৮২৯), রামমোহন রায ও দ্বারকানাথ ঠাকুর

ঠগী-দমন।—ঠগী দস্যুদল দমন বেণ্টিঙ্কের আর একটি স্মরণীয় কার্য্য। ঠগীরা ছদ্মবেশে পথিকদের সঙ্গে মিশিয়া, সুযোগ পাইলে তাহাদিগকে গলায় রুমাল জড়াইয়া শ্বাসরোধ করিয়া মারিয়া ফেলিত, এবং নিহত ব্যক্তির টাকাকড়ি লইয়া পলায়ন করিত। এই ভয়ানক দস্যুরা প্রায় সমগ্র ভারতেই ঘুরিয়া বেড়াইত। তাহাদের অত্যাচারে পথিক ও তীর্থযাত্রীগণ সর্ব্বদা শঙ্কিত হইয়া থাকিত। বেণ্টিঙ্ক উইলিয়ম শ্লীম্যান নামক একজন সুযোগ্য কর্ম্মচারীর উপর এই দুর্দ্দান্ত দস্যুদল দমনের ভার অর্পণ করেন। কয়েক বৎসরের মধ্যেই সহস্র সহস্র ঠগী গ্রেপ্তার হইল। তাহাদিগকে অপরাধের গুরুত্ব অনুসারে বিভিন্ন প্রকারের দণ্ড দেওয়া হয়। এইভাবে দস্যুদল সম্পূর্ণরূপে নির্ম্মূল হইয়া যায়। ইহা ব্যতীত ভারতের অসভ্য আদিম জাতিদের (Aborigines) মধ্যে নরবলি প্রথা রহিত প্রভৃতি অন্যান্য সংস্কার কার্য্যও তিনি করিয়া গিয়াছেন।

উইলিযম শ্লীম্যান

শিক্ষা-সংস্কার।—প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য শিক্ষা কোন্‌টি দেশের পক্ষে উপযোগী, ইহা লইয়া তখন ভাবতবর্ষে দেশী বিদেশী সকল মনীষীদের মধ্যেই প্রবল মতভেদ উপস্থিত হইয়াছিল। বিদেশী পণ্ডিতদের মধ্যে যাঁহারা ভারতে প্রাচ্য শিক্ষা প্রবর্ত্তনের পক্ষে

মতভেদ

ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে সংস্কৃতজ্ঞ উইলসন সাহেবের নাম সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য, আর যাঁহারা ছিলেন পাশ্চাত্য শিক্ষার সমর্থক তাঁহাদের মধ্যে মেকলে সাহেব প্রধান। রাজা রামমোহন রায় বিখ্যাত প্রাচ্যজ্ঞানবিশারদ হইলেও পাশ্চাত্য বিদ্যা ও বিজ্ঞান শিক্ষা প্রবর্ত্তনেব পক্ষপাতী ছিলেন। কারণ, তিনি মনে করিতেন যে, পাশ্চাত্য জাতি বিজ্ঞানের বলেই পৃথিবাতে স্বাধীন এবং এত বড় হইয়াছে; সুতরাং ভারতবাসীকে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে হইলে পাশ্চাত্য বিদ্যা ও বিজ্ঞান আয়ত্ত করিতে হইবে। ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম ও সমাজের প্রবর্ত্তক এবং দেশ-প্রগতিব বহু প্রচেষ্টার প্রযোজক বলিয়া রাম-মোহন অমর হইয়াছেন। বহু তর্ক-বিতর্ক, আলোচনার পর রামমোহন ও মেকলের মতই গৃহীত হয়। স্থির হইল যে, গবর্ণমেণ্ট এদেশে শিক্ষার জন্য যে অর্থ মঞ্জুর করিবেন তাহা ইংরেজি ভাষা এবং পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার জন্যই ব্যয় করা হইবে (১৮৩৫)। ইংরেজি ভাষা কেবল উচ্চশিক্ষারই বাহন হইল না, সরকারী কাজকর্ম্মেরও বাহন হইয়া দাঁড়াইল। ইহাতে একদিকে যেমন ভারতীয় মনীষীদেব সম্মুখে জ্ঞানের নূতন দুয়ার খুলিয়া গিয়াছে, আর একদিকে তেমনই দেশের এই নব্য শিক্ষিত সমাজের সহিত সাধারণ মানুষের এবং ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতির সাময়িক বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে। পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞান ও জীবতত্ত্ব প্রভৃতি শিক্ষা দিবার জন্য ১৮৩৫ খৃঃ অব্দে কলিকাতায় প্রথম মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়।

রাজা রামমোহন রায়

উইলসন ও মেকলে

ইংরাজী ভাষা উচ্চ শিক্ষার বাহন

পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রচার

শিক্ষাক্ষেত্রে যুগান্তর ও বিপর্য্যয়

মেডিক্যাল কলেজ

বেণ্টিঙ্ক ও দেশীয় রাজ্যসমূহ।—বেণ্টিঙ্ক কর্তৃপক্ষের নির্দ্দেশ অনুযায়ী দেশীয় রাজ্যের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে চাহিতেন না; কিন্তু নানা কারণে এ-বিষয়ে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা অবলম্বন করা সম্ভব হয় নাই। রুশগণ এই সময় ইউরোপে প্রবল শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল; তাহাদের প্রভাব ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের কাছাকাছি পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। রুশ অগ্রগতি রোধ করাই তখন ভারত গবর্ণমেণ্টের বৈদেশিক নীতির মূলমন্ত্র হইয়া দাঁড়াইল। প্রধানতঃ ইহারই বশবর্ত্তী হইয়া বেণ্টিঙ্ক পঞ্জাবে রণজিৎ সিংহের সহিত নূতন করিয়া মৈত্রী স্থাপন করেন। সিন্ধুদেশের আমীরদের সহিত মৈত্রী স্থাপনেরও মূল কারণ ছিল রুশভীতি। আসামের অন্তর্গত কাছাড়ের রাজার মৃত্যুতে রাজবংশের বিলোপ ঘটিলে আভ্যন্তরীণ গোলযোগের আশঙ্কায় প্রজারা স্বেচ্ছায় বৃটিশ শাসনের জন্য আবেদন করে এবং বেণ্টিঙ্ক ১৮৩০ খৃঃ অব্দে কাছাড় বৃটিশ অধিকারভুক্ত করেন। এই সময় মহীশূর রাজ্যের আভ্যন্তরীণ শাসনে ঘোর অনাচার চলিতেছিল বলিয়া ১৮৩১ খৃঃ অব্দে বেণ্টিঙ্ক কৃষ্ণরাজকে পদচ্যুত করিয়া মহীশূরে সাময়িকভাবে বৃটিশ শাসন প্রবর্ত্তন করেন। প্রজাদের আবেদনে বেণ্টিঙ্ক কুর্গের অত্যাচারী রাজাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া ১৮৩৪ খৃঃ অব্দে উহা বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া লইলেন। প্রধানত জনসাধারণের মঙ্গলের জন্যই তাঁহাকে এইসব রাজ্য বৃটিশ অধিকারভুক্ত করিতে হইয়াছিল।

বৈদেশিক নীতি

রুশদের প্রভাব প্রতিরোধ

রণজিৎ সিংহ ও সিন্ধুর আমিরদের সহিত মৈত্রী

কাছাড় (১৮৩০)

মহীশূর (১৮৩১)

কুর্গ (১৮৩৪)

কোম্পানীর নূতন সনন্দ।—১৮৩৩ খৃঃ অব্দে কোম্পানী নূতন সনন্দ শেষবার লাভ করেন। এবার তাঁহাদের চীনদেশের সহিত একচেটিয়া ব্যবসায়ের অধিকারও বিলুপ্ত হইল; ভারতবর্ষেও নূতন করিয়া আর বাণিজ্য করার অধিকার রহিল না, কোম্পানীর হাতে রহিল কেবল পার্লামেণ্টের অধীন ভারত-শাসনের ভার। এতদিন বৃটিশ-ভারতের গবর্ণর-জেনারেলের পদবী ছিল 'বাঙ্গালার গবর্ণর-জেনারেল'; এই সনন্দে উহা পরিবর্ত্তিত করিয়া 'ভারতবর্ষের গবর্ণর-জেনারেল' পদবীর প্রবর্ত্তন করা হইল। ১৮২৩ খৃঃ অব্দের সনন্দে উল্লিখিত ছিল যে, কোম্পানীর উচ্চকর্ম্ম নিয়োগে জাতি-ধর্ম্ম-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে সব ভারতীয়কেই লওয়া হইবে। কিন্তু ভারতীয় শাসনকর্ত্তারা ইংরাজী জ্ঞানের উপরই অধিক এবং অন্যায় চাপ

বাণিজ্যাধিকার লোপ, ভারতবর্ষের গবর্ণর-জেনারেল,

দিতেন। এতদিন বোম্বাই ও মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্টের নিজ নিজ প্রদেশের জন্য আইন প্রণয়নেব অধিকার ছিল; এবার তাহা উঠাইয়া দেওয়া হইল। গবর্ণর-জেনারেলের শাসন-পরিষদে একজন আইন-সচিব নিযুক্ত করিয়া পরিষদের সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধি করা হইল। মেকলে সাহেব হইলেন ভারত-গভর্ণমেণ্টের প্রথম আইন-সচিব (Law Member). তিনি ছিলেন প্রসিদ্ধ লেখক ও ঐতিহাসিক এবং ক্লাইভ, হেষ্টিংস্, প্রভৃতির বিষয়ে মূল্যবান প্রবন্ধ লিখিয়া গিয়াছেন।

বোম্বাই ও মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্টের আইন-প্রণয়নের অধিকার লোপ, আইন-সচিব মেকলে

স্যর চার্লস্ মেটকাফ্।—বেণ্টিঙ্ক ১৮৩৫ খৃঃ অব্দে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, এবং আগ্রা প্রদেশের শাসনকর্ত্তা স্যর চার্লস্ মেটকাফ্‌কে অস্থায়ী গবর্ণর-জেনারেল নিযুক্ত করা হয় (১৮৩৫)। তাঁহাব শাসনকালে দেশীয় পত্রিকাসমূহকে অবাধ স্বাধীনতা প্রদান করা হয; এবং সেজন্য তাঁহার সম্মানার্থে Metcalf Hall নামে কলিকাতায় একটি বিরাট গ্রন্থাকার (Imperial Library) প্রতিষ্ঠিত হয়। মেটকাফ্ সামন্তনীতির একটি সর্ত্তকে অত্যন্ত অসঙ্গত বিবেচনা করিতেন—যথা, সামন্ত রাজের প্রজাদের উপর কোম্পানীর কোন দায়ীত্ব থাকিবে না অথচ রাজাদেব মন্ত্রীনির্ব্বাচনে কোম্পানীর ইচ্ছাই প্রবল হইবে। এই অবৈধ নিয়ম রহিত করিবার ক্ষমতা থাকিলে তিনি নিশ্চয়ই করিতেন, এই কথা তিনি স্পষ্ট কবিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা

মেটকাফ্ আরো বলিয়াছেন, "ভারতের গ্রামগুলি সব সাধারণতন্ত্র স্বরূপ বিরাজ করিতেছে। যাবতীয় চাহিদা তাহারা নিজেবাই মিটায় এবং তাহারা সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং শান্তিপ্রিয়। একটি গ্রাম যেন একটি রাজ্য, পরিপূর্ণতায় শৃঙ্খলতায় অখণ্ড। ভারতের কৃষ্টি ও জীবন এই গ্রামগুলিই রক্ষা করিয়া আসিতেছে। আমি আশা করি এই গ্রাম্যতন্ত্রকে কোন বাহিরের শাসনতন্ত্র যেন আঘাত না করে।"

লর্ড অক্‌ল্যাণ্ড।—(১৮৩৬—৪২)।—মেটকাফের পর লর্ড অক্‌ল্যাণ্ড ভারতবর্ষের গবর্ণর-জেনারেল হইয়া আসিলেন। তাঁহার শাসনকালের প্রধান ঘটনা আফগানিস্থানের সহিত যুদ্ধ।

বৃটিশ-ভারতের সীমান্ত ও আফগানিস্থানের মধ্যে তখন ছিল

রুশ সাম্রাজ্য ও রুশ ভীতি

রণজিৎ সিংহের মিত্ররাজ্য। তবুও ইংলণ্ডের মন্ত্রিসভা মধ্য-এশিয়ায় রাশিয়ার প্রভাব বিস্তারে বৃটিশ-ভারতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিতেছিলেন। ১৮৩৪ খৃঃ অব্দেই পারস্যের দরবারে রাশিয়ার প্রভাব বিস্তৃত হইতেছিল, আর সেজন্যই লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক সিন্ধুর আমীরদের সহিত মৈত্রী স্থাপনেব জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন। ১৮৩৭ খৃঃ অব্দে রাশিয়ার প্ররোচনায় পারস্য দরবার আফগানিস্থানের অন্তর্ভু'ত হিরাট আক্রমণেব আয়োজন করিলেন। বৃটিশ মন্ত্রিসভার বৈদেশিক সচিব পামারষ্টোন্ ভারতের গভর্ণব-জেনারেলকে আফগানিস্থানে রাশিয়ার প্রভাব প্রতিরোধ করিবার নির্দেশ দিয়া পাঠাইলেন।

কর্ত্তৃপক্ষের নির্দেশ

দোস্ত মুহম্মদের সহিত সন্ধির ব্যর্থ প্রয়াস

লর্ড অক্‌ল্যাণ্ড আফগানিস্থানের দোস্ত মুহম্মদের সহিত মৈত্রী স্থাপনের চেষ্টা করিলে দোস্ত মুহম্মদ পেশোয়াব জেলাটি চাহিয়া বসেন। পেশোয়ার তখন ছিল রণজিৎ সিংহের অধীনে। অক্‌ল্যাণ্ড রণজিৎ সিংহকে উহা আমীরের হাতে ছাড়িয়া দিতে অনুরোধ করিতে পারিলেন না। এদিকে দোস্ত মুহম্মদ রাশিয়ার দূতকে নিজের দরবারে অভ্যর্থনা করিলেন। তখন অক্‌ল্যাণ্ড আহ্‌ম্মদ শাহ দুর্‌রাণীর পৌত্র বৃটিশের বৃত্তিভোগী শাহ্ সুজাকে কাবুলেব সিংহাসনে স্থাপন করিবার বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

অক্‌ল্যাণ্ড, শাহ্ সুজা ও রণজিৎসিংহেব সন্ধি, শাহ্ সুজার কাবুলের রাজ পদ লাভ, দোস্ত মুহম্মদেব আত্মসমর্পণ

তদনুসারে অক্‌ল্যাণ্ড, শাহ সুজা ও রণজিৎ সিংহের মধ্যে সন্ধি হইল (১৮৩৮)। যুদ্ধের প্রথম দিকে মিত্রশক্তি জয়লাভ করিল,—কান্দাহার, গজনী এবং কাবুল তাঁহাদের করায়ত্ত হইলে শাহ্ সুজাকে কাবুলের সিংহাসন দান করা হইল (১৮৩৯)। কিছু-কাল পরে দোস্ত মুহম্মদ আত্মসমর্পণ করিলে তাঁহাকে কলিকাতায় লইয়া আসা হইল (১৮৪০)। কিন্তু শাহ্ সুজা আফগানদের বড়ই অপ্রিয় ছিলেন। ইংরেজদের সৈন্যদলই ছিল তাঁহার একমাত্র নির্ভর। উপরন্তু উদ্ধত ইংরেজ সৈন্যদের যথেচ্ছাচার আফগানদের মধ্যে অপরিসীম চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে।

কাবুলে বিদ্রোহ (১৮৪১)

অবশেষে একদিন কাবুলের ক্ষিপ্ত জনতা সেনাপতি আলেকজান্দার বার্ণেসকে নির্দ্দয়ভাবে হত্যা করিল (১৮৪১)। কাবুলের বৃটিশ অমাত্য ম্যাক্‌নাটন্ ভীত হইয়া বিদ্রোহীদের নেতা দোস্ত মুহম্মদের পুত্র আকবর খাঁর সহিত এক সন্ধির উদ্যোগ করিলেন।

আকবর খাঁর সহিত সন্ধির চেষ্টা

সন্ধির কথাবার্ত্তা চলিবার কালে ম্যাক্‌-নাটন্‌ও বিদ্রোহীদের হস্তে নিহত হন। তখন বৃটিশ সৈন্যদের পক্ষে

কাবুল ত্যাগ করা ব্যতীত গতি রহিল না। তাহারা গোলাবারুদ রাখিয়া জালালাবাদের দিকে যাত্রা করিল (জানুয়ারী, ১৮৪২)। তাহাদের দলে ছিল সাড়ে চার হাজার বৃটিশ সৈন্য আর বার হাজার অনুচর। দুর্গম পার্ব্বত্য প্রদেশে নিদারুণ শীতের মধ্যে আফগানদের অবিশ্রান্ত গোলা বর্ষণের ফলে সমস্ত ইংরেজ সৈন্য নিহত হইল। কেবল ডাঃ ব্রাইডন নামক জনৈক ইংরেজ শেষ পর্য্যন্ত জালালাবাদে ফিরিয়া আসিতে পারিয়াছিলেন। তখনও সেল ও নট নামক দুইজন সেনাধ্যক্ষের অধীনে বৃটিশ সৈন্যদল জালালাবাদ ও কান্দাহারে আফগানদের সহিত যুদ্ধ করিতেছিল।

বৃটিশ সৈন্য-দলের কাবুল ত্যাগ (১৮৪২),

বৃটিশ সৈন্যদল ধ্বংস (১৮৪২)

লর্ড অক্‌ল্যাণ্ডের সময়েই সিমলা গবর্ণরের গ্রীষ্মাবাস হিসাবে প্রথম আবিষ্কৃত হয়। ফলে লর্ড অক্‌ল্যাণ্ড অধিকাংশ সময়ই সিমলায় কাটাইতেন এবং পরিষদের বিনা পরামর্শেই বৈদেশিক নীতি চালাইতেন। ইহাতে পরিষদে অসন্তোষ ঘনাইয়া ওঠে।

লর্ড এলেন্‌বরা।—এরূপ অবস্থায় লর্ড অক্‌ল্যাণ্ড স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলে (১৮৪২) লর্ড এলেন্‌বরা এদেশে গবর্ণর-জেনারেল হইয়া আসিলেন। তখনও যুদ্ধ শেষ হয় নাই। কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া এলেন্‌বরা কান্দাহার ও পেশোয়ার হইতে যথাক্রমে নট ও পোলক নামক দুইজন সৈন্যাধ্যক্ষের অধীনে দুইটি সৈন্যদল আফগানদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। এবার বৃটিশের জয় হইতে লাগিল। তাহারা গজনী অধিকার করিয়া নগরী এবং উহার দুর্গ বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিল। কাবুলের সুবৃহৎ বাজারটিও তোপ দাগিয়া উড়াইয়া দিল। ইহাতে পরাজয়ের গ্লানি দূর হইলেও আসলে কিছু লাভ হইল না,—এলেন্‌বরা আফগানিস্থানের আভ্যন্তরীণ শাসনে হস্তক্ষেপ না করাই যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করিলেন। শাহ্ সুজা ইতিমধ্যে নিহত হইয়াছিলেন। দোস্ত মুহম্মদকে কাবুলে ফিরিয়া যাইবার অনুমতি দেওয়া হইল।

বৃটিশ কর্ত্তৃক গজনী ও কাবুল বিধ্বস্ত

দোস্ত মুহম্মদের মুক্তি

সিন্ধুজয়।—আহ্‌মদ শাহ দুর্‌রাণীর পরে 'আমীর' বা 'মীর' উপাধিধারী বেলুচি রণনায়কগণের অধীনে হায়দরাবাদ, খয়েরপুর ও মীরপুর নামে সিন্ধুদেশে তিনটি রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল। ১৮০৯ খৃঃ অব্দে লর্ড মিণ্টো প্রথমে সেখানকার আমীরদের সহিত মৈত্রী স্থাপন করেন। তারপর ১৮২০ খৃঃ অব্দে লর্ড হেষ্টিংসের

আমীরদের সহিত ইংরেজদের সন্ধি (১৮০৯, ১৮২০ ১৮৩২),

শাসনকালে আবার নূতন করিয়া সন্ধি স্থাপিত হয়। ১৮৩২ খৃঃ অব্দে লর্ড বেণ্টিঙ্ক তৃতীয় বার আমীরদের সহিত সন্ধি করেন। পঞ্জাব-কেশরী রণজিৎ সিংহ সিন্ধু দেশ ভাগাভাগি বা জয়ের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে ইংরেজগণ তাহাতে অসম্মত হন। লর্ড অক্ল্যাণ্ড আমীরদের সহিত পুনরায় এক সন্ধি করিয়া সিন্ধুদেশে একজন বৃটিশ রেসিডেণ্ট রাখার ব্যবস্থা করেন (১৮৩৮); এইভাবে সেখানে বৃটিশ আধিপত্য বিস্তারের ব্যবস্থা হয়। আফগান যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গেলে ইংরাজগণ সন্ধির সর্ত্তসমূহ অগ্রাহ্য করিয়া সিন্ধুদেশের মধ্য দিয়া যাত্রা করেন। আফগান যুদ্ধের সময় আমীরগণ ইংরেজের বিরোধিতা করিয়াছেন, এই অভিযোগে এলেন্‌বরা ১৮৪২ খৃঃ অব্দে স্যর চার্লস্ নেপিয়ার নামক কর্ম্মচারীকে যুদ্ধবিগ্রহের সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব দিয়া বৃটিশ-প্রতিনিধি (রেসিডেণ্ট) হিসাবে সিন্ধুতে প্রেরণ করিলেন। নেপিয়ার আমীরদের মুদ্রা প্রস্তুতের অধিকার লোপ করিয়া দিলেন ও বৃটিশ জাহাজে কয়লা সরবরাহের জন্য তাঁহাদের নিকট হইতে সিন্ধুর কিয়দংশ কাড়িয়া লইলেন। নেপিয়ারের আচরণে উত্তেজিত হইয়া আমীরগণ কর্ণেল আউট্রামের বাসভবন আক্রমণ করিলে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। আমীরগণ মিয়ানী এবং দাবো—এই দুই স্থানে পরাভূত হইয়া বিতাড়িত হইলেন (১৮৪৩)। সিন্ধু দেশ ইংরেজদের অধিকারভুক্ত হইয়া গেল।

সিন্ধুতে বৃটিশ রেসিডেণ্ট (১৮৩৮)

বৃটিশের বিশ্বাস-ভঙ্গ, নেপিয়ারের কর্ত্তৃত্বে বিদ্রোহ, মিয়ানী ও দাবোর যুদ্ধে আমীরদের পরাজয় (১৮৪৩), ইংরেজদের সিন্ধু অধিকার

গোয়ালিয়র যুদ্ধ।—১৮৩৩ খৃঃ অব্দে গোয়ালিয়র-রাজ জঙ্কজী সিন্ধিয়া অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তাঁহার পত্নী এক বালককে দত্তকপুত্ররূপে গ্রহণ করেন। কিন্তু নাবালক রাজার অভিভাবক নিয়োগ লইয়া সৈন্যদলে গোলযোগ বাধিয়া গেল। তৃতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের পরও গোয়ালিয়র অতিশয় পরাক্রান্ত রাজ্য ছিল। এলেন্‌বরার আশঙ্কা হইল, গোয়ালিয়রের চল্লিশ সহস্র সুশিক্ষিত সৈন্য যদি শিখদের সহিত যোগদান করে তবে ভারতের বৃটিশ শাসন আবার বিপন্ন হইবে। তাই তিনি কাল-বিলম্ব না করিয়া সেখানে একদল বৃটিশ সৈন্য প্রেরণ করিলেন। মহারাজপুর ও পনিয়ার নামক স্থানে গোয়ালিয়রের সৈন্যেরা পরাভূত হইল (১৮৪৩)। তখন এক অমাত্য-পরিষদের উপর গোয়া-

মহারাজপুর ও পনিয়ারের যুদ্ধ (১৮৪৩)

লিয়রের শাসনভার অর্পণ করিয়া পরিষদকে বৃটিশ রেসিডেন্টের উপদেশ অনুযায়ী কাজ করিতে নির্দেশ দেওয়া হইল। গোয়ালিয়র রাজ্যের সৈন্যসংখ্যাও হ্রাস করা হয়।

শাসন-সংস্কার।—লর্ড এলেন্‌বরার আভ্যন্তরীণ শাসন-সংস্কারের দিকে কিছু কিছু মনোযোগ ছিল। লর্ড এলেন্‌বরা বিলাতে এক প্রতিবাদপত্র পাঠান যে, ভারতে নির্ম্মিত এবং ভারতে ব্যবহৃত সমস্ত জিনিষের উপরই যদি অসঙ্গত ভাবে কর ধার্য্য করা হয়, তবে অচিরে ভারত দারিদ্র্যের শেষ সীমায় উপনীত হইবে। তাঁহার মন্তব্য—"ভারতে-তৈরী তুলার উপর ৫%, সুতার উপর আরও ৭½%, কাপড়ের উপর ২½% রঙ্গীন হইলে আরো ২½ ,, সর্ব্বশুদ্ধ ১৭½% বেশী দিতে হইবে বিলাতে তৈরী বস্ত্রের চেয়ে। কাঁচা চামড়া এবং জুতা, চিনি, প্রভৃতি দৈনন্দিন ব্যবহৃত সমস্ত মালপত্রের উপরই অন্যায় ভাবে কর চাপান হয়। তদুপরি শুল্ক-কর্ম্মচারীদের অত্যাচারে সাধারণ লোক এবং ব্যবসায়ীরা এতদূর নির্য্যাতীত যে, প্রত্যেকে নিজেকে বাঁচাইয়া রাখার জন্য কোম্পানীর কর্ম্মচারীদের সহিত গোপনে উৎকোচের বন্দোবস্ত করিয়া দেশের নৈতিক চরিত্রকে অত্যন্ত কলুষিত করিতেছে এবং এশিয়ায় বৈদেশিক বণিকদের প্রতি বিষম ঘৃণার উদ্রেক হইয়াছে। ইহার সত্বর প্রতিকার বাঞ্ছনীয়"। এলেনবরা এদেশ হইতে দাসত্ব-প্রথা ও লটারী খেলা তুলিয়া দেন, দারোগাদের বেতন বৃদ্ধি করেন এবং ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট পদ সৃষ্টি করেন; শুনা যায়, তিনি এবিষয়ে দ্বারকানাথ ঠাকুরের পরামর্শে কাজ করিয়াছিলেন। দ্বারকানাথের পুত্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই সময়ে (১৮৪৪) রামমোহন রায় প্রবর্ত্তিত ব্রাহ্ম ধর্ম্মে দীক্ষা লইয়া 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র সাহায্যে বঙ্গভাষা, ইতিহাস ও সাহিত্যের প্রসার সাধন করেন।

বিধিব্যবস্থা

স্যার হেন্‌রী হার্ডিঞ্জ (১৮৪৪—৪৮)।—কর্তৃপক্ষের নির্দেশানুযায়ী ১৮৪৪ খৃঃ অব্দে লর্ড এলেন্‌বরা স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলে স্যর হেন্‌রী (পরে লর্ড) হার্ডিঞ্জ গবর্ণর জেনারেল হইয়া এদেশে আগমন করেন। তাঁহার শাসনকালে স্মরণীয় ঘটনা শিখ যুদ্ধ।

প্রথম শিখ যুদ্ধ।—১৮৩৯ খৃঃ অব্দে রণজিৎ সিংহের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র খড়্গ সিংহ সিংহাসন লাভ করিলেন। তাঁহার

রণজিৎ সিংহের মৃত্যুর

পর বিশৃঙ্খলা, খড়্গ সিংহ, দলীপ সিংহ

অকর্ম্মণ্যতায় রণজিতের দুর্দ্দান্ত খাল্‌সা সৈন্যরাই রাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া উঠিল। ১৮৪৩ খৃঃ অব্দে রণজিতের নাবালক পুত্র দলীপ সিংহকে সিংহাসনে বসান হইল। দলীপের মাতা রাণী ঝিন্দন হইলেন পুত্রের অভিভাবিকা। লাল সিংহ ও তেজ সিংহ নামক দুইজন মন্ত্রী রাজমাতাকে সাহায্য করিতে লাগিলেন। কিন্তু দুর্দ্দান্ত খাল্‌সা সৈন্যদলকে সংযত করা তাঁহাদেব সাধ্যাতীত হইয়া উঠিল। এদিকে ইংরেজদেব কয়েকটি কাজে শিখদের মনে ইংরেজ-দের সততা ও বন্ধুত্ব সম্বন্ধে সহজেই সন্দেহ উপস্থিত হইল। তখন খাল্‌সা সৈন্যবা শতদ্রুর অপর পারে উপস্থিত হইয়া বৃটিশ রাজ্য আক্রমণ করিবাব জন্য উৎসুক হইয়া উঠিল। অগত্যা রাজমাতা ঝিন্দন এবং তাঁহার মন্ত্রীরা তাহাদিগকে ইংরেজ রাজ্য আক্রমণের অনুমতি দান করিলে প্রায ৬০ হাজার শিখ শতদ্রু অতিক্রম করিয়া দিল্লী আক্রমণের অভিপ্রায়ে অগ্রসর হইল (ডিসেম্বর, ১৮৪৫)। এইরূপে ইংরেজ ও শিখে যুদ্ধ বাধিয়া গেল। প্রথমে মুদ্‌কী নামক স্থানে যুদ্ধ হইল; ইংবেজরা অপ্রত্যাশিত ক্ষতি স্বীকার করিলেও শেষ অবধি শিখ-সেনানায়ক লাল সিংহের সৈন্য-পরিচালনার ত্রুটির ফলে বৃটিশদল জয়লাভ করিল (ডিসেম্বর, ১৮৪৫)। ইহার কয়েকদিন পরেই ফিরোজ শা বা ফিরোজ শহর নামক স্থানে আর একটি যুদ্ধ হইল; এই যুদ্ধে ইংরেজদের প্রধান সেনাপতি স্যর হিউ গাফ এবং বড়লাট বাহাদুর স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। এবাবও ইংরেজদের প্রচুর লোকক্ষয় হইল; কিন্তু শিখ সেনাপতি তেজসিংহের নির্ব্বুদ্ধিতায় শিখরাই পরাভূত হইল (ডিসেম্বর, ১৮৪৫)। তারপর আলিওয়ালের যুদ্ধে (জানুয়ারী, ১৮৪৬) খাল্‌সা দল শত্রুপক্ষের প্রভূত ক্ষতি করিয়াও সৈন্যাধ্যক্ষদের অকর্ম্মণ্যতার ফলে পরাভূত হইল। সোব্রাওঁ নামক স্থানে ঠিক অনুরূপ কারণেই শিখদিগকে আবার পরাজয় স্বীকার করিতে হইল (ফেব্রুয়ারী, ১৮৪৬)। অনেকেরই বিশ্বাস, সৈন্যাধ্যক্ষদের এরূপ অকর্ম্মণ্যতার মূলে স্বেচ্ছাকৃত বিশ্বাসঘাতকতা ছিল এবং সে বিশ্বাসঘাতকতা বৃটিশের অর্থে পুষ্টি লাভ করিয়াছিল।

যুদ্ধের কারণ

যুদ্ধ

মুদ্‌কীর যুদ্ধ

ফিরোজ শার যুদ্ধ

আলিওযালের যুদ্ধ

সোব্রাওঁয়ের যুদ্ধ

লাহোরের প্রথম সন্ধি

ইহার পর লাহোরে উভয় পক্ষের মধ্যে সন্ধি হইল। এই সন্ধি অনুসারে জলন্ধর দোয়াব (শতদ্রু ও বিপাশার অবকাশ স্থলে)

এবং শতদ্রুর দক্ষিণে সমুদয় ভূ-ভাগ ইংরেজদের অধিকারে আসিল। যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ইংরেজগণ প্রচুর অর্থও দাবী করিলেন। শিখ রাজকোষে তত অর্থ ছিল না। তাই গুলাব সিংহ নামক জনৈক প্রাদেশিক কর্ম্মচারীব নিকট হইতে ৭৫ লক্ষ টাকা লইয়া তাঁহার কাছে কাশ্মীর ও জম্মু বিক্রয় করিয়া অমৃতসরের সন্ধিতে গুলাব সিংহকে কাশ্মীর ও জম্মুর রাজা বলিয়া স্বীকার করা হয়; ইহার পর ইংরেজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিবার অভিযোগে শিখনায়ক লাল সিংহ পঞ্জাব হইতে নির্ব্বাসিত হইলেন। তারপর হইল 'লাহোরের দ্বিতীয় সন্ধি'। ইহাতে পঞ্জাবে বৃটিশ বাহিনী রাখিবার ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার শাসনভার স্যার হেন্‌রী লরেন্স নামক জনৈক বৃটিশ প্রতিনিধির উপর অর্পণ করা হইল। নাবালক দলীপ সিংহ নামে রাজা হইলেও কার্য্যতঃ পঞ্জাবে পূর্ণ বৃটিশ কর্ত্তৃত্ব স্থাপিত হইয়া গেল।

গুলাব সিংহের নিকট কাশ্মীর ও ;

লাহোরের ২য় সন্ধি

লর্ড ডালহৌসী (১৮৪৮—৫৬)।—১৮৪৮ খৃঃ অব্দে হার্ডিঞ্জ স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন এবং লর্ড ডালহৌসী ভারতবর্ষের গবর্ণর-জেনারেল নিযুক্ত হইয়া এদেশে আসিলেন।

দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধ।—বৃটিশ শাসকদের ঔদ্ধত্য দুর্দ্দান্ত খাল্‌সাদের সহ্য হইতেছিল না। তদুপরি রাজমাতা ঝিন্দনকে বৃটিশগণ অন্যত্র প্রেরণ করায় অসন্তোষ আরও বাড়িয়া উঠিতে থাকে। অবশেষে মুলতানের শাসনকর্ত্তা মুলরাজের নিকট হিসাব-নিকাশ দাবি করা হইলে, তিনি পদত্যাগ করেন। নূতন শাসনকর্ত্তা দুই-জন ইংরেজ কর্ম্মচারীর সহিত মুলতানে আসিলে কর্ম্মচারী দুইজনকে হত্যা করা হয়। এই ব্যাপারে মুলরাজের হাত কতখানি ছিল বলা কঠিন। লাহোরের বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষ শের সিংহকে মুলরাজের বিদ্রোহ দমন করিতে প্রেরণ করিলেন, কিন্তু শের সিংহ বিদ্রোহী-দের সহিত যোগ দিয়া বসিলেন। দেখিতে দেখিতে প্রায় সমগ্র পঞ্জাব বিদ্রোহের আগুনে জ্বলিয়া উঠিল। ডালহৌসীও যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। বিতস্তাতীরে চিলিয়ানবালা নামক স্থানে ইংরেজ সেনাপতি লর্ড গাফ শের সিংহের সহিত যুদ্ধে পরাভূত হইলেন (জানুয়ারী, ১৮৪৯)। চিলিয়ানবালার যুদ্ধে পরাভবের ফলে তাঁহাকে প্রধান সেনাপতির পদ হইতে অপসারিত করিয়া

কারণ

চিলিয়ানবালার যুদ্ধ (১৮৪৯)

সেস্থলে স্যার চার্লস নেপিয়ারকে নিযুক্ত করা হইল। অল্পকাল পরেই আবার চন্দ্রভাগা নদীর তীরে গুজরাট নামক স্থানে গাফ শিখদিগকে পরাভূত করিলেন (ফেব্রুয়ারী, ১৮৪৯)। অতঃপর ডালহৌসী সমগ্র পঞ্জাব বৃটিশ ভারতের অন্তর্ভুক্ত করিয়া ফেলিলেন। দলীপ সিংহকে বার্ষিক পাঁচলক্ষ টাকা বৃত্তি দিয়া সিংহাসনচ্যুত করা হইল।

পঞ্জাব জয় (১৮৪৯)

দ্বিতীয় ব্রহ্মযুদ্ধ।—ব্রহ্মদেশে বৃটিশ বণিকদিগকে নানারূপ উৎপীড়ন করা হইতেছিল। ইহার প্রতিবিধান-কল্পে ইংরেজ নৌসেনাপতি ল্যাম্বার্টকে সেখানে প্রেরণ করা হইল। উদ্ধত কর্ম্মচারীটি সেখানে গিয়া ব্রহ্মরাজের একখানা জাহাজ দখল তো করিলেনই, রেঙ্গুন বন্দরও অবরোধ করিয়া বসিলেন। অতএব যুদ্ধ বাধিল। পদে পদে ইংরেজদের জয় হইতে লাগিলেও ব্রহ্মরাজ কিছুতেই সন্ধি করিতে রাজি হইলেন না। তখন এক ঘোষণাপত্র জারি করিয়া পেগু প্রদেশ ইংরেজ রাজ্যের অধিকারভুক্ত করা হইল (১৮৫২)।
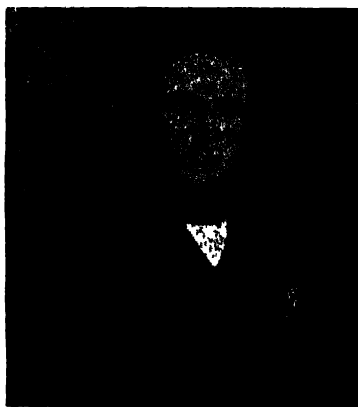
কারণ

লর্ড ডালহৌসী

ইংরেজদের পেগু অধিকার (১৮৫২)

ডালহৌসীর স্বত্বলোপ নীতি ও রাজ্যগ্রাস।—ডালহৌসীর অনেকদিন আগেই কোম্পানী এক আইন করেন যে, কোন দেশীয় রাজার অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যু হইলে কোম্পানী তাঁহার রাজ্য দখল করিতে পারিবেন,—রাজার কোন দত্তক পুত্র থাকিলে তাঁহার অধিকার গ্রাহ্য হইবে না। এই নীতিটি স্বত্বলোপ নীতি (Doctrine of Lapse) নামে পরিচিত।

দেশীয় রাজ্যসমূহে কুশাসন ও প্রজাদের দুর্দ্দশা দেখিয়াই

যেন ডালহৌসী এই আইনটি প্রয়োগ করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন; কারণ তিনি হয়ত বিশ্বাস কবিতেন যে, দেশীয় রাজাদের শাসন অপেক্ষা ইংরেজ-শাসন প্রজার পক্ষে কল্যাণকর। ফলে সাতারা, ঝান্সী ও নাগপুর ইংরেজ অধিকারভুক্ত হইয়া গেল। এই সকল রাজ্যেব রাজারা অপুত্রক অবস্থায় পরলোক গমন করেন। বুন্দেলখণ্ডেব অন্তর্গত জৈৎপুর ও সম্বলপুর রাজ্যও বাদ গেল না। তারপর, তাঞ্জোর ও কর্ণাটের রাজারা যে বৃত্তি পাইতেন, তাঁহাদের মৃত্যুর পর, তাঁহাদের দত্তক পুত্রদিগকে সে সকল বৃত্তি হইতেও বঞ্চিত করা হইল। পেশবা ২য় বাজীরাওয়ের মৃত্যুর পর তাঁহার দত্তক পুত্র ধুন্দুপন্থ বা নানা সাহেব যখন বৃত্তির জন্য আবেদন কবেন, তখন তাঁহাকে জবাব দেওয়া হয় যে, মৃত পেশবাকে কেবল তাঁহার জীবদ্দশার জন্যই বৃত্তি দেওয়া হইয়াছিল।

সাতারা, ঝান্সি নাগপুর,

জৈৎপুর, সম্বলপুর

বৃত্তিলোপ

স্বত্বলোপ নীতি ছাড়া ডালহৌসী রাজ্যগ্রাসের অন্য পন্থাও অবলম্বন করিয়াছিলেন। কুশাসনের অজুহাতে অযোধ্যার নবাব ওয়াজিদ আলীকে রাজ্যচ্যুত করিয়া বার্ষিক বার লক্ষ টাকা বৃত্তির বিনিময়ে অযোধ্যা প্রদেশটি বৃটিশের অধিকাবভুক্ত করা হইল (১৮৫৬)। ইতিপূর্ব্বে দুইজন বৃটিশ কর্ম্মচারীকে বন্দী করার অপরাধে সিকিমের রাজার প্রতি শাস্তি হিসাবে ডালহৌসী তাঁহার রাজ্যের কিয়দংশ গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছিলেন (১৮৫০)। বৃটিশ সৈন্যের ব্যয়ভারের জন্য নিজামের নিকট হইতে বেরার এবং অন্যান্য কয়েকটি জেলাও আদায় করা হইল। ইহার ফলে ভারতের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ ইংরাজের শাসনে ও মাত্র এক-তৃতীয়াংশ পরাধীন দেশীয় রাজন্যবর্গের হাতে রহিল।

অন্যান্য উপায়ে রাজ্যগ্রাস অযোধ্যা

সিকিম

বেরার

শাসন-সংস্কার।—আভ্যন্তরীণ শাসন-ব্যাপারেও ডালহৌসী যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। তাঁহারই সময়ে এদেশে প্রথম রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, পূর্ত্তবিভাগ (Public Works Department), সস্তা ডাক, প্রভৃতির প্রতিষ্ঠাও প্রচলন হয়। এই সময়েই বোর্ড-অব্-কণ্ট্রোলের সভাপতি স্যর চার্লস্ উড ভারতবর্ষে বিশ্ববিদ্যালয়, স্কুল, কলেজ, প্রভৃতি স্থাপনের জন্য এক বিরাট পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়া তাহা বড়লাটের নিকট প্রেরণ করেন; মেকলের (১৮৩৫) ডেসপ্যাচের পর, উহাই ১৮৫৪ অব্দের

রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, পূর্ত্তকার্য্য, সস্তা ডাক

'এডুকেশন-ডেসপ্যাচ' (১৮৫৪)

সুবিখ্যাত 'এডুকেশন ডেসপ্যাচ' বা শিক্ষাবিষয়ক নির্দ্দেশপত্র। তদনুযায়ী ডালহৌসী 'জনশিক্ষা বিভাগ' (Department of Public Instruction) খুলিয়া এদেশে কিছু শিক্ষা বিস্তারের কার্য্য আরম্ভ করেন। রুড়কীতে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইল এবং পুনায় এলিফিন্-ষ্টোনের উৎসাহে ও পৃষ্ঠপোষকতায় সংস্কৃত কলেজ খোলা হয়। মাতৃভাষার পরিবর্ত্তে কেবল মাত্র ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্ত্তনের তিনি ঘোর বিরোধী ছিলেন। গবর্ণমেণ্টের অর্থে কতকগুলি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল এবং এই সকল বিদ্যালয়ে নিয়মিত সরকারী সাহায্য দিবার ব্যবস্থাও হইল কিন্তু শিক্ষার প্রসার অতি মন্দ বেগেই চলিল। কারণ সংস্কৃত টোল, পাঠশালা, মাদ্রাসা—যেগুলি প্রকৃত জাতীয় শিক্ষার পীঠস্থান ছিল সেগুলি সরকারী সাহায্য লাভে বঞ্চিত হইল এবং বিদেশী ভাষার সাহায্যে বিদ্যাশিক্ষার প্রবর্ত্তন হওয়াতে শিক্ষার্থীদের বিড়ম্বনার অবধি রহিল না। জাতীয় শিক্ষার অভাবে ভারতবাসীর মনও ইংরেজ ক্রমশঃ দখল করিয়া বসিল। মেকলের মনোবাসনাই পূর্ণ হইল। তিনি এমন একটি ভারতীয় শ্রেণী গঠন করিতে চাহিয়াছিলেন, "যাহারা রক্তে ও বর্ণে থাকিবে ভারতীয় কিন্তু রুচি, মত, মন ও নীতিতে হইবে ইংরেজ।" এই সময় বাঙ্গালা দেশের শাসনভার জনৈক ছোটলাটের উপর অর্পিত হয়। ডালহৌসীর শাসনকালে পুণ্যশ্লোক পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায় 'বিধবা বিবাহ আইন' বিধিবদ্ধ এবং বেথুন সাহেবের সাহায্যে নারীশিক্ষার প্রবর্ত্তন হয়। বিদ্যাসাগর রামমোহন রায়ের আদর্শে নারীকল্যাণ ও জনহিতব্রতে আত্মনিয়োগ করেন এবং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু ও অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতির সাহায্যে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' গড়িয়া তোলেন। এই পত্রিকাতে 'বিধবা বিবাহ' প্রভৃতি বিদ্যাসাগরের অনেক রচনা ছাপা হয়।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

কোম্পানীর সনন্দ (১৮৫৩)।—১৮৫৩ খৃঃ অব্দে কোম্পানী অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য এক নূতন সনন্দ পাইলেন। এই সময় হইতেই ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কোম্পানীর ডিরেক্টরদের প্রাধান্য খর্ব্ব করিয়া বিলাতের মন্ত্রীসভাকে অধিক ক্ষমতা দেওয়া হয়।

কোম্পানী ও মন্ত্রীসভার ক্ষমতার মধ্যে কোন সীমা নির্দ্দিষ্ট না থাকায় কার্য্যের বড় অসুবিধা হইতেছিল। লর্ড আমহার্ষ্টকে মন্ত্রী-সভা বহাল রাখিতে চাহিল অথচ কোম্পানী নারাজ; লর্ড এলেন্‌বরাকে কোম্পানী মন্ত্রীসভার আপত্তি সত্ত্বেও পদত্যাগ করিতে বাধ্য করিল। ১৮৫৩ খৃঃ অব্দের এই সনন্দ অনুসারে বাঙ্গালা ও বিহারের শাসনভার একজন ছোটলাটের (Lieutenant Governor) হস্তে ন্যস্ত হইল। প্রতিযোগীতামূলক পরীক্ষা দ্বারা উচ্চ রাজকর্ম্মচারী (Civil Servant) নিয়োগেরও ব্যবস্থা হইল। কিন্তু ভারতীয়দের উচ্চ পদে নিযুক্ত করা হইল না কারণ ইংরাজী শিক্ষায় ইংরেজদের সহিত সমকক্ষতা দেখান তখন ভারতীয়দের পক্ষে সম্ভব ছিল না। সেইজন্য লর্ড ষ্ট্যানলী ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াও নিষ্ফল হইয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত বারজন সভ্য লইয়া গঠিত একটি ব্যবস্থাপক সভাও গঠিত হইল; বড়লাট স্বয়ং, তাঁহার পরিষদের চারিজন সদস্য, প্রধান সেনাপতি এবং সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ও গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মনোনীত অপর পাঁচজন সদস্য, এই বারজন সভার সভ্যরূপে কার্য্য করিবেন স্থির হইল। কিন্তু ইহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া বাগ্মী রামগোপাল ঘোষ প্রমুখ জাতীয় নেতাগণ জনসাধারণের অধিকার দাবী করিতে লাগিলেন এবং কংগ্রেসের অগ্রদূত, 'বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এশোসিয়েশন' কলিকাতায় স্থাপিত হইল।

ডালহৌসীর কৃতিত্ব।—ডালহৌসী ছিলেন অক্লান্ত পরিশ্রমী ও প্রভুত্বপ্রিয় কঠোর-প্রকৃতির শাসক। তিনি ভারতবর্ষের জবরদস্ত গবর্ণর-জেনারেলদের অন্যতম। রাজ্যবিস্তার এবং আভ্যন্তরীণ শাসন উভয় ক্ষেত্রেই তিনি সমান কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। তবুও তিনি ছিলেন সেকালের ছাঁচের ইংরেজ রাজনীতিক,—গর্ব্বিত, উদ্ধত ও নিষ্ঠুর। বীর শিখজাতির স্বাধীনতা হরণের জন্য তাঁহাকে ন্যায়নীতির দিক হইতে সমর্থন করিতে পারা যায় না; কারণ দলীপ সিংহের নাবালক অবস্থায় বৃটিশ কর্ম্মচারীরাই পঞ্জাব শাসন করিতেছিলেন। অসহায় অবস্থায় তাঁহাকে পিতৃরাজ্য হইতে বঞ্চিত করা ন্যায়সঙ্গত হয় নাই। ব্রহ্মদেশ সম্বন্ধেও তিনি ন্যায়নিষ্ঠার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করেন নাই। স্বত্বলোপনীতির বলে

দলীপ সিংহের প্রতি অন্যায় আচরণ

ব্রহ্মরাজের প্রতি অন্যায়,

রাজ্যগ্রাসে অন্যায় আচরণ

এবং অন্যান্ত অজুহাতে দেশীয় রাজ্যসমূহ গ্রাস করার পক্ষেও কোন সাফাই নাই। আভ্যন্তরীণ শাসন-ব্যাপারে তিনি রেল, টেলিগ্রাফ, প্রভৃতির ব্যবস্থা কেবলমাত্র ভারতবাসীর উন্নতির আশায় করেন নাই ;—তাঁহাব আবও এক নিগূঢ় উদ্দেশ্য ছিল—তাহা বৃটিশদের ব্যবসায়ের দ্রুত প্রসার এবং বৃটিশ-শাসনের সুবিধা সৃষ্টি করা। এ বিষয়ে ডালহৌসী কর্তৃপক্ষের সহিত যে সকল সরকারী চিঠিপত্রের আদান-প্রদান করিয়াছিলেন, সেগুলিই তাঁহার প্রকৃত উদ্দেশ্যেব অকাট্য প্রমাণ। ডালহৌসীর কঠোরনীতিই কতকাংশে সিপাহী বিদ্রোহের প্রধান কারণ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

রেল, টেলিগ্রাফের মূল উদ্দেশ্য, সিপাহী বিদ্রোহেব কাবণ

লর্ড ক্যানিং (১৮৫৬—৫৮)।—১৮৫৬ খৃঃ অব্দের প্রথম ভাগে ডালহৌসী ভারত ত্যাগ করিলেন এবং তাঁহার স্থলে ভাই-কাউণ্ট ক্যানিং গবর্ণর-জেনারেল হইয়া আসিলেন (ফেব্রুয়ারী, ১৮৫৬)। তাঁহার শাসনকালের প্রসিদ্ধ ঘটনা সিপাহী বিদ্রোহ।

সিপাহী বিদ্রোহের কারণ।—সিপাহী বিদ্রোহের মূলে অনেক কারণ ছিল। প্রথমাবধিই বৃটিশ শক্তি 'ছলে বলে কৌশলে' এদেশের দেশীয় রাজ্যগুলি গ্রাস করিতেছিলেন। তবুও, যতদিন সামন্ত বাজ্যগুলির অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিশেষ ভয় ছিল না, ততদিন পর্য্যন্ত বিদ্রোহেব বিশেষ কারণ ঘটে নাই। অবশেষে লর্ড ডালহৌসীব কার্য্যাবলীতে প্রায় সকল সামন্তরাজাই আপন আপন রাজ্যের অস্তিত্ব সম্বন্ধেই শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। বিভিন্ন রাজ্যের রাজ্যচ্যুত দাবিদারগণ সহজেই লোকের সহানুভূতি আকর্ষণ করিলেন। তখনকার অযোধ্যার নবাব ওয়াজিদ আলীকে রাজ্য-চ্যুত করায় সেখানে অসন্তোষের মাত্রা বিশেষভাবে বাড়িয়া যায়। কোম্পানীর সিপাহীদের মধ্যে অধিকাংশ ছিল আগ্রা-অযোধ্যা অঞ্চলের অধিবাসী। দ্বিতীয়তঃ, সতীদাহ নিবারণাদি সমাজ-সংস্কারের জন্য এবং রেলওয়ে, ডাক ও টেলিগ্রাফের বিস্তার এবং পাদ্রীদের প্রচার প্রভৃতির ফলে অশিক্ষিত জনসাধারণের ভয় হইল—কোম্পানীর বুঝি হিন্দু-মুসলমান সকলকে খৃষ্টান করিয়া দিবার অভিসন্ধি আছে। মিশনারীদের প্রাদুর্ভাবে এবং উপদ্রবে এইরূপ শঙ্কা নেহাৎ অমূলক ছিল না। লর্ড ক্যানিং যখন ভারতের শাসন-কর্ত্তা নিযুক্ত হইলেন, সেই উপলক্ষে এক ভোজসভায় বিলাতের

দেশীয় রাজ্যগ্রাস

শাসন-সংস্কার

প্রধান মন্ত্রী পামারষ্টোন বলিয়াছিলেন, "ভারতের লক্ষ লক্ষ নরনারীকে আধ্যাত্মিক দীক্ষা দিবার সময় হয়ত আমাদের আসিয়াছে।" পঞ্জাবের জন্ লরেন্স ও হার্ব্বার্ট এডোয়ার্স প্রায়ই বলিতেন, "প্রভু ভারতের ভার আমাদের হাতে তুলিয়া দিয়াছেন দেশকে খৃষ্টান করিবার জন্যই।" সুযোগ বুঝিয়া লর্ড ডালহৌসী (১৮৫০ খৃঃ) এক আইনের বলে ভারতব্যাপী সমস্ত নবদীক্ষিত খৃষ্টানদের সম্পত্তিতে অধিকার স্বীকার করেন। ইহাতে এমন বিক্ষোভের সৃষ্টি হইয়াছিল যে, শুধু মাত্র কলিকাতায় ৬০,০০০ নাগরিক স্বাক্ষরিত এক আবেদনপত্র লর্ড ডালহৌসীর নিকট পেশ করা হয়। হিন্দুধর্ম্ম ধ্বংস করাই যে কোম্পানীর নীতি, এইরূপ আতঙ্ক জনগণের মধ্যে দেখা যায়। ঔরঙ্গজীবের পর আবার দ্বিতীয়বার হিন্দুরা সন্ত্রস্ত হইয়া ওঠে। সিপাহী বিদ্রোহের প্রত্যক্ষ কারণ সিপাহীদের মধ্যে এন্‌ফিল্ড রাইফেলের প্রবর্ত্তন। এই রাইফেলে টোটা ভরিবার সময় উহার খানিকটা দাঁত দিয়া কাটিয়া লইতে হইত। সৈন্যদের মধ্যে গুজব রটিয়া গেল যে, টোটায় গরু ও শূকরের চর্ব্বি আছে, উহা মুখে তুলিলে হিন্দু-মুসলমান সকলেরই জাতি যাইবে। ইহাতেই হয়ত সকল সিপাহী হঠাৎ ক্ষেপিয়া উঠিল। গুজবের মধ্যে কিছু সত্যও ছিল।

এন্‌ফিল্ড রাইফেল

সিপাহী বিদ্রোহ।—বিদ্রোহ প্রথম আরম্ভ হয় বাঙ্গালা দেশের ব্যারাকপুরে। ১৮৫৭ খৃঃ অব্দের ২৯শে মার্চ্চ সিপাহীরা ক্ষেপিয়া উঠিয়া তাহাদের বৃটিশ অধ্যক্ষদিগকে হত্যা করিল। বাঙ্গালার বহরমপুরে এবং পঞ্জাবের আম্বালায় বিদ্রোহ প্রসার লাভ করিল। ১০ই মে মীরাটে বিদ্রোহ প্রবল আকার ধারণ করিল। ইউরোপীয়দিগকে হত্যা করিয়া তাহারা দিল্লীতে অগ্রসর হইল। তখনও নামে মাত্র মুঘল বাদশাহ ২য় বাহাদুর শাহ সেখানে বাস করিতেছিলেন। তাঁহাকে আনিয়া সিপাহীরা হিন্দুস্থানের সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিল। দিল্লীতে ইউরোপীয়দের প্রায় কেহই আর জীবিত রহিল না। ক্রমশঃ বিদ্রোহ প্রায় সমগ্র যুক্তপ্রদেশ, বুন্দেলখণ্ড ও মধ্য-ভারতে ছড়াইয়া পড়িল। বিদ্রোহীদের প্রধান কেন্দ্র হইল দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, কানপুর, বেরিলী ও ঝান্সী।

আরম্ভ—ব্যারাকপুর

বহরমপুর মীরাট ও আম্বালা

বাহাদুর শাহকে সম্রাট বলিয়া ঘোষণা

এদিকে বিদ্রোহের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে গভর্ণমেণ্ট উহা দমনের

বিদ্রোহ দমন

দিল্লী

ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। আম্বালার বিদ্রোহ সহজেই দমন করা হইয়াছিল। সেখান হইতে একদল বৃটিশ সৈন্য দিল্লীর দিকে অগ্রসর হইল। সেনাপতি নিকলসন্ ছিলেন তাহাদের অধিনায়ক; ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখে তিনি দিল্লীতে কাশ্মীর দুয়ারটি তোপ দাগিয়া উডাইয়া দিলেন; শীঘ্রই নগরী অধিকৃত হইল। নিকল্সন এই যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিলেন। হাডসন্ নামে তাঁহার এক সহকারী, বাহাদুর শাহের দুই পুত্র ও এক পৌত্রকে বিনা কারণে গুলি করিয়া মারিয়া ফেলিল। বিদ্রোহের প্রারম্ভে লক্ষ্ণৌর চীফ কমিশনার স্যর হেনরী লরেন্স স্থানীয় সকল ইউরোপীয় অধিবাসীসহ বৃটিশ রেসিডেন্সিতে আশ্রয় লইয়াছিলেন। সেখানে সিপাহীরা তাঁহাদিগকে অবরোধ করিয়াছিল। সে সংঘর্ষে লরেন্স নিহত হইলেন। তারপর আউট্রাম ও হ্যাভ্‌লক নামক সেনাপতিদ্বয়ের নেতৃত্বে একদল সৈন্য আসিয়া পৌঁছিল (২৫শে সেপ্টেম্বর)। তবুও কোন ফল হইল না। শেষে স্যর কলিন ক্যাম্বেল আর একদল সৈন্যের সহায়তায় অবরুদ্ধ ইউরোপীয়-গণকে উদ্ধার করিলেন (নভেম্বর ১৮৫৭)। ১৮৫৮ খৃঃ অব্দে মার্চ্চ মাসে বিদ্রোহীদের সম্পূর্ণ পরাজয় হইলে ইংরেজগণ পুনরায় লক্ষ্ণৌ অধিকার করিলেন। কানপুরের বিদ্রোহীদের নেতা ছিলেন পেশবা ২য় বাজীরাওয়ের দত্তকপুত্র নানা সাহেব। সেখানে প্রায় একহাজার ইংরেজ নরনারী এক কাঁচা দেওয়ালের আড়ালে কোনরূপে আত্ম-রক্ষা করিতেছিল। নানা সাহেবের আশ্বাসে সরল বিশ্বাসে সকলে বাহির হইয়া এলাহাবাদ যাইবার জন্য নদীতীরে পৌঁছিবামাত্র, নানা সাহেবের আদেশে, বিদ্রোহীরা বেপরোয়া গুলি চালাইয়া নর-নারী, বালক-বালিকা প্রায় সকলেই নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিল। ইহাতেও নানা সাহেবের তৃপ্তি হইল না। অসহায় স্ত্রীলোক ও বালক বালিকা সমেত প্রায় দুই শত বন্দীকে হত্যা করিয়া নিকটবর্ত্তী এক কূপে তাহাদের দেহগুলি নিক্ষেপ করা হইল (১৫ই জুলাই)। ইহার দুই তিন দিন পরেই হ্যাভ্‌লক কানপুর উদ্ধার করিলেন। নানা সাহেব আর তাঁহার সহকারী তান্তিয়া তোপী পলায়ন করিয়া আত্ম-রক্ষা করিলেন। ইহার পরে কানপুর আর একবার বিদ্রোহীদের হস্তগত হয়; তখন স্যর কলিন ক্যাম্বেল উহার পুনরুদ্ধার সাধন করেন (ডিসেম্বর, ১৮৫৮)। বেরিলীতে যে মাসে বিদ্রোহ আরম্ভ

লক্ষ্ণৌ

কানপুর
নানা সাহেব

বেরিলী

হয়। বিদ্রোহীরা রোহিলা-সর্দ্দার হাফিজ রহমৎ খাঁর পৌত্রকে, নবাব বলিয়া ঘোষণা করিল। এক বৎসর যাবৎ সেখানে বিদ্রোহিদের আধিপত্য চলিতে থাকে। অবশেষে ক্যাম্বেল সাহেব উহা অধিকার করেন (মে, ১৮৫৮)। ঝান্সীর বিদ্রোহীদের নায়িকা ছিলেন সেখানকার রাণী লক্ষ্মীবাঈ। লোপ-নীতির বলে ডালহৌসী এই রাজ্যটি অধিকার করিয়াছিলেন। তাহার পর হইতেই সেখানকার বিধবা রাণী রাজ্য উদ্ধারের চেষ্টায় ছিলেন। তিনি তখন মাত্র বিংশতি বর্ষীয়া তরুণী। কানপুরে পরাভূত হইয়া মারাঠা-নায়ক তান্তিয়া তোপী আসিয়া তাঁহার সঙ্গে যোগ দিলেন। কিন্তু উভয়ের সম্মিলিত বাহিনী বেতোয়ার যুদ্ধে স্যর হিউ রোজ নামক ইংরেজ সেনানায়কের হস্তে পরাভূত হইল। ইহার পর বীরাঙ্গনা লক্ষ্মীবাঈ আর এক যুদ্ধেও নামেন কিন্তু পরাজিত হন (জুন, ১৮৫৮)। পুরুষের বেশে উন্মুক্ত তরবারি হস্তে যুদ্ধ করিতে করিতে বীরনারী লক্ষ্মীবাঈ রণক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন দিলেন। ঝান্সী ইংরেজদের হস্তগত হইল এবং সিপাহী বিদ্রোহেরও অবসান হইল (১৮৫৮)। শুনা যায়, নানা সাহেব পরাজয়ের পর নেপাল অভিমুখে পলায়ন করেন। মারাঠা-সেনানায়ক তান্তিয়া তোপী ধৃত হইয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। বৃদ্ধ বাহাদুর শাহের কোন দোষ ছিল না; তবুও তাঁহার পুত্রপৌত্রদের হত্যা করা হইয়াছিল। তাঁহাকেও রেঙ্গুনে নির্ব্বাসিত করা হইল। প্রধান প্রধান সামন্ত নরপতি এবং নববিজিত শিখরা এই বিদ্রোহে যোগদান করেন নাই। বরঞ্চ শিখদের পূর্ণ সহায়তার বলেই অবশেষে ইংরেজরা জয়ী হয়। এই যুদ্ধে ইংরেজ সেনানায়কগণ কোন কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই। সেনাধ্যক্ষগণ যে 'অযোগ্য, প্রতিভাহীন, নির্জ্জীব শুধু বয়সের সম্মানেই নির্ব্বাচিত' সেকথা লর্ড ডালহৌসী বিলাতে ১৮৫১ খৃঃ অব্দে লিখিয়াছিলেন। অথচ বিদ্রোহীগণ যে উচ্চাঙ্গের বীর্য্য ও ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা ইংরাজগণও স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। তাহা সত্ত্বেও বিদ্রোহীদের ভাগ্যেই পরাজয় ঘটিল।

লক্ষ্মীবাঈ

বিদ্রোহের অবসান

নানা সাহেবের পলায়ন, তান্তিয়ার প্রাণদণ্ড, বাহাদুর শাহের নির্ব্বাসন।

সিপাহী বিদ্রোহের স্বরূপ ও তাহার ব্যর্থতা।— সিপাহী বিদ্রোহীরা ভারতে বৃটিশ কর্ত্তৃত্ব উচ্ছেদের উপক্রম করিয়া-

জনসাধারণের ঔদাসীন্য

ছিল। কিন্তু উহারা সফল হইতে পারে নাই। প্রথমতঃ, সিপাহীরা জনসাধারণ বা দেশীয় নরপতিগণের নিকট হইতে কোনরূপ সাহায্য পায় নাই,—পূর্ণ সহানুভূতি যে পাইয়াছিল তাহাও বলা যায় না; ববং দেশীয় রাজন্যবর্গ বিদ্রোহ দমনে ইংরেজ কর্তৃপক্ষকে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন। দ্বিতীয়তঃ, বিভিন্ন বিদ্রোহী দলের মধ্যে ভাব, আদর্শ বা কর্ম্মপন্থার সামান্যতম ঐক্যও ছিল না। নানা-সাহেব, লক্ষ্মীবাঈ, প্রভৃতি বিভিন্ন নায়ক-নায়িকাদের প্রত্যেকেব উদ্দেশ্য ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সকলে মিলিয়া কোন এক সাধারণ কর্ম্মপন্থা স্থির করিয়া কার্য্যে অগ্রসর হন নাই। তৃতীয়তঃ, বিদ্রোহী-দের মধ্যে সত্যকার নেতার অভাব ছিল। একমাত্র ঝান্সীর রাণী ব্যতীত আর কাহারও চরিত্রে প্রকৃত নেতার ন্যায় বীরত্ব, নিঃস্বার্থতা, তেজস্বিতা, ইত্যাদি কোনও সদ্‌গুণের বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং এ আন্দোলন সাফল্য লাভ করিতে পারে নাই। তবে এই ব্যর্থতাব আঘাতেই সাধারণ ভারতবাসী তাহাব রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে সজাগ হইয়া উঠে, এবং রাজা ও প্রজার সম্পর্ক লইয়া বহু রাজনৈতিক আন্দোলনের ফলে ক্রমশঃ British Indian Association ও জাতীয় মহাসভা (Indian National Congress) প্রতিষ্ঠিত হয় (১৮৮৫)।

আদর্শ ও কর্ম্মপন্থার অভাব

STUDIES AND QUESTIONS

1. Describe the various reforms of Lord William Bentinck (C. U. '12, '23, '26, '31, '39).

2. Show how the Government of East India Company was modified by the Charter Act of 1833. (C. U. '15, '19).

3. Write a narrative of the two Sikh Wars. What did the English gain by them? (C. U. '12).

4. Explain the Policy of annexation through lapse. (C. U. '14, '15).

5. Summarise the social and intellectual progress of India under the British rule during the period from 1828-1850. (C. U '16, '17).

6. Give an account of the achievements of Lord Dalhousie. (C. U '29, '31).

7. Review the administration of Lord Dalhousie. (C. U. '31, '37, '39).

1. Write an account of the Sepoy Mutiny, indicating its causes and effects. (C. U. '25, '41).

9 Describe Lord Dalhousie's policy towards the Indian States. How far was the policy a success? (C. U. '43).

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়

আধুনিক কালের ইতিহাস

কোম্পানীর কর্তৃত্বের অবসান।—সিপাহী বিদ্রোহের অবসান হইলে ভারত-শাসনে কোম্পানীর কর্তৃত্ব লোপ পাইল। ইংলণ্ডের কর্তৃপক্ষ ভারতবর্ষের শাসন ভার একটি বণিক-সমিতির হাতে আর ফেলিয়া রাখিতে চাহিলেন না। পার্লামেণ্টে এক 'ভারত-শাসন আইন' (Government of India Act, 1858) বিধিবদ্ধ হইল। তদনুযায়ী ইংলণ্ডের রাণী ভিক্টোরিয়া স্বহস্তে ভারতবর্ষের দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন। ভারতবর্ষের গবর্ণর-জেনারেল সেইসঙ্গে 'ভাইস্‌রয়' (Viceroy) অর্থাৎ রাজ-প্রতিনিধি নামেও পরিচিত হইলেন। ইংলণ্ডের মন্ত্রিসভার জনৈক সদস্য ভারত-সচিব (Secretary of State for India) নিযুক্ত হইলেন। ভারত-শাসনের সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতা তাঁহার হস্তে ন্যস্ত হইল। ভারত-সচিবের সাহায্যের জন্য ১৫ জন সদস্য লইয়া একটি পরিষদ (India Council) গঠিত হইল। ভাইস্‌রয়ের নিজের পরিষদের প্রত্যেক সদস্যকে কাজ ভাগ (Port folio system) করিয়া স্বতন্ত্র আফিস দেওয়া হইল, তাহাতে দ্রুত এবং সুশৃঙ্খলার সহিত কাজ চলিতে লাগিল। ভাইস্‌রয় লইলেন বৈদেশিক নীতির ভার। ভারত-সচিব এবং গবর্ণর-জেনারেলের মধ্যে সুনির্দ্দিষ্ট ক্ষমতার সীমা লিপিবদ্ধ না থাকায় মাঝে মাঝে বেশ গোলযোগের সৃষ্টি হইত। জন্ লরেন্স মনে করিতেন, ভারত-সচিবের রেষারেষির দরুণই তাঁহার কোন কাজই সিদ্ধ হইতেছে না। লর্ড মিণ্টোর অভিযোগ

নূতন ভারত-শাসন আইন (১৮৫৮)

ছিল যে, লর্ড মর্লির নির্ব্বাচিত সব সদস্যই অযোগ্য। ভাইস্রয়ের পরিষদের অধিকাংশ সদস্যই পরবর্ত্তী আইনের বলে ভারত-সচিব কর্ত্তৃক নিয়োজিত হইতেন। ইহাতে গবর্ণর-জেনারেলের কর্তৃত্ব বহু পরিমাণে খর্ব্ব হয়। একবার লর্ড লিটন তাঁহার পরিষদের মতের বিরুদ্ধেও তুলার দর রহিত করেন। ১৮৯৪ খৃঃ অব্দে লর্ড এলগিন পরিষদের মত অগ্রাহ্য করিয়া ভারত-নির্ম্মিত বস্ত্রের উপর কর ধার্য্য করেন। তখন ভারত-সচিব স্যার হেন্‌রী ফাউলার ঘোষণা করেন যে, গবর্ণর-জেনারেলের কার্য্যকরী পরিষদের সদস্যগণ তাঁহার (ভাইস্রয়ের) নীতি যাহাতে চালু হয় তাহা দেখিবেন অথবা মত বিরোধ ঘটিলে তাঁহারা পদত্যাগ করিবেন কিন্তু বাধার সৃষ্টি করিতে পারিবেন না। ইহাতে ভাইস্রয়ের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকে। নহিলে একদিকে ভারত-সচিব অন্য দিকে স্বীয় পরিষদের চাপে ভাইস্রয়ের ক্ষমতা অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল।

মহারাণীর স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ, পুরাতন সন্ধি বলবৎ, ধর্ম্ম ও সামাজিক ব্যাপারে স্বাধীনতা, সরকারী কর্ম্মচারী নিয়োগে নিরপেক্ষতা, বিদ্রোহীদের প্রতি ক্ষমা

মহারাণীর ঘোষণা পত্র।—১৮৫৮ খৃঃ অব্দে ১লা নভেম্বর লর্ড ক্যানিং এলাহাবাদে এক দরবার আহ্বান করিলেন। সে দরবারে মহারাণীর প্রতিনিধি হিসাবে তিনি ঘোষণা করিলেন যে, ভারতবর্ষের ভার কোম্পানীর হাত হইতে মহারাণী ভিক্টোরিয়া স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন। এই ঘোষণাপত্রে কোম্পানীর পূর্ব্বতন কর্ম্মচারীদিগকে স্ব স্ব কার্য্যে বহাল রাখা হইল। ইতিপূর্ব্বে দেশীয় রাজন্যবর্গের সহিত কোম্পানীর যে সকল সন্ধি হইয়াছিল সে সকল সন্ধিও বলবৎ রহিল। অধিকন্তু মহারাণী ঘোষণা করিলেন যে, ভারতবর্ষে বৃটিশের রাজ্যবিস্তারের আর আকাঙ্খা নাই। মহারাণী সকলকে আশ্বাস দিলেন যে, ভারতবাসীর ধর্ম্ম ও সামাজিক ব্যাপারে ইংরেজগণ কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিবেন না; দেশের প্রাচীন রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহারের প্রতি সম্মান প্রদর্শিত হইবে; জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে যোগ্যতাই রাজকীয় কার্য্যের একমাত্র মানদণ্ড বলিয়া বিবেচিত হইবে; এই ঘোষণাপত্রে সকলকে জানাইয়া দেওয়া হইল,—যে-সকল বিদ্রোহী প্রত্যক্ষভাবে নরনারী হত্যায় লিপ্ত ছিল তাহারা ব্যতীত আর সকলকেই অস্ত্রত্যাগ করিলে ক্ষমা করা হইবে।

লর্ড ক্যানিং (১৮৫৮—৬১) ও শাসন-সংস্কার।—ভারত-শাসন আইন ও মহারাণীর ঘোষণা-পত্রের বলে ক্যানিং ভারতবর্ষে বৃটিশ রাজশক্তির প্রথম প্রতিনিধি নিযুক্ত হইলেন। বিদ্রোহ-শেষে দেশে পুনরায় শান্তি স্থাপিত হইলে, তিনি শাসন-সংস্কারে মনোনিবেশ করিলেন। বিদ্রোহের অভিজ্ঞতার ফলে এদেশে বৃটিশ সৈন্যের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইল, আর গোলন্দাজ সৈন্যদলে ভারতীয় নিয়োগ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল।

ক্যানিং প্রথম ভাইসরয়

সৈন্য-বিভাগ

ইউরোপীয় নীলকরগণের নানারূপ অত্যাচারে কৃষকদের সহিত তাহাদের গোলযোগ হইতেছিল। কৃষকদের অধিকাংশ অভিযোগ যথার্থ প্রমাণিত হওয়ায় উদারহৃদয় ক্যানিং নীলকরদের অত্যাচার দমনের জন্য ন্যায়সঙ্গত ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন। হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'Hindoo Patriot' পত্রিকায় ও দীনবন্ধু মিত্রের 'নীল-দর্পণ' নাটকে নীলকর সাহেবদের ভয়াবহ অত্যাচারের বাস্তব-চিত্র পাওয়া যায়। 'খাজানা আইন' (Rent Act, 1859) পাশ হওয়ায় প্রজাদের উপর জমিদারের অত্যাচারও কিয়ৎ পরিমাণে কম হইল এবং কিছু পরে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সঞ্জীবচন্দ্র "বাংলাদেশের কৃষক" প্রবন্ধাদি লিখিয়া ও বঙ্গদর্শন পত্রিকায় (১৮৭২) তাহা ছাপাইয়া প্রজাদের কিছু উন্নতি করেন।

নীলকরদের অত্যাচার দমন

ইতিপূর্ব্বে লর্ড বেণ্টিঙ্কের আমলে আইন-সচিব মেকলে সাহেব শিক্ষার ডেস্‌প্যাচ্‌ ও অনেকগুলি আইনের খসড়া তৈয়ারী করিয়া গিয়াছিলেন। সিপাহী বিদ্রোহের পর সেগুলি বিধিবদ্ধ করা হইল (১৮৫৯—৬১)। এই সকল আইনের মধ্যে 'ভারতীয় দণ্ডবিধি আইন' (Indian Penal Code) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৮৬১ খৃঃ অব্দে কলিকাতা হইতে সুপ্রীম কোর্ট তুলিয়া দিয়া সেখানে বর্ত্তমান হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠা করা হইল। ১৮৬১ খৃঃ অব্দে 'ইণ্ডিয়ান কাউন্সিলস্‌ অ্যাক্ট' লিপিবদ্ধ হইল। ইহার বলে 'লেজিস্‌লেটিভ কাউন্সিল' বা আইন-সভা প্রতিষ্ঠা করা হইল; সে সভায় অন্যূন ছয়জন এবং বার জনের অনধিক অতিরিক্ত সদস্য লওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। এই অতিরিক্ত সদস্যদের মধ্যে অর্দ্ধেক হইবে বে-সরকারী সদস্য; অবশ্য এই বে-সরকারী সদস্যেরা বড়লাট কর্ত্তৃক মনোনীত হইতেন। ১৮৬২ খৃঃ অব্দে বাঙ্গালাদেশে প্রথম আইন-সভা প্রতিষ্ঠা

ভারতীয় দণ্ড-বিধি আইন

হাইকোর্ট, Indian Councils Act.

বে-সরকারী সদস্য, প্রাদেশিক

সরকারগুলির আইন-প্রণয়নের ক্ষমতা,

করা হইল। মান্দ্রাজ ও বোম্বাই প্রদেশেও অনুরূপ আইন-সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রাদেশিক সরকারগুলিকেও স-পরিষদ বড়লাটের অনুমতি লইয়া নিজ নিজ প্রদেশের জন্য আইন প্রণয়নের অধিকার দেওয়া হইল। সিপাহী বিদ্রোহের ফলে রাজস্বের অনেক ঘাটতি পড়িয়াছিল। আয়-বৃদ্ধির জন্য গবর্ণমেণ্ট তখন আয়কর (Income Tax) ধার্য্য করিলেন। এই সময়েই প্রথম 'কারেন্সী নোটে'র প্রচলন হয়। ক্যানিং-এর শাসনকালেই 'ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস অ্যাক্ট' অনুসারে কয়েকটি উচ্চপদ ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের সদস্যদের জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়। ১৮৫৭ খৃঃ অব্দে কলিকাতা, মান্দ্রাজ ও বোম্বাইতে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়; এবং উচ্চ শিক্ষার প্রভাবে ভারতবাসী রাজকার্য্য, ব্যবসায় ও শিল্পক্ষেত্রে স্বীয় প্রতিভা দেখাইতে সচেষ্ট হইল।

আয়কর, কারেন্সী নোট, Indian Civil Service

প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা

১৮৬১ খৃঃ অব্দে দেশে এক ভয়ানক দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় এবং তাহাতে বহুলোক প্রাণত্যাগ করে। এই বৎসরই দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ তাঁহাদের কলিকাতার জোড়া-সাঁকো বাড়ীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং দেবেন্দ্রনাথ ধর্ম্মপ্রাণ বাগ্মী কেশবচন্দ্র সেনকে তাঁহার সহকারীরূপে পান।

লর্ড এল্‌গিন্ (১৮৬১—৬৩)।—১৮৬১ খৃঃ অব্দে ক্যানিং স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে লর্ড এল্‌গিন ভারতবর্ষের বড়লাট হইয়া আসিলেন। কিন্তু ১৮৬৩ খৃঃ অব্দেই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার শাসনকালে 'ওহাবী' নামক সীমান্ত অঞ্চলের এক মুস্‌লিম সম্প্রদায় বিদ্রোহ করিলে তাহা সহজেই দমন করা হয়।

ওহাবী বিদ্রোহ

স্যার জন লরেন্স (১৮৬৪—৬৯)।—লর্ড এল্‌গিনের আকস্মিক মৃত্যুতে পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা স্যার জন লরেন্সকে বড়লাট নিযুক্ত করা হয় (১৮৬৪)। তিনি কৃষকদের দুরবস্থা দূর করিবার অভি-প্রায়ে আইন প্রণয়ন করেন। তাঁহার শাসনকালে উড়িষ্যা, মধ্যভারত ও রাজপুতানা অঞ্চলে নিদারুণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় এবং যথোপযোগী সরকারী সাহায্যের ব্যবস্থা না থাকায় বহু লোকক্ষয় হয়। ভবিষ্যতে যাহাতে এরূপ শোচনীয় ব্যাপার আর সহজে না ঘটে, সে জন্য গবর্ণমেণ্ট দুর্ভিক্ষ প্রতিকারের ব্যবস্থা করেন এবং ফসল উৎপাদনের সুবিধার জন্য সেচবিভাগ (Irrigation Depart-

মধ্যভারত, রাজপুতানা ও উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষ

ment)ও স্থাপন করা হয়। তাঁহার শাসনকালে রুড্‌কিতে একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপিত হয়। বিশ্ববিখ্যাত বাগ্মী ও সমাজ-সংস্কারক কেশবচন্দ্র সেনের সহিত লরেন্সের গভীর সহযোগিতা ও সখ্য ছিল।

ভুটান যুদ্ধ

লরেন্সের শাসনকালে আর একটি ঘটনা ভুটান যুদ্ধ। ভুটিয়ারা প্রায়ই বৃটিশ-ভারতের প্রত্যন্তসীমায় পৌছিয়া লুঠতরাজ করিত। দেওয়ানগিরি নামক স্থানে ইংরেজসৈন্য পরাভূত হইল। ১৮৬৫ খৃঃ অব্দের সন্ধি অনুযায়ী ভুটিয়ারা ডুয়ার অঞ্চলটি বৃটিশকে সমর্পণ করিল, বিনিময়ে ইংরেজগণ তাহাদিগকে বার্ষিক কর দিতে লাগিলেন। ডুয়ারে বহু ইংরেজের বিরাট চা বাগান গড়িয়া উঠিয়াছে।

লর্ড মেয়ো (১৮৬৯—৭২)।—লরেন্সের পর লর্ড মেয়ো বড়-লাট নিযুক্ত হইলেন (১৮৬৯)। তিনি আভ্যন্তরীণ শাসনে কয়েকটি উন্নতি সাধন করেন। এই সময় আয়কর ও লবণকব বৃদ্ধি করা হয়। তাঁহারই সময়ে (১৮৭১) প্রথম ভারতবর্ষে লোক গণনা (Census) হইয়াছিল। এই সময়ে রাজস্ব বিষয়ে একটি প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধিত হয়। তিনি কেন্দ্রীয় তহবিল হইতে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলিকে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দিবার ব্যবস্থা করেন; এই অর্থ প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট সমূহ স্ব স্ব প্রদেশের উন্নতিকল্পে ব্যয় করিবেন, এরূপ ব্যবস্থা করা হইল। মেয়োর সময়েই মহারাণী ভিক্টোরিয়ার দ্বিতীয় পুত্র ডিউক অব এডিনবরা ভারত-ভ্রমণে আসেন এবং সামন্ত রাজকুমারদের শিক্ষার জন্য এই সময় আজমীরে মেয়ো কলেজ স্থাপিত হয়। মেয়ো আফগানিস্থানের সহিত মৈত্রী রক্ষার জন্য আমীর শের আলীকে আম্বালা শহরে এক দরবারে সম্বর্দ্ধনা করেন। আফগানিস্থানে রুশ প্রভাব বিনষ্ট করিবার অভিপ্রায়েই এই সম্বর্দ্ধনার ব্যবস্থা হয়। সিপাহী বিদ্রোহের পরই ভারতের সহিত বিলাতের দ্রুত যোগাযোগের উপায় স্বরূপ পারস্য, তুর্কী ও রাশিয়ার মধ্য দিয়া এক টেলিগ্রাফ লাইন খোলা হয়। ইহাতে অসুবিধা অনেক ছিল, কারণ বিদেশী রাজ্যগুলির সহিত সদ্ভাবের অভাব ঘটিলেই সংবাদ প্রদানে বিলম্ব হইত। তাই সুয়েজ, এডেন ও বোম্বাইএর মধ্য দিয়া জলপথে টেলিগ্রাফ লাইন (Cable)

শাসন-সংস্কার

লোক-গণনা

মেয়ো কলেজ, আফগানি-স্থানের সহিত মৈত্রী

খোলা হয়। ১৮৭০ খৃঃ অব্দ হইতেই এই পথে সংবাদাদি প্রেরণ ও সংগ্রহ হইতে থাকে। ইহাতে গবর্ণর-জেনারেলের ক্ষমতাও হ্রাস পাইতে থাকিল কারণ এযাবৎ দূরত্ব হেতু তাঁহাকে জরুরী বিষয়ে কতকগুলি ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছিল।

মেয়োর অপমৃত্যু

১৮৭২ খৃঃ অব্দের জানুয়ারী মাসে লর্ড মেয়ো আন্দামানের বন্দীশালা পরিদর্শন করিতে যান। সেখানে এক মুসলমান কয়েদী অতর্কিতে তাঁহাকে ছুরিকাঘাত করে; এই আঘাতে তাঁহার মৃত্যু হয়। ১৮৭২ সালে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার বিখ্যাত "বঙ্গদর্শন" পত্রিকা স্থাপন করিয়া বঙ্গ-সাহিত্যে এক নব যুগের সূচনা করেন।

আফগানিস্থানের সহিত মনোমালিন্য

লর্ড নর্থব্রুক (১৮৭২-৭৬)।—১৮৭২ খৃঃ অব্দে লর্ড নর্থব্রুক ভারতবর্ষের বড়লাট হইয়া আসেন। তিনি তাঁহার পূর্ব্বগামী লর্ড মেয়োর ন্যায় আফগানিস্থানের সহিত মিত্রতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারেন নাই। আমীর শের আলী একবার বিপন্ন হইয়া তাঁহার সহায়তা প্রার্থনা করিলে বড়লাট তাহাতে অস্বীকৃত হন। তখন শের আলী রাশিয়ার সহিত মিত্রতা স্থাপনের জন্য চেষ্টা করিতে থাকেন। লর্ড নর্থব্রুকের শাসন সময়ে বৃটিশ রেসিডেণ্ট কর্ণেল ফেয়ারকে বিষ-প্রয়োগে হত্যার চেষ্টা করিবার অভিযোগে বরোদার গায়কবাড় মল্‌হর রাওয়ের বিচার হয়। বিচারে মতদ্বৈধের ফলে তাঁহার উপর হইতে হত্যার অভিযোগ তুলিয়া লইয়া কু-শাসনের অজুহাতে তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করা হয়। তারপর মল্‌হর রাওয়ের দূর আত্মীয় সয়াজী রাও নামে এক বালককে বরোদার সিংহাসন দান করা হইল (১৮৭৫)। নর্থব্রুক ছিলেন 'অবাধ বাণিজ্য নীতি'র (Free Trade) সমর্থক। এজন্য তিনি আমদানী-রপ্তানীর উপর শুল্ক কমাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার সময়েই যুক্তপ্রদেশের সৈয়দ আহম্মদ খাঁর প্রচেষ্টায় আলিগড়ে মুসলমানদের জন্য একটি হাই স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয় (১৮৭৫) এবং ১৮৭৮ খৃঃ অব্দে ইহা কলেজে পরিণত হয়। এযাবৎ মুসলমানরা পাশ্চাত্যশিক্ষার প্রতি নিতান্তই বিরূপ ছিল। ১৮৭৩—৭৪ খৃঃ অব্দে বিহারে দুর্ভিক্ষ হয়; কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষের তৎপরতায় বিশেষ ক্ষতি হয় নাই। আন্তর্জাতিক বিবাহ (Inter-Caste Marriage) আইন কেশব সেনের প্রভাবে

গায়কবাড় মল্‌হর রাওয়ের পদচ্যুতি

বিহারে দুর্ভিক্ষ

পাশ হয় (১৮৭৩)। তিনি ১৮৭০ সালে বিলাতে গিয়া ভারতবাসীর অভাব-অভিযোগের কথা বৃটিশদের শুনাইয়া আসেন।

পদত্যাগ (১৮৭৬)

ভারত-সচিবের সহিত আফগানিস্থান সম্বন্ধে মতভেদ হওয়ায় ১৮৭৬ খৃঃ অব্দে নর্থব্রুক পদত্যাগ করিয়া দেশে চলিয়া যান। টেলিগ্রাফ (Cable) লাইন খোলার সঙ্গে সঙ্গেই গবর্ণর-জেনারেলের প্রভুত্ব কমিয়া আসে এবং ভারত সচিবের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। লর্ড স্যালিস্‌বারির সঙ্গে লর্ড নর্থব্রুক একমত না হওয়ায় নর্থব্রুককে তাড়াইয়া তিনি অন্য গবর্ণর-জেনারেল নিযুক্ত করেন। তাই লর্ড রিপন বলিয়াছিলেন, 'তিনি যখন সহকারী ভারত-সচিব ছিলেন তখন গবর্ণর-জেনারেলের যে ক্ষমতা তিনি দেখিয়াছিলেন, তাহার জন্যই তিনি এই পদ গ্রহণে সম্মত হইয়াছিলেন। গবর্ণর-জেনারেলের এমন শোচনীয় অবস্থা জানিতে পারিলে তিনি কদাচ এই পদ গ্রহণ করিতেন না।' তাঁহার শাসনকালে তৎকালীন যুবরাজ এড্‌ওয়ার্ড (পরে সম্রাট ৭ম এড্‌ওয়ার্ড) সস্ত্রীক ভারত-ভ্রমণে আসিয়াছিলেন (১৮৭৫—৭৬)।

সস্ত্রীক যুবরাজের ভারত ভ্রমণ

লর্ড লিটন (১৮৭৬—৮০)।—১৮৭৬ খৃঃ অব্দে লর্ড লিটন বড়লাট হইয়া আসিলেন। এই সময় পার্লামেন্টে 'রাজকীয় পদবী আইন' (Royal Titles Act, 1876) নামে এক আইন প্রণীত হয় এবং তদনুযায়ী মহারাণী ভিক্টোরিয়া 'ভারত-সম্রাজ্ঞী' উপাধি গ্রহণ করেন। এতকাল দেশীয় রাজারা কার্য্যতঃ না হইলেও, অন্ততঃ আইনের চক্ষে বৃটিশ গবর্ণমেন্টের মিত্রশক্তি বলিয়া পরিগণিত হইতেন। নূতন আইনের ফলে দেশীয় রাজারা সকলেই বৃটিশ গবর্ণমেন্টের সামন্ত-শ্রেণীতে পরিণত হইয়া গেলেন। ১৮৭৭ খৃঃ অব্দের ১লা জানুয়ারী সাড়ম্বরে দিল্লীতে দরবার করিয়া মহারাণীকে ভারতের সম্রাজ্ঞী বলিয়া ঘোষণা করা হয়।

মহারাণীর 'ভারত-সম্রাজ্ঞী' উপাধি গ্রহণ

১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে মান্দ্রাজ ও বোম্বাই প্রদেশে নিদারুণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছিল। লিটন যখন মহাসমারোহে দিল্লীতে দরবারের অনুষ্ঠান করিতেছিলেন তখন দুর্ভিক্ষ মধ্যপ্রদেশ, যুক্তপ্রদেশ ও পঞ্জাব অবধি বিস্তার লাভ করিল। গবর্ণমেন্টের শৈথিল্যের ফলে প্রায় ৫০ লক্ষ লোকের প্রাণহানি হয়। এই উপলক্ষে বালক-কবি রবীন্দ্রনাথ এক জাতীয়-কবিতা রচনা করেন এবং ১৮৭৮ সালে

বোম্বাই ও মান্দ্রাজে দুর্ভিক্ষ

কবি বিলাত যাইয়া লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন। দুই বৎসর পরে দেশে ফিরিয়া রবীন্দ্রনাথ "ভারতী" পত্রিকায় (১৮৬৫ প্রতিষ্ঠিত) 'চীনে মরণের (আফিমের) ব্যবসা' প্রবন্ধ লিখিয়া প্রতিবাদ জানান। লিটন দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদিগের সাহায্যার্থে কিছু অর্থব্যয় করেন। ইহা ব্যতীত তিনি দুর্ভিক্ষের কারণ অনুসন্ধানের জন্য এক 'কমিশন'ও নিযুক্ত করিয়াছিলেন (১৮৭৮)। কমিশনের সুপারিশ (১৮৮০) অনুযায়ী দুর্ভিক্ষ প্রতিকারের ব্যবস্থা হইল; এখনও মোটামুটি সেই নীতি অনুসারেই গবর্ণমেণ্ট দুর্ভিক্ষ প্রতিকারের চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। ইংরাজ শাসনের বহু পূর্ব্বে যখন গ্রাম্য পঞ্চায়েৎ জীবন্ত প্রতিষ্ঠান ছিল, তখন অন্নকষ্ট বা দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা হইলেই দেশবাসীরা পল্লীসমবায়ের সাহায্যে (Village Co-operative) 'ধর্ম্মগোলা' প্রভৃতির দ্বারা শস্য সঞ্চয় করিয়া রাখিত। একস্থানে অনটন অত্যধিক ভাবে দেখা দিলে সেখানে অন্য গ্রামের সমবায় হইতে খাদ্য সরবরাহ করা হইত। এইভাবে পুরাকালে দুর্ভিক্ষ নিবারণ করার ব্যবস্থা ছিল।

দুর্ভিক্ষ কমিশন নিয়োগ

অবাধ বাণিজ্য নীতি

নর্থব্রুকের ন্যায় লিটনও ছিলেন 'অবাধ বাণিজ্যের' পৃষ্ঠপোষক। তিনিও অনেকগুলি আমদানী-রপ্তানীর উপর হইতে শুল্ক উঠাইয়া দিয়াছিলেন। এই সময়ে (১৮৭০) সুয়েজখাল কাটা শেষ হওয়াতে ইউরোপের সঙ্গে এশিয়ার বাণিজ্যগত যোগ দ্রুততর ও প্রবলতর হয়।

দেশীয় সংবাদ-পত্র আইন ও অস্ত্র-আইন

লিটনের সময় 'দেশীয় সংবাদপত্র আইন' (Vernacular Press Act) ও 'অস্ত্র-আইন' (Arms Act) বিধিবদ্ধ হয়। প্রথমোক্ত আইনের বলে তিনি দেশীয় ভাষায় প্রচলিত সংবাদ-পত্রাদির স্বাধীনতা খর্ব্ব করেন। অস্ত্র-আইনের জন্য গবর্ণমেণ্টের অনুমতি ব্যতিরেকে ভারতবাসীদের পক্ষে অস্ত্রশস্ত্র রাখা নিষিদ্ধ হয়।

কারণ

দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধ।—লর্ড নর্থব্রুক আফগানিস্থানের আমীর শের আলীকে সাহায্য করিতে অস্বীকৃত হইলে, শের আলী রাশিয়ার সহিত মৈত্রী স্থাপনের উদ্যোগ করিতে থাকেন। ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী ডিজ্‌রেলি (Disraeli) ছিলেন সাম্রাজ্যবাদী ও রক্ষণশীল দলের নায়ক। তাঁহার উপদেশে লিটন আফগানিস্থান হইতে রুশীয় প্রভাব দূর করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। লিটন

বেলুচিস্থানের অন্তর্গত কোয়েটা অধিকার করিয়া সেখানে একটি বৃটিশ সৈন্যাবাস স্থাপন করিলেন। ইহাতে শের আলী নিরতিশয় কুপিত হইয়া রুশ দূতকে তাঁহার দরবারে অভ্যর্থনা করিলেন (১৮৭৮), কিন্তু বৃটিশ দূতকে তাঁহার রাজ্যে প্রবেশ করিবার অনুমতি দিলেন না। তখন বৃটিশ সৈন্যেরা একযোগে তিন দিক হইতে আফগানিস্থান আক্রমণ করিল। শের আলী পলায়ন করিয়া তুর্কিস্থানে গিয়া আশ্রয় লইলেন। কিছুকাল পরে সেখানে তাঁহার মৃত্যু হইলে, শের আলীর পুত্র ইয়াকুব খাঁর সহিত গণ্ডামক নামক স্থানে সন্ধি হয় (১৮৭৯)। তদনুসারে ইযাকুব খাঁ নিজ দরবারে একজন বৃটিশ রেসিডেণ্ট রাখিতে এবং বৈদেশিক ব্যাপারে বৃটিশের নির্দ্দেশ অনুযায়ী চলিতে স্বীকৃত হইলেন; কিন্তু বিক্ষুব্ধ আফগানগণ বৃটিশদূতকে কাবুলে হত্যা করিলে আবার যুদ্ধ বাধিল। ইয়াকুব খাঁকে বৃটিশরা নির্ব্বাসিত করিলেন। কিন্তু যুদ্ধ চলিতে লাগিল। এরূপ অবস্থায় ইংলণ্ডে ডিজ্‌রেলির মন্ত্রিসভার পতন হইলে উদারনীতিক দলের নেতা গ্লাড্‌ষ্টোন (Gladstone) প্রধান মন্ত্রী হইলেন। তিনি লিটনের কার্য্যকলাপ অনুমোদন করিলেন না। ফলে যুদ্ধসমাপ্তির পূর্ব্বেই লর্ড লিটন পদত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন (১৮৮০)।

শের আলীর পলায়ন ও মৃত্যু, ইযাকুব খাঁ, গণ্ডামকের সন্ধি

আবার যুদ্ধ

বৃটিশ মন্ত্রিসভার পরিবর্ত্তন ও লিটনের পদত্যাগ

লর্ড রিপন (১৮৮০-৮৪)।—অতঃপর উদারনীতিক দলের সদস্য ধার্ম্মিক ক্যাথলিক লর্ড রিপন বড়লাট হইয়া আসিলেন (১৮৮০)।

দ্বিতীয় আফগান-যুদ্ধের সমাপ্তি।—ইয়াকুব খাঁর নির্ব্বাসনের পর শের আলীর এক ভ্রাতুষ্পুত্র আব্দর রহমান কাবুলের রাজপদ লাভ করেন। লর্ড রিপন তাঁহার সহিত এই মর্ম্মে সন্ধি করিলেন যে, আব্দর রহমান ইংরেজ ভিন্ন অপর কোন বৈদেশিক শক্তির সহিত মৈত্রী স্থাপন করিতে পারিবেন না। ইহার পরিবর্ত্তে ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে বৈদেশিক আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবেন এবং বার্ষিক ১২ লক্ষ টাকা বৃত্তি দিবেন। কিন্তু আয়ুব খাঁ নামে শের আলীর এক পুত্র সিংহাসন-প্রত্যাশী হইয়া মাইবন্দ নামক স্থানে ইংরেজ বাহিনীকে পরাস্ত করিলেন; কিন্তু শীঘ্রই আবার তাঁহাকে ইংরেজদের কাছে পরাভব স্বীকার করিতে হইল। আব্দর রহমান কাবুলে আমীর হইয়া বসিলেন।

আব্দর রহমান সন্ধি

আযুব খাঁ, যুদ্ধের ফলাফল

বড়লাট বেলুচিস্থান প্রদেশ গঠন করিয়া কোয়েটা শহরে সেনা-নিবাস স্থাপন করিলেন। ভারত হইতে পারস্যে প্রবেশের বোলান গিরিপথ ইংরেজ অধিকারে আসিল। খেলাৎ রাজ্যের মুস্‌লিম শাসনকর্ত্তাও বৃটিশের আনুগত্য স্বীকার করিলেন।

শাসন-সংস্কার।—লর্ড রিপন উদার স্বভাবের লোক ছিলেন। তাঁহার নাম প্রধানতঃ শাসন-সংস্কার ও জনহিত সাধনের জন্যই স্মরণীয় হইয়া আছে। বেণ্টিঙ্কের শাসনকালে কু-শাসনের জন্য মহীশূর রাজ্য অস্থায়ীভাবে বৃটিশ শাসনাধীনে আসিয়াছিল। লর্ড রিপন উহা পুনরায় সেখানকার হিন্দু রাজাকে ফিরাইয়া দিলেন (১৮৮১)। এই বৎসর ভারতবর্ষে দ্বিতীয় লোক-গণনা (census) করা হয় (১৮৮১)। লিটন সাহেব পূর্ব্বে যে অপ্রিয় 'দেশীয় সংবাদ-পত্র আইন' চাপাইয়া দিয়াছিলেন, উদারনৈতিক লর্ড রিপন তাহা উঠাইয়া জাতির কণ্ঠরোধ দূর করিয়া দিলেন। তিনি কৃষি ও রাজস্ব সম্বন্ধেও কয়েকটি সংস্কার প্রবর্ত্তন করেন এবং দেশীয় শিল্পের উন্নতির জন্য প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। রিপন ছিলেন 'অবাধ ব্যণিজ্যের' সমর্থক। লবণ ও অন্যান্য কয়েকটি জিনিসের শুল্ক তিনি হ্রাস বা একেবারে রহিত করেন। তাঁহার শাসনকালে কারখানার নারী ও শিশু শ্রমিকদের মঙ্গলের জন্যও প্রথম কারখানা আইন (Factory Act) পাশ হয়। ভারতে শ্রমিক-শোষণ বন্ধ করার ইহাই প্রথম চেষ্টা।

মহীশূর প্রত্যর্পণ, লোক-গণনা, দেশীয় সংবাদ-পত্র আইন প্রত্যাহার

বাঙ্গালা দেশে স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসনের (Self-Government) প্রসার লর্ড রিপনের একটি স্মরণীয় কার্য্য। ইহার পূর্ব্বেই কলিকাতা, মাদ্রাজ, বোম্বাই, প্রভৃতি বড় বড় সহরে মিউনিসিপ্যালিটি ছিল, কিন্তু তখন মিউনিসিপ্যালিটির কাজে জনসাধারণের কোনও হাত ছিল না। ১৮৮৪ খৃঃ অব্দে রিপন বঙ্গীয় মিউনিসিপ্যাল আইন পাশ করেন। তদনুযায়ী মিউনিসিপ্যালিটিগুলি তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানসমূহের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য করদাতাদের ভোটে নির্ব্বাচিত হইতেন, আর তৃতীয় শ্রেণীর মিউনিসিপ্যাল প্রতিষ্ঠানগুলির সদস্যেরা সকলেই গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মনোনীত হইতেন। গ্রামাঞ্চলে পথঘাট-সংস্কার, শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য-রক্ষা প্রভৃতি কাজের

স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন

Bengal Municipal Act (1884)

জন্য ১৮৭১ খৃঃ অব্দে (লর্ড মেয়োর সময়ে) কয়েকটি 'জেলা সভা' (District Council) স্থাপন করা হইয়াছিল। লর্ড রিপন ১৮৮৫ খৃঃ অব্দে প্রত্যেক জেলায় একটি করিয়া 'জেলা বোর্ড (District Board) এবং প্রত্যেক মহকুমায় একটি করিয়া 'লোকাল বোর্ড' (Local Board) স্থাপন করেন। এই সকল স্বায়ত্তশাসন-প্রতিষ্ঠানের সদস্যগণের মধ্যে কয়েকজন গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মনোনীত এবং কয়েকজন করদাতাদের দ্বারা নির্ব্বাচিত হইতেন। তিনিই প্রথম ব্যালট প্রথায় ভোট দেওয়া প্রচলন করেন। স্বাধীনতা অর্জ্জনেব প্রথম সোপান স্বায়ত্ত-শাসন এবং ইহার জন্য প্রয়োজন রাজনৈতিক শিক্ষা, শৃঙ্খলা ও কর্ম্মচালনার শক্তি অর্জ্জন। এই ক্ষুদ্র গণ্ডীবদ্ধ কর্ম্মপ্রণালী যদি ভারতীয়দের দ্বারা সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় তবে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের পথ দুরূহ হইবে না, এইরূপ বিশ্বাস লর্ড রিপনের ছিল। শিক্ষার উন্নতির জন্যও লর্ড রিপন হাণ্টাব কমিশন নিযুক্ত করেন; এই সময়ে এলাহাবাদ ও পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কমিশনে অনুন্নত শ্রেণীর (Depressed class) মধ্যে শিক্ষা বিস্তার এবং প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতি বিষয়ে বিশেষ আলোচনা হইয়াছিল। আইনের চক্ষে ভারতবাসী ও ইউ-রোপীয়দের মধ্যে যে পার্থক্য ছিল লর্ড রিপন তাহা দূর করিবাব জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। তদুদ্দেশে যে আইনের খসড়া রচিত হয় তাহা তৎকালীন আইন-সচিব 'ইলবার্ট' সাহেবেব নামে ইলবার্ট বিল (Ilbert Bill) রূপে প্রসিদ্ধ হইয়া আছে। এই বিলে ভারতীয় ম্যাজিষ্ট্রেটগণকে ইউরোপীয়দের বিচারের ক্ষমতাও দান করা হইয়াছিল। কিন্তু এই অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত বিলের বিরুদ্ধেও এদেশের উদ্ধত ইউরোপীয় সমাজ হইতে এরূপ তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল যে, শেষে বাধ্য হইয়া সংশোধিত আকারে বিলটিকে আইনে পরিণত করিতে হয়; স্থির হইল যে, ফৌজদারী মামলায় কোন ইউরোপীয় যদি কখনও কোন দেশীয় ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে অভিযুক্ত হয়, তবে ইউরোপীয় আসামী ইউরোপীয় জুরি দাবি করিতে পারিবে। এই সব অন্যায় ও জাতিগত বৈষম্যের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিতে কংগ্রেস বা জাতীয় মহাসভার কর্ম্মসূচনা রিপন দেখিয়া যান।

District Board & Local Board

হাণ্টার কমিশন

ইলবার্ট বিল

রিপনের জনপ্রিয়তা ও ভারত ত্যাগ

লর্ড রিপন তাঁহার কার্য্যকালে এদেশে যেরূপ জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করিয়াছিলেন তাহা, অপর কোন বড়লাটের ভাগ্যে জুটিয়াছে কিনা সন্দেহ। সেজন্য দেশনায়ক সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যে কলেজ এসময়ে স্থাপন করেন, তাহার নাম হয় রিপন কলেজ। ১৮৮৪ খৃঃ অব্দের ডিসেম্বর মাসে রিপন ভারত ত্যাগ করেন।

আফগানিস্তান

লর্ড ডাফ্‌রিন (১৮৮৪—৮৮)।—পরবর্ত্তী বড়লাট লর্ড ডাফ্‌রিন আফগানিস্থানের আমীরের সহিত রাওয়ালপিণ্ডিতে সাক্ষাৎ করিয়া আমীরেব সহিত বৃটিশের মৈত্রীবন্ধন দৃঢতর করেন।

সিন্ধিয়া

সিন্ধিয়ার সহিতও আপোষের জন্য তিনি ঝান্সীর পরিবর্ত্তে সিন্ধিয়াকে গোয়ালিয়র ও মোরার দুর্গ দান করেন। বাঙ্গালা, অযোধ্যা ও পঞ্জাবে কৃষকদের দুরবস্থা লাঘব করিবার জন্য ডাফ্‌বিন কয়েকটি প্রজাস্বত্ব আইন প্রণয়ন করেন (১৮৮৬—৮৭)। এই সময়ে আর একটি 'কারখানা আইন'ও বিধিবদ্ধ হইল। ফলে কারখানার শ্রমিকদের অবস্থার কিছু উন্নতি হইল। ১৮৮৬ খৃঃ অব্দে বাজকর্ম্মচারী নিয়োগের জন্য পাব্‌লিক সার্ভিস্ কমিশন গঠিত হইল। ১৮৮৭ খৃঃ অব্দে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বের পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হওয়ায় মহাসমারোহে স্বর্ণ-জুবিলী (Golden Jubilee) উৎসব সম্পন্ন হয়।

প্রজাস্বত্ব আইন

কারখানা আইন

স্বর্ণ-জুবিলী

কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা (১৮৮৫)

লর্ড ডাফ্‌রিনের আমলে আর একটি প্রধান ঘটনা ১৮৮৫ খৃঃ অব্দে ভারতের জাতীয় মহাসভার (Indian National Congress) প্রতিষ্ঠা। প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়েব সভাপতিত্বে বোম্বাই নগরে কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন হয়। জাতীয় মহাসভার প্রথম সভাপতি বাঙ্গালী।

কারণ

তৃতীয় ব্রহ্মযুদ্ধ।—ব্রহ্মরাজ থিবো ফরাসীদের সহিত বৃটিশের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিতেছিলেন। বৃটিশ বণিকরাও ব্রহ্মদেশে নানারূপে উৎপীড়িত হইতেছিলেন। ব্রহ্মরাজের নিকট প্রতিকার প্রার্থনা করিয়া কোন ফল না হওয়ায় লর্ড ডাফ্‌রিন যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। ১৮৮৪ খৃঃ অব্দে রাজধানী মান্দালয় অধিকৃত হইলে সপরিবারে থিবো ভারতবর্ষে নির্ব্বাসিত হইলেন। ১৮৮৬ খৃঃ অব্দে সমগ্র

উত্তর-ব্রহ্ম ইংরেজরা কাড়িয়া লইল কিন্তু ব্রহ্মদেশের প্রতি সহানুভূতি দেখাইয়া জাতীয় কংগ্রেস প্রকাশ্যে প্রতিবাদ করিল।

উত্তর-ব্রহ্ম-অধিকার (১৮৮৬)

লর্ড ল্যান্সডাউন (১৮৮৮—৯৪)।—১৮৮৮ খৃঃ অব্দে লর্ড ল্যান্সডাউন বড়লাট হইয়া ভারতে আসেন। আফগানিস্থানের আমীর আব্দর রহমানের সহিত মৈত্রী দৃঢ়তর করিবার জন্য তিনি আমীরের বাৎসরিক বৃত্তি বাড়াইয়া ১২ লক্ষ টাকা হইতে ১৮ লক্ষ টাকা করিয়া দিলেন। এই সময়ই বৃটিশ-ভারত ও আফগানিস্থানের মধ্যে সীমা নির্দ্দিষ্ট করিবার জন্য স্যর মার্টিন ডুরাণ্ড নামক দূতকে প্রেরণ করা হয়। তিনি যে সীমারেখা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন তাহাই 'ডুরাণ্ড লাইন' নামে বিখ্যাত হইয়াছে।

আফগানিস্থান·

'ডুরাণ্ড লাইন'

এই সময় মণিপুর রাজ্যের উত্তরাধিকার লইয়া গোলযোগ উপস্থিত হইলে ল্যান্সডাউন মণিপুরের সেনাপতি টিকেন্দ্রজিৎকে নির্ব্বাসিত করিবার অভিপ্রায়ে আসামের চীফ-কমিশনার কুইন্‌টন্ সাহেবকে সেখানে প্রেরণ করিলেন। টিকেন্দ্রজিতের অনুচরেরা সদলবলে চীফ কমিশনার সাহেবকে বন্দী করিয়া হত্যা করে। তখন টিকেন্দ্রজিৎকে পরাজিত করিয়া তাঁহাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হইল। রাজবংশের জনৈক বালককে মণিপুরের সিংহাসনে বসাইয়া একজন বৃটিশ কর্ম্মচারীর উপর রাজ্যশাসনের ভার দেওয়া হয়।

মণিপুর যুদ্ধ, টিকেন্দ্রজিতের ফাঁসি

ল্যান্সডাউন ভারতের পূর্ব্ব সীমান্ত অঞ্চলে বৃটিশ প্রভাব বিস্তারে সচেষ্ট হন। এই সময়ে সিকিম, লুসাই পর্ব্বত অঞ্চল এবং শান্ দেশেও ইংরেজ-প্রভাব বিস্তার লাভ করিল। পশ্চিম সীমান্তে কাশ্মীরের অন্তর্গত গিল্‌গিটের কিয়দংশও বৃটিশ অধিকারে আসে। গিলগিটের ভিতর দিয়া মধ্য এশিয়া ও রাশিয়ায় যাওয়া যায়।

ইংলণ্ডের সাম্রাজ্য রক্ষাব জন্য যত যুদ্ধ-বিগ্রহ হইয়াছে যথা—আফগান, ব্রহ্ম, মেসোপটেমিয়া, চীন, আবিসিনিয়া, বুয়োর, প্রভৃতি—তাহার সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে হইয়াছে ভারত-সরকারকে, যদিও এই সব যুদ্ধের সহিত ভারতের কোনও সম্বন্ধ নাই। এই সব কারণেও ভারত এত দ্রুত দারিদ্র্যের শেষ ধাপে নামিয়া গেল। বহু ইংরেজ মনীষী এই জন্য প্রতিবাদ করিয়াছেন। আবিসিনিয়ার যুদ্ধের খরচ সম্পর্কে তখনকার গবর্ণর-জেনারেল লর্ড লরেন্স বলিয়াছিলেন, "এই যুদ্ধে ভারতের কোনরূপ স্বার্থ-সংস্রব নাই,

অতএব আমার মতে ভারত কিছুই খরচ করিবে না।" ভারত-সচিব লর্ড স্যালিস্‌বারিও এই কথার সমর্থন করিয়া লিখিয়াছিলেন, "ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, ভারতকে মনে করা হয় যেন ইংলণ্ডের সৈন্য-নিবাস, যেখান হইতে যত খুসী সৈন্য-সামন্ত সরবরাহ করা হইবে অথচ ইংলণ্ড কোন বেতন বা খরচ দিবে না।" লর্ড নর্থব্রুকও বিরক্ত হইয়া "পেরেকের যুদ্ধ" ও "দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধের" খরচ যোগান সম্বন্ধে অত্যন্ত কড়া পত্র লণ্ডনে লিখিয়াছিলেন। ইংরেজ শক্তি যত রাজ্য গ্রাস করিতে লাগিল ভারতের তহবিলও ততই শূন্য হইয়া পড়িতে লাগিল এবং প্রজাদের দুর্দ্দশা দারিদ্র্যও তত বাড়িতে লাগিল।

এই সময় মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধি দক্ষিণ আফ্রিকায় নির্য্যাতিত ভারতীয়দের নেতারূপে আবির্ভূত হন এবং অদ্বৈতবাদী স্বামী বিবেকানন্দ Chicago Parliament of Religions মহাসভায় ভারতীয় বেদান্ত ধর্ম্ম প্রচাব করেন (১৮৯৩)। বিবেকানন্দের জীবনের মূলমন্ত্র ছিল পরাধীন জড় ভারতবাসীকে প্রকৃত মানুষ করিয়া গড়িয়া তোলা।

Indian Councils Act (1892)

১৮৯২ খৃঃ অব্দে 'ইণ্ডিয়ান কাউন্সিলস্ অ্যাক্ট' নামে এক আইন পাশ হয়। তাহাতে আইন-সভার বে-সরকারী সদস্যদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইল। দেশের বিশ্ববিদ্যালয়, ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটিগুলিকে সভ্য-নির্ব্বাচনের অধিকার দেওয়া হয়। আইন-সভায় সভ্যগণকে শাসন-প্রণালী সম্বন্ধে প্রশ্ন-জিজ্ঞাসা ও মন্তব্য জ্ঞাপনের অধিকারও দেওয়া হইল। লর্ড ল্যান্সডাউন সামরিক বিভাগেরও সংস্কার করেন। রাশিয়ার আক্রমণ হইতে ভারত সাম্রাজ্য রক্ষার উদ্দেশ্যে সামন্ত রাজ্যগুলিতে ইম্পিরিয়াল সার্ভিস ট্রুপস্ (Imperial Service Troops) বা সাম্রাজ্য-রক্ষী সৈন্যদল গঠিত হইল। দেশীয় রাজগণই নিজব্যয়ে এই সৈন্যদল পোষণ করিতে লাগিলেন।

২য় লর্ড এলগিন (১৮৯৪—৯৯)।—লর্ড এলগিনের পুত্র ২য় লর্ড এল্‌গিন ১৮৯৪ খৃঃ অব্দে ভারতবর্ষের বড়লাট নিযুক্ত হন। লর্ড এলগিন পামিরের পর্ব্বতসন্ধিকে বৃটিশ-ভারত ও রুশ সাম্রাজ্যের মধ্যবর্ত্তী ভূখণ্ডরূপে নির্দ্দিষ্ট করেন; ফলে অক্ষু (Oxus)

নদীর উত্তর-তীর অবধি রাশিয়ান সাম্রাজ্যের সীমা স্বীকৃত হইল। তাঁহার সময় আফগানিস্থান ও বৃটিশ-ভারত এবং চীন ও ব্রহ্মদেশের মধ্যেও সীমারেখা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। রুশ, জার্ম্মাণ, ফরাসী ও ইংরাজগণ এই সময় হইতে মধ্য এশিয়া আবিষ্কারে নিরত হন। সুদূর প্রাচ্যে চীন-জাপানের প্রথম যুদ্ধ (১৮৯৪) এই সময়ে বাধে, দুর্ব্বল চীনারা পরাস্ত হয় ও জাপানের দুরাকাঙ্খা বাড়িতে থাকে।

বৃটিশ-রুশ সীমান্ত-নির্ণয়

১৮৯৫ খৃঃ অব্দে আফগানিস্থানের উপজাতিদের বিদ্রোহ দমন করিয়া চিত্রলে বৃটিশ কর্ত্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করা হয়। ১৮৯৭ খৃঃ অব্দে আফ্রিদিরা বিদ্রোহ করিলে তাহাদিগকেও দমন করা হয়। পেশোয়ার হইতে চিত্রল অবধি একটি রাজপথ নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করিয়া চিত্রলকে একটি সুরক্ষিত সীমান্ত ঘাঁটিতে পরিণত করা হয়।

সীমান্তে অশান্তি

এতদিন ভারতীয় সেনাদল তিনটি স্বতন্ত্র ভাগে বিভক্ত ছিল এবং প্রত্যেক ভাগ এক-একজন সেনাপতির অধীন ছিল। লর্ড এলগিন এই ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করিয়া সমগ্র ভারতীয় সেনাদলগুলিকে একজন প্রধান সেনাপতির অধীন করিলেন।

কোম্পানীর আমলে ভারতের নিজস্ব ব্যবসা-বাণিজ্য সব অবলুপ্ত হইয়া যায় কোম্পানীর কঠোর আইন ও ব্যবস্থার ফলে। এ বিষয়ে একজন ইংরেজ 'পাইওনিয়ার' পত্রিকায় (১৮৯১ খৃঃ ৭ই সেপ্টেম্বর) লিখিয়াছিলেন, "ম্যানচেষ্টারের কাছে ভারতীয় ব্যবসায়ীগণকে তাহাদের রং করা এবং অন্যান্য ব্যবসা সংক্রান্ত সকল গোপন তথ্য-প্রণালী বলপ্রকাশ দ্বারা স্বীকার করাইয়া লওয়া হইত। ইহা অর্থনীতি হইতে পারে কিন্তু দৃশ্যতঃ অন্যরূপ মনে হয়।" তারপর ভারতীয় তাঁতের উপর এমন কর স্থাপন করা হইল যে, কাপড়ের ব্যবসাই লোপ পাইয়া গেল। কোম্পানী যখন পরে হাত বদল করিয়া সম্রাটের শাসন-অধীনে চলিয়া যায়, তখন ভারতে প্রকৃত বণিকতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইল। বিলাতের রাজনীতি তখন চালনা করিত ল্যাঙ্কেশায়ার ও ম্যানচেষ্টারের বণিক-সঙ্ঘ। তাহাদের প্রভাবে ভারতের ইংরেজ বণিক্‌গোষ্ঠী ভারতনীতি প্রবর্ত্তন করিতে সুরু করিল। লর্ড এল্‌গিনের সময় ভারত-সচিব লর্ড জর্জ্জ হ্যামিলটন ল্যাঙ্কেশায়ারের বণিকদের পরামর্শে ১৮৯৫ খৃঃ

ভারতের সমস্ত বন্দর-শুল্ক রহিত করিয়া দেন শুধু বিলাতের মাল ভারতে চালু করার উদ্দেশ্যে। ইহাতে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের যে কত বড় ক্ষতি হইল, তাহার হিসাব কে করিবে! ইংরেজের দমন নীতি সত্ত্বেও যখন ভারতীয় মিলগুলি মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে লাগিল, তখন ইংরেজ বণিকদের সহায়তায় একদল নব্য-ভারতীয় ধনী বণিকশ্রেণী গড়িয়া উঠিল, তাঁহারা পৃথিবীর সব পুঁজিপতিদের সহিত এক জাতীয়। এই মুষ্টিমেয় দলই দেশের সব ধন কবলীকৃত করিয়া রাখিয়াছে। আজও রাজনীতি ইহাদেরই হাতে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ, হীরক জুবিলী (১৮৯৭)

লর্ড এলগিনের শাসনকালে ভারতবর্ষে ভূমিকম্প, দুর্ভিক্ষ ও প্লেগ মহামারীতে বিস্তর লোকক্ষয় হয় (১৮৯৬—৯৭)। ১৮৯৭ খৃঃ অব্দে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বের ৬০ বৎসর পূর্ণ হইলে মহাসমারোহে 'হীরক জুবিলী' উৎসব (Diamond Jubilee) অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

লর্ড কার্জ্জন (১৮৯৯—১৯০৫)।—১৮৯৯ খৃঃ অব্দে লর্ড কার্জ্জন ভারতবর্ষের বড়লাট হইয়া আসেন। তিনি ছিলেন এদেশের শ্রেষ্ঠ বৃটিশ শাসকদের অন্যতম। তিনি সুদূর চীন, পারস্য ও মধ্য-এসিয়া পরিভ্রমণ করিয়া গ্রন্থাদি লিখিয়া কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

আফগানিস্থান, পারস্য, তিব্বত

বৈদেশিক নীতি।—পশ্চিম-এশিয়ায় বৃটিশ প্রভাব বিস্তার করা কার্জ্জনের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল, তাই তিনি পারস্য দেশে বৃটিশ স্বার্থ রক্ষার যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিব্বত হইতে চীনের প্রভাব দূর করিবার জন্য সেখানেও এক অভিযান প্রেরণ করেন এবং সেই সুযোগে বাঙ্গালী পণ্ডিত শরৎচন্দ্র দাস তিব্বতে গিয়া, সেখানকার ভাষা শিখিয়া বিরাট তিব্বতী অভিধান রচনা করেন। কিন্তু ইহাতে তিব্বতীরা বিশেষ খুসী হয় নাই। আফগানিস্থানের আমীর হবিবুল্লার সহিতও তিনি মৈত্রী রক্ষা করিয়া চলিতেন; দক্ষিণ আফ্রিকায় বুয়োর যুদ্ধ এইসময় আরম্ভ হয়।

বুয়োর যুদ্ধ

আভ্যন্তরীণ ব্যাপার।—পশ্চিম দিক হইতে বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিরোধ এবং দুর্দ্ধর্ষ আফগান উপজাতিসমূহ দমনের জন্য লর্ড কার্জ্জন প্রথম 'উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত' প্রদেশ গঠন করিয়া, সেখানকার শাসনভার একজন চীফ্-কমিশনারের উপর ন্যস্ত

সীমান্ত প্রদেশ

করেন। বার্ষিক ২৫ লক্ষ টাকা দিবার অঙ্গীকারে নিজামের নিকট হইতে তিনি বেরার প্রদেশটি বৃটিশ অধিকারভুক্ত করিয়া লন। অভিজাত শ্রেণীর সন্তানদিগকে সামরিক শিক্ষা দিবার জন্য 'ইম্পিরিয়েল ক্যাডেট কোর' নামে এক সৈন্যদল গঠিত হইল। দেশের শিল্পবাণিজ্য সম্বন্ধীয় সমস্যার সমাধানকল্পে লর্ড কার্জ্জন একটি বাণিজ্য-বিভাগ স্থাপন করেন। পুলিশবিভাগেও এই সময় অনেক সংস্কার সাধন করা হয়। পঞ্জাবে মহাজনদের অত্যাচার হইতে কৃষকদিগকে রক্ষা করার জন্য তিনি 'পঞ্জাব ভূমি-হস্তান্তর আইন' প্রণয়ন করেন। কৃষি-ব্যাঙ্ক, সমবায়-সমিতি স্থাপন ও কৃষিঋণ দানের ব্যবস্থা করিয়াও তিনি কৃষকদের অবস্থার কিছু উন্নতি করিতে চেষ্টা করেন। জনসাধারণের হিতের জন্য তিনি লবণকর এবং আয়করও হ্রাস করিয়া দিয়াছিলেন।

বেরার

Imperial Cadet corps, বাণিজ্য-বিভাগ, পুলিশ-বিভাগ, The Punjab Land Alienation Act, Co-operative Societies.

বৃটিশ-বুয়োর যুদ্ধ শেষ হইবার কিছু আগে লর্ড কার্জ্জনের শাসনকালে ১৯০১ খৃঃ অব্দে মহারাণী ভিক্টোরিয়া পরলোক গমন করেন এবং তাঁহার পুত্র ৭ম এড্‌ওয়ার্ডের অভিষেক-বার্ত্তা ঘোষণা করা হয়। মহারাণীর স্মৃতিরক্ষার উদ্দেশ্যে কার্জ্জন কলিকাতায় 'ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল' নামক সুপ্রসিদ্ধ মর্ম্মর সৌধের নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ করেন; এবং প্রত্নতত্ত্ব বিভাগটির (Archæological Survey) সংস্কার করিয়া ঐতিহাসিক স্মৃতিরক্ষার স্থায়ী ব্যবস্থা কার্জ্জনই করেন। কলিকাতা ইম্পিরিয়েল লাইব্রেরী স্থাপনও তাঁহার আর একটা মহৎ কার্য্য।

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যু, সপ্তম এড্‌ওয়ার্ডের রাজ্যলাভ (১৯০১)

১৯০৪ খৃঃ অব্দে লর্ড কার্জ্জন এক আইন প্রণয়ন করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়গুলির গঠনতন্ত্রের অনেক পরিবর্ত্তন করেন। ইহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতা অনেক বৃদ্ধি পাইল। কিন্তু মনীষী আশুতোষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বিচক্ষণ জাতীয় নেতাদের অক্লান্ত চেষ্টায় সরকারী প্রভাব প্রবল হইতে পারে নাই।

বিশ্ববিদ্যালয় আইন (১৯০৪)

এতদিন পর্য্যন্ত বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যা একজন ছোটলাট বা লেফটেনাণ্ট গবর্ণরের দ্বারা শাসিত হইয়া আসিতেছিল। শাসনকার্য্যের সুবিধার জন্য কার্জ্জন ঐ সম্মিলিত প্রদেশত্রয়কে দুই ভাগ করিয়া দুইটি স্বতন্ত্র প্রদেশে পরিণত করিলেন,—পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম লইয়া একটি প্রদেশ হইল, আর পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যা

বঙ্গ-বিভাগ

লইয়া আর একটি প্রদেশ। শিক্ষিত বাঙ্গালীরা মনে করিলেন, বাঙ্গালীজাতিকে দ্বিধা-বিভক্ত করিয়া তাহাদের জাতীয় ও রাষ্ট্রীক উন্নতির পথে অন্তরায় সৃষ্টি করিবার জন্যই এই ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু প্রমুখ দেশনেতাদের নেতৃত্বে ইহার বিরুদ্ধে ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত হইল। ইহাই "স্বদেশী আন্দোলন" নামে প্রসিদ্ধ। সুরেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ নেতৃবৃন্দ দেশবাসীকে বিলাতী পণ্য বর্জ্জনের উপদেশ দিলেন। কবি রবীন্দ্রনাথ রাখিবন্ধনের সূচনা করেন ও মৌলবী লিয়াকৎ হুসেন তাঁহার সমর্থন করেন। গবর্ণমেণ্ট জনমত শান্ত না করিয়া কঠোরভাবে এই আন্দোলন দমন করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। ফলে দেশ বিপ্লববাদী গুপ্ত-সমিতিতে ছাইয়া গেল। দমননীতির ফলে আন্দোলনের বেগ প্রশমিত হইয়া আসিলেও, জাতীয়তার আদর্শ হিন্দু-মুসলমান নির্ব্বিশেষে জনসাধারণকে স্বাধীনতা-সংগ্রামের পথে ক্রমশ অগ্রসর করিয়া দিল।

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বদেশী আন্দোলন

১৯০৫ খৃঃ অব্দে প্রধান সেনাপতি লর্ড কিচেনারের সহিত সমর বিভাগের পরিচালনা সম্বন্ধে মতভেদ হওয়ায় লর্ড কার্জ্জন পদত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। ১৯০৫ খৃঃ অব্দে এক আইনের বলে ভাইসরয়ের পরিষদে যুদ্ধ-বিভাগের একজন কর্ম্মচারী এবং সেনাপতি উভয়কেই লওয়া হইল। কর্ম্মচারীর কর্ত্তব্য হইল যান, খাদ্য-বস্ত্র সরবরাহ, অর্থনীতি, প্রভৃতির তদারক করা এবং ভাইসরয় ও সেনাপতির সহিত যোগাযোগ রক্ষা করা; এবং সেনাপতির কার্য্য-সীমা সৈন্যদল-গঠন, শৃঙ্খলা-রক্ষা ও যুদ্ধ ইত্যাদিতে আবদ্ধ। লর্ড কিচেনার বলিলেন, 'এক বিভাগের জন্য দুইটা স্বতন্ত্র অফিস এবং তদ্দরুণ অতিরিক্ত খরচের প্রয়োজন নাই। একই কাজের জন্য দুইটি অফিস থাকিলে কাজের বিশৃঙ্খলা, বিরোধ ও অসুবিধা ঘটিবে।' লর্ড কার্জ্জন এই মতে সায় দিতে পারিলেন না কারণ তাহাতে সেনাপতি হইয়া পড়িবেন অতি স্বাধীন ও ক্ষমতাবান। অবশেষে পার্লামেণ্ট লর্ড কিচেনারের মতই গ্রাহ্য করেন এবং ক্ষুব্ধ লর্ড কার্জ্জন পদত্যাগ করেন। ইহার ফল যে ভাল হয় নাই তাহার প্রমাণ মেসোপটেমিয়ার যুদ্ধে বিশৃঙ্খলা ও বিপর্য্যয়, যদিও এই যুদ্ধের সহিত ভারতের কোন যোগাযোগ

কার্জ্জনের পদত্যাগ

ছিল না। নাগরিক গবর্ণমেণ্টের অধীনে সামরিক গবর্ণমেণ্টের থাকা উচিত, তাহা না হইলে দেশের বহুবিধ অকল্যাণ হয়। লর্ড কার্জ্জন ঠিকই বুঝিয়াছিলেন। কিন্তু পদত্যাগের পূর্ব্বেই তিনি বঙ্গ-ভঙ্গ সমাপ্ত করিয়া দেশব্যাপী বিক্ষোভের সৃষ্টি করেন।

২য় লর্ড মিণ্টো (১৯০৫—১০)।—কার্জ্জনের পদত্যাগের পর ২য় লর্ড মিণ্টো বড়লাট হইয়া আসেন। এদেশে আসিয়াই তিনি স্বদেশী আন্দোলনের মূলোচ্ছেদ করিবার জন্য কঠোর দমন-নীতি অবলম্বন করিলেন। অশ্বিনীকুমার দত্ত, বিপিনচন্দ্র পাল, কৃষ্ণকুমার মিত্র, অরবিন্দ ঘোষ প্রমুখ বঙ্গের বহু বিখ্যাত নেতাকে বিনা বিচারে অনির্দ্দিষ্টকালের জন্য কারাবাস বা নির্ব্বাসন দেওয়া হইল, এবং বহু বিপ্লবী ধরা পড়িয়া মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত অথবা নির্ব্বাসিত হইল। জনচিত্ত শান্ত করিবার উদ্দেশ্যে দমন-নীতি প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে তিনি শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তনের ব্যবস্থাও করিলেন। এই শাসন-সংস্কার তৎকালীন ভারতসচিব মর্লে ও বড়লাট মিণ্টোর নামানুসারে 'মর্লে-মিণ্টো শাসন-সংস্কার' নামেই সমধিক পরিচিত। তদনুযায়ী প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় আইন-সভাগুলিতে বে-সরকারী সদস্যের সংখ্যা কিছু বৃদ্ধি করা হইল। বে-সরকারী সদস্যের মধ্যে কয়েকজন দেশবাসীর নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি লওয়ার ব্যবস্থাও হইল। ভারত-সচিবের পরিষদেও ভারতীয় সদস্য লওয়ার ব্যবস্থা এই সময় হয়। মর্লে-মিণ্টো সংস্কারের বিধানগুলিতে সত্যকার শাসন-কর্ত্তৃত্ব দেশবাসীকে দেওয়া হয় নাই; তাহার উপর আবাব এই সময়েই ভেদমূলক সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন-প্রথা (Communal Representation) প্রবর্ত্তন করা হয়। ফলে জাতীয়তার উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গেই দেশের মুসলমান ও অ-মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা হইল। মর্লে স্পষ্টই বলিয়াছিলেন, "ভারতকে ক্ষমতা দিবার মূলে একটি সর্ত্ত থাকিবে যে, সম্রাটের প্রাধান্য কোনমতে একটুও ক্ষুণ্ণ হইতে পারিবে না।" বড়লাটের এবং প্রাদেশিক গবর্ণরের শাসন-পরিষদে (Executive Council) ভারতীয় সদস্য লওয়ার ব্যবস্থা হইল। স্যর সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ (পরে লর্ড) বড়লাটের শাসন-পরিষদের আইন-সচিব নিযুক্ত হইলেন, আর কিশোরীলাল গোস্বামী হইলেন বাঙ্গালায় লেফ্‌টেন্যাণ্ট গবর্ণরের পরিষদের সদস্য।

দমননীতি

অশ্বিনীকুমার দত্ত

মর্লে-মিণ্টো সংস্কার (১৯০৯)

সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন-প্রথা

স্যর সত্যেন্দ্র প্রসন্ন সিংহ, কিশোরীলাল গোস্বামী

৭ম এড্‌ওয়ার্ডের মৃত্যু ও ৫ম জর্জ্জের অভিষেক, বঙ্গ-ভঙ্গ রদ (১৯১১)

২য় লর্ড হার্ডিঞ্জ (১৯১০—১৬)।—১৯১০ খৃঃ অব্দে ২য় লর্ড হার্ডিঞ্জ বড়লাট নিযুক্ত হন। এই বৎসরই সম্রাট ৭ম এড্‌ওয়ার্ড পরলোক গমন করেন এবং তাঁহার পুত্র ৫ম জর্জ্জ রাজপদে অভিষিক্ত হন। ১৯১১ খৃঃ অব্দে নূতন সম্রাট ও সাম্রাজ্ঞী ভারতবর্ষে আগমন করিলে দিল্লীতে এক দরবারে মহাসমারোহে তাঁহাদের পুনরাভিষেক হয়। প্রজাদের সন্তুষ্ট করিতে বঙ্গ-ভঙ্গ রহিত করা হয় ও ভারতবর্ষের রাজধানী কলিকাতা হইতে দিল্লীতে স্থানান্তরিত করা হয়। পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গকে একত্র করিয়া একজন গবর্ণর বা লাটের অধীনে একটি প্রেসিডেন্সি গঠন করা হইল এবং বিহার, ছোটনাগপুর ও উড়িষ্যা একত্রিত হইয়া একটি নূতন প্রদেশ গঠিত হইল ; আসামও স্বতন্ত্রভাবে একজন চীফ্‌-কমিশনারের শাসনাধীন হইয়া গেল। মান্দ্রাজের গবর্ণর লর্ড কারমাইকেল হইলেন নব্য বাঙ্গালার প্রথম গবর্ণর। ইনি ভারতীয় কৃষ্টি ও শিল্পকলার বিশেষ গুণগ্রাহী ছিলেন এবং Indian Society of Oriental Art (১৯০৭ সালে স্থাপিত) সমিতিকে প্রচুর অর্থ সাহায্য করেন।

ইউরোপে মহাযুদ্ধ (১৯১৪)

লর্ড হার্ডিঞ্জের শাসনকালেই ইউরোপের মহাসমর (Great War) আরম্ভ হয় (১৯১৪)। এই যুদ্ধে ভারতবর্ষ দ্রব্যসামগ্রী, অর্থ ও সৈন্যের দ্বারা বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ও মিত্র পক্ষকে প্রভূত সহায়তা করিয়াছিল। কিন্তু প্রতিদানে, যুদ্ধান্তে (১৯১৮) ভারতবাসী বিশেষ কিছুই সুযোগ-সুবিধা পায় নাই।

লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ড (১৯১৬—২১)।—১৯১৬ খৃঃ অব্দে লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ড বড়লাট হইয়া আসিলেন। তাঁহার শাসনকাল দু'টি বিষয়ের জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কারের জন্য স্যাড্‌লার কমিশন (Sadler Commission) নিয়োগ, এবং 'মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড সংস্কার' (Montague-Chelmsford Reforms). স্যর মাইকেল স্যাড্‌লার ছিলেন ইংলণ্ডের একজন প্রসিদ্ধ শিক্ষাব্রতী। তাঁহার সভাপতিত্বে যে কমিশন নিযুক্ত করা হয়, স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তাহার অন্যতম সদস্য ছিলেন। স্যাড্‌লার কমিশন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কারের জন্য যে মূল্যবান রিপোর্ট দাখিল করেন, কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে তদনুযায়ী

Sadler Commission.

স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

কিছু কিছু সংস্কার প্রবর্ত্তিত হইলেও, সরকারী সাহায্য ও সহানুভূতির অভাবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সেগুলি এখনও সম্পূর্ণ প্রয়োগ করা সম্ভব হয় নাই।

শাসন-সংস্কার।—ইউরোপের মহাসমরে ভারতবর্ষ অকাতরে ধনপ্রাণ দিয়া বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করিয়াছিল। বিনিময়ে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ভারতবাসীকে স্বায়ত্তশাসন প্রদানের প্রতিশ্রুতি দান করেন। তৎকালীন ভারত-সচিব মণ্টেগু সাহেব ভারতবর্ষের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণের জন্য নিজে এখানে আগমন করিয়া চেম্‌স্‌ফোর্ডের সহিত একযোগে এক রিপোর্ট পেশ করেন। এই রিপোর্টের উপর ভিত্তি করিয়া ১৯১৯ খৃঃ অব্দে পার্লামেণ্টে 'ভারত-শাসন আইন' (Government of India Act, 1919) বিধিবদ্ধ হয়। এই শাসনবিধি অনুসারে ভারতবর্ষের শাসনতন্ত্রের যে পরিবর্ত্তন সাধিত হয় তাহাই 'মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড সংস্কার' নামে প্রসিদ্ধ। এই আইন অনুসারে ভারত-সচিবের পরিষদের (India Council) সভ্যসংখ্যা হ্রাস করা হইল, আর ইংলণ্ডে ভারতীয় ছাত্রছাত্রীদের তত্ত্বাবধান ও ভারত গবর্ণমেণ্টের পক্ষে ইংলণ্ড হইতে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি খরিদ করা প্রভৃতি কাজের জন্য একজন 'হাই কমিশনার' (High Commissioner) নিযুক্ত করার ব্যবস্থা হইল। ভারতসচিবের বেতন এবং তাঁহার অফিসের যাবতীয় ব্যয়ভার বিলাতের গবর্ণমেণ্ট বহন করিবেন এবং এখন হইতে ভারতসচিবের প্রাধান্য অনেক হ্রাস পাইল। বড়লাটের শাসন-পরিষদে তিনজন দেশীয় সদস্য নিয়োগের ব্যবস্থাও হইল। সমগ্র বৃটিশ ভারতের জন্য আইন-প্রণয়নের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় আইন-সভা সৃষ্টি করা হইল,—এই আইন-সভার হইল দুইটি কক্ষ,—ব্যবস্থাপক সভা (Legislative Assembly), আর রাষ্ট্রীয় পরিষদ (Council of State)। ব্যবস্থাপক সভার মোট ১৪৪ জন সদস্যের মধ্যে ১০৩ জন জনসাধারণের ভোটে নির্ব্বাচিত এবং অবশিষ্ট কয়জন গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মনোনীত হইবেন এরূপ ব্যবস্থা হইল। রাষ্ট্রীয় পরিষদের ৬০ জন সদস্যের মধ্যে ৩৩ জন নির্ব্বাচিত এবং ২৭ জন মনোনীত। আয়ব্যয়-নির্দ্ধারণ, আইন-প্রণয়ন, প্রভৃতি উভয় কক্ষের সম্মতিক্রমে স্থির হইবে; কিন্তু প্রয়োজনবোধে

ভারত-শাসন আইন (১৯১৯)

মণ্টেগু-চেম্‌সফোর্ড সংস্কার

হাই কমিশনার

বড়লাটের শাসন-পরিষদ

কেন্দ্রীয় আইন-সভা

বড়লাট ব্যবস্থাপক সভার মত অগ্রাহ্য করিয়া নিজের দায়িত্বে 'অর্ডিনান্স' জারি করিতে পারিবেন, রাজস্ব-সংগ্রহ ও ব্যয় নিজের ইচ্ছায় করিতে পারিবেন। তাঁহাব শাসন-পরিষদের সদস্যরাও ব্যবস্থাপক সভার নিকট দায়ী হইবেন না।

দ্বৈত শাসন বা ডায়ার্কী

প্রাদেশিক ব্যাপারে যে অভিনব শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তন করা হইল তাহা 'ডায়ার্কী' (Dyarchy) নামে প্রসিদ্ধ। যে সকল বিষয়ের ভার প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলিকে দেওয়া হইল সেগুলি দুইভাগে বিভক্ত করা হইল,—এক ভাগের নাম হইল রক্ষিত (Reserved) বিষয়, অপর ভাগের নাম হস্তান্তরিত (Transferred). জেল, বিচার, পুলিশ, প্রভৃতি রহিল 'রক্ষিত' বিভাগে আর শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, প্রভৃতি হইল 'হস্তান্তরিত' বিষয়ের অঙ্গীভূত। রক্ষিত বিষয়গুলি রহিল গবর্ণরের শাসন-পরিষদের সদস্যদের অধীনে, আর হস্তান্তরিত বিষয়গুলি মন্ত্রীদের অধীনে। শাসন-পরিষদের সদস্যদের ব্যবস্থাপক সভার নিকট কোনই দায়িত্ব রহিল না, কিন্তু মন্ত্রীরা ব্যবস্থাপক সভার নিকট দায়ী রহিলেন; কারণ ব্যবস্থাপক সভার নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্য হইতেই গবর্ণর মন্ত্রী নিযুক্ত করিতেন। তদুপরি সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন স্বীকৃত হওয়ায় হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে মনোমালিন্য আরো বাড়িয়া চলিল। সংখ্যালঘু মুসলমানদের দাবী গ্রাহ্য হওয়ায় অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ও তাহাদের আবেদন পেশ করিতে লাগিল। জাতীয়তার ঐক্যের মূলে এই নব-শাসন-সংস্কার এইভাবে কুঠারাঘাত করিল।

দেশব্যাপী অসন্তোষ, রাওলাট আইন

জালিয়ান-ওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড

কিন্তু এই শাসন-সংস্কারে দেশের প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদীরা সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। ইতিমধ্যে বড়লাট 'রাওলাট আইন' নামে এক দমনাত্মক বিধি প্রবর্ত্তন করিলেন। অমৃতসরে জালিয়ান ওয়ালাবাগ নামক স্থানে এক শোভাযাত্রায় অগণিত নরনারী, বালকবালিকা সম্মিলিত হইয়াছিল। ডায়ার (Dyer) নামে এক বৃটিশ সেনানায়ক সেখানকার নিরস্ত্র জনতার উপর গুলিবর্ষণ করিয়া প্রলয়কাণ্ড বাধাইয়া দিল। অথচ ডায়ারের অত্যন্ত লঘু শাস্তি হইল, আর গবর্ণমেণ্টও দমন নীতি প্রত্যাহার করিতে চাহিলেন

না। এরূপ অবস্থায় দেশবাসীর পক্ষে গবর্ণমেণ্টের সহিত সহযোগীতা করা অসম্ভব হইয়া উঠিল। তখন দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে প্রত্যাগত (১৯১৪) মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে দেশময় 'অসহযোগ আন্দোলন' আরম্ভ হইল (১৯২০)। এদিকে ১৯২০ খৃঃ অব্দে মহাযুদ্ধের শেষে তুরস্কের সুলতানের প্রতি ইংরেজ ও মিত্রশক্তির অন্যায় ব্যবহারের ফলে ভারতবর্ষে সৌকৎআলি ও মুহম্মদ আলির নেতৃত্বে মুসলমানগণ অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে 'খিলাফৎ আন্দোলন' আরম্ভ করিলেন। গবর্ণমেণ্টের পক্ষে এক সঙ্কটকাল উপস্থিত হইল।

মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন, খিলাফৎ আন্দোলন

লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ডের আমলের আর একটি ঘটনা তৃতীয় আফগান যুদ্ধ। ১৯১৯ খৃঃ অব্দে আমীর আমানুল্লা বৃটিশ রাজ্য আক্রমণ করিলেন। কয়েকমাস যুদ্ধের পর সন্ধি হইল। আমানুল্লা তাঁহার আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক সকল ব্যাপারেই পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব পাইলেন, এবং নব্য তুর্কীর ন্যায় নব্য আফগান রাজ্য গড়িবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

তৃতীয় আফগান যুদ্ধ (১৯১৯)

লর্ড রেডিং (১৯২১—২৬)।—অসহযোগ ও খিলাফতের দুশ্চিন্তা লইয়া লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ড ১৯২১ খৃঃ অব্দে ভারত ত্যাগ করিলে, সেই বৎসরই লর্ড রেডিং বড়লাট হইয়া আসিলেন। অসহযোগ আন্দোলনে পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, লাজপৎ রায়, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, প্রভৃতি প্রধান প্রধান নেতারা সকলেই কারারুদ্ধ হইলেন। কিছুদিন পরে জনবিক্ষোভ সংযত রাখা কঠিন দেখিয়া ১৯২৩ খৃঃ অব্দে মহাত্মা গান্ধী আন্দোলন বন্ধ করিয়া দিলেন। দেশবন্ধু, মতিলাল প্রমুখ নেতারা কারাগার হইতে বাহির হইয়া 'স্বরাজদল' নাম দিয়া এক নূতন রাজনীতিক দল গড়িয়া তুলিলেন।

আন্দোলন

লর্ড রেডিং-এর আমলে লবণকর বৃদ্ধি, রাওলাট আইন প্রত্যাহার এবং ফৌজদারী দণ্ডবিধির সংশোধন হয়। তিনি একটি অতি ক্ষুদ্র ভারতীয় নৌ-বাহিনী স্থাপনের ব্যবস্থাও করেন।

লর্ড আরউইন (১৯২৬—৩১)।—১৯২৬ খৃঃ অব্দে লর্ড রেডিং-এর পর লর্ড আরউইন বড়লাট নিযুক্ত হন। এই সময়

১৯১৯ খৃঃ অব্দের শাসন-সংস্কারের ফলাফল বিচারের জন্ত স্তর জন সাইমনের নেতৃত্বে এক কমিশন প্রেরিত হয় (১৯২৭)। কোন ভারতবাসীকেই উহার সদস্য নিয়োগ করা হয় নাই। সেজন্ত সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে দেশময় প্রবল বিক্ষোভ প্রদর্শিত হয়; ১৯৩০ খৃঃ অব্দে কমিশন 'রিপোর্ট' দাখিল করিলেন। ভারতবর্ষের কোন রাজনীতিক দলই এই রিপোর্ট গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। সাইমন কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী কোনরূপ বিধিব্যবস্থা করা সম্ভব হয় নাই।

সাইমন কমিশন (১৯২৭)

নানা রাজনীতিক ঘটনা-পরম্পরায় ১৯৩০ সালে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে আবার দেশময় 'আইন-অমান্ত আন্দোলন' ছড়াইয়া পড়িল। আন্দোলন দমনের চিরাচরিত প্রথা অনুসারে নেতা ও কর্মীদের কারারুদ্ধ করা হইল। শেষে আবার মহাত্মাজী, জহরলাল নেহেরু প্রমুখ নেতাদের মুক্তি দিয়া বড়লাট গান্ধীজীর মধ্যস্থতায় কংগ্রেসের সহিত এক চুক্তি করিলেন। ইহাই গান্ধী-আরউইন চুক্তি' নামে প্রসিদ্ধ।

আইন-অমান্ত আন্দোলন (১৯৩০)

'গান্ধী-আরউইন' চুক্তি

এদিকে ১৯৩১ খৃঃ অব্দে ভারতবর্ষের নূতন শাসনতন্ত্র রচনার জন্ত ইংলণ্ডে এক 'গোলটেবিল বৈঠক' হয়। ইহাই 'প্রথম গোলটেবিল' বৈঠক। কংগ্রেস ইহাতে যোগদান না করায় ইহার দ্বারা বিশেষ কোন ফলই হইল না।

প্রথম গোল-টেবিল বৈঠক (১৯৩১)

লর্ড উইলিংডন (১৯৩১—৩৬)।—১৯৩১ খৃষ্টাব্দে লর্ড উইলিংডন বড়লাট হইয়া আসিলেন। 'গান্ধী-আরউইন চুক্তি' অনুযায়ী মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেসের সদস্ত হিসাবে '২য় গোলটেবিল বৈঠকে' যোগদান করিবার জন্ত ইংলণ্ডে গমন করেন। কিন্তু বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট কংগ্রেসের দাবী স্বীকার করিলেন না। ফলে আবার 'আইন-অমান্ত আন্দোলন' আরম্ভ হইল। উইলিংডন কঠোর হস্তে আন্দোলন দমন করিতে লাগিলেন। নেতাদের সকলকেই কারারুদ্ধ করা হইল।

২য় গোল-টেবিল বৈঠক

আন্দোলন

১৯৩৫ খৃঃ অব্দে পার্লামেণ্টে নূতন এক 'ভারত-শাসন আইন' (Government of India Act, 1935) বিধিবদ্ধ হয়। বৃটিশ শাসিত ও দেশীয় রাজ্যগুলিকে লইয়া ভারতে একটি যুক্তরাষ্ট্র

ভারত-শাসন আইন (১৯৩৫)

(Federation) সংগঠন এবং 'প্রাদেশিক আত্মকর্তৃত্ব' স্থাপন (Provincial Autonomy) এই আইনের মূল প্রস্তাব বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

রজত-জুবিলী (১৯৩৫)

১৯৩৫ খৃঃ অব্দের মে মাসে সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের রাজত্বকালের পঞ্চবিংশ বৎসর পূর্ণ হওয়ায় 'রজত-জুবিলী' অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৩৬ খৃঃ অব্দের জানুয়ারী মাসে সম্রাট দেহত্যাগ করিলে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র ৮ম এড্ওয়ার্ড সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু সেই বৎসরের শেষেই তিনিই স্বেচ্ছায় সিংহাসন ত্যাগ (abdicate) করিয়া সাধারণ জীবনযাপন সুরু করেন।

সম্রাটের মৃত্যু, ৮ম এডওয়ার্ড

লর্ড লিন্‌লিথগো (১৯৩৬—৪৩)।—১৯৩৬ খৃঃ অব্দে লর্ড লিন্‌লিথ্‌গো বড়লাট হইয়া আসিলেন। বড়লাট হইবার আগে তিনি **Royal Agricultural Commission of India**র সভাপতিরূপে এদেশে আসিয়া ভারতীয় কৃষি ও তৎসম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান অর্জ্জন করেন, অথচ ১৯৪২।৪৩ খৃঃ অব্দের দুর্ভিক্ষে বাঙ্গালার চাষীরা লাখে লাখে যখন মরিল তখন তিনি দিল্লীর গদী ছাড়িয়া একবার তাহা দেখিতেও আসেন নাই। তাঁহার সময়ে সিন্ধু ও উড়িষ্যা দুইটি নূতন প্রদেশ হিসাবে পুনর্গঠিত হয়।

সম্রাট ৬ষ্ঠ জর্জ্জ

সম্রাট ৮ম এড্ওয়ার্ড ১৯৩৬ খৃঃ অব্দের ডিসেম্বর মাসে সিংহাসন ত্যাগ করিলে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ৬ষ্ঠ জর্জ্জ নাম ধারণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন।

ব্রহ্মদেশ বিচ্ছিন্ন, প্রাদেশিক আত্মকর্তৃত্ব

নূতন শাসনবিধি অনুযায়ী ১৯৩৭ খৃঃ অব্দের ১লা এপ্রিল হইতে নূতন রাজনৈতিক বিধান সুরু হয় এবং ব্রহ্মদেশকে ভারতবর্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ভারতের ১১টি প্রদেশে 'প্রাদেশিক আত্ম-কর্ত্তৃত্ব' (Provincial Autonomy) প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে। কিন্তু ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের সহানুভূতির অভাবে এবং দেশীয় রাজনীতিক দলের বিরুদ্ধতায় আজও এদেশে 'যুক্তরাষ্ট্র' প্রবর্ত্তন করা সম্ভবপর হইয়া উঠে নাই। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে ইউরোপে পুনরায় মহাসমর আরম্ভ হওয়ায় বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট যুক্তরাষ্ট্র প্রবর্ত্তনের প্রস্তাব স্থগিত রাখিয়াছেন। দেশীয় নেতাগণ এই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সহযোগিতা করিতে সম্মত হন কিন্তু সেই সঙ্গে পূর্ণ

রাজনৈতিক অধিকারও দাবী করেন। সে দাবী অগ্রাহ্য হইলে (১৯৪০, নবেম্বর) মহাত্মা গান্ধী আবার সত্যাগ্রহ স্থরু করেন এবং ১৯৪২ খৃঃ অব্দের আগষ্টে দেশব্যাপী প্রজাবিক্ষোভের পর, নেতৃবৃন্দ সকলেই কারারুদ্ধ হন। এখনও অচল অবস্থার পরিবর্ত্তন হয় নাই, যদিও গান্ধী ও অন্যান্য নেতাদের মুক্তি দেওয়া হইয়াছে।

লর্ড ওয়েভ্‌ল।—১৯৪৩ খৃঃ অব্দের অক্টোবর মাসে ভূতপূর্ব্ব প্রধান সেনাপতি বর্ত্তমান যুদ্ধে উত্তর আফ্রিকার রণবীর লর্ড ওয়েভ্‌ল ভারতের শাসন-ভার গ্রহণ করেন ও ভারতে আসিয়াই বাঙ্গালা দেশের দারুণ দুর্ভিক্ষ নিবারণে সচেষ্ট হন। ১৯৪২ খৃঃ অব্দে মেদিনীপুরের বন্যায় লক্ষ লক্ষ নরনারী অসহায় হইয়া পড়ে অথচ যুদ্ধের জন্য ভারতবর্ষ হইতে চাউলের রপ্তানী বন্ধ করা সম্ভব হইল না। ফলে ১৯৪৩ খৃঃ অব্দে বাঙ্গালায় বিষম দুর্ভিক্ষ ও ভীষণ মহামারীর করালছায়া দেখা দিল। মার্সাল ও মাদাম চিয়াঙ কাইসেক্ ভারতবর্ষ পরিদর্শন (১৯৪২) করিয়া প্রথমে মেদিনীপুর 'আর্ত্ত-তারণ ফাণ্ডে' (Relief Fund) পঞ্চাশ হাজার টাকা এবং ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে প্রায় ৭ লক্ষ টাকা দান করেন। তাঁহারা আগে শান্তি-নিকেতনে আসিয়া (১৯৪২) বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিরক্ষার উদ্দেশ্যে ৫০০০০ টাকা উৎসর্গ করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের ৭ই আগষ্ট পরলোক গমন করেন।

১৯৪৪ খৃঃ অব্দের গোড়ায় জাপ অধিকৃত ব্রহ্মদেশ পুনরধিকার করিতে চেষ্টা স্থরু হয়। যুদ্ধবিশারদ লর্ড ওয়েভ্‌ল, লর্ড মনট্‌বাটেন্ ও অচিনলেক্ এর সহযোগীতায় পূর্ব্বসীমান্ত-যুদ্ধ পূর্ণ সাফল্য লাভ করে।

১৯৪৫ খৃঃ অব্দের মে মাসে জার্ম্মানী ও আগষ্টে জাপান সম্পূর্ণ পরাজিত হইয়া সন্ধি ভিক্ষা করে। কিন্তু যুদ্ধ থামিলেই শান্তি-আসে না। ভারতে ও এশিয়ার নানা স্থানে অশান্তির মেঘ ঘনাইয়া আসিতেছে। যুদ্ধোত্তর জগতে, ভারতের স্থান কি হইবে, এই গুরুতর সমস্যা সমাধানের জন্য একদিকে মহাত্মা গান্ধী, জহরলাল, প্রভৃতি নেতাগণ এবং অন্যদিকে বৃটিশ উদার-নৈতিক ও সমাজতান্ত্রিক (Socialist) দল গভীর ভাবে

চিন্তা করিতেছেন। রক্ষণশীল পুঁজিবাদীরা বিশ্বযুদ্ধ-বিজয়ী চার্চ্চিলের নেতৃত্বেও তাহাদের ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিল না। শ্রমিকদল (Labour Party) প্রধান মন্ত্রী এ্যাট্লীর নেতৃত্বে নূতন কর্ম্মপদ্ধতি সুরু করিয়াছেন। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে র‍্যামসে মেকডোনাল্ডের নেতৃত্বে প্রথম শ্রমিক মন্ত্রীত্বের প্রায় কুড়ি বছর পরে মেজর এ্যাট্লী বিশ্বের আর এক সঙ্কটময় যুগে কার্য্যারম্ভ করিলেন।

STUDIES AND QUESTIONS

1. Summarise the leading events of the administration of Lord Canning as Viceroy of India. (C. U. '32).

2. Describe the changes in the internal administration and foreign relations which took place during the viceroyalty of Lord Lyton. (C. U. '44).

3. Narrate the constitutional reforms associated with the administration of Lord Ripon. (C. U. '30, '35, '36, '39, '42).

4. Narrate the constitutional reforms associated with the administration of Lord Lansdowne. (C. U. '30).

5. State the leading events of the administration of Lord Curzon. (C. U. '33, '37, '38, '45).

6. What were the constitutional reforms during the time of Lord Minto II. (C. U. '38).

7. Describe the constitutional reforms during the time of Lord Chelmsford. (C. U. '30, '34, '39).

8. Give an account of the Viceroyalty of Lord Curzon. (C. U. '43).

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়

শাসন-পদ্ধতির বিবর্ত্তন

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী

১৬০০ খৃঃ অব্দের ৩১শে ডিসেম্বর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী (East India Company) নামে এক ইংরেজ বণিক-সম্প্রদায় রাণী এলিজাবেথের নিকট হইতে প্রাচ্য দেশে বাণিজ্য করিবার জন্য এক সনন্দ লাভ করেন। এই সনন্দ অনুসারে কোম্পানী তাঁহাদের অধীনস্থ কর্ম্মচারী নিয়োগ এবং ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের জন্য আইন-প্রণয়নের ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। বৃটিশ বাণিজ্য কিছু বিস্তৃত হইলে ১৬৬১ ও ১৬৭৬ খৃঃ অব্দের দুইটি সনন্দের বলে কোম্পানী রাজ্যবিস্তার, দুর্গ-নির্ম্মাণ, নিজ নামে মুদ্রা প্রচার, সৈন্যরক্ষা এবং স্বীয় অধিকারের অন্তর্গত ইউরোপীয় ও ভারতীয় প্রজাগণের শাসন ও বিচারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন। অতঃপর রাজ্য-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে, কোম্পানী সৈন্যদের শাসন ও শৃঙ্খলা রক্ষার এবং সৈন্যবৃদ্ধির অধিকার লাভ করেন।

কোম্পানীর ঊর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ

কোম্পানীর কার্য্য নিয়ন্ত্রণের জন্য ইংলণ্ডে 'হাউস্ অব্ প্রোপ্রাইটার্স' (House of Proprietors) বা অংশীদারগণের সভা এবং 'কোর্ট অব ডিরেক্টর্স' (Court of Directors) বা পরিচালক সভা নামে দুইটি সমিতি ছিল। ডিরেক্টর সভায় মোট ২৪ জন সভ্য ছিলেন এবং তাঁহারাই প্রকৃতপক্ষে কোম্পানীর যাবতীয় কার্য্য পরিচালনা করিতেন।

পলাশীর যুদ্ধ

কোম্পানী প্রথমে বাণিজ্য বিস্তারের দিকে মনোনিবেশ করিলেও ১৭৫৭ খৃঃ অব্দে পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভ করিবার ফলে বিশাল বাঙ্গালাদেশের শাসন কর্তৃত্ব প্রকৃতপক্ষে ইংরেজগণেরই হস্তগত হইল, এবং ১৭৬৫ খৃঃ অব্দে কোম্পানীর নিযুক্ত বাঙ্গালাদেশের গবর্ণর ক্লাইভ দিল্লীর সম্রাট্ শাহ আলমের নিকট হইতে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশের দেওয়ানী লাভ করিলেন। ইহার ফলে উপরি-উক্ত প্রদেশসমূহের রাজস্ব-সংক্রান্ত সকল ক্ষমতা কোম্পানীর হাতে আসিল। সৈন্যবিভাগ ও রাজ্যরক্ষার ভারও কোম্পানী ইতিপূর্ব্বেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং কেবলমাত্র শাসন ও বিচারাদির ভার

বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানী

দ্বৈত-শাসন

নবাবের হাতে রহিল। এই ব্যবস্থা 'দ্বৈত-শাসন' নামে প্রসিদ্ধ। নবাব নামে-মাত্র শাসনকর্ত্তা রহিলেন, আর ইংরেজ বাঙ্গালাদেশের সর্ব্বময় প্রভুত্ব লাভ করিল। দ্বৈত-শাসনের কু-ব্যবস্থার ফলে শাসনকার্য্যে নানা বিশৃঙ্খলা ঘটায় ওয়ারেন্ হেষ্টিংস তাহার প্রতিকারে জন্য কতকগুলি ব্যবস্থা (১৭৭২-৭৩) অবলম্বন করিয়াছিলেন।

এতদিন ভারতবর্ষে কোম্পানীর শাসনকার্য্যে বৃটিশ পার্লামেণ্ট হস্তক্ষেপ করেন নাই; ডিরেক্টর সভাই ভারতসংক্রান্ত সকল কার্য্যে স্বাধীনভাবে নির্ব্বাহ করিতেন। কিন্তু ভারতবর্ষে কোম্পানীর রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে শাসনকার্য্যে নানা বিশৃঙ্খলা ঘটিতেছে, এই সংবাদ পাইয়া পার্লামেণ্ট ভারতের শাসন-ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা আবশ্যক মনে করিলেন। ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী লর্ড নর্থ 'রেগুলেটিং অ্যাক্ট' (Regulating Act) নামে প্রথম 'ভারত-শাসন আইন' বিধিবদ্ধ করেন। এই আইন পাশ হইবার কাল হইতেই পার্লামেণ্ট সরাসরিভাবে ভারতের শাসনকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে লাগিলেন এবং বৃটিশ-শাসিত ভারতের প্রজাবৃন্দের শুভাশুভের দায়িত্ব ক্রমশঃ গ্রহণ করিলেন। এই আইন অনুসারে প্রায় দশ বৎসরকাল শাসনকার্য্য পরিচালিত হইল। কিন্তু রেগুলেটিং অ্যাক্টেও নানাবিধ ত্রুটি থাকায় ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে প্রধানমন্ত্রী পিট (Pitt the Younger) 'ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট' (India Act) নামে আর একটি 'ভারত-শাসন আইন' পাশ করিলেন। এই আইন অনুসারে 'বোর্ড অব্ কণ্ট্রোল' (Board of Control) নামে ইংলণ্ডের রাজা কর্ত্তৃক মনোনীত ছয়জন সভ্যবিশিষ্ট একটি পরিষদের উপর ভারত-শাসন ভার ন্যস্ত হইল। এই আইনের ফলে ভারত-শাসনের সকল ক্ষমতা প্রকৃতপক্ষে পার্লামেণ্টের কর্ত্তৃত্বাধীন হইয়া পড়িল; কোম্পানীর ডিরেক্টরদের আর কোন ক্ষমতা রহিল না। এই আইনে গবর্ণর-জেনারেলের ক্ষমতাও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। সিপাহী বিদ্রোহের সময় পর্য্যন্ত (১৮৫৮) বৃটিশ ভারতের শাসনকার্য্য মোটামুটি পিটের আইন অনুসারে পরিচালিত হইয়াছিল।

লর্ড নর্থের রেগুলেটিং অ্যাক্ট (১৭৭৩)

পিটের ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট (১৭৮৪)

এই সময়ে প্রতি ২০ বৎসর অন্তর পার্লামেণ্টের কাছে সনন্দ বদল করিয়া কোম্পানী আপনার বাণিজ্যাধিকার অব্যাহত রাখিতে-

ছিলেন। ঐ সকল সনন্দে ভারত-শাসন কার্য্যের কিছু কিছু পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। ১৮১৩ খৃঃ অব্দের সনন্দে ভারতবর্ষে কোম্পানীর অধিকার বৃটিশ সাম্রাজ্যের অধীন বলিয়া স্পষ্ট ঘোষিত হয়।

সনন্দ আইন (১৮৩৩)

১৮৩৩ খৃঃ অব্দের সনন্দ অনুসারে বাঙ্গালার গবর্ণর-জেনারেল সমগ্র ভারতের গবর্ণর-জেনারেল হইলেন। ইতিপূর্ব্বে গবর্ণর-জেনারেলের বোম্বাই ও মান্দ্রাজ প্রদেশের আভ্যন্তরীণ শাসনের জন্য কোন বিধি (Regulation) প্রণয়ন করিবার অধিকার ছিল না। কিন্তু এই আইনের ফলে সমগ্র বৃটিশ-শাসিত ভারতের শাসন-সংক্রান্ত বিষয়ের উপর তাঁহার কর্তৃত্ব স্থাপিত হইল এবং সপরিষদ গবর্ণর-জেনারেল সমগ্র বৃটিশ-ভারতের জন্য আইন-প্রণয়নের ক্ষমতা পাইলেন। গবর্ণর-জেনারেলের পরিষদে একজন আইন-সচিবও (Law Member) নিযুক্ত হইলেন।

১৮৫৩ খৃঃ অব্দের সনন্দ অনুসারে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য কোম্পানীর হস্তে বৃটিশ ভারতেব শাসনভার ন্যস্ত হইল। এই আইন অনুসারে ভারতে প্রথম ব্যবস্থাপক সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। গবর্ণর-জেনারেল, তাঁহার পরিষদের চারিজন সদস্য, প্রধান সেনাপতি, সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ও অপর পাঁচজন মনোনীত সভ্য,—মোট বারজন সদস্য লইয়া ব্যবস্থাপক সভা গঠিত হইল। বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার শাসনভার একজন লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণরের (Lieutenant Governor) হস্তে ন্যস্ত হইল।

সিপাহী বিদ্রোহ (১৮৫৭) এবং মহারাণী কর্ত্তৃক ভারত-শাসনের ভার গ্রহণ (১৮৫৮)

সিপাহী বিদ্রোহের পর ১৮৫৮ খৃঃ অব্দে পার্লামেণ্টের এক আইন অনুসারে ভারতে কোম্পানীর রাজত্বের সম্পূর্ণ অবসান হইল এবং মহারাণী ভিক্টোরিয়া স্বয়ং ভারত শাসনভার গ্রহণ করিলেন। 'ভারত-সচিব' (Secretary of State for India) নামে অভি-হিত এক বৃটিশ মন্ত্রীর হস্তে ভারত-শাসনভার অর্পিত হইল এবং তাঁহাকে শাসনকার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য 'ভারত-সভা' (India Council) নামে পনর জন সভ্য লইয়া গঠিত একটি পরিষদ স্থাপিত হইল। ভারতবর্ষের গবর্ণর-জেনারেল 'ভাইসরয়' (Viceroy) বা রাজ-প্রতিনিধি নামে পরিচিত হইলেন। অতঃপর ১৮৬১ খৃঃ অব্দে

Indian Councils Act, 1861)

'ইণ্ডিয়ান কাউন্সিলস্ অ্যাক্ট' (Indian Councils Act, 1861)

প্রবর্ত্তিত হইলে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রথম বে-সরকারী সভ্য লইবার ব্যবস্থা হইল। বে-সরকারী সভ্যগণ গবর্ণর-জেনারেল কর্ত্তৃক মনোনীত হইতেন। বাঙ্গালা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রদেশেও পৃথক তিনটি ব্যবস্থাপক সভা স্থাপিত হইল।

মহারাণী ভিক্টোরিয়া স্বহস্তে ভারত-শাসনভার (১৮৫৮) গ্রহণ করিবার পর পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার প্রভাবে ভারতবর্ষ নানাদিকে এবং নানাভাবে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে লাগিল এবং ভারতের শিক্ষিত জনসাধারণের মনে রাষ্ট্রীয় অধিকারের আকাঙ্ক্ষা ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিল। লর্ড ডাফ্‌রিণের শাসনকালে ১৮৮৫ খৃঃ অব্দে বোম্বাই সহরে ভারতীয় জাতীয় মহাসভা'র (Indian National Congress) প্রথম অধিবেশন হয় এবং এই অধিবেশনে ভারতবাসী সুস্পষ্টভাবে তাঁহাদের রাষ্ট্রীয় অধিকার দাবী করিলেন। প্রথম সভাপতি উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁহার সহকর্ম্মী দাদাভাই নৌরোজী প্রমুখ নেতাদের আন্দোলনের ফলে ১৮৯২ খৃঃ অব্দের 'ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল্‌স্ অ্যাক্ট' (Indian Councils Act, 1892) নামক নূতন 'ভারত-শাসন আইন' বিধিবদ্ধ হইল। ইহা দ্বারা ব্যবস্থাপক সভাসমূহে বে-সরকারী সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধি করা হয় এবং সভ্যগণ শাসন ও আয়ব্যয় সংক্রান্ত প্রশ্ন করিবার অধিকার লাভ করেন।

কংগ্রেস স্থাপন (১৮৮৫)

Indian Councils Act, (1892)

বিংশ শতকের প্রথমভাগে জাতীয় আন্দোলন প্রবল আকার ধারণ করিল এবং দেশের নানা স্থানে তীব্র অসন্তোষ আত্মপ্রকাশ করিল। জনসাধারণের মন হইতে এই অসন্তোষ দূর করিয়া দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য ১৯০৯ খৃঃ অব্দে ভারত-সচিব লর্ড মর্লে ও বড়লাট লর্ড মিণ্টো পরামর্শ করিয়া 'মর্লে-মিণ্টো শাসন-সংস্কার' (Morley-Minto Reforms) প্রবর্ত্তন করিলেন। এই ব্যবস্থা অনুসারে ভারতীয় ও প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাগুলিতে বে-সরকারী সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধি করা হইল এবং বে-সরকারী সভ্যদের মধ্যে কয়েকজন দেশবাসী কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইবেন, ইহাও স্থির হইল। সভ্যদের ক্ষমতাও কতক পরিমাণে বৃদ্ধি করা হইল; বড়লাট ও প্রাদেশিক গবর্ণরদিগের পরিষদে

জাতীয় আন্দোলন

মর্লে-মিণ্টো সংস্কার (১৯০৯)

এবং ভারত-সচিবের পরিষদেও ভারতীয় সভ্যগণ নিয়োগের ব্যবস্থা করা হইল।

মর্লে-মিণ্টো সংস্কারে জাতীয়তাবাদী ভারতবাসীগণ সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। কারণ ইহা দ্বারা ভারতে প্রকৃতপক্ষে কোন দায়িত্ব-মূলক শাসন-ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করা হয় নাই। সুতরাং জাতীয় আন্দোলন প্রশমিত না হইয়া উত্তরোত্তর বাড়িয়া যাইতে লাগিল। ইতিমধ্যে ইউরোপের মহাসমর (১৯১৪—১৮) বাধিল। এই যুদ্ধে ভারতবর্ষ সর্ব্বপ্রকারে ইংলণ্ডকে সাহায্য করায় ইংরেজ কর্ত্তৃপক্ষ ভারতবাসীকে দায়িত্ব-মূলক স্বায়ত্ব-শাসন দিবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। এই উদ্দেশ্যে ভারত-সচিব মিঃ মণ্টেগু ১৯১৭ খৃঃ অব্দে ভারতে আসিয়া তদানীন্তন বড়লাট লর্ড চেমস্‌ফোর্ডের সহিত পরামর্শ করিয়া 'মণ্টেগু চেমস্‌ফোর্ড রিপোর্ট দাখিল করেন। এই রিপোর্ট অবলম্বন করিয়া ১৯১৯ খৃঃ অব্দের 'ভারত-শাসন আইন' (Government of India Act, 1919) বিধিবদ্ধ হইল। এই শাসনবিধি অনুসারে শাসনতন্ত্রে যে পরিবর্ত্তন সাধিত হয় তাহাই 'মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড সংস্কার' নামে প্রসিদ্ধ।

ইউরোপীয় মহাসমর (১৯১৪-১৮)

মণ্টেগু-চেমস্‌-ফোর্ড শাসন সংস্কার (১৯১৯)

'মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড সংস্কার' ভারতের জনসাধারণের দাবী মিটাইতে পারিল না। দেশব্যাপী তুমুল আন্দোলন আরম্ভ হইলে গবর্ণমেণ্ট তাহা দমন করিবার জন্য কঠোর নীতি অবলম্বন করিলেন। কয়েক বৎসরব্যাপী আন্দোলন, গোলযোগ, Simon কমিশন ও অন্য পরামর্শের পর ইংরেজ কর্ত্তৃপক্ষ ১৯৩৫ খৃঃ অব্দে পুনরায় একটি নূতন 'ভারত-শাসন আইন' (Government of India Act, 1935 বিধিবদ্ধ করিলেন। ১৯৩৭ খৃঃ অব্দের ১লা এপ্রিল হইতে ভারতের প্রদেশসমূহ নূতন 'ভারত-শাসন আইন' অনুসারে শাসিত হইতেছে। কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের শাসন-কার্য্যে ১৯৩৫ খৃঃ অব্দের আইন-অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্র প্রবর্ত্তন এখনও সম্ভবপর হয় নাই। কারণ ১৯৩৯ খৃঃ অব্দে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সুরু হয়।

জাতীয় আন্দোলন

'ভারত-শাসন আইন' (১৯৩৫)

'ভারত-শাসন আইন, ১৯৩৫'।—ইংলণ্ডের রাজা ভারত-সম্রাটের নামে ভারতবর্ষের শাসনকার্য্য পরিচালিত হয়। তিনি ভারত-সচিবের (Secretary of State for India) পরামর্শ

সম্রাট ও পার্লামেণ্ট

অনুসারে ভারতবর্ষের শাসনকার্য্য সম্পাদন করেন। ভারত-সচিব ইংলণ্ডের মন্ত্রিসভার (Cabinet) অন্যতম সদস্য।

ভারত-সচিব

ভারত-সচিব ভারতবর্ষের শাসন-সংক্রান্ত বিষয়ের উপর কর্ত্তৃত্ব করেন। বড়লাটকে এবং প্রাদেশিক গবর্ণরদিগকে অনেক বিষয়ে তাঁহার আদেশ অনুসারে চলিতে হয়। শাসনকার্য্যে তাঁহাকে সহায়তা করিবার জন্য কয়েকজন পরামর্শদাতা (Advisors) আছেন। ইঁহাদের সংখ্যা অন্যূন তিনজন এবং ছয়জনের অনধিক হইবে। বৃটিশ ভারত-সচিব ভারতবর্ষের শাসন-বিষয়ে পার্লামেণ্টের নিকট দায়ী থাকিবেন।

ভারত-সচিবের পরামর্শদাতৃগণ

নূতন আইন অনুযায়ী বৃটিশ ভারতীয় প্রদেশসমূহ এবং দেশীয় রাজ্যগুলি লইয়া একটি 'যুক্তরাষ্ট্র' (Federation) ভবিষ্যতে গঠিত হইবে, স্থির হইয়াছে। 'যুক্তরাষ্ট্রে' যোগ দেওয়া বা না দেওয়া দেশীয় রাজাদের ইচ্ছাধীন এবং নির্দ্দিষ্ট বিষয়গুলি ছাড়া অন্য ব্যাপারেও যোগদানকারী রাজার বিশেষ অধিকার থাকিবে। গবর্ণর-জেনারেল রাজপ্রতিনিধি হিসাবে যুক্তরাষ্ট্র-সঙ্ঘের প্রধান পরিচালক হইবেন। শাসন সংক্রান্ত বিষয়গুলি দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র নীতি, খৃষ্টীয় ধর্ম্ম সংক্রান্ত বিষয়, প্রভৃতি গবর্ণর-জেনারেল স্বয়ং পরিচালনা করিবেন। এই কার্য্যের সুবিধার জন্য তিনি তিনজনের অনধিক উপদেষ্টা (Counsellors) নিযুক্ত করিতে পারিবেন। অবশিষ্ট বিষয়গুলির পরিচালনে তাঁহাকে সাহায্য করিবার ও উপদেশ দিবার জন্য একটি মন্ত্রি-সভা (Council of Ministers) থাকিবে। মন্ত্রিগণের সংখ্যা দশজনের অনধিক হইবে এবং ইঁহারা আইন-সভার সদস্যদিগের মধ্য হইতে গবর্ণর-জেনারেল কর্ত্তৃক মনোনীত হইবেন। মন্ত্রীগণ তাঁহাদের কার্য্যের জন্য আইন-সভার নিকট দায়ী থাকিবেন এবং আইন-সভা তাঁহাদের কার্য্য অনুমোদন না করিলে পদত্যাগ করিতে বাধ্য থাকিবেন।

যুক্তরাষ্ট্র

শাসন-বিভাগ

নূতন 'ভারত-শাসন আইন' অনুসারে কয়েকটি বিষয় গবর্ণর-জেনারেলের বিশেষ দায়িত্ব বলিয়া (Special Responsibilities) স্থির করা হইয়াছে। বিশেষ দায়িত্বমূলক বিষয়গুলির ব্যবস্থার সম্পূর্ণ ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত হইয়াছে। দেশের শান্তি, শৃঙ্খলা ও

গবর্ণর-জেনারেলের বিশেষ দায়িত্ব

নিরাপত্তা রক্ষার জন্য তিনি যে-কোনও বিভাগের উপর হস্তক্ষেপ করিতে পারেন। এজন্য আইনে তাঁহাকে কতকগুলি বিশেষ ক্ষমতাও (Safeguards) দেওয়া হইয়াছে।

'রাষ্ট্র-পরিষদ ও ব্যবস্থাপক সভা'

যুক্তরাষ্ট্রের আইন-সভা (Legislature) দুইটি পরিষদ লইয়া গঠিত হইবে। একটির নাম হইবে রাষ্ট্রপরিষদ (Council of State) এবং অপরটিকে বলা হইবে ব্যবস্থাপক সভা বা ফেডারেল্ এসেম্‌ব্লি (Federal Assembly). উভয় পরিষদেই বৃটিশ-ভারত ও দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধি থাকিবেন। রাষ্ট্রপরিষদে মোট ২৬০ জন সভ্য থাকিবেন। ইঁহাদের মধ্যে ১৫০ জন বৃটিশ-ভারতের এবং ১০০ জন দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধি থাকিবেন। বাকি ১০ জন গবর্ণর-জেনারেল কর্ত্তৃক মনোনীত হইবেন। ব্যবস্থাপক সভা মোট ৩৭৫ জন সভ্য লইয়া গঠিত হইবে। ইঁহাদের মধ্যে ২৫০ জন বৃটিশ-ভারতের এবং ১২৫ জন দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধি থাকিবেন। বৃটিশ-ভারতের প্রতিনিধিগণ পরোক্ষভাবে নির্ব্বাচিত হইবেন; দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিগণ নিজ নিজ শাসকগণ কর্ত্তৃক মনোনীত হইবেন অথবা ইঁহারা নির্ব্বাচিতও হইতে পারেন। রাষ্ট্রপরিষদ স্থায়ীভাবে গঠিত হইবে; তিন বৎসর অন্তর এক-তৃতীয়াংশ সভ্য অবসর গ্রহণ করিবেন এবং তাঁহাদের স্থানে নূতন সভ্য আসিবেন। ব্যবস্থাপক সভা পাচ বৎসরের জন্য গঠিত হইবে; আইন-সভা গবর্ণর-জেনারেলের অনুমোদনক্রমে আইন প্রণয়ন ও শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন।

যুক্তরাষ্ট্র এখনও কার্য্যকরী না হওয়ায় ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের 'ভারত-শাসন আইন' অনুযায়ী ভারত গবর্ণমেণ্ট বর্ত্তমানে পরিচালিত হইতেছে। শুধু নূতন আইন অনুসারে দিল্লীতে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত (Federal Court) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

প্রাদেশিক শাসনতন্ত্র

নূতন 'ভারত-শাসন আইন' অনুসারে ভারতবর্ষ মোট ১১টি প্রদেশে বিভক্ত হইয়াছে (বাঙ্গালা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, সিন্ধু, পঞ্জাব, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম, যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, ও উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশ) এবং প্রত্যেক প্রদেশে 'প্রাদেশিক আত্মকর্ত্তৃত্ব'

(Provincial Autonomy) প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ব্রহ্মদেশ ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। এই এগারটি প্রদেশ ব্যতীত ভারতে কয়েকটি চীফ-কমিশনার-শাসিত প্রদেশ আছে। চীফ-কমিশনারগণ গবর্ণর-জেনারেলের কর্ত্তৃত্বাধীন থাকিয়া ব্যক্তিগত দায়িত্বে নিজ নিজ প্রদেশ শাসন করেন।

ভারতবর্ষের প্রদেশগুলি এক-একজন গবর্ণরের শাসনাধীন। গবর্ণরগণ সম্রাট কর্ত্তৃক নিযুক্ত হন। শাসনকার্য্যে তাঁহাদের সাহায্য করিবার এবং পরামর্শ দিবার জন্য প্রত্যেক প্রদেশে একটি মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছে। মন্ত্রিগণ আইন-সভার নির্ব্বাচিত সভ্যদিগের মধ্য হইতে গবর্ণর কর্ত্তৃক মনোনীত হন। মন্ত্রীসভা তাঁহাদের কার্য্যের জন্য আইন-সভার নিকট দায়ী। সাধারণতঃ গবর্ণরগণ মন্ত্রীসভার পরামর্শানুসারে শাসনকার্য্য পরিচালনা করেন। কিন্তু গুরুতর প্রয়োজন হইলে তাঁহারা মন্ত্রিসভার পরামর্শ অগ্রাহ্য করিতে পারেন। আইন-সভা মন্ত্রিগণের নীতি বা কার্য্য অনুমোদন না করিলে তাঁহারা পদত্যাগ করিতে বাধ্য থাকিবেন। প্রাদেশিক মন্ত্রীদের সংখ্যা আইনে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয় নাই।

গবর্ণর ও মন্ত্রীদের দায়িত্ব ও ক্ষমতা

'ভারত-শাসন আইনে' প্রদেশসমূহেও কয়েকটি বিষয় গবর্ণরদের বিশেষ দায়িত্ব বলিয়া ধার্য্য করা হইয়াছে। প্রদেশের শান্তি, শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য গবর্ণর বিশেষ ক্ষমতাবলে শাসনসংক্রান্ত গুরুতর ব্যাপারে সহসা হস্তক্ষেপ করিতে পারেন। আইনসভার মত না লইয়াও গবর্ণরগণ প্রয়োজন মত 'বিশেষ আইন' (Ordinance) পাশ করিতে পারেন। আবশ্যক হইলে নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য তাঁহারা 'জরুরী আইন'ও (Guidance) পাশ করিতে পারেন।

'বিশেষ আইন' 'জরুরী আইন' ইত্যাদি

প্রত্যেক প্রদেশে আইন প্রণয়ন ও শাসন-কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার জন্য আইন-সভা স্থাপিত হইয়াছে। মাদ্রাজ, বোম্বাই, বাঙ্গালা, বিহার, যুক্তপ্রদেশ ও আসাম, এই ছয়টি প্রদেশে আইন-সভার দুইটি কক্ষ (Chamber) আছে। একটির নাম ব্যবস্থা-পরিষদ (Legislative Council) এবং অপরটি আইন-সভা (Legislative Assembly) নামে পরিচিত। বাকি প্রদেশ-

গুলিতে একটি করিয়া আইন-সভা (Legislative Assembly) আছে। গবর্ণরের অনুমোদন অনুসারে আইন-সভা আইন প্রণয়ন ও শাসনকার্য্য সম্পাদন করেন। প্রাদেশিক আইন-সভার সভ্যগণ সকলেই নির্ব্বাচিত হন।

বাঙ্গালার শাসন-ব্যবস্থা

নূতন আইন অনুসারে বাঙ্গালা দেশের আইন-সভা (Legislature) দুইটি কক্ষে বিভক্ত—ব্যবস্থা-পরিষদ (Legislative Council) ও আইন-সভা (Legislative Assembly). ব্যবস্থা-পরিষদের সভ্যসংখ্যা অন্যূন ৬৩ এবং অনধিক ৬৫। সভ্যদিগের মধ্যে অন্যূন ৬ এবং অনধিক ৮ জন গবর্ণর কর্ত্তৃক মনোনীত হন। বাকি সকলেই নির্ব্বাচিত হন। ইঁহাদের মধ্যে ১০ জন অ-মুসলমান, ১৭ জন মুসলমান, ৩ জন ইউরোপীয় জনসাধারণ এবং ২৭ জন ব্যবস্থাপক সভা হইতে নির্ব্বাচিত হন। প্রতি তিন বৎসর অন্তর এক-তৃতীয়াংশ সভ্য অবসর গ্রহণ করেন এবং তাঁহাদের স্থানে নূতন সভ্য নির্ব্বাচিত হন।

ব্যবস্থাপক সভার মোট সভ্যসংখ্যা ২৫০ জন। ইঁহারা সকলেই বিভিন্ন নির্ব্বাচকমণ্ডলী কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হন। ইঁহাদের মধ্যে অ-মুসলমান ৭৮ (অনুন্নত সম্প্রদায় হইতে ৩০), মুসলমান ১১৭, ইউরোপীয় ১১, অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ৩, ভারতীয় খৃষ্টান ২, বিভিন্ন বণিক-সমিতির প্রতিনিধি ১০, জমিদার ৫, বিশ্ববিদ্যালয় ২, শ্রমিক ৮, এবং নারী প্রতিনিধি ১ জন। অন্যান্য প্রদেশের শাসন-ব্যবস্থাও অনেকাংশে বাঙ্গালা দেশের অনুরূপ।

ইংরেজ শাসনে ভারতের উন্নতি।—ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশে এক নূতন যুগের সূচনা হইয়াছে। ইংরেজ শাসকগণ এই বিশাল দেশের শাসনভার গ্রহণ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই; তাঁহারা নানাভাবে, দেশের সাধারণ উন্নতি-সাধনের জন্য বহুবিধ উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। দেশের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি, প্রভৃতি প্রত্যেকটি বিষয়েই আধুনিক পদ্ধতি প্রয়োগে উন্নতির চেষ্টা হইতেছে।

নবযুগ

শিক্ষার উন্নতি।—এদেশের শাসনভার গ্রহণ করিবার সঙ্গে

সঙ্গে দেশবাসীর শিক্ষার উৎকর্ষ সাধনের প্রতি ইংরেজ কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। ইংরেজ আমলে প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য, এই দুই সভ্যতার সংমিশ্রণে দেশে শিক্ষার বিকাশ হইতেছে এবং জাতি-ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষ সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষা বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে ওয়ারেন্ হেষ্টিংসের শাসনকালে (১৭৮৪) সুপ্রীমকোর্টের বিচারপতি মনীষী স্যর উইলিয়ম জোন্স ভারতের প্রাচীন সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান, প্রভৃতি আলোচনার জন্য 'এশিয়াটিক সোসাইটি' কলিকাতায় স্থাপিত করেন। এই সময় আরবী ও ফারসী ভাষা শিক্ষার জন্য 'কলিকাতা মাদ্রাসা'ও স্থাপিত হয় এবং সংস্কৃত চর্চ্চার জন্য কাশীতে সংস্কৃত কলেজ গঠিত হয়। ১৮১৩ খৃঃ অব্দে প্রাচ্য ভাষাসমূহ শিক্ষাদান-কল্পে গভর্ণমেণ্ট বার্ষিক (১৮১৩) এক লক্ষ টাকা ব্যয়ের ব্যবস্থা করেন। 'সমাচার-দর্পণ' নামক বাঙ্গালা সংবাদপত্র ১৮১৮ খৃঃ অব্দে শ্রীরামপুরের মিশনারীগণ (১৮১৮) কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয় এবং ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বেই 'হিন্দু কলেজ' স্থাপিত হওয়ায় দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রচলনও আরম্ভ হয়। লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের শাসনকালে ডেভিড্ হেয়ার, রাজা রামমোহন ও মেকলে প্রভৃতি শিক্ষাব্রতীগণের প্রচেষ্টায় এদেশ-বাসীকে পাশ্চাত্য ভাষা, সাহিত্য ও বিজ্ঞান প্রভৃতি শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়। পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিধান শিক্ষাদানের জন্য কলিকাতায় 'মেডিকেল কলেজ' (১৮৩৫) প্রতিষ্ঠিত হইল। দেশের (১৮৩৫) নানা স্থানে ইংরাজী বিদ্যালয় ও বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ায় শিক্ষার প্রসার ক্রমে বাড়িতে লাগিল। ১৮৫৪ খৃঃ অব্দে বোর্ড (১৮৫৪) অব কণ্ট্রোলের সভাপতি স্যর চার্লস উডের শিক্ষা-বিষয়ক নির্দ্দেশ-পত্রের (Education Despatch) নীতি অনুসারে লর্ড ডাল-হৌসী শিক্ষাবিভাগের সংস্কার সাধন করেন এবং শিক্ষার জন্য সরকারী সাহায্যদানের ব্যবস্থা করেন। ১৮৫৭ খৃঃ অব্দে কলিকাতা, (১৮৫৭) বোম্বাই ও মান্দ্রাজে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ১৮৮৪ খৃঃ অব্দে লর্ড (১৮৮৪) রিপন প্রাথমিক শিক্ষা এবং অনুন্নত সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষার প্রসারের জন্য হাণ্টার কমিশন নিযুক্ত করেন। এই সকল ব্যবস্থার ফলে শিক্ষার দ্রুত প্রসার আরম্ভ হয়। লর্ড কার্জ্জন এক নূতন আইন দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সংস্কার করেন। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে ভারতের (১৯০১)

প্রাচীন কীর্ত্তিসমূহ আবিষ্কার ও রক্ষাকল্পে 'প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগ' প্রতিষ্ঠাও তাঁহার শাসনকালেব সুমহান গৌরব। ইহার ফলে ঐতিহাসিক গবেষণার পথ সুগম হইয়াছে। এই সময়ে আবার 'ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী' নামক বিরাট পুস্তকাগার স্থাপিত হয়। ১৯১৭ খৃঃ অব্দে লর্ড চেম্‌সফোর্ডের শাসনকালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কারের জন্য স্যাড্‌লাব কমিশন নিযুক্ত হয়। ইহার প্রদত্ত রিপোর্ট অনুসারে ভারতের কয়েকটি প্রদেশে বহু প্রয়োজনীয় শিক্ষা-সংস্কার সাধিত হইয়াছে। ১৯১৯ খৃঃ অব্দের মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড সংস্কাবের ফলে শিক্ষা-বিভাগের ভার দেশীয় মন্ত্রীর হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে। ১৯৩৫ খৃঃ অব্দের নূতন 'ভারত-শাসন আইন' অনুসারেও শিক্ষা-বিভাগের ভার দেশীয় মন্ত্রীর হস্তেই অর্পিত হইয়াছে এবং ইহার ফলে জাতীয় শিক্ষার প্রসার-লাভ ঘটিতেছে। কয়েকটি প্রদেশে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে।

(১৯১৭)

(১৯১৯)

(১৯৩৫)

বর্ত্তমান শিক্ষানীতি, শিক্ষামন্ত্রী ও ডিরেক্টর

শিক্ষা-বিভাগের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণের জন্য প্রাদেশিক শিক্ষা-মন্ত্রীর অধীনে 'ডিরেক্টব অব পাব্লিক ইন্‌স্‌ট্রাক্‌শন' (Director of Public Instruction) নামে একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী আছেন। তিনি তাঁহার বিভাগীয় কর্ম্মচারীগণের সাহায্যে মাধ্যমিক শিক্ষা-বিভাগের কার্য্য পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণ করেন।

প্রাইমারী শিক্ষা

শিক্ষাকে জ্ঞানের তারতম্য অনুসারে কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। পাঠশালা ও প্রাইমারী বিদ্যালয়সমূহে মাতৃভাষা, অঙ্ক, ভূগোল, ইতিহাস, প্রভৃতি সাধারণভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়। ইহাই প্রাথমিক শিক্ষা। তারপর মধ্য-বাঙ্গালা, মধ্য-ইংরাজী ও উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয়ে মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করা হয়, এবং প্রবেশিকা শ্রেণীতে উঠিয়া এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া শিক্ষার্থীগণ বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারে উপনীত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত কলেজসমূহে উচ্চশিক্ষা দান করা হয়। কলেজ ও অন্যান্য বিদ্যালয়গুলিতে সরকারী সাহায্যদানের ব্যবস্থা আছে। সংস্কৃত, আরবী, ফারসী, প্রভৃতি প্রাচ্যবিদ্যা শিক্ষার জন্য দেশের নানাস্থানে টোল, মক্তব ও মাদ্রাসা স্থাপিত হইয়াছে। চিকিৎসা-বিদ্যা, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও আইন প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় শিক্ষার জন্যও বিশেষ বিশেষ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং বহু ছাত্র-ছাত্রী এই সকল

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা

টোল, মাদ্রাসা, শিল্প-বাণিজ্যাদি বিষয়ক শিক্ষা

বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া নূতন নূতন জ্ঞান লাভ করিতেছে। চারুশিল্প ও চিত্রবিদ্যা শিক্ষার ব্যবস্থাও করা হইয়াছে। এই সকল বিদ্যালয়ের মধ্যে কতকগুলি সরকারী ও কতকগুলি বে-সরকারী। ইহা ব্যতীত সামরিক শিক্ষার জন্য দেরাদুনে একটি সামরিক বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে এবং নৌ-যুদ্ধ শিক্ষারও আয়োজন চলিতেছে। উপযুক্ত শিক্ষক না থাকিলে শিক্ষাদান কার্য্যে বহু ত্রুটি থাকে, সে জন্য বহু ট্রেনিং কলেজ ও নর্ম্মাল স্কুল স্থানে স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

স্ত্রী-শিক্ষা

স্ত্রী-শিক্ষার বিস্তারের প্রয়োজনীয়তাও গভর্ণমেণ্ট ক্রমশঃ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এ কারণে মেয়েদের জন্য কয়েকটি কলেজ ও স্কুল স্থাপিত হইয়াছে। প্রায় ১০০ বৎসর পূর্ব্বে নারীশিক্ষাব্রতী মহাত্মা Bethune সাহেবের নামে কলেজটি কলিকাতায় স্থাপিত হয়। নারীদের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় ২৫ বৎসর আগে পুনাসহরে প্রতিষ্ঠিত হয়।

গবেষণাদি

নানা বিষয়ে জ্ঞানেব প্রসারকল্পে এবং গবেষণার সুবিধার জন্য প্রাদেশিক লাইব্রেরী, মিউজিয়ম ও পশুশালা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলি সম্পূর্ণ বা আংশিক ভাবে সরকারী ব্যয়ে পরিচালিত হয়। ইহা ব্যতীত মেধাবী শিক্ষার্থীগণকে উৎসাহ দিবার জন্য এবং বিলাতে পাঠাইয়া বিশেষজ্ঞ করার জন্য সরকারী বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

ভারতবর্ষে বর্ত্তমানে মোট ১৮টি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। তাহাতে নিয়মিত পরীক্ষার পর বিদ্যার্থীকে ডিগ্রী দেওয়া হয়। সম্প্রতি উড়িষ্যা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে এবং আসামের জন্যও চেষ্টা চলিতেছে। তাহা ছাড়া রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতন ও স্বামী শ্রদ্ধানন্দস্থাপিত গুরুকুলও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পর্য্যায়ে পড়ে।

স্বাস্থ্য-বিভাগ

স্বাস্থ্য-রক্ষা।—দেশবাসীর স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট নানাবিধ ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। পাব্লিক হেল্‌থ ডিপার্টমেণ্ট বা জনস্বাস্থ্য-বিভাগের ভার বর্ত্তমানে প্রত্যেক প্রদেশে একজন মন্ত্রীর হস্তে অর্পণ করা হইয়াছে। ম্যালেরিয়া, টাইফয়েড, যক্ষ্মা, কলেরা, বসন্ত, প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধির নিবারণ কল্পে নানা উপায়

অবলম্বন করা হইয়াছে এবং এজন্য প্রতি বৎসর বহু অর্থব্যয় করা হয়। রোগ-চিকিৎসা ও মহামারী নিবারণের জন্য বহু চিকিৎসালয় ও হাসপাতাল প্রভৃতি দেশের নানাস্থানে স্থাপিত হইয়াছে এবং হইতেছে। প্রধানতঃ জেলাবোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটি, প্রভৃতি জাতীয় স্বায়ত্তশাসন-মূলক প্রতিষ্ঠানগুলির তত্ত্বাবধানেই স্বাস্থ্য-রক্ষার কার্য্য সম্পাদিত হয়। এই সকল প্রতিষ্ঠান গবর্ণমেণ্ট হইতে আবশ্যক মত কিছু অর্থ সাহায্য পায়। ইহা ব্যতীত সরকারী স্বাস্থ্য-পরিদর্শকগণ জেলাবোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটির কার্য্যের তত্ত্বাবধান করেন। গবর্ণমেণ্ট-প্রতিষ্ঠিত গবেষণাগারে রোগের কারণানুসন্ধান ও তাহাব প্রতিকারের প্রচেষ্টা চলিতেছে। খাদ্যপরীক্ষাগার-সমূহে পুষ্টিকর খাদ্যদ্রব্য পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে। ইহা ব্যতীত দেশের নানাস্থানে কুষ্ঠাশ্রম, উন্মাদাগাব ও পশু-চিকিৎসালয় আছে। পশু-দের রোগ নিবারণ ও উন্নতির জন্য বিশেষ গবেষণার ব্যবস্থা হইতেছে।

জেলাবোর্ড, মিউনিসি-প্যালিটি, প্রভৃতির কার্য্য

অর্থনৈতিক উন্নতির ব্যবস্থা।—ভারতের অধিকাংশ লোক কৃষিজীবী। সুতরাং দেশের দারিদ্র্য দূর করিবার প্রধান উপায় কৃষির উন্নতিসাধন। এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। লর্ড লিন্‌লিথ্‌গো Royal Agricultural Commission-এর সভাপতি হিসাবে অনেক উন্নতির চেষ্টা কবিয়াছেন। কৃষি সম্বন্ধে গবেষণার জন্য দিল্লীতে একটি সমিতি (Imperial Council of Agricultural Research) স্থাপিত হইয়াছে। আধুনিক উন্নত প্রণালীতে কৃষি-বিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য কৃষি-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রত্যেক প্রদেশে একটি করিয়া কৃষিবিভাগও গঠিত হইয়াছে এবং এই বিভাগের ভার একজন মন্ত্রীর হস্তে অর্পণ করা হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টের সেচ-বিভাগ (Irrigation Dept.) হইতে কূপ প্রভৃতি খনন ও খালকাটার আয়োজন করিয়া কৃষিক্ষেত্রে জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কৃষকদিগের মধ্যে উৎকৃষ্ট বীজ সরবরাহ করিয়া, কৃষি-ব্যাঙ্ক ও সমবায়-সমিতি স্থাপিত করিয়া, এবং অন্য নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিয়া কৃষির ও দরিদ্র কৃষকদিগের অবস্থার উন্নতির চেষ্টা করা হইতেছে।

কৃষি-সমিতি

শিল্প-বিদ্যালয়

দেশের শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি সাধনেও গবর্ণমেণ্ট সচেষ্ট; জনসাধারণের শিল্প-শিক্ষা সুবিধার জন্য শিল্প-বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। শিল্প-প্রদর্শনী প্রভৃতি দ্বারা শিল্প-প্রসারের এবং শিল্পিগণের উৎসাহবর্দ্ধনের ব্যবস্থাও করা হইয়াছে। প্রত্যেক প্রদেশে একটি করিয়া শিল্প ও বাণিজ্য-বিভাগ (Industry and Commerce) স্থাপন করা হইয়াছে, এবং ইহার ভার এক-একজন মন্ত্রীর উপর অর্পিত হইয়াছে। শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতির জন্য এবং বৈদেশিক প্রতিযোগিতা হইতে দেশীয় শিল্পগুলিকে রক্ষার জন্য গবর্ণমেণ্ট একটি শুল্ক-নির্দ্ধারণ-সমিতি (Tariff Board) গঠন করিযাছেন। এই সমিতি নানা প্রয়োজনীয় উপায় অবলম্বন করিয়া আমাদের দেশের নিজস্ব শিল্প-বাণিজ্যের রক্ষা ও উন্নতি বিধানে তৎপর আছেন। শ্রমজীবিদিগের আর্থিক উন্নতি ও কল্যাণের জন্যও গবর্ণমেণ্ট নূতন নূতন শ্রমিকবিধির (Factory laws) প্রবর্ত্তন করিয়াছেন।

শ্রমিক-বিধি।

কুটীর-শিল্প

এদেশে কুটীর-শিল্পের দিকেও গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে, এবং কুটীর-শিল্পের উন্নতিকল্পে নানাবিধ ব্যবস্থা কবা হইয়াছে।

গমনাগমন ও সংবাদ-প্রেরণের সুবিধা।—ইংরেজ-শাসনকর্তৃগণ যাতায়াত (Transport) ও সংবাদ-প্রেরণের সুবন্দোবস্ত করিয়া ভারতবর্ষের এক মহৎ উপকার সাধন করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা বিচ্ছিন্ন ভারতকে পৃথিবীর সঙ্গে যুক্ত করিয়া নিগূঢ় আন্তর্জ্জাতিক সম্বন্ধের মধ্যে আনিয়া ফেলিয়াছেন। হিন্দু ও মুসলমান আমলে এদেশে অনেক রাজপথ নির্ম্মিত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু তাহাতে এরূপ বিশাল দেশের অভাব কিছুমাত্র পূর্ণ হয় নাই। ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট এদেশে অগণিত অর্থব্যয়ে বহু প্রশস্ত ও দীর্ঘ রাস্তা, খাল ও সেতু নির্ম্মাণ করিয়াছেন। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আমাদের দেশে ষ্টীমার ও রেলপথের প্রচলন হইয়াছে এবং বর্ত্তমানে সমস্ত ভারতে রেলপথ জালের মত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। রেল ও ষ্টীমার প্রভৃতি প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য দ্রুত প্রসার লাভ করিয়াছে এবং দূরের মানুষ নিকটে আসিয়াছে। ইহা ব্যতীত মোটর, এরোপ্লেন, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, ডাকঘর ও বেতার প্রভৃতি আধুনিক বৈজ্ঞানিক

পথঘাট

রেলওয়ে, ষ্টীমার, মোটর, এরোপ্লেন, টেলিগ্রাফ,

টেলিফোন, ইত্যাদি

আবিষ্কারগুলির প্রচলন হওয়ায় যাতায়াত ও সংবাদ-প্রেরণের অভাবনীয় সুবিধা হইয়াছে এবং ভারতবর্ষ পৃথিবীর অন্যান্য সকল দেশের সহিত অতি ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। ভারতের ভবিষ্যৎ এখন পৃথিবীর ইতিহাসের অঙ্গীভূত।

STUDIES AND QUESTIONS

1. Briefly review the rise and growth of British administration in India.

2. Summarise the main provisions of the Government of India Act of 1935.

পরিশিষ্ট (ক)

বংশ-তালিকা

মগধের বিভিন্ন রাজবংশ

(ক) হর্য্যঙ্ক বংশ

(১) প্রতিষ্ঠাতা—অজ্ঞাত

(২) ২য় ও ৩য় রাজা—অজ্ঞাত

(৪) বিম্বিসার
|
(৫) অজাতশত্রু
|
(৬) উদয়ী

(খ) শিশুনাগ বংশ

(১) শিশুনাগ

অন্যান্য রাজার নাম অজ্ঞাত

(গ) নন্দ বংশ

মহাপদ্ম নন্দ
|
ধননন্দ (শেষ রাজা)

(ঘ) মৌর্য্য বংশ

(আনুমানিক ৩২১-১৮৫ খৃঃ পূঃ)

(১) চন্দ্রগুপ্ত (৩২১-২৯৭ খৃঃ পূঃ)
|
(২) বিন্দুসার (২৯৭-২৭৩ খৃঃ পূঃ)
|
(৩) অশোক (২৭৩-২৩২ খৃঃ পূঃ)
|
(৪) কুনাল
|
(৫) সুযশস্
|
(৬) সম্প্রতি
|
(৭) শালিশূক
|
(৮) দেববর্দ্মন্
|
(৯) শতধন্ব
|
(১০) বৃহদ্রথ

(ঙ) শুঙ্গ বংশ

(১) পুষ্যমিত্র
|
(২) অগ্নিমিত্র
|
(৩) বসুমিত্র

অন্যান্য রাজার নাম অজ্ঞাত

(চ) কণ্ব বংশ

(১) বাসুদেব

অন্যান্য রাজার নাম অজ্ঞাত

(ছ) গুপ্ত বংশ

(১) ১ম চন্দ্রগুপ্ত (৩২০-৩৩৫)

(২) সমুদ্রগুপ্ত (৩৩৫-৩৭৫)

(৩) ২য় চন্দ্রগুপ্ত (৩৭৫-৪১৪)

(৪) ১ম কুমারগুপ্ত (৪১৪-৫৫)

২য় কুমারগুপ্ত

বালাদিত্য

বজ্র

কনৌজের বিভিন্ন রাজবংশ

(ক) পুষ্যভুতি বংশ

(১) প্রভাকরবর্দ্ধন

(২) রাজ্যবর্দ্ধন

(৩) হর্ষবর্দ্ধন

(৪) ধ্রুবসেন—হর্ষের জামাতা

(৫) ধরসেন

(খ) (১) যশোধর্ম্মন্ (বংশ অজ্ঞাত)

(গ) (১) ইন্দ্রায়ুধ (বংশ অজ্ঞাত)

(ঘ) (১) চক্রায়ুধ (বংশ অজ্ঞাত) পালরাজগণের আশ্রিত
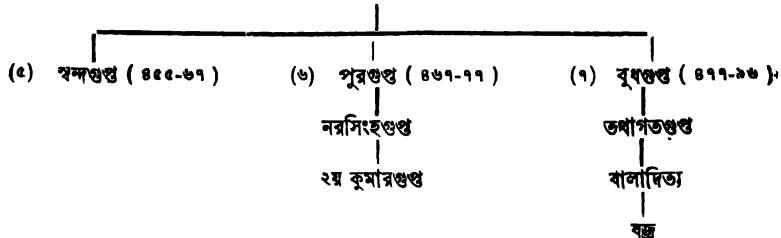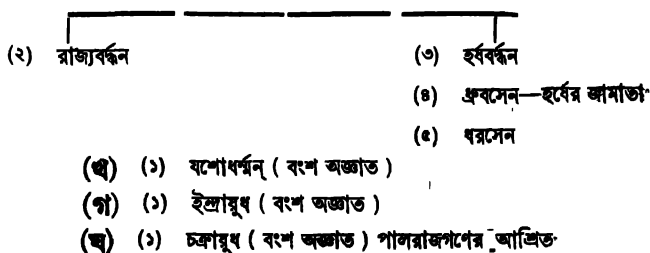
(ঙ) গুর্জ্জর-প্রতিহার বংশ

(১) নাগভট (৮১৫-৩৩)
|
(২) নাগভটের পুত্র (নাম অজ্ঞাত) (৮৩৩-৩৬)
|
(৩) ভোজ (৮৩৬-৯০)
|
(৪) মহেন্দ্রপাল (৮৯০-৯০৮)
|
(৫) মহীপাল
|
(৬) রাজ্যপাল (শেষ রাজা)

(চ) গাহড়বাল বংশ

প্রতিষ্ঠাতা—অজ্ঞাত

গোবিন্দচন্দ্র—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজা (১১১৪-৫৪)
|
পুত্র নাম অজ্ঞাত (১১৫৪-৭০)
|
জয়চন্দ্র (১১৭০-৯৪)

বাংলার পাল বংশের রাজগণ

(৯) প্রথম মহীপাল (৯৯২-১০৪০

(১০) নয়পাল (১০৪০-৫৫)

(১১) ৩য় বিগ্রহপাল (১০৫৫-৮১)

(১২) ২য় মহীপাল (১০৮১-৮২)

১৩) শূরপাল (১০৮২-৮৪) (১৪) রামপাল (১০৮৪-১১২৬)

(১৫) কুমারপাল (১১২৬-৩০) (১৬) তৃতীয় গোপাল (১১৩০)

(১৭) মদনপাল (১১৩০-৫০)

বাংলার সেনবংশের রাজগণ

(১) সামন্ত সেন ১০৫০-৭৪)

(২) হেমন্ত সেন (১০৭৫-৯৭)

(৩) বিজয় সেন (১০৯৭-১১৫৯)

(৪) বল্লাল সেন (১১৫৯-৮৫

(৫) লক্ষ্মণ সেন (১১৮৫-১২০৬)

বিশ্বরূপ সেন (১২০৬-২৫) (৭) কেশব সেন (১২২৫-৩০)
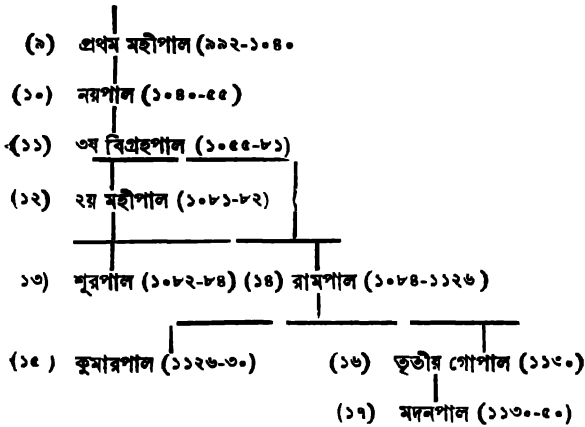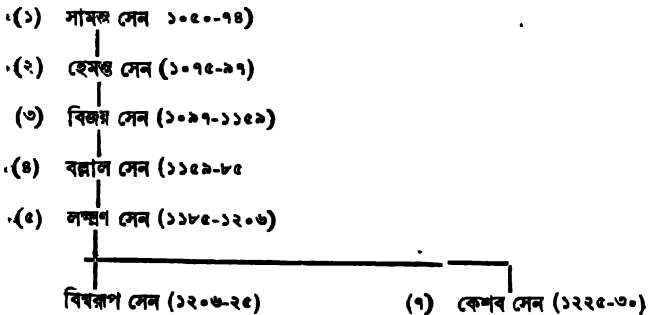
পরিশিষ্ট (খ)

সুলতানী রাজবংশ

(ক) দাস বংশ (১২০৬-৯০)

(১) কুতব্ উদ্দীন (১২০৬-১০)—মহম্মদ ঘুরীর ক্রীতদাস

২ অরাম (দত্তক পুত্র)—(১২১০) (সিংহাসনচ্যুত)

(৩) ইলতুত্‌মিস (১২১০-৩৬)—কুতব্‌উদ্দীনের জামাতা
(৪) রুক্‌নউদ্দীন (১২৩৬) সিংহাসনচ্যুত ও নিহত
(৫) রজিয়া (১২৩৬-৪০)
(৬) মুই্‌জউদ্দীন (১২৪০-৪২)
(৮) নাসিরউদ্দীন মামুদ (১২৪৬-৬৬)
(৭) আলাউদ্দীন মামুদ—(১২৪২-৪৬)
(৯) গিয়াস্‌উদ্দীন বলবন (১২৬৬-৮৭)—নাসিরউদ্দীনের শ্বশুর
(১০) কায়কোবাদ (১২৮৭-৯০)
(খ) খল্‌জী বংশ (১২৯০-১৩২০)
(১) জলালউদ্দীন খল্‌জি (১২৯০-১২৯৬)
(২) রুকনউদ্দীন (১২৯৬)—সিংহাসনচ্যুত
(৩) আলাউদ্দীন খল্‌জি ১২৯৬-১৩১৬)—জলালউদ্দীনের ভ্রাতুষ্পুত্র
(৪) শাহব্‌উদ্দীন মুবারক (১৩১৬)—নিহত
(৫) কুতব্‌উদ্দীন মুবারক (১৩১৬-২০)
(৬) নাসীরউদ্দীন খুসরু (১৩২০)—কুতব্‌উদ্দীন মুবারকের কর্ম্মচারী
(গ) তুঘ্‌লুক বংশ (১৩২০-১৪১৩)
(১) ঘিয়াসউদ্দীন তুঘ্‌লক্‌ (১৩২০-২৫)
(২) মুহম্মদ বিন্‌ তুঘ্‌লুক (১৩২৫-৫১)
(৩) ফিরুজ শাহ তুঘ্‌লুক (১৩৫১-৮৮)—মুহম্মদ তুঘ্‌লুকের খুল্লতাত-পুত্র
ফতে খাঁ
জাফর খাঁ
(৬) নাসিরউদ্দীন মুহম্মদ (১৩৯০-৯৪)
(৮) নসরৎসা (১৩৯৪-৯৮)
(৪) ২য় ঘিয়াসউদ্দীন তুঘ্‌লুক্‌ (১৩৮৮-৮৯)
(৫) আবুবকর (১৩৮৯-৯০)
৭) আলাউদ্দীন শিকন্দর (১৩৯৪)
(৯) মামুদ শাহ (১৩৯৯-১৪১৩)
(ঘ) সৈয়দ বংশ (১৪১৪-৫১)
(১) খিজ্‌র খাঁ ১৪১৪-২১
(২) মুইজ্‌ উদ্দীন (১৪২২-১৪৩৪)
ফরিদ খাঁ
(৩) মুহম্মদ শাহ (১৪৩৪-৪৫)
(৪) আলাউদ্দীন আলমশাহ (১৪৪৫-৫১)

(ঙ) লোদী বংশ (১৪৫১-১৫২৬)

(১) বহ্‌লুল লোদী (১৪৫১-৮৯)
|
(২) সিকন্দর লোদী (১৪৮৯-১৫১৭)
|
(৩) ইব্রাহিম লোদী (১৫১৭-২৬) পাণিপথের যুদ্ধে নিহত, পাঠান বংশের লোপ ও মুঘল রাজবংশের প্রতিষ্ঠা

(চ) মুঘল রাজবংশ (১৫২৬-৩৯)

(১) বাবুর (১৫২৬-৩০) মুঘল রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা
|
(২) হুমায়ুন (১৫৩০-৩৯

(ছ) স্থর বংশ (১৫৩৯-৫৬)

(১) শেরশাহ ১৫৩৯-৪৫)
|
২) ইস্‌লাম শাহ (১৫৪৫-৫৪)
|
(৩) মুহম্মদ আদিল শাহ (১৫৫৪-৫৫)—শের শাহের ভ্রাতুষ্পুত্র

মুঘল রাজবংশ (১৫৫৫-১৭১২)

পরবর্ত্তী মুঘল রাজবংশের সম্রাটগণ (১৭১২-১৮৮৫)

(৭) বাহাদুর শাহ (১৭০৭-১২)
|
(৮) জহান্দর শাহ (১৭১২-১৩)

[৯] ফর্‌রুখ্‌ শিয়র [১৭১৩-১৯]—জহান্দর শার ভ্রাতুষ্পুত্র
[১০] রফিউদ্‌দরজাৎ [১৭১৯]—জহান্দর শার ভ্রাতুষ্পুত্র
[১১] নেকুসিয়র [১৭১৯]—বাহাদুর শার ভ্রাতুষ্পুত্র
[১২] দ্বিতীয় শাহ্‌জহান [১৭১৯]—জহান্দর শার ভ্রাতুষ্পুত্র
[১৩] মুহম্মদ শাহ [১৭১৯-৪৮]—জহান্দর শার ভ্রাতুষ্পুত্র
[১৪] আহম্মদ শাহ [১৭৪৮-৫৪]
[১৫] দ্বিতীয় আলম্‌গীর [১৭৫৪-৫৯]—জহান্দর শার পুত্র
[১৬] তৃতীয় শাহ্‌জহান [১৭৫৯-৬০]—নেকুসিযরের পুত্র
[১৭] দ্বিতীয় শাহ্‌ আলম [১৭৬০-১৮০৬]—দ্বিতীয় আলমগীরের পুত্র
[১৮] দ্বিতীয় আকবর [১৮০৬-৩৭]
[১৯] দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ [১৮৩৭-৫৮]

মারাঠা রাজবংশ

[১] শিবাজীর [জন্ম ১৬২৭, মৃত্যু ১৬৮০]

[২] প্রথম শম্ভুজী [১৬৮০-৮৯]
[৫] তৃতীয় শিবাজী [১৭১২-৪৯]

[৩] রাজারাম [১৬৮৯-১৭০০]
[৪] দ্বিতীয় শিবাজী [১৭০০-১২]
[৬] রামরাজা
[৭] দ্বিতীয় শাহু দত্তকপুত্র

পেশবাগণ

বালাজী বিশ্বনাথ [১৭১৪-২০]
[২] প্রথম বাজীরাও [১৭২০-৪০]

[৩] বালাজী বাজীরাও [১৭৪১-৬১]
[৬] রঘুনাথ রাও [১৭৭৩-৭৪]

[৪] ১ম মাধব রাও [১৭৬১-৭২]
[৫] নারায়ণ রাও [১৭৭২-৭৩]
[৭] ২য় মাধব রাও (১৭৭৪-৯৬)
(৮) ২য় বাজীরাও (১৭৯৬-১৮১৮)
(৯) নানাসাহেব দত্তক পুত্র

পরিশিষ্ট (গ)

ইংরেজ আমলে শাসনকর্ত্তৃগণ

(১) বাঙ্গালার গবর্ণর

লর্ড ক্লাইভ	...	...	১৭৬৫-৬৭
ভেরেলষ্ট	...	...	১৭৬৭-৬৯
কার্টিয়ার	...	...	১৭৬৯-৭২
ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্	...	...	১৭৭২-৭৪

(২) বাঙ্গালার গভর্ণর-জেনারেল

(লর্ড নর্থের 'রেগুলেটিং অ্যাক্ট' অনুসারে)

ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্	...	...	১৭৭৪-৮৫
*স্যার জন ম্যাক্ফারসন	...	...	১৭৮৫-৮৬
লর্ড কর্ণওয়ালিস্	...	...	১৭৮৬-৯৩
স্যার জন্ শোর	...	...	১৭৯৩-৯৮
*স্যার এ ক্লার্ক	...	...	১৭৯৮
লর্ড ওয়েলেস্লী	...	...	১৭৯৮-১৮০৫
লর্ড কর্ণওয়ালিস্	...	...	১৮০৫
*স্যার জর্জ্জ বার্লো	...	...	১৮০৫-১৮০৭
প্রথম লর্ড মিণ্টো	...	...	১৮০৭-১৮১৩
লর্ড ময়রা (লর্ড হেষ্টিংস্)	...	...	১৮১৩-২৩
*জন্ অ্যাডাম	...	...	১৮২৩
লর্ড আমহার্ষ্ট	...	...	১৮২৩-২৮
*উইলিয়ম বেলী	...	...	১৮২৮
লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক	...	...	১৮২৮-৩৩

(৩) ভারতের গভর্ণর-জেনারেল

(১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের সনন্দ অনুসারে)

লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক	...	...	১৮৩৩-৩৫
*স্যার চার্লস মেট্কাফ	...	...	১৮৩৫-৩৬
লর্ড অক্ল্যাণ্ড	...	...	১৮৩৬-৪২
লর্ড এলেন্বরা	...	...	১৮৪২-৪৪
*উইলিয়ম বার্ড	...	...	১৮৪৪

---

*অস্থায়ী

প্রথম লর্ড হার্ডিঞ্জ	...	...	১৮৪৪-৪৮
লর্ড ডালহৌসী	...	...	১৮৪৮-৫৬
লর্ড ক্যানিং	...	...	১৮৫৬-৫৮

(৪) ভারতের গবর্ণর-জেনারেল ও ভাইসরয়

(১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ভারত-শাসন আইন অনুসারে)

লর্ড ক্যানিং	...	...	১৮৫৮-৬২
প্রথম লর্ড এল্‌গিন	...	...	১৮৬২-৬৩
*লর্ড নেপিয়ার	...	..	১৮৬৩
*স্যর উইলিয়ম ডেনিসন	...	...	১৮৬৩
লর্ড লরেন্স	...	.	১৮৬৪-৬৯
লর্ড মেয়ো	...	...	১৮৬৯-৭২
লর্ড নর্থব্রুক	...	...	১৮৭২-৭৬
লর্ড লিটন (১)	...	...	১৮৭৬-৮০
লর্ড রিপন	...	...	১৮৮০-৮৪
লর্ড ডফ্‌রিণ	...	...	১৮৮৪-৮৮
লর্ড ল্যান্সডাউন	...	...	১৮৮৮-৯৪
দ্বিতীয় লর্ড এল্‌গিন	...	...	১৮৯৪-৯৯
লর্ড কার্জ্জন	...	...	১৮৯৯-১৯০৫
*লর্ড এম্পথিল	...	...	১৯০৫
দ্বিতীয় লর্ড মিণ্টো	...	...	১৯০৫-১০
দ্বিতীয় লর্ড হার্ডিঞ্জ	...	...	১৯১০-১৬
লর্ড চেম্‌সফোর্ড	...	...	১৯১৬-২১
লর্ড রেডিং	...	...	১৯২১-২৬
*লর্ড লিটন (২)	...	...	১৯২৬
লর্ড আরউইন	...	...	১৯২৬-৩১
*লর্ড গোসেন	...	...	১৯৩১
লর্ড উইলিংডন	...	...	১৯৩১-৩৬
*স্যর জর্জ্জ ষ্ট্যান্‌লী	...	...	১৯৩৬
লর্ড লিন্‌লিথগো	...	...	১৯৩৬-৪৩
লর্ড ওয়াভেল	...	...	১৯৪৩ অক্টোবর -১৯৪৬

*অস্থায়ী

পরিশিষ্ট (ঘ)

বৃটিশ কর্ত্তৃক প্রাপ্ত রাজ্যসমূহ

[১] মান্দ্রাজ ক্রয়—(১৬৩০)

[২] বোম্বাই প্রাপ্তি—(১৬৬৯)

[৩] কলিকাতা প্রাপ্তি—(১৬৯০)

ক্লাইভের শাসনকালে

[৪] বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ—(১৭৬৫)

ওয়ারেণ হেষ্টিংসের শাসনকালে

[৫] সল্‌সেট—(১৭৮২)

কর্ণওয়ালিসের শাসনকালে

[৬] মালাবার, কুর্গ. মদুরা ও সালেমের কিয়দংশ—(১৭৯২)

ওয়েলেস্‌লীর শাসনকালে

[৭] তাঞ্জোর ও সুরাট (১৭৯৯), মহীশূরের কতকাংশ (১৭৯৯), রোহিলখণ্ড, কর্ণাটক ও গোরক্ষপুর (১৮০১) এবং উড়িষ্যা, দিল্লী ও আগ্রা (১৮০৩)

আমহার্ষ্টের শাসনকালে

[৮] আসাম, আরাকান ও টেনাসেরিম—(১৮২৬)

বেণ্টিঙ্কের শাসনকালে

[৯] কাছাড় (১৮৩০), কুর্গ (১৮৩৪)

এলেন্‌বরার শাসনকালে

[১০] সিন্ধু প্রদেশ—(১৮১৩)

হার্ডিঞ্জের শাসনকালে

[১১] জলন্ধর দোয়াব—(১৮৪৬)

ডালহৌসীর শাসনকালে

[১২] ঝান্সি ও সাতারা (১৮৪৮), পঞ্জাব (১৮৪৯), পেগু (১৮৫২), বেরার (১৮৫৩), নাগপুরঃ (১৮৫৪), অযোধ্যা (১৮৫৬)

লরেন্সের শাসনকালে

[১৩] দোয়াব প্রদেশ—(১৮৭৫)

লিটনের শাসনকালে

[১৪] কোয়েটা, কুরাম—(১৮৭৮)

ডফ্‌রিণের শাসনকালে

[১৫] উত্তর ব্রহ্মদেশ (১৮৮৪)